RARE BOOK

# পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন
# ও
# সমকালীন কবিতা : ১৯৪৭ - ১৯৭১

মোঃ সাঈদ-উর রহমান

Dhaka University Library
A170519

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য
প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ
১৯৭৮

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

DACCA UNIVERSITY LIBRARY

| | | | |
|---|---|---|---|
| Accession No. | A | 170519 | 83. |
| Stamped | | Book Carded | |
| Classified | | Labelled | A |
| Catalogued | | Checked | |
| Typed | | Shelved | |

RE
954.92
SAL

Dhaka University Institutional Repository

## পূর্বকথা

পাকিস্তান-আমলে পূর্ব বাংলার জনমানসে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তার যে-পরিবর্তন হয়েছে, তার পটভূমিতে সে-সময়ের কবিতা পর্যালোচনাই এই গবেষণার লক্ষ্য। কবিতার, তথা যে-কোনো শিল্পকর্মের, শিকড় সমকালীন সমাজের গর্ভে প্রোথিত থাকে, এবং সমসাময়িক জীবনের আলোবাতাসে তা বিকশিত হয়। অথচ, ইতিপূর্বে পূর্ব বাংলার কবিতা নিয়ে, বিচ্ছিন্নভাবে হলেও, যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরা প্রাধান্য দিয়েছেন নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে। সামগ্রিকভাবে ও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে সমসাময়িক জীবনের সাথে একে সম্পর্কিত করার কোনো চেষ্টা বিশেষ হয়নি। সেই অভাববোধই আমাকে উৎসাহিত করেছে এই গবেষণা-কর্মে।

১৯৭২ সালের জুলাই মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি-প্রাপ্ত গবেষক হিসাবে বাংলা বিভাগে সংশ্লিষ্ট থেকে আমি গবেষণা শুরু করি। ১৯৭৫ সালের সেপটেম্বর মাসে বিভাগে শিক্ষকরূপে যোগ দেওয়ার পরও কাজ অব্যাহত থাকে। তারই ফল এই অভিসন্দর্ভ।

আমার বৃত্তিলাভের ব্যাপারে বিশেষভাবে উদযোগী হয়েছিলেন বাংলা বিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ ডকটর মিসেস নীলিমা ইব্রাহিম। পরবর্তীকালে বিভিন্ন জটিলতার সময় সাহায্য করেছেন কলা অনুষদের ডীন ও বাংলা বিভাগের বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক ডকটর আহমদ শরীফ ও আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ডকটর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।

গবেষণাকালে ডকটর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের সহযোগিতা ও পরামর্শ পেয়েছি সর্বপ্রকারে। তাঁর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে আমি অধিকাংশ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি; কিন্তু সাহিত্যকর্মের মূল্যায়ন-প্রসঙ্গে তিনি সর্বদা জোর দিয়েছেন আমার নিজস্ব বিচার-

Dhaka University Institutional Repository

সূফি পুরুষদের উপর। তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পেরেও আমি বেশ লাভবান হয়েছি।

দীর্ঘ ছয় বছরে আমাকে আরো অনেকে সাহায্য করেছেন। সবার নামোল্লেখ সম্ভব নয়, তবে কয়েকজনের কথা অবশ্যই উল্লেখ্য। গবেষণা-কর্মে আমাকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন মরহুম অধ্যাপক ইদরিস আলী। কোনো-কোনো মতামত সংশোধন করেছি অধ্যাপক ডক্টর আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক ডক্টর আবু হেনা মোস্তফা কামাল ও অধ্যাপক ডক্টর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনা করে। বিভাগে আমার সহকর্মী-বন্ধু জনাব আবুল কাসেম ফজলুল হক, জনাব আহমদ কবির, জনাব মনসুর মুসা ও জনাব মোহাম্মদ আবু জাফরের সঙ্গে আলাপ করেও উপকৃত হয়েছি। সংকটকালে আমার পাশে ছিলেন আরো দুজন ঃ ভূঁইয়া মোঃ ইকবাল ও আহমেদ কামাল।

যাঁদের নামোল্লেখ করেছি এবং যাঁদের করতে পারিনি, এই সুযোগে তাঁদের সবার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। জনাব আবু তালেব অত্যন্ত যত্ন নিয়ে অভিসন্দর্ভটি টাইপ করেছেন — তাঁকেও আমি ধন্যবাদ জানাই।

ঢাকা
২৫-এ বৈশাখ, ১৩৮৫

মোঃ সাঈদ-উর রহমান
প্রভাষক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

# সূচী

অবতরণিকা : ক – ট

## রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পরিচয়

### প্রথম অধ্যায় : ১৯৪৭ – ১৯৫৪

রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ

পূর্ব বাংলার পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি : ১, বঙ্গীয় মুসলিম লীগ : ৪, কমিউনিস্ট পার্টি : ৭, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের উত্থান : ১১, গণতান্ত্রিক যুব লীগ : ৯, পাকিস্তান যুবলীগ : ১৩, গণতন্ত্রী দলের জন্ম : ১৩, কৃষক-শ্রমিক পার্টি : ১৩, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার বিভিন্ন প্রস্তাব ও পূর্ব বাংলায় এর প্রতিক্রিয়া : ১৫, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা : ১৮

সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহ

প্রগতি লেখক সংঘ : ২৪, পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি : ২৫, পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ : ২৫, পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস : ২৬, সংস্কৃতি সংসদ : ২৭, বাংলা ভাষার উপর হামলা ও প্রতিরোধ — বাংলা ভাষার শব্দসম্ভারে পরিবর্তন করার চেষ্টা : ২৯, বাংলা ভাষার হরফ পরিবর্তনের চেষ্টা : ৩০, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন : ৩৩, সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলন — পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সম্মেলন : ঢাকা : ৩৭, পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন : চট্টগ্রাম : ৩৮, পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন : কুমিল্লা : ৪০, ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন : ঢাকা : ৪২, পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সম্মেলন : ঢাকা : ৪৪

আলোচ্য পর্বের কবিতার গতি-প্রকৃতি : ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

## দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ১৯৫৪ – ১৯৫৮

### রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করা ঃ ৪৯, গণপরিষদ পুনর্গঠন ও পূর্ব বাংলার ভাষা-বিতর্ক ঃ ৫০, পূর্ববাংলা মন্ত্রিসভার কার্যাবলী ঃ ৫৩, গণপরিষদের মাধ্যমে কেন্দ্রে সরকার গঠন ঃ ৫৭, কাগমারীতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির জন্ম ঃ ৫৮, পূর্ব পাকিস্তান যুবক সমিতির প্রতিষ্ঠা ঃ ৬১

### সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহ

কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন ঃ ৬২, সিপাহী বিদ্রোহ শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান ঃ ৬৫, [illegible] সাহিত্য-সম্মেলন ঃ ৬৭, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে পূর্ববাংলার সাহিত্য-সম্পর্কে আলোচনা ঃ ৭০, পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সম্মেলন ঃ চট্টগ্রাম ঃ ৭২

আলোচ্য পর্বের কবিতার গতি-প্রকৃতি ঃ ৭৬

## তৃতীয় অধ্যায় ঃ ১৯৫৮ – ১৯৬৫

### রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ

১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি ঃ ৮২, আইয়ুব খানের কার্যাবলী ঃ ৮৪, ছাত্র আন্দোলন ঃ ৯১, রাজনৈতিক দলসমূহের কার্যক্রম ঃ ১০০, ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট-নির্বাচন ঃ ১০২

### সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহ

রোমান হরফ প্রবর্তন ও জাতীয় ভাষা সৃষ্টির উদ্যোগ ঃ ১০৬, পাকিস্তান লেখক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা ঃ ১০৯, রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী উদযাপন ঃ ১১২, ছায়ানটের প্রতিষ্ঠা ঃ ১১৬, ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ঃ ১১৭, পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান ঃ ১১৯

আলোচ্য পর্বের কবিতার গতি-প্রকৃতি ঃ ১২০

Dhaka University Institutional Repository


## চতুর্থ অধ্যায় : ১৯৬৫ – ১৯৬৯

### রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ

পাক-ভারত সংঘর্ষ ও ছয় দফার জন্ম : ১২৩, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির তৎপরতা ও দ্বিধা বিভক্তি : ১২৮, পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্ম : ১৩০, উর্দু হরফ প্রচলন : ১৩১, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা : ১৩২, ঊনসত্তরের গণআন্দোলন ও সামরিক আইন জারি : ১৩৫

### সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহ

পাক-ভারত সংঘর্ষের প্রভাব : ১৪৪, নজরুল একাডেমীর প্রতিষ্ঠা ও কার্যকলাপ : ১৪৭, রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্পর্কিত বিতর্ক : ১৪৯, বাংলা ভাষা সংস্কার ও জাতীয় ভাষা সৃষ্টির চেষ্টা : ১৫২, লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চল শাখার তৎপরতা — মহাকবি স্মরণোৎসব : ১৬০, আফ্রো-এশীয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : ১৬৩

আলোচ্য পর্বের কবিতার গতি-প্রকৃতি : ১৬৬

## পঞ্চম অধ্যায় : ১৯৬৯ – ১৯৭১

### রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহ

ইয়াহিয়া খানের গৃহীত ব্যবস্থা : ১৬৮, রাজনৈতিক দলসমূহের তৎপরতা : ১৬৯, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা : ১৭৪

### সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহ

পুস্তক বাজেয়াপ্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন : ১৭৯, নবপর্যায়ে জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা : ১৮২, 'পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টি' বিরোধী আন্দোলন : ১৮৩

আলোচ্য পর্বের কবিতার গতি-প্রকৃতি : ১৮৬

Dhaka University Institutional Repository

কবিতার আলোচনা

## ষষ্ঠ অধ্যায়

### পাকিস্তান ও ইসলাম বিষয়ক কবিতা

গোলাম মোস্তফা : ১৯১, মুফী জুলফিকার হায়দার : ২০৪, জসীমউদ্দীন : ২১৩, রওশন ইজদানী : ২২৫, ফররুখ আহমদ : ২৩৩, তালিম হোসেন : ২৪০, মুফাখ্খারুল ইসলাম : ২৫৭, সৈয়দ আলী আহসান : ২৬২, কয়েকজন অনুবাদক কবির কয়েকটি কাব্য : ২৬৯, পাকিস্তান ভিত্তিক বাংলা কবিতা : ২৭৮, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত যুদ্ধসম্পৃক্ত কবিতা : ২৮৩, আলোচ্য বিষয়ে রচিত আরো কয়েকটি কাব্যের তালিকা : ২৯০

## সপ্তম অধ্যায়

### উদারনৈতিক মানবতাবাদের কবিতা

বেগম সুফিয়া কামাল : ২৯৯, সিকানদার আবু জাফর : ৩০৫, আহসান হাবীব : ৩১৪, সৈয়দ আলী আহসান : ৩২৩, সানাউল হক : ৩২৮, আবদুল গনি হাজারী : ৩৩৪, আশরাফ সিদ্দিকী : ৩৪৪, শামসুর রাহমান : ৩৫৪, হাসান হাফিজুর রহমান : ৩৬৯, সৈয়দ শামসুল হক : ৩৭১, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : ৩৮৩, আল মাহমুদ : ৩৯০, ওমর শাহাবুদ্দীন : ৪০০, শহীদ কাদরী : ৪০৩, বাছাই কবিতা : ৪১০

## অষ্টম অধ্যায়

### বাঙালী জাতীয়তাবাদমূলক কবিতা

একুশে ফেব্রুয়ারী বিষয়ক কবিতা : ৪২৫, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক কবিতা : ৪৩৯, পূর্ব বাংলা বিষয়ক কবিতা : ৪৪৬, পাকিস্তান-বিরোধী বাংলা কবিতা : ৪৫৫, বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিষয়ক কবিতা : ৪৬০

## নবম অধ্যায়

### বিদ্রোহ বিপ্লব ও গণজাগরণমূলক কবিতা

নতুন পৃথিবীর কথা : ৪৭২, মরণ মিছিল : ৪৭৬, আজিজুল হাকিমের কবিতা : ৪৭৮, আফ্রিকার হৃদয়ে সূর্যোদয় : ৪৮২, মানচিত্র : ৪৮৬, মিছিল : ৪৯০, জীবনের সুখে আনন্দের কবিতা : ৪৯২,

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালী চেতনার মত পুনর : ৪১৪, মতের কারবার : ৪১৭, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক কবিতা : ৫০২, বর্ণ তান্ত্রিক কবিতা : ৫১১, ইসলামী ভাবধারার কবিতা : ৫১৬

## দশম অধ্যায়

### অনুবাদ কবিতা

ইংরেজের কবিতা : ৫২১, ফরাসী কবিতা : ৫২৮, রোমান্টিক কবিতা : ৫৩৪, অগ্রগামী কবিতা : ৫৪১

## একাদশ অধ্যায়

উপসংহার : ৫৪৭

### পরিশিষ্ট

১ আলোচিত কাব্যসমূহের তালিকা : ৫৬৪

২ পাকিস্তান আমলে প্রকাশিত কাব্য-সংকলন সমূহের (মৌলিক ও অনুবাদ) কালানুক্রমিক তালিকা : ৫৭৯

গ্রন্থপঞ্জী : ৬২১

Dhaka University Institutional Repository



## অবতরণিকা

বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ইতিহাসে কবিতাই সবচেয়ে বেশি বিকাশ লাভ করেছে। বাঙালী-প্রতিভা সাহিত্যের এ-শাখায় যত বেশি স্ফূর্তি লাভ করেছে অন্য কোনো শাখাতে তেমন পারেনি। বাঙালী-মানসের স্পষ্ট পরিচয়ও পাওয়া যায় কবিতার মধ্যেই।

প্রাচীন কালের কবিদের সম্পর্কে কিংবদন্তি আছে তাঁদের প্রতিভা ছিল অলৌকিক, কবিতা-রচনায় তাঁরা সাহায্য পেতেন আরাধ্য দেবদেবীর ; জয়দেবকে গীতগোবিন্দের অংশ-বিশেষ রচনা করে দিয়েছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, দেবাদিদেব মহাদেব ভৃত্যবেশে অবস্থান করতেন বিদ্যাপতির বাড়িতে, চণ্ডী দেবী মুকুন্দরামকে মঙ্গল কাব্য রচনার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন স্বপ্নের মাধ্যমে। আধুনিক কালের কবিরাও কিন্তু কবিতাকে অলৌকিকতার প্রভাবমুক্ত করতে পারেননি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাকাব্য রচনার শুরুতে সাহায্য আকাঙ্ক্ষা করেছেন দেবী ভারতীর, বিহারীলাল বন্দনা করতেন দেবী সারদার, আর রবীন্দ্রনাথ আস্থা স্থাপন করেছিলেন জীবনদেবতায়। এই ঐতিহ্যের সরণি বেয়েই মোহিতলাল মজুমদার কবিতার সংজ্ঞায় বলেছেন — 'কাব্যলক্ষ্মীর সঙ্গে আত্মার রতি-মুগ্ধ সম্ভোগকালে স্বতঃউচ্ছ্বসিত ভাবের দিব্য ভাবনিষ্ঠ পদপরম্পরাই কবিতা'।[১]

সংস্কৃত আলংকারিকেরা কবিতা-রচনাকে এত অলৌকিক মহিমামণ্ডিত না-করলেও বলেছেন একটি সফল কবিতা-পাঠের আনন্দ ব্রহ্মাস্বাদ আস্বাদ তুল্য। ইংরেজ রোমান্টিক কবিরাও কবি ও কবিতার জন্য সমাজে ও সাহিত্যে নির্দেশ করেছেন উচ্চতর স্থান। শেলীর মতে, কবিরা হলেন Unacknowledged Legislators of the World, কোলরীজ বলেছেন, কবিতা হল Best words in the Best Order , আর ওয়ার্ডসওয়ার্থ মনে করতেন Poetry is the Spontaneous overflow of powerful feelings.

---

১। শ্রীশচন্দ্র দাশ, সাহিত্য-সন্দর্শন, ৪র্থ সং, কলকাতা, ১৯৬৩, ৩১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

Dhaka University Institutional Repository



এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এ-কালের কবিতার আলোচনা করতে গেলে অসুবিধায় পড়তে হয়। কেননা কবিতার আবেদনপূর্ণ সুনির্বাচিত শব্দের জন্য অপেক্ষা না-করে সাধারণ পাঠকের চোখে একে দেখাই সংগত। অনুসারে

> I mean by poetry what a man means when he goes to a bookstore to buy a book of poems as a graduation gift, or when he is commissioned by a publisher to do an anthology of sixteenth century poems, Poetry is what looks like poetry, what sounds like poetry. It is a metrical composition.2

কবিতার প্রধান অবলম্বন কি ; এ-বিষয়ে একাধিক মত পাওয়া যায়। কারো-কারো মতে কবিতা ধ্বনি সর্বস্ব, শব্দই কবিতা; অন্য একদল বলেন, কবিতায় কবির প্রধান চেষ্টা বিশেষ বক্তব্য প্রকাশ করা; আর তৃতীয় এক দলের মতে, ধ্বনি নয়, বাচ্য নয়, বাচ্যাতিরিক্ত ব্যঞ্জনাই কবিতার প্রধান আকর্ষণ। মনে হয়, এর কোনো একটিকে অত্যধিক গুরুত্ব না-দিয়ে তিনটিকে প্রাধান্য দেওয়া দরকার ঃ অর্থাৎ অর্থ (Sense), ধ্বনি (Sound) ও ব্যঞ্জনা (Suggestion) — এই উপাদান ত্রয়ের যথাযথ সমবায়েই একটি সফল কবিতা জন্ম নেয়। একটি বিশেষ বস্তু, ঘটনা বা দৃশ্য দর্শনে কবির মনে যে প্রবল আবেগের ও জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হয়, ধ্বনি-শব্দ-চিত্র-ছন্দ-অলংকারের মাধ্যমে তাকে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করে, ব্যক্তিগত অনুভূতিকে সর্বজনের অনুভূতিতে পরিণত করতে পারাটাই কবির চেষ্টা। এই দৃষ্টিতে কবিতায় অর্থ ও বক্তব্যের গুরুত্ব প্রাথমিক।

> Great Poetry is always very highly charged with meaning, and it is this combination of significant words with other aspects of language such as sound, 'colour', rhyme, and emotional association which produce the poetic effect.3

---

২। J.V.Cunningham, 'Poetry, structure and Tradition', Tradition And Poetic Structure, (USA, Denver : Alan Swallow, 1960), p. 14

৩। David Daiches, The place of Meaning in poetry, (London, Edinburgh : Oliver & Boyd, 1935), pp. 78-79.

Dhaka University Institutional Repository

এই কবিতা কি সমকালের অন্য মানুষের চিন্তাভাবনার সঙ্গে সম্পর্কিত, না, একক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক ? এ-বিষয়ে সমালোচকেরা মত প্রকাশ করেছেন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে । সমাজবিজ্ঞানীর মতে সমাজ বিভক্ত দুভাগে : কাঠামো ও উপরিকাঠামো । উৎপাদন-পদ্ধতি ও উৎপাদন-সম্পর্ক নিয়ে গড়ে উঠে কাঠামোর স্তর, আর তার উপর তৈরী হয় মানুষের চিন্তা-ভাবনার স্তর উপরিকাঠামো । এ-দুয়ের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ, কিন্তু সবসময় সরাসরি ও একমুখীন নয় । কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করে উপরিকাঠামোকে, আবার উপরিকাঠামো প্রভাব ফেলে কাঠামোতে, যদিও এক্ষেত্রে পরিবর্তন আনয়নের উপর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না । কাঠামোর ভিত্তিতে উপরিকাঠামো গড়ে উঠলেও তার বিকাশ ও বিবর্তনের পদ্ধতি অনেকটা স্বতন্ত্র ও আভ্যন্তরীণ ।[৪]

উপরিকাঠামোর মধ্যে রয়েছে সাহিত্য-সংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতি । একই ভিত্তির উপর বিকশিত বলে এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রভাব বিদ্যমান । মাও সে তুং-এর কথায় :

> A given culture is the ideological reflection of the politics and economics of a given society.5

এই প্রভাব ও সম্পর্ক একালে যত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ, প্রাগাধুনিক কালে তেমন ছিলনা; বিশেষত বর্তমানে রাজনীতির প্রভাব হয়েছে সর্বগ্রাসী, তা স্পর্শ করেছে সমাজের প্রতিটি প্রত্যন্ত অঞ্চলকে । সেজন্য, বর্তমান যুগের কোনো বিশেষ এলাকার বিশেষ সময়ের কবিতার বিকাশে সেকালের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তা কি প্রভাব বিস্তার করেছে, তার আলোচনা চিত্তাকর্ষক হতে পারে ।

---

৪। D.I. Chesnokov, 'Basis and superstructure', <u>Historical Materialism</u>, (Moscow : Progress Publishers, 1969), pp. 273-280.

৫। Mao Tse-Tung, 'The culture of new Democracy', <u>On Literature And Art</u>, (Peking : Foreign Language Press, 1967), p. 58

Dhaka University Institutional Repository



## দুই

১৯৪০ সালের লাহোর-প্রস্তাবের মাধ্যমে পাকিস্তান-আন্দোলন একটি নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে, কিন্তু দেশবিভাগের প্রাক্কালে সে-প্রস্তাবে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। এ-পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালে বিভক্ত বঙ্গের একটি অংশ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ভিত্তিতে বণ্টিত হয়ে পূর্ব বাংলা নামে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এই অভাবিত-পূর্ব আকারে অন্তর্ভুক্তির ফলে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক দিকটি ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানের সংহতির বেলায় অপরাপর অঞ্চলের সঙ্গে পূর্ব বাংলার সম্পর্ক কিরূপ হবে; — পূর্ব বাংলা কি লাহোর প্রস্তাবানুযায়ী স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম হবে, না কি পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ নিয়ে অন্যান্য ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র প্রদেশের সঙ্গে সমমর্যাদাসম্পন্ন হবে, না কি কার্যকর সমাধান হবে অন্যরূপ — এটিই ছিল প্রধান জিজ্ঞাসা।

সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐতিহ্য নির্ণয়ের বিতর্ক দেখা দেয় চার প্রকারে : ঐতিহ্য হবে যুক্ত বাংলার হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধের মিলিত সাধনার প্রবহমান ঐতিহ্যের অংশ, ঐতিহ্য হবে ঐ ঐতিহ্যের শুধু ইসলামানুবর্তী ধারা, পূর্ব বাংলার ভূগোল-ইতিহাস-জনজীবনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ঐতিহ্যই হবে পূর্ব বাংলার ঐতিহ্যের রূপবিন্যাস, আর পূর্ব বাংলার কৃষ্টি ও তমদ্দুন হবে পাকিস্তানের অবশিষ্টাংশের ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই বিতর্কের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি।

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের, বিশেষত হিন্দুদের, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্নটিও বিশেষ জটিলতার সৃষ্টি করেছিল। যদিও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাক গণপরিষদের প্রথম বৈঠকেই ঘোষণা করেছিলেন যে, পাকিস্তানে হিন্দু-মুসলমান-বাঙালী-পাঠান সবাই স্বাতন্ত্র্যসূচক পরিচয় ত্যাগ করে এক অখণ্ড পাকিস্তানী জাতি হিসাবে গড়ে উঠবে, কিন্তু তা অনেকেরই মনঃপূত হয়নি এবং তাঁর মৃত্যুর পর সবাই তা ভুলে গেল।

Dhaka University Institutional Repository



অর্থনৈতিক-বিতর্ক ছিল উৎপাদন-পদ্ধতি নিয়ে। পূর্ব বাংলা সরকার জমিদারী প্রথা তুলে দিয়েছিল কিন্তু সামন্ত-স্বার্থকে উচ্ছেদ করেনি। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পরিকল্পনা ছিল মূল শিল্পসমূহকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার,[৬] কলকাতায় মুসলিম লীগ কর্মীদের সঙ্গে আলোচনায় তিনি এ-ও বলেছিলেন, স্পষ্টভাবে he had no sympathy with the capitalists,[7] অথচ পূর্ব বাংলা সরকারের প্রথম মুখ্য মন্ত্রী ও পরে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দিনের কাছে কমিউনিজম সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা ছিল ভীতিপ্রদ ব্যাপার।[৮] এরই মধ্যে ধীরে-ধীরে পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছিল ধনতান্ত্রিক পদ্ধতি, যদিও এদেশের শিক্ষিত তরুণ মধ্যবিত্তের ঝোঁক ছিল সমাজতন্ত্রের দিকে।

রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চালু থাকলে এই দুর্গতির কার্যকর সমাধান হয়ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেত, কিন্তু পাকিস্তানে আলোচ্য সময়ে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি, বরং ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র, সামরিক অভ্যুত্থান, নির্বাচনের রায় নস্যাৎকরণ, আমলাতন্ত্রের উপর অবাধ নির্ভরশীলতা, মৌলিক গণতন্ত্রের প্রবর্তন প্রভৃতিই প্রধান অবলম্বন ছিল। জনগণের বিক্ষোভও তাই, প্রকাশের স্বাভাবিক পথ না-পেয়ে, বার-বার বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থানের পথ নিয়েছে। এভাবে কোনো-কোনো প্রশ্নে আপাত-সমাধান পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু সরকারী ঐসব সমাধানের সঙ্গে দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো সম্পর্ক ছিল না।

রাজনৈতিক এই ভাঙাচোরার মধ্যেও অবশ্য অর্থনীতিতে ও সমাজ-সংস্কৃতির বিকাশের অনিবার্য প্রক্রিয়ায় কিছু-কিছু পরিবর্তন এসেছে। শিল্প-কারখানা স্থাপিত হয়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে, পুঁজির মালিক নতুন একটি শ্রেণী ও ক্রমবর্ধিষ্ণু শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম

---

৬। Jamil-ud-Din Ahmad,(collected & edited), Speeches and writings of Mr. Jinnah, Reprinted,(Lahore : Sh. Muhammad Asraf, 1964), P. 232

৭। 'Talk to Muslim League Workers at Calcutta, on March 1, 1946', Ibid, p.272

৮। মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ, 'স্যার নাজিমের কমিউনিজম', যুগবিচিত্রা, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৬৭), পৃ ৪৭৫

Dhaka University Institutional Repository



হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে, শহরের সঙ্গে গ্রামের, শহরের সঙ্গে শহরের, দেশের সঙ্গে বিদেশের সংযোগ ঘটেছে। সামাজিক ও প্রাকৃতিক নানা কারণে ভূমিহীনদের সংখ্যা বেড়েছে, গ্রাম-সমাজের ভাঙন ও অবক্ষয়ের ফলে মানুষ শহরমুখী হয়েছে। উচ্চশিক্ষার প্রসার ঘটায় শিক্ষিত বেকার ও মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবীর উদ্ভব ঘটেছে। সমাজের কাঠামোতে এই পরিবর্তন প্রভাব ফেলেছে উপরিকাঠামোতেও। সেখানে নতুন প্রশ্ন, নতুন জীবন-জিজ্ঞাসা ও চিন্তাধারা জেগেছে। কালপরিক্রমায় এসব জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতে খুঁজতে জনসাধারণ উপরিউক্ত প্রশ্নগুলির এক-একটি সমাধান নিজেদের মতো করে নিয়েছিল। সমাজ-মানসে যখন এভাবে পরিবর্তন সাধিত হল, তখন তার প্রয়োজনেই অনিবার্য হয়ে উঠল নতুন সমাজ-কাঠামোর প্রতিষ্ঠার। পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে সম্ভব ছিলনা নবজাগ্রত শ্রেণী সমূহের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন। ফলে বিকাশের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় জন্ম হয়েছে স্পষ্ট আদর্শ নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের। বাংলাদেশের বিকাশ, তাই, পাকিস্তান থেকে সহসা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া কোনো ঘটনা নয়, একটি পুরানো আদর্শের উপর নতুন আদর্শে বিশ্বাসী একটি নতুন রাষ্ট্রের অনিবার্য অভ্যুদয়।

## তিন

এই সময়ে পূর্ব বাংলায় বিকাশ লাভ করেছে এক প্রাণবন্ত কাব্যসাহিত্যের ধারা। বিভাগ-পূর্ব কালের বাংলা কবিতার ঐতিহ্যকে আশ্রয় করেই এদেশের কবিতা অঙ্কুর হয়েছে নতুন দিগন্ত-সন্ধানে, বাঁক নিয়েছে মোড়ে-মোড়ে। সেকালের সকল বিক্ষোভ-আন্দোলন-আবেগ ও হতাশা থেকে উপকরণ আহরণ করে এ-কবিতা হয়েছে সম্পদশালী, বিচিত্র আত্মপ্রকাশে সক্ষম ও জনচিত্তের সমীপবর্তী। আন্তর্জাতিক কবিতা-আন্দোলনের প্রভাবও পড়েছে এর উপর। এসময়ে প্রকাশিত কবিতা-সংকলনের সংখ্যা তিন শ'য়ের অধিক। বলা অনাবশ্যক এর অনেকগুলিই শিল্পবিচারে মূল্যহীন এবং আলোচনার দাবিও রাখেনা। কিন্তু এগুলো একটি সত্যকে দেখিয়ে যায়, বহুলোক তখন নিজেদেরকে প্রকাশ করতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তাই,

Dhaka University Institutional Repository



এগুলির মধ্যে পূর্ব বাংলার তৎকালীন মনোচিত্রের পরিচয় অনুধাবন করা যেতে পারে ।

এই কবিতার মধ্যে নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় ঃ

এ-কবিতা বিষয়-বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ । ধর্ম, রাজনীতি, জাতীয়তাবাদ, জীবনধারা, স্বদেশপ্রেম, নারীপ্রেম, ভগবৎ-প্রেম, আধুনিক জীবনযন্ত্রণা, বিদ্রোহ-বিপ্লব-গণজাগরণ, হাস্য-কৌতুক, প্রভৃতি বহু বিষয় কবিতার অবলম্বন হয়েছে ।

এই কবিতা মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবেগানুভূতি । এই শ্রেণীর মধ্যে অবশ্য দৃষ্টিভঙ্গিগত বৈচিত্র্য ও পার্থক্য রয়েছে । কেউ-কেউ সাম্যবাদী অবস্থানে দাঁড়িয়ে কবিতা লিখেছেন, যার অধিকাংশের অবস্থান ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে । প্রাথমিক যুগের বুর্জোয়াদের মধ্যে লক্ষ করি উদারনৈতিক মানবতাবাদের প্রতি প্রবল আগ্রহ, আর দ্বিতীয় যুগের বুর্জোয়াদের মধ্যে সর্বাত্মিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির বিকৃত রূপের দুঃখ-হতাশা-বিচ্ছিন্নতার মধ্যে নিমজ্জন । শুধু একটা অংশ অবস্থান নিয়েছিলেন প্রগতিশীল মানুষের সঙ্গে, যদিও এদের কেউ-কেউ পরিবর্তনের স্রোতে ক্রমশ অবস্থানচ্যুত হয়ে স্থান নিয়েছেন দ্বিতীয় যুগের বুর্জোয়াদের কাতারে ।

তৎকালীন জীবনের নানা অনুভব এই কবিতার ধারার উপর বিচিত্র ছাপ ফেলেছে । এ-সময়টা ছিল বিক্ষোভ-আন্দোলন-পরিবর্তনের কাল । সমাজের সচেতন অংশ হিসাবে কবিদের পক্ষে সম্ভব হয়নি নির্লিপ্ত থাকা । ভাষা আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ-বিজয়, ভাষা-সংস্কার প্রভৃতি ঘটনার সঙ্গে কবিদের সংযোগ ছিল নিবিড় ও গভীর । এগুলিকে তাঁরা আগ্রহের সঙ্গে কবিতার উপাদান করেছেন ।

এই প্রসঙ্গেই বলা যেতে পারে, কবিদের অনেকেই রাজনীতির ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন । পাকিস্তান-আন্দোলন ও -প্রতিষ্ঠা অনেকের কাব্যজীবনে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশক ঘটনা । পরবর্তীকালের তরুণ কবিদের কেউ-কেউ কবিতা লিখেছেন মার্কসবাদী রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository



মতের বন্দী ছিলেন। সমাজের ইতিহাসে এ-অবস্থা আসে যখন প্রতিবাদী শ্রেণীসমূহের বাইরে থেকেও উন্নত সাহিত্যরচনা করা সম্ভব হয়, কিন্তু এর বিপরীতও আসে যখন সাহিত্যিককে পক্ষাবলম্বন করতেই হয়।

> In such societies, conscious political partisanship and the capacity to produce significant art at all, go spontaneously together.9

পূর্ব বাংলায় এ-অবস্থা দীর্ঘদিন বিরাজ করেছিল।

এই কবিতার এক বৃহৎ অংশ আবেগ ও বক্তব্য-প্রধান। জাতি-জীবন-সমাজ ও রাষ্ট্রের সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে কবিরা বক্তব্য রেখেছেন। অনেকের লেখায় বক্তব্য যত স্পষ্ট-ভাবে প্রকাশিত হয়েছে, প্রকাশভঙ্গী তত পরিচ্ছন্ন পায়নি। এর কারণও স্পষ্ট রয়েছে। বলা হয়, emotions recollected in tranquillity -তে কবিতা রচিত হয়, কিন্তু আন্দোলন সময়ে কবিরা যখন ঘটনার অংশ ও আন্দোলনে শরীক, তখন এই আদর্শ অবস্থা অর্জন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অনেকেই কবিতা লিখে আন্দোলনে শক্তি যোগাতে চেয়েছেন। তাঁদের লক্ষ ছিল শিল্প-সৃষ্টি নয়, উদ্দীপনা-সঞ্চার। কিন্তু এ-ও সত্য, এ-ধরনের কবিতা পাঠক-সমাজে আদৃত হয়েছে বেশি।

আবার অনেকের রচনায় আবেগ এসেছে স্বতঃস্ফূর্ত অনুভবের মাধ্যমে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে নয়। অনেক নবাগত কবি ইউরোপের বোদলেয়ার-এলিয়টীয় ধারাকে গ্রহণ করেছেন বাংলা সাহিত্যের তিরিশোত্তর কবিদের মাধ্যমে। তাঁরা এই আধুনিক বক্তব্য ও আধুনিক আঙ্গিক উপস্থাপনে যতটা মনোযোগী হয়েছেন, জীবনাভিজ্ঞতা ও সমাজ-উপলব্ধিতে ততটা আগ্রহী হননি। এঁদের সৃষ্টি ভুবন ও পাঠকদের প্রত্যাশার মধ্যে ব্যবধান, তাই, দুস্তর হয়েছে।

---

৯। Terry Eagleton, 'The writer and commitment', Marxism And Literary Criticism, (London : Methuen & Co. Ltd., 1976), p. 57

## চার

আলোচ্য সময়ের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পটভূমিতে কবিতাকে আলোচনা করাই এই গবেষণার লক্ষ্য। এটা কবিতার ইতিহাস নয়, কবিতার সমালোচনাও নয়, বরং এই পটভূমিতে কবিতাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা। সমালোচকের কাজ কবিতার ভাষ্য (interpret) তৈরি করা নয়, কবিতাকে ব্যাখ্যা (explain) করা[১০] — এমন সাহিত্য-সমালোচকের এই মন্তব্য, আমার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছে।

আলোচনায় একক কবি বা কবি-কৃতির মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণের চেয়ে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বিশেষ কাব্যধারার বিকাশ ও গতিপথ নির্ধারণে। সুতরাং আলোচনা করা হয়েছে প্রধানত মধ্যমের ও গৌণের, ব্যতিক্রমীর নয়। শিল্পবিচারে কম গুরুত্বপূর্ণ কবিতাও এখানে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। এ রীতি আলোচনার যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু মনে রাখা দরকার এগুলিতেই সমকাল তার ছাপ সরল ও স্পষ্ট অক্ষরে এঁকে দিয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বিলেতের নটিংহামের অধ্যাপক হেনরী মর্লির একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

> The true love of literature does not walk only on the mountain tops, it leads us also to the copse and meadow on the lower slopes, and gives us rest upon the moss beside the small rills of the valley.[১১]

আলোচনা করা হয়েছে দু-অংশে, দশ অধ্যায়ে। প্রথমাংশে চেয়েছি এই কাল পরিধিতে বিভিন্ন দশকের অবলম্বনে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার বিকাশ ও বিবর্তনের যে-সূত্রের সৃষ্টি হয়েছে তার অনুসরণ করা। সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে আলোচনায় আনা হয়েছে প্রধানত রাজনৈতিক দিকে তীব্র আলোক সম্পাত করার জন্য। পূর্ব বাংলার এই

---

১০। See ~~Terry Eagleton~~.
Pierre Macherey, quoted in Marxism and Literary Criticism, Ibid Notes 4, P. 77

১১। সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, ৩য় সং, (কলকাতা : ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ১৩৭৭), পুনর্মুদ্রণ-পত্রে উদ্ধৃত।

Dhaka University Institutional Repository



সময়কার ইতিহাসে এটা স্পষ্টভাবে লক্ষ করা গেছে যে, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন এখানে পরস্পর পরিপূরক শক্তি হিসাবে কাজ করেছে এবং প্রকাশ্য রাজনৈতিক ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগের অভাবে, যেমন সামরিক শাসনামলের প্রথমদিকে, সংস্কৃতিকে ঘিরেই সে-বক্তব্য ভাষা পেয়েছে। সেজন্য এটাও আমি সমান গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছি।

চিন্তাধারার এই বিকাশ বুঝবার জন্য প্রধানত নির্ভর করা হয়েছে বিভিন্ন সংগঠন ও সম্মেলনের কার্যাবলী ও সেগুলির বক্তব্যের উপর। প্রাথমিক লক্ষ রাখা হয়েছে বক্তব্যের দিকে, সাংগঠনিক কার্যকলাপের উপর নয়। সব সংগঠন ও সম্মেলনই বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে মোটামুটিভাবে চারটি দলই /মুসলিম লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, আওয়ামী লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি/ সর্বাধিক সক্রিয় ছিল। অন্যান্য দল ছিল এগুলির শাখা-প্রশাখা বিশেষ। সুতরাং এগুলির বক্তব্যেই সে-সময়ের রাজনৈতিক বক্তব্য অনুসন্ধান করা যেতে পারে। আলোচনার সুবিধার জন্য পাকিস্তান-পূর্ব যুগও মধ্যে-মধ্যে এসেছে। সাংস্কৃতিক দিকও আলোচিত হয়েছে মোটামুটি এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই।

এই সময়কে পাঁচটি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে : ১৯৪৭–১৯৫৪, ১৯৫৪ – ১৯৫৮, ১৯৫৮ – ১৯৬৫, ১৯৬৫ – ১৯৬৯ ও ১৯৬৯ – ১৯৭১। প্রতিটি পর্ব আলোচিত হয়েছে এক-একটি অধ্যায়ে। প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত সময় বিস্তৃত মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান লাভ থেকে শুরু করে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের হাতে এর সার্বিক পরাজয় পর্যন্ত; দেশব্যাপী প্রথম সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে আইউব খানের সামরিক শাসন জারি পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ের কর্মকাণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয়বস্তু; তৃতীয় অধ্যায়ে বিধৃত কাল হচ্ছে ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে মৌলিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট হিসাবে আইউব খানের নির্বাচন পর্যন্ত; চতুর্থ অধ্যায় শেষ হয়েছে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে আইউব খানের পতন ও দ্বিতীয় বার সামরিক শাসন প্রবর্তন পর্যন্ত এসে /এই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা পাক-ভারত সংঘর্ষ/; পঞ্চম অধ্যায়ের সমাপ্তি ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণায় এসে। প্রতি অধ্যায়েই

Dhaka University Institutional Repository



রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগ ও চিন্তাধারার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। একসঙ্গে রয়েছে সে-পর্বে রচিত কবিতার গতি-প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

দ্বিতীয়াংশে রয়েছে কবিতার আলোচনা। কবিতাকে বিষয়ানুসারে পাঁচভাগে বিন্যাস করে পাঁচটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইসলাম ও পাকিস্তান-সম্পর্কিত কবিতা আলোচিত হয়েছে। এই ধারাটি সৃষ্ট হয় লাহোর-প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর। পাকিস্তান সৃষ্টির কিছুকাল পরও এটি উল্লেখযোগ্য ধারা হিসেবে ক্রিয়াশীল থাকে। এই ধারাটিকে সামন্তবাদের ফসল বলা যেতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়ের কবিতা উদারনৈতিক মানবতাবাদের ধারায় চিহ্নিত। আধুনিক বাংলা কবিতার মূল ধারার সঙ্গে এটি সম্পর্কিত। দেশবিভাগোত্তর পূর্ব বাংলার লেখকদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এতে স্থানীয় রূপ ও রং লেগেছে। এটিই এদেশের কবিতার মূল ধারা। এই কবিতার প্রথমাংশে সমষ্টি জীবনাকূতি ও মানবতাবাদের প্রকাশ লক্ষণীয়, আর শেষাংশে লক্ষ করি ক্রমবর্ধমান নৈরাশ্য ও হতাশার মনোভাব।

তৃতীয় ধারার কবিতা বাঙালি জাতীয়তাবাদমূলক। এটি অষ্টম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু। পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষে ও মুক্তিসংগ্রামে পূর্ব বাংলায় যে-বিশেষ এক শ্রেণীর কবিতা রচিত হয়েছিল, এবং এদেশের প্রকৃতি-ঐতিহ্য ও আবহমান যার বিষয় অবলম্বন ছিল, তা-ই এ-ধারায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পূর্ব বাংলার প্রায় সব কবিই এ-বিষয়ে কোনো-না-কোনো সময়ে ও সূত্রে কবিতা লিখেছেন, কিন্তু এ-বিষয়ে একক পূর্ণাঙ্গ কাব্য কেউ সে-সময়ে প্রকাশ করেন নি। তবে একক কবি-ব্যক্তিত্ব ধরে আলোচনা এখানে সম্ভব হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়ে বিদ্রোহ-বিপ্লব-গণজাগরণমূলক কবিতা আলোচিত হয়েছে। সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নের একটি আন্তরিক ইচ্ছা এদেশের অনেক কবির মধ্যে প্রথমাবধি লক্ষ করা যায়। প্রথম দিকে কবিরা লিখেছেন অন্যায়-অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে। নজরুল ইসলামের কবিতাকে তাঁরা আদর্শ হিসাবে নিয়েছিলেন, কিন্তু বিশিষ্ট কোনো রাজনৈতিক আদর্শ তাঁদের ছিল না। শেষ দিকে কয়েকজন কবি লিখেছেন মার্কসবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে। কবি সুকান্ত আদর্শ ছিলেন এই কবিগোষ্ঠীর।

দশম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে অনুবাদ-কবিতা। এই বিভাগটি বিষয় ভিত্তিক নয়; কিন্তু উপবিভাগ করা হয়েছে সেখানে।

সর্বশেষে রয়েছে উপসংহার।

Dhaka University Institutional Repository

# প্রথম অধ্যায় : ১৯৪৭-১৯৫৪

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক ইতিহাস

এক

## পূর্ব বাংলার পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তি

প্রধানত অর্থনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই যে বাঙালী মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তা আজ স্বীকৃত সত্য। কেউ-কেউ যে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য এ-আন্দোলনে অংশ নেয়নি, তা-ও অবশ্য বলা যাবেনা; তবে প্রধানদিকে, বিশেষত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের /১৯৩৯ – ৪৫/ পূর্ব পর্যন্ত, অর্থনৈতিক মুক্তির চিন্তাই মুসলমানদের কাছে প্রধান বিবেচ্য ছিল।[1] ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের রূপরেখা

---

১। এ সম্পর্কে কয়েকজনের উক্তি ও মত উদ্ধৃত করা যেতে পারে ঃ

ক. 'তাঁদের /বাংলার মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ফজলুল হক বা সোহরাওয়ার্দী/ প্রধান সমস্যা ছিল মুসলমানদের অর্থনৈতিক মুক্তি, যা স্বাধীনভাবে স্বায়ত্তশাসন পরিচালনা ক্ষমতা না থাকায় সম্ভব ছিলনা। তাঁদের যুক্তি হল, স্বাধীন না হলে অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করা অসম্ভব/। কামরুদ্দীন আহমদ, পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি, /ঢাকা ঃ স্টুডেন্টস পাবলিকেশন্স, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ/ পৃঃ ৪৭

খ. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে বক্তৃতা করতে গিয়ে বাবা নাজিরুদ্দীন চৌধুরীর এক জনসভায় বলেছিলেন, 'পাকিস্তান হাসিল হলে, আপনার ছেলে মুনসেফ হবে, তাঁর ছেলে ম্যাজিস্ট্রেট হবে, উহার ছেলে ডেপুটি হবে, দারোগা হবে' ইত্যাদি। 'বক্তৃতার বৈশিষ্ট্য', মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ, যুগ-বিচিত্রা, পূর্বোক্ত পৃঃ ৪৭৫–৭৬

গ. ১৯৪৬ সালে কলকাতায় শ্রমিকদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের সময় একজন শ্রমিক জিন্নাহকে জিজ্ঞাসা করে — স্যার, তারা /কম্যুনিস্টরা/ বলে, পাকিস্তান হবে শুধু ধনীদের জন্য, গরীবদের জন্য নয়, এটা কি সত্য? উত্তরে জিন্নাহ বলেন — যদি ব্রিটিশদের ত্যাগের পর অবশেষে পাকিস্তান না-হয়, তাহলে হিন্দু জমিদারদের হাত থেকে মুসলমানদের মুক্ত করার জন্য কোনো আইন করতে দিবেনা আমাদের দেশে। সুতরাং আমাদের পাকিস্তান চাই-ই।

Serajuddin Hussain, Look Into The Mirror, (Dacca : Khoshroz Kitab Mahal, 1974), p. 1

ঘ. 'To the Muslim middle class of Bengal, the demand of Pakistan not only meant a separate state, but also meant employment for the unemployed, promotion for those who were in inferior positions and economic ~~mfxkm~~ emancipation of the village society from the clutches of the usurous money lending class and the exacting zemindars and talukders'. Abu Jafar Shamsuddin, 'Reflections on East Bengal Elections - 1954', Sociology of Bengal Politics, (Dacca: Bangla Academy, 1973), p. 37

Dhaka University Institutional Repository



সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণার সৃষ্টি হয়। বাংলার তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী এ,কে, ফজলুল হক (১৮৭৩ – ১৯৬২) কর্তৃক উত্থাপিত এই প্রস্তাবে বলা হয়, ভারতের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ গঠিত হবে।[২] লক্ষণীয়, এতে একাধিক রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছিল, যদিও সেগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কিছু বলা হয়নি। পরের বছর নিখিল ভারত মুসলিম লীগের মাদ্রাজ অধিবেশনে এই দাবিকে মুসলিম লীগের আদর্শ বলে গ্রহণ করা হয়।[২ক]

মুসলিম লীগ এই প্রস্তাবকে 'লাহোর প্রস্তাব' নামে অভিহিত করলেও ব্রিটিশ ও হিন্দু পরিচালিত পত্রিকাগুলির প্রচারণার ফলে এটা সাধারণ্যে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' বলে পরিচিত হল এবং এর চরিত্র সাম্প্রদায়িক হবে বলে ধারণা সৃষ্টি হল।[৩] এ-সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

---

২। Syed Sharifuddin Pirzada, <u>Foundations of Pakistan</u> (All India Muslim League Documents : 1906 – 1947), Vol. II, (Karachi : National Publishing House Ltd. 1970), p. 341

২ক। Ibid, p. 371

৩। 'I think you will bear me out that when we passed the Lahore Resolution, we had not used the word 'Pakistan'. Who gave us this word ? (Cries of 'Hindus') let me tell you it is their fault. ... you know perfectly well that Pakistan is a word which is really foisted upon us and fathered on us by some section of theHindu Press and also by the British Press. Now our resolution was known for a long time as the Lahore Resolution, popularly known as Pakistan. But how long are we to have this long phrase. I now say to my Hindu and British friends: we thank you for giving us one word. (Applauses and cries of 'Hear, hear' !) ১৯৪৩ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ত্রিংশতম অধিবেশনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বক্তৃতা, <u>Foundations of Pakistan</u>, ibid. pp. 425 – 26.

Dhaka University Institutional Repository



চাইছিল এবং মুসলিম লীগের নেতারাও ক্রমশঃ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পোষকতা করতে থাকেন। ১৯৪৬ সালে পাকিস্তান প্রস্তাবের ভিত্তিতে নির্বাচন করতে গিয়ে লীগ পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয় এবং নির্বাচনে সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। সে-বছর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আইনসভার মুসলিম লীগ সদস্যদের এক কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাবের উপর মৌলিক সংশোধনী আনা হয়। এক তীব্র সাম্প্রদায়িক বক্তৃতা দিয়ে বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী /১৮৯৩ – ১৯৬৩/ প্রস্তাব করেন যে, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আসাম ও বাংলা এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান — প্রভৃতি মুসলিম প্রধান পাকিস্তান অঞ্চল নিয়ে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করা হবে।[৪] এই সংশোধনীর বিরুদ্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম /১৯০৫–৭৪/ প্রবল আপত্তি জানালেও তাঁর যুক্তি অগ্রাহ্য করে সোহরাওয়ার্দী আনীত প্রস্তাবই গৃহীত হয়।

পরের বছর দেশবিভাগের প্রাক্কালে গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক বারোজের সঙ্গে আলোচনা করে হিন্দু মহাসভার প্রেসিডেন্ট ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় /১৯০১ – ৫৩/ বাংলা বিভাগের দাবি তোলেন।[৬] একে বানচাল করে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা গঠনের জন্য সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম হিন্দু নেতাদের সঙ্গে মিলিত হন। এক পক্ষে থাকেন সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, খাজা নাজিমুদ্দিন /১৮৯৪ – ১৯৬৪/, মোহাম্মদ আলী /১৯০৯ – ৬৩/, ফজলুর রহমান /১৯০৫ –৬৬/ ও ডাঃ আবদুল মোতালেব মালেক/মৃত্যু ১৯৭৭/ অপর পক্ষে অংশ নেন শরৎচন্দ্র বসু /১৮৮৯ – ১৯৫০/, কিরণ শঙ্কর রায়, সত্যরঞ্জন বক্সী ও যামিনী রঞ্জন সরকার /১৮৮৮ – ১৯৫৩/।[৭]

---

৪। Syed Sharifuddin Pirzada, Ibid, p. 513

৫। Abul Hashim, <u>In Retrospection</u>. (Dacca : Mowla Brothers, 1974),pp. 109–110

৬। ঐ, পৃঃ ১০৭

৭। ঐ, পৃঃ ১০৬

Dhaka University Institutional Repository



প্রাথমিক আলোচনায় 'সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক স্বাধীন বাংলা' গঠনের ব্যাপারে তাঁরা ঐকমত্যে পৌঁছেন এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের ব্যাপারে ছয় দফার কর্মসূচী তৈরী করেন।[৭ক] আসামের অধিবাসীরাও প্রস্তাবিত রাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্তির আগ্রহ প্রকাশ করে ও বাংলার পরিবর্তে নাম রূপ করে 'বঙ্গাসাম'।[৮] এই মহাপরিকল্পনা সফল হবার সম্ভব অজ্ঞাত কারণে তা বানচাল হয়ে যায় এবং বাংলার এক খণ্ডিত অংশ পূর্ব বাংলা নামে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ লিখেছেন:

> শেষের মুখে এই পরাজয় কেন ঘটিল তাহা হয়ত কোনদিনই জানা যাইবেনা। কারণ, এই উদ্যোগের ব্যর্থতার জন্য যাঁহাদিগকে মূলতঃ দায়ী মনে করা হইয়া থাকে, তাঁহাদের কেহ আজ আর জীবিত নাই এবং প্রায়শ্চিত্তমূলক মৃত্যুকালীন স্বীকারোক্তিও কেহ করিয়া যান নাই।[৯]

---

৭ক। Serajuddin Hussain, p. 38

৮। মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ, আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, ২য় সং, (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৭), পৃঃ ৩৭৮ – ৭৯

৯। মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ, যুগ-বিচিত্রা, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৬৭) পৃঃ ৫৩০।

আবুল হাশিম এই ব্যর্থতার জন্য ইঙ্গ-মার্কিন-ভারতীয় যুক্ত পুঁজির তৎপরতাকে দায়ী করেছেন। বঙ্গ-বিভাগের পূর্বে এক বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন:

'Cent percent alien capital, both Indian and Anglo-American exploiting Bengal is invested in West Bengal. The growing socialist tendencies amongst us have created fears of expropriation in the minds of our alien exploiters. They have the prudence to visualise difficulties in a free and united Bengal. It is in the interest of the alien capital that Bengal should be divided, crippled and incapacitated so that neither part thereof may have strength enough to resist it in future.'

For the full text see Serajuddin Hussain, Appendix 'D', pp. 101 – 105.

সর্বোপরি প্রাদেশিক লীগের সোহরাওয়ার্দী-বিরোধী উপদলও ভবিষ্যতের পূর্ব-পাকিস্তানে তাঁর প্রভাব খর্ব করার উদ্দেশ্যে এই চেষ্টায় গোপনে মদদ যুগিয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository



## দুই

### বঙ্গীয় মুসলিম লীগ

ঢাকাতে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের পত্তন হলেও পরবর্তী অনেক বছর বাংলায় এর কোনো সাংগঠনিক তৎপরতা ছিল না। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে মাওলানা আকরাম খাঁ /১৮৬৯ – ১৯৬৯/ ছিলেন এর সভাপতি এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম ছিলেন যথাক্রমে সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক।[১০] এই সময় থেকে লীগে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের প্রভাব অনুভূত হতে থাকে। দলে তিনটি উপদল দেখা দেয়: সামন্তস্বার্থের নেতৃত্ব দিতেন মাওলানা আকরাম খাঁ ও খাজা নাজিমুদ্দিন, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণতন্ত্রী উপদলের নেতৃত্ব দিতেন আবুল হাশিম আর এদুয়ের সমন্বয়কারী ছিলেন মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।[১১] ১৯৪৪ সালের দলীয় নির্বাচনে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ যুবকেরা প্রাধান্য লাভ করে। এঁদের তৎপরতায় মুসলিম লীগ বাংলার সমগ্র একটি জনপ্রিয় সংগঠনে পরিণত হয়। দেশবিভাগের সময় সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রীত্বে বাংলায় মুসলিম লীগ ক্ষমতাসীন থাকলেও লিয়াকত আলী /১৮৯৬ – ১৯৫১/, ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে, নবগঠিত পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী পদে মনোনীত করলেন খাজা নাজিমুদ্দিনকে।[১২] মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর /১৮৭৬ – ১৯৪৮/ মৃত্যুর পর খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হলে নুরুল আমীন /১৮৯৭ – ১৯৭২/ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং ১৯৫৪ সালের মার্চ পর্যন্ত ঐ-পদে বহাল থাকেন।

দেশবিভাগ হলে সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম ঢাকা আসেন নি কিংবা আসতে পারেননি। তাঁদের অনুসারী যুবকেরা ঢাকায় এসে সাংগঠনিক তৎপরতার চেষ্টা করলেও লীগ নেতৃত্বের প্রতিকূলতায় তা সম্ভব হলনা। তিনটি কারণে প্রাদেশিক লীগ দক্ষিণ পন্থীদের একটি পকেট-সংগঠনে পরিণত হল: এক, মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক চরিত্র বজায় থাকায় ভিন্ন সম্প্রদায়ের

---

১০। বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১ম খণ্ড, ১ম সং, /ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭০/ পৃঃ ২১২

১১। কামরুদ্দীন আহমদ, পৃঃ ৬৭ ও ৬৪

১২। ঐ, পৃঃ ৯৩ – ৯৪।

Dhaka University Institutional Repository



লোকেরা এতে প্রদেশাধিকার থেকে বঞ্চিত হল, দুই, পুরোনো কমিটি ভেঙে অনুগত সদস্য দিয়ে এড-হক কমিটি গঠিত হল এবং তিন, প্রাথমিক সদস্যপদের রশিদ বই হস্তান্তর না-করায় দলের বিস্তৃতির সুযোগ নষ্ট হয়ে গেল।[১৩] অধিকন্তু, প্রাদেশিক লীগের নেতৃত্বে অকর্মণ্য ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্র বিস্তার লাভ করে। ১৯৪৯ সালে মাওলানা আকরাম খাঁ,[১৪] ১৯৫১ সালে মাওলানা আবদুল্লাহেল বাকী /১৮৯৬ – ১৯৫২/[১৫] ও ১৯৫৩ সালে নূরুল আমিনের[১৬] লীগ সভাপতি নির্বাচন গণতান্ত্রিক উপায়ে হয়নি। স্বভাবতই দলের নিষ্ঠাবান কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক হতাশা ও নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়।

জনপ্রিয় ও বাস্তব কর্মসূচীর অভাবেও লীগের বিস্তৃতি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। দেশবিভাগের পূর্বে শুধুই পাকিস্তান-অর্জনের উপর গুরুত্ব দেওয়ায় অন্য প্রশ্নগুলি চাপা পড়ে গিয়েছিল।[১৭] পাকিস্তান কায়েম হলে সে-সব প্রশ্ন মাথা চাড়া দেয়। কিন্তু নেতৃবৃন্দ যুগোপযোগী কর্মসূচী না দিয়ে 'ইসলাম', 'শিশু রাষ্ট্রের ভবিষ্যত', 'পাকিস্তানের সংহতি' প্রভৃতির উচ্চারণে মূল সমস্যাকে এড়িয়ে যান। ১৯৪৮ সালে জিন্নাহর সভাপতিত্বে পাকিস্তান মুসলিম লীগের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশনে ১. পাকিস্তানের সংহতি ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, ২. পাকিস্তানে মুসলমানদের ধর্মীয় সাংস্কৃতিক সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করা, ৩. পাকিস্তান রাষ্ট্রে মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক সৃষ্টি করা, ৪. পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন রাষ্ট্রের মুসলমানদের স্বার্থের জন্য কাজ করা এবং পাকিস্তান ও বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের সম্পর্ক সৃষ্টি করা এবং ৫. পৃথিবীব্যাপী শান্তি, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের পতাকাকে তুলে ধরা — প্রভৃতি দলের লক্ষ্য বলে ঘোষিত হয়।[১৮] ১৯৫২ সালে যুক্ত হয় আরো দুটি লক্ষ্য : ১. ইসলাম ধর্মের আদর্শ মোতাবেক গণতন্ত্র, সাম্য, স্বাধীনতা, সহিষ্ণুতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার পাকিস্তানে কায়েম করা ও ২. কোরান ও সুন্নাহর নির্দেশ মোতাবেক পাকিস্তানী

---

১৩। আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ২য় মুদ্রণ /ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭০/, পৃঃ ৩০৯–১০।

১৪। বদরুদ্দীন উমর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪০–৪৫।

১৫। সরলানন্দ সেন, ঢাকার চিঠি, ১ম খণ্ড, ১ম সং /মুক্তধারা, ১৯৭১/, পৃঃ ৪৮–৪৯।

১৬। মর্নিং নিউজ ১১.৫.৫৩

১৮। Constitution and Rules of the Pakistan Muslim League, published by S.Shamsul Hassan. Karachi (No date of publication).

Dhaka University Institutional Repository



পাকিস্তানী মুসলমানদের শান্তি ও সমন্বিত জীবন যাপনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা ।[১৯]

এই লক্ষ্যগুলি উচ্চ আদর্শ ভিত্তিক হলেও সমাজে এর বিশেষ কোনো উপযোগিতা ছিল না। বরং অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সমস্যাদি তীব্রভাবে দেখা দেয় । দেশবিভাগের পর থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যাদি এবং স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ও বিদেশ থেকে আমদানীকৃত শিল্পজাত দ্রব্যাদির দাম ক্রমশঃ বাড়তে থাকে, অপরদিকে কমতে থাকে বিদেশে রপ্তানীযোগ্য কাঁচামালের মূল্য । কোরিয়া যুদ্ধের /১৯৫০-৫৩/ সময় পাটের দাম কিছু সময়ের জন্য বৃদ্ধি পেলেও তা ছিল সাময়িক মাত্র ঃ

> The sum-total of these double-fanged pressure on the peasantry of East Bengal has been a contimuous deterioration in their oconomic life.20

এই সময়ে সারা প্রদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় । ১৯৪৮-৪৯ সালে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে ১৯৫০ সালে একটু স্তিমিত হয়, কিন্তু ১৯৫১ সালের শেষভাগে পুনরায় বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত চলে ।[২১] শেষ দিকে এর সঙ্গে যুক্ত হয় লবণ সঙ্কট । ঢাকা শহরে লবণের সের দশ টাকায় উন্নীত হয়, প্রদেশের অন্যত্র কোথাও তা ষোল টাকায় ওঠে ।[২২] দুর্ভিক্ষে কত লোক মৃত্যুবরণ করেছে তার কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি, তবে বিরোধী দলের রাজনীতিবিদদের মতে তা ছিল বিশ হাজারের মত ।[২৩] হাজার-হাজার মানুষ সে-সময় পূর্ব বাংলা ত্যাগ করে আসামে গমন করে ।[২৪]

মুসলিম লীগ সরকার প্রদেশের জন্য জনহিতকর কর্মসূচী নেয়নি এমন নয়, তবে কেন্দ্রীয় সরকারের ঔদাসীন্য ও দীর্ঘসূত্রিতায় তার অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়নি কিংবা শ্রেণীগত কারণে তাতে কোনো সুফল আসেনি । ১৯৫১ সালে জমিদারী উচ্ছেদ সংক্রান্ত আইন পাশ হলেও জোতদারী

---

১৯। Constitution of the East Pakistan Provincial Muslim League, as passed in the Council Meeting held at Dacca on 12.10.52.(Booklet)

20। A Sadeque, The Economic Emergence of Pakistan (with special reference on East Pakistan), Part I (Dacca, 1954), pp. 1-2

২১। বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ২য় খণ্ড, /১ম সং /ঢাকা ঃ মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৮২/, পৃঃ ৮৮ । বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ১ম অধ্যায়, পূর্ব বাংলায় দুর্ভিক্ষ, ১ - ১৯ । ২২। ঐ, পৃঃ ৯৭

২৩। মুসলিম লীগ, যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী লীগ আমলের তুলনামূলক খতিয়ান, পূর্ব পাক আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক হাফেজ হাবীবুর রহমান কর্তৃক প্রকাশিত, /পুস্তিকা/, /প্রকাশের তারিখ নেই/, পৃঃ ৩

২৪। বদরুদ্দীন উমর, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৫-৫৭

থেকে যায় । ফলে হিন্দু জমিদারদের স্থানে মুসলমান জোতদারেরা শোষকের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় ।[২৫]

ক্রমশঃ মুসলিম লীগ সরকারের প্রতি অসন্তোষ সমাজের সর্বস্তরে সঞ্চারিত হয় । ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ঢাকার পুলিশ, ছাত্র-ছাত্রী, ডাক্তার, সরকারী কর্মচারী, সাংবাদিক, দোকানদার, কৃষক পৃথক-পৃথক ভাবে নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য ধর্মঘট করে ও কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সাফল্যও লাভ করে ।

এভাবে পূর্ব বঙ্গে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস পায় । ১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইলের এক উপনির্বাচনে মুসলিম লীগের শক্তিশালী সদস্য শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয় । নূরুল আমীন এর পর বহু উপনির্বাচন ঠেকিয়ে রাখেন কিন্তু ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে দলের পতন সম্পূর্ণ হয় ।

তিন

## কম্যুনিস্ট পার্টি

১৯৪৭ সালের ভারত-বিভাগকে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের স্বীকৃতি হিসাবে স্বাগত জানায় এবং কংগ্রেস-লীগ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে মনস্থ করে । অনুসারে কম্যুনিস্ট পার্টির পূর্ব বাংলার সদস্যরা খাজা নাজিমুদ্দিনের কাছে এক স্মারক লিপিতে এ-দেশকে সুখী সমৃদ্ধিশালী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র রূপে গড়ে তোলার কাজে সরকারকে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত জানায় । প্রধানমন্ত্রী এ-ব্যাপারে বাহ্যত বেশ আগ্রহ দেখান কিন্তু গোপন নির্দেশে কম্যুনিস্টদের পাকিস্তানের শত্রু বলে চিহ্নিত করে মুসলিম লীগ সদস্যদের তাদের সঙ্গে মিশতে বারণ করেন ।[২৬]

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে কলকাতায় ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় । এতে নব-নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক রনদীভে /            / পাক-ভারত পরিস্থিতি ও প্রয়োজনীয় কর্মসূচী সম্পর্কে নতুন 'থিসিস' হাজির করেন । তাতে বলা হয়,

২৫। বদরুদ্দীন উমর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩-২৮ ।
২৬। অনিল মুখার্জী, স্বাধীন বাংলাদেশ সংগ্রামের পটভূমি, /ঢাকা ঃ সুদেশ প্রকাশনী, ১৩৭৯/, পৃঃ ৩৩ – ৩৫ ।

Dhaka University Institutional Repository



ভারত-বিভাগ মূলত ইঙ্গমার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও ভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়াদের আপোস-রফার ফল এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দুই দেশের সরকারকে উৎখাত করতে হবে। 'থিসিস' কংগ্রেসে গৃহীত হয় এবং এর বাস্তবায়ন সম্পর্কে আলোচনা হয়।[২৭]

দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ব বাংলা শাখা ঢাকায় গঠিত হয় সে-বছরের মার্চ মাসে। পার্টির নগণ্য সংখ্যক কর্মী প্রকাশ্যে কাজ করতে থাকে আর অধিকাংশই সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।[২৮] বিদ্রোহ বিশেষ ভাবে দেখা দেয় ময়মনসিংহের হাজং এলাকা, সিলেটের বিয়ানীবাজার, রাজশাহীর নাচোল, খুলনার কাল-শিরা ও ধানকুনিয়ায়। কিন্তু সরকারের কঠোর নির্যাতনের মুখে তা বিশেষ সফলতা লাভ করেনি এবং অনেক কর্মীর জীবননাশ ঘটে।[২৯] হাজং এলাকায় নিহত হয় ১০৩ জন, সেনা-বাহিনীর দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পাহাড়ে-পাহাড়ে অনাহারে ও অখাদ্য খেয়ে প্রাণহারায় ৪শ নারী-শিশুসহ ৫০০ জন,[৩০] বিয়ানীবাজারে বন্দী হয় ৬০ জন ও নিহত হয় ৬ জন, নাচোল এলাকায় জেল-হাজতে হত্যা করা হয় ২৪ জনকে।[৩১] এই এলাকায় ইলা মিত্রের উপর পুলিশ যে-অত্যাচার চালিয়েছে, তা সভ্য-সমাজের ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক ঘটনা।[৩২]

ঢাকা-রাজশাহীর কারারুদ্ধ কর্মীরা অসহ্য নির্যাতনের প্রতিবাদে চারবার অনশন ধর্মঘট করে। ঢাকা জেলের বন্দীরা দুবারে মোট ১২৭ দিন ও রাজশাহীর বন্দীরা দুবারে ১৫ দিন।[৩৩] অনশন ভাঙানোর জন্য কর্তৃপক্ষ আরো বেশি অত্যাচার চালায় এবং ১৯৫০ সালে ২৪-এ এপ্রিল রাজশাহী জেলে গুলি করে ৭ জনকে হত্যা করে ও অনেককে আহত করে।[৩৪] বরিশাল, যশোর ও ময়মনসিংহ জেলেও অনশনের সময় অনেক বন্দীর মৃত্যু হয়।

---

২৭। বদরুদ্দীন উমর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৪

২৮। ঐ, পৃঃ ৩০৫-৬

২৯। ঐ, পৃঃ ৩২৯-৩৩

৩০। কণজু সেনগুপ্ত, যাঁরা পথ দেখিয়েছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রসঙ্গে, /কলকাতা ১৯৭২/, পৃঃ ১৭

৩১। বদরুদ্দীন উমর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৯-৩৪

৩২। ঐ, ইলা মিত্রের জবানবন্দী, পৃঃ ৩৩৫-৩৬

৩৩। ধনঞ্জয় দাস, আমার জন্মভূমি স্মৃতিময় বাংলাদেশ, ২য় মুদ্রণ/কলিকাতা ঃ মুক্তধারা, ১৯৭৮, পৃঃ ২৯

৩৪। বদরুদ্দীন উমর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪২-৪৪।

Dhaka University Institutional Repository



কারাগারে বন্দীদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে ঢাকার মহিলারা এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করলে পুলিশ সভা পণ্ড করে ও অনেককে বন্দী করে। এই বন্দিনীরা জেলের অন্যদের সঙ্গে মিলিতভাবে ১৯৪৯ সালে ৩০ দিন ও ১৯৫০ সালে ৬০ দিন অনশন ধর্মঘট পালন করে।[৩৫]

রণদীভে থিসিসের এই ধরণের ব্যর্থতা ভারতেও দেখা দেয়। ফলে পার্টির ভেতরে নতুন চিন্তাভাবনা শুরু হয়। তখন স্ট্যালিনের /১৮৭৯–১৯৫৩/ অনুমোদনক্রমে নতুন কর্মসূচী গৃহীত হয়ঃ প্রথম পর্যায়ে জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পন্ন করা ও দ্বিতীয় পর্যায়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে অগ্রসর হওয়া।[৩৬] এই পটভূমিতে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্টদের মুসলমান অংশ নবগঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগে ও হিন্দু অংশ বিভিন্ন শ্রমিক-কৃষক সংগঠনে অনুপ্রবেশ করে।[৩৭] এদের প্রভাবে আওয়ামী মুসলিম লীগ তার সাম্প্রদায়িক চরিত্র বর্জন করে। অসাম্প্রদায়িক সংগঠন গণতন্ত্রী দলের জন্মও এ-সময়ে ঘটে।

চার

গণতান্ত্রিক যুবলীগ

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের পর কলকাতার সিরাজউদ্দৌলা হোস্টেলে কিছু মুসলমান যুবক মিলিত হয়ে পূর্ব বাংলায় অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি করার জন্য সংগঠন করার সিদ্ধান্ত নেয়।[৩৮] সে বছরই ঢাকায় ৬ ও ৭ই সেপ্টেম্বরের কর্মী সম্মেলনে ২৫ জন সদস্য নিয়ে পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগের পূর্ব বাংলা শাখা গঠিত হয়।[৩৯] শামসুল হক ছিলেন এর সভাপতি এবং

---

৩৫। অমলেন্দু সেনগুপ্ত, পৃঃ ২২–২৪

৩৬। Mohan Ram, Indian Communism, 1st ed.(Delhi : Vikas publications,1969),pp.47-55. And, Tariq Ali, Pakistan Military Rule of People's power(Newyork : William Morrow and Company, Inc., 1970) pp. 52-53.

৩৭। Tariq Ali, P. 53

৩৮। বদরুদ্দীন উমর, ১ম খণ্ড, পৃঃ [illegible] ৬

৩৯। ঐ, পৃঃ ১৩

Dhaka University Institutional Repository



অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন মোঃ তোয়াহা, কামরুদ্দিন আহমদ (জন্ম ১৯১৩), মহীউদ্দিন আহমদ, তাজউদ্দিন আহমদ (১৯২৬ – ৭৫), অলি আহাদ প্রমুখ।[৪০] যুবলীগ নিম্নলিখিত লক্ষ্যে সংগ্রাম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে :

১. উৎপাদন করা হবে ব্যবহারের জন্য, মুনাফার জন্য নয়,

২. প্রত্যেক নিজের সাধ্যানুযায়ী পরিশ্রম করবে এবং উৎপাদিত দ্রব্যাদি নিজের চাহিদানুযায়ী গ্রহণ করবে,

৩. সমস্ত উৎপাদন পদ্ধতি শ্রমিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে এবং সমষ্টির মালিকানায় ন্যস্ত হবে,

৪. জনগণের মুক্তি অর্জনে নিম্নলিখিত পন্থা গৃহীত হবে :

ক. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী ও জায়গীরদারী প্রথার উচ্ছেদ,

খ. সকল জাতির শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য কাজ করা এবং সকল সম্প্রদায় ও শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে এমন একটি গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করা,

গ. প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটে এবং আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে এমন একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যবস্থা করা যাতে সাধারণ মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা ও মৌলিক অর্থনৈতিক অধিকারের নিশ্চয়তা থাকে,

ঘ. সংখ্যালঘুদের ভাষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষা করে তাদের ন্যায্য ও গণতান্ত্রিক অধিকারের ব্যবস্থা করা,

ঙ. অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা,

চ. কমনওয়েলথ ত্যাগ করে পূর্ণ ও প্রকৃত স্বাধীনতার নিশ্চয়তা করা।[৪১]

গণতান্ত্রিক যুবলীগ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। সরকারী ও সরকার-সমর্থক নানা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হস্তক্ষেপ ও নির্যাতনে প্রতিষ্ঠানটি ধীরে-ধীরে লোপ পায়।[৪২]

---

৪০। বদরুদ্দীন উমর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬-৮

৪১। The Pakistan Year Book 1949, (Karachi : Kitabistan), P. 744.

৪২। বদরুদ্দীন উমর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩

Dhaka University Institutional Repository



## পাঁচ

### আওয়ামী মুসলিম লীগের উত্থান

দেশবিভাগের পর দলীয় মুসলিম লীগের আবুল হাশিম উপদলের যুবকর্মীরা পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগে স্থান করতে না পেরে নতুন সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে।[৪৩] সে-সময় আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮৫-১৯৭৬) সবেমাত্র জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ঢাকা এলে কর্মীরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে।[৪৪] সোহরাওয়ার্দীও কিছু সময়ের জন্য তখন ঢাকা ছিলেন। তিনি কর্মীদের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ন্যায় আওয়ামী লীগ গঠনের পরামর্শ দেন।[৪৫] এভাবে ১৯৪৯ সালের ২৩ ও ২৪-এ জুন পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগ কর্মীদের এক সম্মেলনে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামক সংগঠনের মাধ্যমে মুসলিম লীগকে পুনর্গঠিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরূপে মনোনীত হন যথাক্রমে মাওলানা ভাসানী ও শামসুল হক, যুগ্ম সম্পাদক হন শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-৭৫) ও খন্দকার মুশতাক আহমদ (১৯২০)। পরদিন আরমানীটোলা ময়দানে দলের প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।[৪৬]

সভায় দলের লক্ষ্য, আদর্শ ও কর্মসূচী সম্বলিত ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। প্রস্তাবনায় বলা হয়, পৃথিবীর এই অঞ্চলে কমুনিজমের প্রসারকে রোধ করতে হলে পাকিস্তানকে দারুল ইসলাম বা সত্যিকার মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।[৪৭] ইসলামী রাষ্ট্রের রূপ সম্পর্কে বলা হয়:

১. পাকিস্তান খেলাফত বা আল্লাহর প্রতিনিধিমূলক রাষ্ট্র হবে,
২. আল্লাহ-তায়ালার উপর এই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা ও প্রভুত্ব ন্যস্ত থাকবে,
৩. আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসাবে জনগণ এই সার্বভৌম ক্ষমতা ও প্রভুত্বের অধিকারী হবে,
৪. পাকিস্তান বৃটিশ কমনওয়েলথ তথা সর্বপ্রকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাসনের বাইরে একটি পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে,

---

৪৩। বদরুদ্দীন উমর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২০-২২
৪৪। ঐ, পৃঃ ২৪৬
৪৫। ঐ, পৃঃ ২৪৭
৪৬। ঐ, পৃঃ ২৪৭-৫০
৪৭। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের খসড়া ম্যানিফেস্টো, জেনারেল সেক্রেটারী শামসুল হক এম এল এ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা, (প্রকাশের তারিখ নেই), পৃঃ ৩-৪

Dhaka University Institutional Repository



৫. এই রাষ্ট্রে পূর্ব ও পশ্চিমে দুটি আঞ্চলিক ইউনিট থাকবে,

৬. আঞ্চলিক ইউনিটগুলিকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারপূর্ণ অধিকার দিতে হবে,

৭. শাসনতন্ত্র রচিত হবে পূর্ণ গণতন্ত্রের ভিত্তিতে ।[৪৮]

এতদ্ব্যতীত মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান, পূর্ব বাংলার নিজস্ব পদাতিক, নৌ ও বিমান বাহিনী গঠন করা, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী ও কায়েমী স্বার্থের উচ্ছেদ, মূল শিল্প ও বিদেশী শিল্পের জাতীয়করণ, পর্যায়ক্রমে সমস্ত কৃষিজমিকে রাষ্ট্রের অধীনে নিয়ে আসা, শিল্প ও ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত একচেটিয়া অধিকার না-হতে দেওয়া প্রভৃতি বিষয়েও প্রস্তাব নেওয়া হয় ।[৪৯] বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার নীতি অনুসরণের আহ্বান জানিয়ে বলা হয় ঃ

> সাম্রাজ্যবাদী সরীসৃপের ফোঁস ফোঁস শব্দ আজ সমাজের আনাচে কানাচে সর্বত্র শোনা যাইতেছে, সেই ফোঁস ফোঁস শব্দই যেন এই যুগের সঙ্গীত । আমাদের কর্মী প্রতিষ্ঠান এই সরীসৃপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া তাহাদের বিষদাঁত উৎপাটন করিতে দৃঢ় পরিকর ।[৫০]

আওয়ামী মুসলিম লীগের নিখিল পাকিস্তান ভিত্তি বিশেষ ছিলনা । ১৯৫২ সালে সোহরাওয়ার্দী লাহোরে মুসলিম লীগ বিরোধী দলগুলির সমন্বয়ে জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন। এর প্রতি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের স্পষ্ট আনুগত্য ছিলনা ।[৫২] এটি তার নিজস্ব পথেই এগিয়ে যায় । বিভিন্ন জনপ্রিয় দাবিদাওয়া নিয়ে সংগ্রামী আন্দোলনের মাধ্যমে প্রদেশে এটি দ্রুত বিস্তার লাভ করে । ১৯৪৯ সালের দুর্ভিক্ষে ও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে এটি বলিষ্ঠ ভূমিকা নেয় । ১৯৫৩ সালে ময়মনসিংহে কাউন্সিল অধিবেশনে দলের সাম্প্রদায়িক চরিত্র পরিবর্তন করে সর্বশ্রেণীর জনগণের জন্য উন্মুক্ত করার প্রস্তাব নেওয়া হয় এবং ১৯৫৫ সালে দলের নামকরণ হয় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ।[৫৩]

---

৪৮। [illegible], ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩

৪৯। ঐ, পৃঃ ১৪ – ২৪

৫০। ঐ, পৃঃ ৩০ – ৩১

৫১। Mushtaq Ahmad, Government and Politics in Pakistan, 2nd ed.(Karachi : Pakistan publishing House, 1963) P. 148.

৫২। ঐ, পৃঃ ১৫২

৫৩। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ কাউন্সিল অধিবেশনের সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর অভিভাষণ, /পুস্তিকা/, ১৯৫৫, পৃঃ ২১

Dhaka University Institutional Repository



## ছয়

## পাকিস্তান যুব লীগ

গণতান্ত্রিক যুব লীগের অবলুপ্তির পর এর কর্মীরা পুনরায় সংঘবদ্ধ হবার চেষ্টা চালায়। ১৯৫১ সালের প্রথম দিকে ঢাকায় সম্মেলনের আয়োজন করলেও পুলিশের হস্তক্ষেপে ব্যর্থমনোরথ হয়ে বুড়িগঙ্গায় নৌকা ভাসিয়ে অনুষ্ঠান করা হয়। সেখানে জন্ম নেয় 'পাকিস্তান যুব লীগ'।[৫৪] এর ঘোষণাপত্রে গণতান্ত্রিক যুবলীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথাই মূলত বলা হয়, তবে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয় যুদ্ধবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির উপর। সম্মেলনে প্রচারিত ইশতাহারে বলা হয়ঃ

> আমরা যুদ্ধ চাইনা। দুনিয়ার যুব সমাজ আজ যুদ্ধের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করিতেছে। তাহাদের সঙ্গে কন্ঠ মিলাইয়া আমরাও ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিব। সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধের কামানের খোরাক হইব না। আমরা দাবী করিতেছি যে, আমাদের সরকার যুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াক। ... আজ আমরা ইহাও লক্ষ্য করিতেছি যে, দুনিয়ার গুটি কয়েক রাষ্ট্র এশিয়া আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশের কোটি-কোটি মানুষকে দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং উপনিবেশিক দেশগুলির আজাদীর আন্দোলনে ভীত সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরা মারমুখো হইয়া ঐসব দেশে রক্তের স্রোত ভাসাইয়া দিতেছে। আমরা এই সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ ও নৃশংসতার বিরুদ্ধে দৃঢ় আওয়াজ তুলিতে চাই এবং আজাদী সংগ্রামে লিপ্ত আমাদের কোটি কোটি ভাইবোনদের অভিনন্দন ও অকুন্ঠ সমর্থন জানাই।[৫৫]

১৯৫১ সালে যুব লীগের কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন মাহমুদ আলী /সভাপতি/, মোঃ তোয়াহা /সহসভাপতি/, অলি আহাদ/সাধারণ সম্পাদক/ ও আনিসুজ্জামান /দপ্তর সম্পাদক/।[৫৬]

---

৫৪। রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, বাংলাদেশ, মনসুর মুসা/সম্পাদক/, /ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৪/ পৃঃ ৩৯৩

৫৫। পাকিস্তান যুব সম্মেলন, /পুস্তিকা/, /ঢাকা ঃ ৩৬ নং রেঙ্কিন স্ট্রীট/, পৃঃ ৯

৫৬। রফিকুল ইসলাম, পূর্বোক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository



## সাত

### গণতন্ত্রী দলের জন্ম

১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাসের ১৬, ১৭ ও ১৮ তারিখে ঢাকার আরমানীটোলা ময়দানে পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকার বামপন্থী নেতাদের এক সম্মেলন হয়। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এতে যোগদেন সরদার শওকত হায়াত ও মিয়া ইফতেখার উদ্দিন (জন্ম ১৯০৮)।[৫৭] সম্মেলনের বিভিন্ন বক্তা সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশ রোধ করা ও জনগণের সেনাবাহিনী গড়ে তোলার আহ্বান জানান।[৫৮] এখানে গণতন্ত্রী দলের জন্ম হয় এবং পূর্ব বাংলা শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হন যথাক্রমে হাজী মোহাম্মদ দানেশ ও মাহমুদ আলী। সভায় প্রস্তাব নেওয়া হয়: বর্তমান গণপরিষদ বাতিল করে প্রাপ্ত বয়স্কদের যুক্ত নির্বাচনের দ্বারা নতুন গণপরিষদ প্রতিষ্ঠা করা, মূলনীতি উপকমিটির রিপোর্ট বাতিল করা, কেন্দ্রের এখতিয়ারে দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও আন্তঃআঞ্চলিক যোগাযোগ রেখে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের কনফেডারেশনের ভিত্তিতে নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা, ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিয়ে অবাধ গণতন্ত্রের পথ সুগম করা।[৫৯]

## আট

### কৃষক – শ্রমিক পার্টি

অবিভক্ত বাংলায় এ, কে, ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টি (১৯২৭) একটি শক্তিশালী সংগঠন ছিল, কিন্তু দেশবিভাগোত্তর পূর্ব বাংলায় এর অস্তিত্ব ছিল না। ফজলুল হকও প্রাদেশিক সরকারের এটর্নী জেনারেলের চাকুরী নিয়ে রাজনীতি থেকে সরে পড়েছিলেন। সে-সময় ১৯৫৩ সালের মে মাসে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে লীগ সভাপতি নূরুল আমীনের বিরুদ্ধে আনীত

---

৫৭। মর্নিং নিউজ, ১৭.১.৫৩

৫৮। মর্নিং নিউজ, ১৭.১.৫৩ ও ১৮.১.৫৩

৫৯। মর্নিং নিউজ, ১৯.১.৫৩

Dhaka University Institutional Repository



অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হয়; কিন্তু কেন্দ্রীয় লীগ নেতৃত্ব তার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত না-নেওয়ায় বিদ্রোহী সদস্যরা নতুন দল গঠন করতে উদযোগ নেয়। তারা ফজলুল হকের সঙ্গে তাঁর বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন সেপ্টেম্বর মাসে।[৬০] তিনি তাঁর কৃষক-প্রজা পার্টিকে পুনর্গঠন করেন। পূর্ব বাংলায় জমিদারী উঠে যাওয়ায় প্রজা শব্দটি রাখার যৌক্তিকতা ছিলনা, বরং শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে ওঠায় শ্রমিক শব্দটির অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব আসে। এভাবে জন্ম নেয় কৃষক-শ্রমিক পার্টি। কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এ,কে,ফজলুল হক ও আবদুল লতিফ বিশ্বাস এবং প্রাদেশিক কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে আবু হোসেন সরকার (১৮৯৪ - ১৯৬৯) ও কে,এম, সোলায়মান (জন্ম ১৯২৮)।[৬১]

পার্টির কর্মসূচীতে সমাজতন্ত্র কায়েম করা, বিনা খেসারতে জমিদারী ও জায়গীরদারী উচ্ছেদ করা, পাট ও চা ব্যবসা জাতীয়করণ করে নেওয়ার কথা ঘোষিত হয়, কিন্তু কর্মসূচীর চেয়ে পার্টি নেতৃত্বই ছিল এর প্রধান অবলম্বন ও আকর্ষণ। এ,কে, ফজলুল হকের অপরিসীম জনপ্রিয়তা ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবই দলটিকে পরিচিত করে তোলে।[৬২]

## নয়

### পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার বিভিন্ন প্রয়াস ও পূর্ব বাংলায় এর প্রতিক্রিয়া

১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানের ভবিষ্যত-শাসনতন্ত্রের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে পাক-গণপরিষদে একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়। Objective Resolution নামে অভিহিত এই প্রস্তাবে পাকিস্তানের ইসলামিক ভিত্তির উপর আত্যন্তিক গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়, সমগ্র জগতের মালিক আল্লাহ এবং তিনি পাকিস্তানের মাধ্যমে এর অধিবাসীদের উপর এক অত্যন্ত পবিত্র দায়িত্ব অর্পণ করেছেন; তাই ইসলাম ধর্মে গণতন্ত্র, সাম্য, স্বাধীনতা, সহিষ্ণুতা ও সামাজিক ন্যায়-বিচারের যে-আদর্শ রয়েছে, পাকিস্তানে তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত করা হবে এবং কোরান ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন-যাপনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।[৬৩]

---

৬০। Mushtaq Ahmad, P. 163

৬১। এম,নজরুল ইসলাম, কৃষক শ্রমিক পার্টি(অপ্রকাশিত প্রবন্ধ), ১৯৭৫ সালের ১০-১২ই জানুয়ারী বাংলাদেশ মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে আয়োজিত উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক সেমিনারে পঠিত, পৃঃ ৬

৬২। Mushtaq Ahmad, P. 165

৬৩। G.W.Choudhury, Documents And Speeches on the Constitution of Pakistan, (Dacca : Green Book House, 1967), PP. 23-24

Dhaka University Institutional Repository



এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্রের 'মূলনীতি' রচনা করা হয়। মূলনীতিতে বলা হয় : বিকল্প দ্বিকক্ষবিশিষ্ট জাতীয় পরিষদ হবে, House of Units নামক উচ্চ পরিষদে বিভিন্ন প্রদেশের সমান প্রতিনিধিত্ব থাকবে, House of People নামক নিম্ন পরিষদে প্রতিনিধিত্ব হবে জনসংখ্যানুপাতে, দুই পরিষদের ক্ষমতা সমান থাকবে কিন্তু অর্থনৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে উভয় পরিষদের যুক্ত বৈঠকে। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা ও শক্তিশালী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কথাও এতে বলা হয়।[৬৪]

রিপোর্টের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় দারুণ বিক্ষোভ দেখা দেয়। বিভিন্ন সভায় বক্তারা পাকিস্তানে ক্রমবর্ধমান ইসলামিক প্রভাব, নিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্সের যথেচ্ছ প্রয়োগ, একচেটিয়া সুবিধাভোগী ক্ষুদ্র শ্রেণীর সৃষ্টি প্রভৃতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন।[৬৫] আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতৃত্বে বিভিন্ন দলের যৌথ জনসভায় আতাউর রহমান খান (জন্ম ১৯০৭) ও কামরুদ্দিন আহমদ (জন্ম ১৯১২) স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের, শামসুল হক সমাজতান্ত্রিক পাকিস্তানের এবং কমিউনিস্ট দলের নেতারা পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত জাতি সমূহ নিয়ে গঠিত পাকিস্তান কনফেডারেশনের পক্ষে যুক্তি দেন।[৬৬] সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ বিকল্প শাসনতন্ত্র হাজির করা হয় :

ক. রাষ্ট্রের নাম হবে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র,

খ. পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র হবে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র,

গ. উভয় প্রদেশ থেকে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সমানসংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি আইনপরিষদ গঠিত হবে,

ঘ. রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু ও বাংলা,

ঙ. কেন্দ্রের হাতে শুধু বৈদেশিক সম্পর্ক ও দেশরক্ষার দায়িত্ব থাকবে, তবে দুই প্রদেশে এই দুই বিভাগের আঞ্চলিক অফিস থাকতে হবে। দেশরক্ষার জন্য দুই প্রদেশের যুবকদের নিয়ে গঠিত স্বতন্ত্র ক্যাডেট দুটি স্বতন্ত্র বাহিনী থাকবে,

চ. অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রের কর-ধার্যের অধিকার থাকবে, নতুন কর আরোপ করতে হবে প্রদেশের অনুমোদন নিয়ে।[৬৭]

---

৬৪। ঐ, Introduction, P. III

৬৫। সরলানন্দ সেন, পৃঃ ৯-১০

৬৬। অমিত মুখার্জী, পৃঃ ৪৮

৬৭। Kamruddin Ahmad, ... Social History of East Pakistan, 2nd ed. (Dacca : Cresent Book Store, 1967), Appendix C.

Dhaka University Institutional Repository



পূর্ব বাংলার ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের পরিপ্রেক্ষিতে লিয়াকত আলী তাঁর প্রস্তাব স্থগিত রাখলেন। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনও পাঞ্জাবে বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় রিপোর্ট পরিত্যাগ করেন।[৬৮] তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী তৃতীয় রিপোর্ট পরিষদে পেশ করেন ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে। এতে প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে এমন বিধান রাখা হয়, যাতে উভয় পরিষদের যুক্ত বৈঠকে দুই অংশের সদস্য সংখ্যা সমান হয়, যদিও নিম্নপরিষদের সদস্য সংখ্যা হবে জনসংখ্যানুপাতে। এতে উর্দু ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার কম্যুর সমাধিকার করা হয় এবং বাদো বলা হয় কেন্দ্রীয় সরকার পাকিস্তান ভিত্তিক একটি জাতীয় ভাষা সৃষ্টির চেষ্টা করবেন।[৬৯]

এই রিপোর্টের বিরুদ্ধে কৃষক-প্রজা পার্টির নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখা দেয়। অক্টোবর মাসের নয় তারিখে এক বিরাট সভায় মোহাম্মদ আলীর ফর্মুলাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। কারণ হিসাবে বলা হয় এতে পূর্ব বাংলার জনগণের সর্বজনীন দাবি লাহোর-প্রস্তাব ভিত্তিক পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের ব্যবস্থা নেই, প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে পারস্পরিক স্বেচ্ছার পরিবর্তে অবিশ্বাসের মনোভাব রাখা হয়েছে, House of Units -এ পূর্ব বাংলাকে প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে পশ্চিমাঞ্চলের ছোট-ছোট অঞ্চলের সমতুল্য করা হয়েছে, এবং জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়ে সীমাবদ্ধ ক্ষমতার অধিকারী এক কেন্দ্রীয় ফেডারেল বিধান সভা সৃষ্টির পূর্ব বাংলার দাবিকে স্বীকার করা হয়নি।[৭০] তবু গণপরিষদ এই ফর্মুলা গ্রহণ করে এবং ১৯৫৪ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর জন্মদিনে নতুন শাসনতন্ত্র জারির ঘোষণাও হয়, কিন্তু এই সময় গভর্ণর জেনারেল এক আদেশ বলে গণপরিষদই বাতিল করে দিলে শাসনতন্ত্র রচনার প্রয়াস পরিত্যক্ত হয়।

দশ

১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ

১৯৪৬ সালের নির্বাচিত সদস্যরাই দেশবিভাগের পর পূর্ব বাংলা পরিষদের সদস্য হিসাবে কাজ করে। ১৯৫১ সালে এদের মেয়াদ শেষ হলেও নানা অজুহাতে বিলম্ব করে ১৯৫৪ সালের

---

৬৮। G.W.Choudhury, Introduction, P. IV

৬৯। Ibid, P. V-VI

৭০। Constituent Assembly of Pakistan Debates : Official Report.24.10.53, P.397

Dhaka University Institutional Repository



মার্চ মাসে নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়।[৭১]

মুসলিম লীগ নির্বাচনের ব্যাপারে বিরাট তোড়জোড় শুরু করে। প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীসহ পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক বড়-বড় নেতা নির্বাচনী প্রচারে পূর্ব বাংলা আসেন। ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসে দলের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করা হয়। এতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা, পূর্ব বাংলায় নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, কৃষি-শিল্পের উন্নতির জন্য বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণের ওয়াদা করা হয়। তাছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে কোরান শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, পাকিস্তানী আদর্শ মোতাবেক মৌলিক অধিকার দান, মসজিদকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া, কোরান-সুন্নাহর ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও ইসলামী সমাজ গঠনেরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।[৭২]

মুসলিম লীগের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আওয়ামী লীগ, কৃষক-প্রজা পার্টি, গণতন্ত্রী দল ও নেজামে ইসলাম ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। এতে কমিউনিস্ট পার্টিকে নেওয়া হয়নি কিন্তু যেখানে সুপরিচিত কমিউনিস্ট কর্মীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে সেখানে কোনো প্রার্থী দেওয়া হয়নি।[৭৩]

যুক্তফ্রন্টের বিখ্যাত একুশ দফা রচনা করেন আবুল মনসুর আহমদ। একুশে ফেব্রুয়ারীকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ফ্রন্টের বিভিন্ন অঙ্গদলের ম্যানিফেস্টোর সমন্বয়ে একুশ দফা প্রণীত হয়।[৭৪] এর মুখবন্ধে নীতি হিসাবে কোরান-সুন্নাহ বিরোধী আইন না করা ও ইসলামী সাম্য-ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে জীবন-যাপনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির কথা বলা হয়। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা /১ নং/, পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাড়ি বর্ধমান হাউসকে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা /১৬ নং/ ভাষা-আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে শহীদ মিনার নির্মাণ করা ও শহীদদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া /১৭ নং/, ২১-এ ফেব্রুয়ারীকে শহীদ দিবস হিসাবে ঘোষণা করে সরকারী ছুটির দিন হিসাবে গণ্য করা /১৮ নং/, বিনা ক্ষতিপূরণে

---

৭১। Keith Callard, Pakistan, A Political Study(London :Allen & Unwin, 1957),P.29

৭২। মর্নিং নিউজ, ৯।১২।৫৩

৭৩। Kamruddin Ahmad, P. 128.

৭৪। আবুল মনসুর আহমদ, পৃঃ ৩২১

Dhaka University Institutional Repository



জমিদারী উচ্ছেদ করা (২ নং), পাট ব্যবসাকে জাতীয়করণ করে পূর্ব বাংলা সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা (৩ নং), কৃষির উন্নতির জন্য সমবায় পদ্ধতির প্রবর্তন করা (৪ নং), পূর্ব বাংলাকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা ও মুসলিম লীগ আমলের লবণ কেলেংকারীর তদন্ত করা (৫ নং), বন্যা ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা (৭ নং), পূর্ববঙ্গকে শিল্পায়িত করা (৮ নং), অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা (৯ নং), শিক্ষা সংস্কার করা (১০ নং), ঢাকা-রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বাতিল করে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা (১১ নং), শাসন ব্যয় হ্রাস করা ও কোনো মন্ত্রীর এক হাজার টাকার বেশি বেতন না নেওয়া (১২ নং), জননিরাপত্তা আইন বাতিল করা (১৪ নং), বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা (১৫ নং), আইন পরিষদের মেয়াদ না-বাড়ানো এবং কার্যকাল শেষ হবার ছয় মাস পূর্বে মন্ত্রিসভার পদত্যাগ করে নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা (২০ নং), এবং শূন্য আসনে তিন মাসের মধ্যে উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা (২১ নং) প্রভৃতি ছিল প্রধান-প্রধান নির্বাচনী ওয়াদা। তাছাড়া গুরুত্বপূর্ণ ছিল লাহোর প্রস্তাব ভিত্তিক পূর্ব বাংলাকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম করা এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত অবশিষ্ট বিষয়সমূহ প্রাদেশিক সরকারের আওতায় নিয়ে আসা।[৭৫]

একুশ দফার প্রভাব হয়েছিল অসাধারণ। মাওলানা ভাসানী ও ফজলুল হকের মত নেতৃত্ব ও অসংখ্য ত্যাগী কর্মীর প্রচারে যুক্তফ্রন্ট ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তিনি একুশ দফার পক্ষে প্রকাশ্য কোনো বক্তব্য রাখেন নি।[৭৬] যাহোক, তবু যুক্তফ্রন্টের বিজয় নিশ্চিত হয়ে যায়। জনসাধারণ যে কিরূপ মনোভাব নিয়ে ভোট দিয়েছিল, আবুল মনসুর আহমদের রাজনৈতিক আত্মজীবনীতে তার উল্লেখ আছে।[৭৭] ফলে যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে। ৩০৯টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ সর্বমোট ১০টি ও যুক্তফ্রন্ট ২৩৩টি আসনে জয়ী হয়।[৭৮] বিভিন্ন দলের ছদ্মাবরণে নির্বাচিত কমিউনিস্ট সদস্যদের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬-এ।[৭৯]

---

৭৫। আবুল কাশেম, একুশ দফার রূপায়ণ, (পুস্তিকা), ঢাকা, ১৯৫৪, পৃঃ ১-৩

৭৬। Syed Qamrul Ahsan, Politics and Personalities in Pakistan, Revised Edition, (Dacca, 1969), PP. 106-107

৭৭। আবুল মনসুর আহমদ, পৃঃ ৩৩০

৭৮ [illegible]

৭৯ Tariq Ali, P. (London: Jonathan Cape Ltd, 1970), P. 62

Dhaka University Institutional Repository



যুক্তফ্রন্টের সাফল্যের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার দীর্ঘদিনের সমস্যা অবসিত হওয়ার ও ন্যায্য অধিকার অর্জনের সম্ভাবনা প্রসূত হয়। নির্বাচিত সদস্যরা প্রকাশ্য জনসভায় শপথ নেন একুশ দফা আদায়ের জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাতে। প্রদেশের সর্বত্র বয়ে যায় আনন্দ-উল্লাসের ঢেউ। এমনি উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিবেশে কৃষক-শ্রমিক পার্টির এ,কে, ফজলুল হক মন্ত্রীসভা গঠন করেন ৩রা এপ্রিল। পরে আওয়ামী লীগকে অন্তর্ভুক্ত করে তিনি মন্ত্রীসভা সম্প্রসারিত করেন ১৫ই মে। ৩০-এ এপ্রিল তিনি যান তাঁর যৌবনের কর্মক্ষেত্র কলকাতায়। প্রধানত চিকিৎসার জন্য গমন করলেও তিনি সে-সুযোগে চিকিৎসক ও পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের (মৃ. ১৯৬২) সঙ্গে দুই বঙ্গের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, ভ্রমণ-যোগাযোগ, সীমান্ত-সমস্যা ও সাংস্কৃতিক সফর বিনিময় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। বিভিন্ন সংবর্ধনা সভায় তিনি পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার সাংস্কৃতিক অভিন্নতা ও ঘনিষ্ঠ সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে খোলাখুলি মত প্রকাশ করেন। ৩রা মে এক সংবর্ধনা সভায় তিনি বলেন:

> একটি দেশের রাজনৈতিক বিভাগে আমি বিশ্বাস করিনা। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান — এই দুইটি বিভেদার্থক শব্দের সঙ্গে আমি এখনও পর্যন্ত সুপরিচিত হতে পারিনি। ... যারা আমার এই সোনার দেশকে দুভাগ করেছে তারা দেশের দুশমন। আমার মতে পাকিস্তান বলতে কিছুই বোঝায় না — এই শব্দটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবার ও স্বার্থসিদ্ধির একটি পন্থামাত্র।[৮০]

---

৮০। অমিতাভ গুপ্ত, <u>বাংলাদেশ</u>, নতুন সং (কলকাতা: আনন্দধারা প্রকাশন, ১৩৭৮), পৃঃ ৫৪

ফজলুল হক পরে রাজনৈতিক চাপের মুখে এই বক্তব্য অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু তিনি যে এ-ধরনের বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার কিছু পরোক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যে সাংবাদিকরা তাঁর সঙ্গে কলকাতা গিয়েছিলেন তাঁরা কেউই কলকাতার বক্তৃতা সম্পর্কে কোনো রিপোর্ট পাঠাননি, 'আপত্তিকর বলে'। (খোন্দকার আবদুল খালেক, <u>এক শতাব্দী</u> (শেরে বাংলার জীবনী), ৩য় সং, (ঢাকা: প্রকাশভবন, ১৩৭৩), পৃঃ ২২৫। মাওলানা আকরাম খাঁ সম্পাদিত মাসিক মোহাম্মদীতে বক্তৃতার নিম্নরূপ সারাংশ পাওয়া যায়:

> কলিকাতায় তিনি যে সকল উক্তি করিয়াছেন তার নির্গলিতার্থ এই যে তিনি দেশ-বিভাগ বিশ্বাস করেন না, পাকিস্তান এবং হিন্দুস্থান শব্দ দুটির সহিত তিনি পরিচিত নহেন, যাঁহারা দেশবিভাগ করিয়াছে তাহারা দেশের দুশমন, পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার ঐক্যে তিনি বিশ্বাস করেন। (মাসিক মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১, পৃঃ ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository



সাংস্কৃতিক ইতিহাসপ্রবাহ

এক

**প্রগতি লেখক সংঘ**

এই শতকের চতুর্থ দশকে লণ্ডন-প্রবাসী কয়েকজন ভারতীয় তরুণ কমুনিস্ট পার্টির সহযোগী একটি সাহিত্য-সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' নামক এই সংগঠনের ঘোষিত লক্ষ্য ছিল বামপন্থী আদর্শে পরিচালিত হয়ে, সমাজের মূল সমস্যা ক্ষুধা দারিদ্র্য সামাজিক পশ্চাৎমুখীনতা ও রাজনৈতিক পরাধীনতাকে অবলম্বন করে নতুন ধারার সাহিত্য রচনা করা এবং সামাজিক পরিবর্তনকে প্রগতিশীলতার খাতে বইয়ে দেওয়া।[১০৫] ১৯৩৯ সালে ঢাকায় এর একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। বেলজিয়ামের ব্রাসেলস নগরীতে রোমাঁ রোলাঁ /১৮৬৬–১৯৪৪/ ও আঁরি বারবুসের চেষ্টায় গঠিত League against Imperialism and War প্রতিষ্ঠানটিও প্রগতি লেখক সংঘকে প্রভাবিত করেছিল বলে কেউ-কেউ মনে করেন।[১০৬] ঢাকা শহরের দক্ষিণ মৈশণ্ডিতে প্রগতি পাঠাগার ছিল সদস্যদের মিলনের স্থান। সোমেন চন্দ /১৯২০–১৯৪২/, রণেশ দাশগুপ্ত, অচ্যুত গোস্বামী, মুনীর চৌধুরী /১৯২৫–১৯৭১/ ও সরদার ফজলুল করিম /জন্ম ১৯২৫/ প্রমুখ ছিলেন নিষ্ঠাবান কর্মীদের কয়েকজন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এর নতুন নামকরণ হয় 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ'।[১০৭] মহাযুদ্ধের অবসানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের অনুচারী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি প্রদেশের জনগণের বিপ্লবী চেতনাকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুখ থেকে সাম্যবাদ বিরোধী মুখে ফেরাবার চেষ্টা করলে সংঘের নতুন দায়িত্ব হয় 'ভারতের বিপ্লবমুখী জনচেতনাকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী খাতে রেখে তীব্রতর করে তোলা, বিপ্লবকে স্বাগত করা'। ১৯৪২ সালে সোমেন চন্দ ঘাতকের হাতে নিহত হলে সংঘে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। দেশবিভাগের পর বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীরা সরকারী নির্যাতনের শিকার হলে সংঘের কর্মীরাও আক্রান্ত হন। অনেকে কারাগারে ও অনেকে ভারতে চলে যান। ফলে সংঘের কাজ অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে।

---

১০৫। সাঈদুর রহমান, নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের ঘোষণাপত্র, অঙ্গীকার/অনিয়মিত পত্রিকা/, ঢাকা জুন ১৯৭৬, পৃঃ ২৫–২৭

১০৬। রণেশ দাশগুপ্ত, সোমেন চন্দের গল্পগুচ্ছ,/ঢাকা : কালিকলম প্রকাশনী, ১৯৭৩/, পটভূমি, পৃঃ ৷৵ – ৷৶

১০৭। ঐ, পৃঃ l. – ll৵.

Dhaka University Institutional Repository



## দুই

### পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি

১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হলে বাঙালী মুসলমান সাহিত্যিকদের একাংশ পাকিস্তানী আদর্শের ভিত্তিতে সাহিত্য সৃষ্টির জন্য সচেষ্ট হলেন — এভাবে ১৯৪২ সালের আগস্ট–সেপ্টেম্বর মাসে মুজিবর রহমান খাঁকে আহবায়ক করে গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি। সোসাইটির লক্ষ্য ছিল 'জাতীয় রেনেসাঁর উদ্বোধক পাকিস্তানবাদের সাহিত্যিক রূপায়ণ', পাকিস্তানবাদ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ও মননমূলক আলোচনার ব্যবস্থা করা, সাহিত্যে পাকিস্তান বিরোধী 'প্রতিক্রিয়াশীল' ভাবধারাকে প্রতিহত করা।[১০৯] সাহিত্যে পাকিস্তানবাদ বলতে এরা নিজেরা যোটামুটি বোঝাতে চাইতেন হিন্দুদের থেকে পৃথক থেকে মুসলমানদের জীবন ভিত্তিক, আরবী–ফারসী–উর্দু শব্দ বহুল বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করা এবং সংস্কার করে নতুন বাংলা ভাষা নির্মাণ করা। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্মই ছিল সংস্কৃতির মুখ্য অবলম্বন।

সোসাইটির কাজকর্ম বেশ জোরে–শোরে চলেছিল এবং প্রথম দুবছরে চল্লিশটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। কোনো–কোনো সভায় গোপাল হালদার ও এম,এন,রায় /১৮৮৭ – ১৯৫৪/ প্রবন্ধ পড়েছিলেন। সমিতি ভবিষ্যত–পূর্ব পাকিস্তানের একটি মানচিত্র তৈরী করে তা জিন্নাহর কাছে পাঠিয়ে দেয়। এতে ভাগীরথী নদীকে পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা হিসাবে চিহ্নিত করায় সোহরাওয়ার্দী ও নাজিমুদ্দিন তা প্রত্যাখ্যান করেন বলে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আবুল কালাম শামসুদ্দিন তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন।[১১০]

## তিন

### পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ

রেনেসাঁ সোসাইটির প্রতিষ্ঠার পর 'বঙ্গ দেশীয় মুসলিম সংস্কৃতিকে বলগতি প্রদান করার আশায়' ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সভাপতি ও সম্পাদক

---

১০৯। পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির কার্য বিবরণী, মাসিক মোহাম্মদী, পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মেলন সংখ্যা, শ্রাবণ–ভাদ্র ১৩৫১, পৃঃ ৫২৭–২৮

১১০। আবুল কালাম শামসুদ্দিন, অতীত দিনের স্মৃতি, /ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৮/, পৃঃ ২৩০–৪১।

Dhaka University Institutional Repository



ছিলেন যথাক্রমে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন ও সৈয়দ আলী আহসান। ১৯৪৩ সালে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে সংসদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[১১১]

তিনটি লক্ষ্যে সংসদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ঃ ইসলামের পুনরুত্থান ঐতিহ্য থেকে উপাদান আহরণ করা, অধুনা অপাংক্তেয় মুসলমানী পুঁথিকে পরিমার্জিত করে প্রাচীন সাহিত্যের অঙ্গীভূত করা এবং পূর্ব পাকিস্তানের অশিক্ষিত গ্রাম্যকবিদেরকে আরো বেশি করে সাহিত্যে নিয়োজিত করা।[১১২] ১৯৪৪ সালে সংসদের পক্ষ থেকে কবি কায়কোবাদকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়, কারণ 'মুসলমানদের পতনকালীন যুগে তিনিই প্রথম ইসলামের ঐতিহ্যগত অনুভূতিকে প্রশ্রয় দেন'।[১১৩]

সংসদের মুখপত্র ছিল পাক্ষিক 'পাকিস্তান'। এর উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যবোধ সৃষ্টির সঙ্গে জাতীয় সাহিত্যের সন্ধান নির্দেশ করা, লোক সাহিত্য থেকে উপাদান নিয়ে নতুন কবিতা লেখা এবং সাহিত্যে ইসলামী আদর্শের প্রচার করা।[১১৪]

প্রতিষ্ঠানটি কয়েকবছর সক্রিয় ছিল।

চার

পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশ

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যে-প্রতিষ্ঠানটি প্রথমদিকে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ছিল তা হল পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশ। 'পাকিস্তানের তৌহিদী জনতার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান' পরিচয়ে এটি ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর গঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র ও অধ্যাপক, বিশেষ করে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাসেম, ছিলেন এর মূল সংগঠক।[১১৫]

---

১১১। সৈয়দ আলী আহসান, পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যের ধারা, মাহে নও, আগস্ট ১৯৫১।

১১২। ঐ, ঐ

১১৩। ঐ, ঐ

১১৪। ঐ, ঐ

১১৫। বদরুদ্দীন উমর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪

Dhaka University Institutional Repository



মজলিসের মূল প্রস্তাবনা ছিল ঃ

ক. 'মজলিশ বিশ্বাস করে ঃ একমাত্র ইসলামী (শাশ্বত) আদর্শের ভিত্তিতেই আমাদের সমস্যা জর্জরিত এবং নিপীড়িত বিশ্ব-মানবের সত্যিকার মুক্তি সম্ভব।'

খ. 'মজলিশ আমাদের মানবতা-বিরোধী সমাজব্যবস্থায় পচা বিকৃত ও জনবিরোধী সংস্কৃতি এবং কুসংস্কার ও প্রতিক্রিয়াশীলতা দূর করে ব্যাপক জাগরণমূলক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সুস্থ ও সুন্দর তমদ্দুন গড়ে তুলবে।'

গ. 'মজলিশ মানবীয় মূল্যবোধের উপর সাহিত্য-শিল্পের মারফত নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে।'

ঘ. 'পাকিস্তানের গণজীবনে মনোবিপ্লব সাধন করে ইসলামী আদর্শের দিকে মানুষকে এগিয়ে দেওয়াই মজলিশের আশু উদ্দেশ্য'।

ঙ. 'মজলিশে স্বার্থপর, মোনাফেক বা নাস্তিকের কোনো স্থান নেই। আদর্শবাদী নিঃস্বার্থ সাংস্কৃতিক কর্মীরাই মজলিশের ধারক, বাহক এবং পরিচালক'।[১১৬]

তমদ্দুন মজলিশ অত্যন্ত সুশৃংখল ও একনিষ্ঠভাবে কাজকর্ম পরিচালনা করে। এর মুখপত্র 'সাপ্তাহিক সৈনিক' নিয়মিত ভাবে প্রায় দশবছর ধরে প্রকাশিত হয়। নানারূপ সাংস্কৃতিক সম্মেলন, বিতর্ক সভা ও আলোচনা সভার মাধ্যমে মজলিশ জনপ্রিয়তা অব্যাহত রাখে। এর পক্ষ থেকে Historical materialism,and Islam, Islamic Economy বিবর্তনবাদ সৃষ্টিতত্ত্ব ও আল্লাহর অস্তিত্ব, পাকিস্তানে ইসলামী আন্দোলন, পাকিস্তানের সাহিত্য ও তমদ্দুন, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রভৃতি বেশ কয়েকটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।[১১৭] সংগঠনগতভাবে ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্বে এর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

পাঁচ

সংস্কৃতি সংসদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক 'সংস্কৃতি সংসদ' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫১ সালে। প্রথম দিকে নাটক অভিনয়ের মধ্যেই এর কার্যকলাপ সীমিত ছিল। জনানন্দী (১৯৫৮), কাজী আফিজুদ্দীন 'পথিক'

---

১১৬। পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশের নয়া গঠনতন্ত্রের খসড়া (পুস্তিকা), প্রকাশের তারিখ নেই।
১১৭। সাপ্তাহিক সৈনিক, ১৯.১২.৫২

Dhaka University Institutional Repository



/১৯৫৩/, মেঘনাদবধ ও মুনীরের 'কবর' /১৯৫৪/ ছিল প্রথম দিকের উল্লেখযোগ্য নাট্যাভিনয়।[১১৮] এগুলির বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী চরিত্র। ধীরে-ধীরে দেশাত্মবোধক ও গণসংগীতের অনুষ্ঠান করা এর কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়। 'সাম্রাজ্যবাদের সমাপ্তি, এবং ধনতন্ত্রবাদের পতন আর সামূহিক সমাজতন্ত্রের অপ্রতিরোধ্য হাওয়া। রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নির্দিষ্ট হয়েছে অনেকবার। সঙ্গে-সঙ্গে সংস্কৃতিরও রূপান্তর' — এই বোধ প্রতিফলিত হয় সংসদের কার্যসূচীতে।[১১৯]

প্রথম তিনবছর সংস্কৃতি সংসদের সভাপতি ছিলেন খান সারওয়ার মুর্শিদ, মুস্তফা নূরুল ইসলাম ও আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ খান।[১২০]

এই সংগঠনটি প্রদেশ-ভিত্তিক না-হলেও এর সদস্যরা পরবর্তীকালে প্রদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেকালে প্রদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় সংস্কৃতি সংসদের পরোক্ষ প্রভাব পড়েছিল সারা প্রদেশে।

ছয়

## বাংলা ভাষার উপর হামলা

দেশবিভাগের পর সরকারী পর্যায়ে বাংলার উপর হামলা আসে তিনদিক থেকে : এক, নির্বিচারে আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দ ঢুকিয়ে বাংলা ভাষার মুসলমানী রূপ ফুটিয়ে তোলা, দুই, আরবী হরফে বাংলা লেখা, তিন, উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করে জাতীয় জীবন থেকে বাংলাকে সরিয়ে দেওয়া। বলা বাহুল্য, কোনো চেষ্টাই সফল হয়নি।

---

১১৮। সংস্কৃতি সংসদ প্রসঙ্গে, কামরুল আহসানের /সম্পাদিত/, সংস্কৃতি সংসদ /স্মরণিকা/, বৈশাখ ১৩৭২, পৃঃ ৯

১১৯। ঐ, পৃঃ ৭

১২০। সংস্কৃতি সংসদের প্রতিষ্ঠা দিবস থেকে সভাপতি ও সম্পাদকগণ, ঐ, পৃঃ ২১

Dhaka University Institutional Repository



১৯৪৭ সালের পূর্ব থেকেই রেনেসাঁ সোসাইটি বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসী-উর্দু তথা মুসলমানী শব্দ অকাতরে ব্যবহার করার জন্য সুপারিশ করে আসছিল — এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। পূর্ব বাংলা সরকারের এই চেষ্টা মনঃপূত হয় এবং বিভিন্ন সরকারী সংস্থার মাধ্যমে অভিনব বাংলা ভাষা নির্মিত হয়ে প্রচারিত হতে শুরু হল। যুক্তি দেওয়া হয়, জন্মের পর থেকে বাংলা ভাষার গতি কখনো একমুখীন থাকেনি, বিভিন্ন সময়ের রাজনৈতিক পরিবর্তন একে প্রভাবিত করেছে। মধ্যযুগে ইসলাম ধর্মাবলম্বী শাসকেরা এর ইসলামী রূপ দিয়েছিল, আধুনিক যুগে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতেরা দেয় সংস্কৃত ঘেঁষা রূপ। সেই ঐতিহ্য অনুসারে বর্তমানে তারা এর পাকিস্তানী রূপ দিতে উৎসুক। মুখপাত্রগণ এই নতুন ভাষাতেই তাদের বক্তব্য হাজির করেছিলেন।

> গোজাস্তা এদারাতে আমরা অতীতে বাংলা ভাষার নানা মোড় পরিবর্তনের কথা মোখতাসার ভাবে উল্লেখ করেছিলাম। বাংলা ভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল সকলকে স্বীকার করতেই হবে, যে শৈশবে বাংলা ভাষা মুসলমান বাদশাহ এবং আমীর-ওমরাহদের নেকনজরেই পরওয়ারেশ পেয়েছিল এবং শাহী দরবারের শান-শওকত হাসিল করেছিল। ... সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের তাহজীব তমদ্দুনের তায়াল্লুক বর্জিত বাংলা ভাষা আসলেকি পাকিস্তানের মাতৃভাষা নয়, এবং হবেনা, হতে পারেনা। একথা ভুলে যাওয়া হবে বোকামী।[১২১]

রেডিও পাকিস্তান থেকে সংবাদ-প্রচার শুরু হয় এই বাংলা ভাষাতেই :

> পিছলে এতোয়ার খান পাক্কার বীর সওকা গ্রেফতার হয়েছেন।... হুকুমতে হায়দরাবাদ হুকুমত হিন্দুস্তানের খেলাফে জং ও জেহাদের ইরাদা জাহির করেছেন।[১২২]

স্কুলে পাঠ্য কবিতা-গানেও এই ভাষার নমুনা পাওয়া যায় :

> পাতা আকলীতে নারঙ্গীন রূপে অনার শরবৎ
> নারঙ্গী রাখে রসিক মেহেলী মেওয়ার মহব্বৎ।
> সবুজ বেগী পুষাক পা'য়দানী সাজিয়াছে মওসুমী
> মজল নূরের চূড়া হতে তার উঠিয়াছে তব্বীর।[১২৩]

---

১২১। আমাদের গোজারেশ, মাসিক মাহে নও, অক্টোবর ১৯৪৯, পৃঃ ৫৪-৫৫

১২২। আতাউর রহমান খান, স্বৈরাচারের দশ বছর, ১ম সং/ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭০/ ৪১২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১২৩। কামারুদ্দিন আহমদ, আমাদের মুক্তি সংগ্রাম/ঢাকা : প্রকাশের তারিখ নেই/ ১৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

Dhaka University Institutional Repository



কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪৭ সাল থেকেই বাংলা ভাষায় আরবী হরফ চালু করার চেষ্টা করে। কেন্দ্রের বাঙালী শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান এবং পূর্ব বাংলা সরকারের অবাঙালী শিক্ষাসচিব [illegible] আহমদ করিম [illegible] ছিল এর উদ্যোক্তা, আর চট্টগ্রামের 'হরফুল কোরান সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা জুলফিকার আলী ছিল তাদের বিশ্বস্ত সহায়তাকারী। এই মাওলানা সাহেব মনে করতেন কোরানের হরফে মুসলমানদের সমস্ত লেখাপড়া হওয়া উচিত। তিনি আরবী হরফে বাংলা লেখে চট্টগ্রামে একটি পত্রিকা চালাতেন ও কিছু-কিছু বই লিখেছিলেন।[124]

ফজলুর রহমান যুক্তি দিতেন এইভাবে: যে হরফের মাধ্যমে যত সহজে ও তাড়াতাড়ি পড়া যায় সে হরফই ভাল, বাংলায় বহু সংযুক্ত অক্ষর থাকায় টাইপরাইটার ও সর্ট হ্যান্ডের কাজে তা ব্যবহারের অসুবিধা অনেক, এদিক দিয়ে আরবী হরফের সুবিধা অনেক, দেশের শতকরা ৯০ ভাগ লোককে সাক্ষর করে তোলার জন্য আরবী হরফের উপযোগিতা সবচেয়ে বেশি এবং পাকিস্তানের দুই অংশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য এভাবে সহজতর হবে।[125]

পরবর্তী পর্যায়ে আরবীতে বাংলা শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা হয়। ১৯৫০ সালের ৬ই এপ্রিল থেকে ২০টি কেন্দ্রে বয়স্কদের শিক্ষা দান শুরু হয়। প্রতি কেন্দ্রে ২৫ থেকে ৩০ জন ছাত্র ছিল এবং শিক্ষাকাল ছিল ছয়মাস। ছাত্রদের বিনামূল্যে আরবী হরফে লেখা বাংলা বই দেওয়া হত। এক বছর পর প্রাথমিক স্কুলে এভাবে শিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।[126]

সরকারী এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত সৃষ্টি হয়। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের 'ভাষা কমিটি' এক বিবৃতিতে এই প্রচেষ্টাকে পূর্ব বাংলার শিক্ষিত সমাজকে অশিক্ষিত বানাবার পাকিস্তান সরকারের এক সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করে,[127] তমদ্দুন মজলিশও এর নিন্দা করে,[128] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড ও বর্ণমালা বিবেচনা বিশেষজ্ঞ কমিটির নিকট স্মারক লিপি দিয়ে প্রতিবাদ জানায়। প্রতিবাদ লিপির শেষাংশে বলা হয়:

> আরবীর প্রভুত্ব লাভের দুরাকাংখা এমনিভাবে পাকিস্তানের শত্রুতা করিতে যাইতেছে। পাক-বাংলার মনে নূতন পরাধীনতার আশঙ্কাকে কায়েম করিয়া তুলিতেছে।[129]

---

১২৪। আবুল ফজল, রেখাচিত্র, ২য় সং/চট্টগ্রাম ঃ নবেম্বর, ১৯৬৮/ পৃঃ ৩০৭

১২৫। বদরুদ্দীন উমর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৭

১২৬। ঐ, পৃঃ ২৬৯—৭০ ।        ১২৭। ঐ, পৃঃ ২৬১

১২৮। ঐ, পৃঃ ২৬২

১২৯। ঐ, পৃঃ ২৬০

Dhaka University Institutional Repository



তাছাড়া প্রতিবাদ জানায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ, ইকবাল হল ছাত্রসংসদ, জগন্নাথ কলেজ ও ইডেন কলেজ ছাত্র সংসদ।[১৩০] এই বিক্ষোভের মুখে প্রাদেশিক সরকার জানায় যে, বাংলা ভাষার রূপ কি হবে তা এ-প্রদেশের জনগণই নির্ধারণ করবে, কিন্তু এর পরেও গোপনে সরকারের তৎপরতা অব্যাহত থাকে।

১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে বাংলা ভাষা সংস্কারের জন্য প্রাদেশিক সরকার যে ভাষা-কমিটি গঠন করে তার মূল উদ্দেশ্য ছিল আরবী হরফে বাংলা লিখার সুপারিশ আদায় করা, কিন্তু সুপারিশ অনুযায়ী না-হওয়ায় এর প্রকাশ স্থগিত রাখা হয়।[১৩১]

ভাষা কমিটির সভাপতি ছিলেন মাওলানা আকরাম খাঁ ও সেক্রেটারী ছিলেন কবি গোলাম মোস্তফা। তাছাড়া বারো চৌদ্দজন সদস্যের মধ্যে ছিলেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫ — ১৯৬৯), আবুল কালাম শামসুদ্দিন, মাওলানা জুলফিকার আলী, সৈয়দ আবুল হাসনাত মোঃ ইসমাইল, ডঃ মোয়াজ্জেম হোসেন (উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ও দুই প্রাদেশিক মন্ত্রী হাবিবুল্লা বাহার চৌধুরী ও ডাঃ আবদুল মোতালেব মালেক প্রমুখ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপকগণের মধ্যে গণেশ চরণ বসু, ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক (জন্ম ১৯০৬), অজিত কুমার গুহ-ও কিছু সময় এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।[১৩২] কমিটির প্রতি নির্দেশ ছিল তিনটি ঃ

ক. পূর্ব বাংলার জনগণের ভাষা (বাংলার ব্যাকরণ, বানান প্রভৃতি সহ) সহজীকরণ, সংস্কার ও প্রমিতকরণের প্রশ্ন বিবেচনা করে সে বিষয়ে সুপারিশ করা,

খ. যে সমস্ত বিদেশী শব্দ ও টেকনিক্যাল শব্দের পরিভাষা এই ভাষায় নেই সেগুলির জন্য নতুন শব্দ, ও বাক্যাংশ গঠন করা এবং সেগুলির জন্য যতদূর সম্ভব অনুবাদ করার উপায় সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া,

গ. এই ভাষাকে বিশেষভাবে পূর্ব বাংলার এবং সাধারণভাবে পাকিস্তানের জনগণের প্রতিভা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য অন্যান্য যা কিছু প্রয়োজনীয় মনে করেন সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া।[১৩৩]

দেড় বছর ব্যাপক আলাপ-আলোচনার পর কমিটি রিপোর্ট প্রস্তুত করে ও সরকারের কাছে তা দাখিল করে ১৯৫০ সালের ৭ই ডিসেম্বর। কমিটির উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিচয় পাওয়া যায়

---

১৩০। ঐ, পৃঃ ২৬৬      ১৩১। ঐ, পৃঃ ২৮৫

১৩২। Report of the East Bengal Language Committee, 1949, Officer on Special Duty (Home Deptt.), East Pakistan Govt. Press, Dacca, pp. 2-3.

১৩৩। ঐ, পৃঃ ২

Dhaka University Institutional Repository



আবুল কালাম শামসুদ্দিনের আত্মস্মৃতিতে। গণেশচন্দ্র বসু কোনো-কোনো ব্যাপারে মতানৈক্য প্রকাশ করলে সদস্যরা বলেছিলেন: 'দেখুন গণেশবাবু, বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের আওতা থেকে মুক্ত করে আমরা যে-ভাবে এর সংস্কার করতে চাইছি, তাতে আপনার মতো সংস্কৃত পণ্ডিত ব্যক্তি কোনো কথা না বললেই সবদিক শোভন হয়। এর পর গণেশবাবু আর বিশেষ কোনো উচ্চবাচ্য করেন নাই এবং তাঁকে ভাষা-সংস্কার কমিটির পরবর্তী কোনো বৈঠকে আর দেখাও যায় নাই'।[১৩৪]

রিপোর্টে বাংলা ভাষা, ব্যাকরণ ও বর্ণমালার গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের পরামর্শ দেওয়া হয়। নতুন ভাষার নামকরণ হয় 'সহজ বাংলা'। স্বাভাবিক গতিতেই এর বিকাশ হবে তবে যাতে সাধারণভাবে পাকিস্তানের এবং বিশেষভাবে পূর্ব বাংলার জনগণের 'প্রতিভা ও সংস্কৃতির' সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন উপাদান সমূহ পরিত্যক্ত হয়ে ক্রমশঃ সংগতিপূর্ণ উপাদানসমূহ যুক্ত হয় — সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। পুঁথি সাহিত্য ও জনগণের মধ্যে প্রচলিত সাহিত্যের উপাদানসমূহ প্রাধান্য পাবে, আর মুসলমান সাহিত্যিকরা ব্যবহার করবেন ইসলামী আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্রকাশভঙ্গী।[১৩৫] বাংলা বর্ণমালা থেকে ঈ, ঊ, ঋ, ৯, ঐ, ঔ, ঙ, ঞ, ণ, য, শ, ষ, ঢ়, ৎ, ং, ঃ বাদ যাবে, যুক্ত হবে নতুন স্বরবর্ণ অ্যা, বর্ণ সংযুক্তকরণের ও ফলা ব্যবহারের রীতিও পরিত্যক্ত হবে।[১৩৬]

কমিটি রোমান বা উর্দু হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাবকে অন্তত বিশ বছরের জন্য স্থগিত রাখার পরামর্শ দেয় এবং এই সময়ের মধ্যে উর্দু ভাষাকেও প্রয়োজনীয় সংস্কারের আহ্বান জানায়।[১৩৭] একজন সদস্য, শেখ শরফুদ্দিন, এর প্রতিবাদ করেন এবং অভিমত প্রকাশ করেন, দেশের বিপুল সংখ্যক লোক আরবী হরফে বাংলা লেখার পক্ষপাতী, সেজন্যে আরবী হরফ প্রচলনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে চেষ্টা চালাচ্ছে প্রাদেশিক সরকারের তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করা উচিত এবং উর্দু যেহেতু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হতে যাচ্ছে সেজন্য সকলের উর্দু শেখা উচিত।[১৩৮]

---

১৩৪। আবুল কালাম শামসুদ্দিন, পৃঃ ৩৩৩-৩৪

১৩৫। Report পৃঃ ৬-৭

১৩৬। ঐ, পৃঃ ১২০

১৩৭। ঐ, পৃঃ ১১

১৩৮। ঐ, পৃঃ ১২

Dhaka University Institutional Repository



৩

## রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন

দেশবিভাগের পূর্বে ১৮ই মে ১৯৪৭ তারিখে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামান হায়দারাবাদের এক সভায় ঘোষণা করে যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।[১৩৯] সে-সময়ে এর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ আসেনি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নানা ঘটনায় দেখা যায়, পাকিস্তান সরকারের লক্ষ্যও তাই। এই মনোভাব প্রকাশ হয়ে পড়লে পূর্ব বাংলায় এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মনোভাব জাগ্রত হয়। গণতান্ত্রিক যুব লীগ ১৯৪৭ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তাদের সম্মেলনে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন ও আইন আদালতের ভাষা 'করার দাবি জানায়।[১৩৯ক] ১৫ই সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিশ 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা – না উর্দু' শীর্ষক একটি পুস্তিকায় বাংলাকে পূর্ব বাংলায় শিক্ষার বাহন, আইন-আদালত ও অফিসাদির ভাষা করার, উর্দুকে আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা ও ইংরেজিকে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে শিক্ষা দিবার দাবি করে। পুস্তিকাটিতে দুটি প্রবন্ধে কাজী মোতাহের হোসেন ও আবুল মনসুর আহমদ ভাষা সমস্যাকে তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করে দেখান যে, উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে পূর্ব বাংলার ক্ষতি মারাত্মক হবে।[১৪০] অনুরূপ একটি প্রবন্ধে ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক স্পষ্টভাবে বলেন, উর্দু প্রচলিত হলে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক রাষ্ট্রিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মরণ ঘনিয়ে আসবে এবং 'সর্বনিম্নে পূর্ব পাকিস্তান হইবে উত্তর ভারতীয় পশ্চিম-পাকিস্তানী উর্দু ওয়ালাদের শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র।[১৪১] কিন্তু ঐ ৫ই ডিসেম্বর করাচীতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা-সম্মেলনে [illegible] উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করা হয়।[১৪২] এই সংবাদ পেয়ে ঢাকার ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে প্রতিবাদ সভা করে এবং প্রস্তাব নেয়ঃ

ক. বাংলাকে পাকিস্তান ডমিনিয়নের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করা হোক;

খ. রাষ্ট্রভাষা ও [illegible] নিয়ে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে তার মূল উদ্দেশ্য আসল সমস্যাকে ধামাচাপা দেওয়া এবং বাংলা ভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।[১৪৩]

---

১৩৯। Serajuddin Hussain পৃঃ ৩৩

১৩৯ক। বদরুদ্দীন উমর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২। ১৪০। ঐ, পৃঃ ১৪–১৭

১৪১। পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উর্দু ও বাংলা, মাসিক কৃষ্টি/নারায়ণগঞ্জ, নভেম্বর, ১৯৪৭

১৪২। বদরুদ্দীন উমর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০

১৪৩। ঐ, পৃঃ ২০–২১

Dhaka University Institutional Repository



এভাবে ছাত্রদের প্রতিবাদে বিভিন্ন স্তরের লোকজনও অংশগ্রহণ করতে থাকে এবং ভাষা সংগ্রাম রাজনৈতিক স্তরে উন্নীত হয়। আন্দোলন চালিয়ে নেওয়ার জন্য তমদ্দুন মজলিশ একটি 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। ১৯৪৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী এই পরিষদের সঙ্গে আলোচনার পর শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান মানিঅর্ডার ফরম, ডাক টিকিট ও মুদ্রায় ইংরেজি-উর্দুর সঙ্গে বাংলা লিখার আশ্বাস দেন।[144]

পাকিস্তান গণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৪৮ সালের ২৩-এ ফেব্রুয়ারী। সেখানে কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম ভাষা করার সুপারিশ করলে মুসলিম লীগ সদস্যদের বিরোধিতায় তা বাতিল হয়ে যায়।[145] ঢাকায় এই সংবাদ পৌঁছলে ছাত্ররাজনীতিবিদ ও শিক্ষিত মহলে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও যুব সংগঠনের সমন্বয়ে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। পরিষদের আহ্বানে ১১ই মার্চ সারা প্রদেশে সাফল্যজনকভাবে হরতাল পালিত হয়। সরকারও বিভিন্ন স্থানে প্রচণ্ড নির্যাতন চালায়। পরিষদের দাবি অনুসারে সেদিন আহত হয় ২৬জন।[146] প্রতিক্রিয়ায় ধর্মঘট-মিছিল চলতে থাকে এবং অনন্যোপায় হয়ে খাজা নাজিমুদ্দিন পরিষদের সঙ্গে আট দফার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এতে দমননীতি প্রত্যাহার, ১৪৪ ধারা তুলে নেওয়া, আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার বন্ধ করা, সংবাদপত্রের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কথা বলা হয়। রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে চুক্তি হয়:

ক. ১৯৪৮ এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব বাংলা সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারী আলোচনার জন্য যেদিন নির্ধারিত হইয়াছে সেইদিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার এবং তাহাকে পাকিস্তান গণপরিষদে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষাদিতে উর্দুর সমমর্যাদা দানের জন্য একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে।

খ. এপ্রিল মাসে ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে যে প্রদেশের সরকারী ভাষা হিসাবে ইংরাজী উঠিয়া যাওয়ার পরই বাংলা তাহার স্থানে সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃত হইবে। ইহা ছাড়া শিক্ষার মাধ্যমও হইবে বাংলা। তবে সাধারণভাবে স্কুল কলেজগুলিতে অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান করা হইবে।[147]

---

১৪৪। ঐ, পৃঃ ৪২

১৪৫। ঐ, পৃঃ ৫০-৫২

১৪৬। ঐ, পৃঃ ৭৫

১৪৭। ঐ, পৃঃ ৮১

Dhaka University Institutional Repository



চুক্তিতে সাধারণ ছাত্ররা খুশি হয়নি, ফলে আন্দোলন অব্যাহত থাকে। এই সময়ে ১৯-এ মার্চ মোঃ আলী জিন্নাহ ঢাকা আসেন। তিনি বিভিন্ন সভায় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন এবং আন্দোলনকারীদের ভারতের চর, কমিউনিস্ট ও রাষ্ট্রদ্রোহী হিসাবে অভিহিত করেন। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে আলোচনায় অনমনীয় মনোভাব প্রকাশ করলে চরম বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। তবু তাঁর এই মনোভাবে আন্দোলনের গতি স্তিমিত হয়ে পড়ে।[১৪৮]

এপ্রিল মাসে পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশন বসে। খাজা নাজিমুদ্দিন সেখানে ভাষা বিষয়ক একটি প্রস্তাব আনেন। অল্প বিতর্কের পর কিছু সংশোধনীসহ সেটি গৃহীত হয়। গৃহীত প্রস্তাবটি ছিল পূর্বোক্ত প্রস্তাবের অনেকটা অনুরূপ।[১৪৯]

এভাবে ভাষা আন্দোলনের একটি পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

১৯৫২ সালের ২৬-এ জানুয়ারী খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ঢাকা আসেন। সেদিন পল্টন ময়দানে এক জনসভায় উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে বলে তিনি ঘোষণা দেন।[১৫০] প্রতিবাদে ৩০-এ জানুয়ারী ঢাকা শহরে ধর্মঘট পালন করা হয় এবং রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদকে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদে' পুনর্গঠিত করা হয়।[১৫১] পরিষদের আহ্বানে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট হয় এবং পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের বাজেট অধিবেশনের দিন, ২১-এ ফেব্রুয়ারী, সারা দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[১৫২] তখন থেকে নিরবচ্ছিন্ন প্রচার কার্য চলতে থাকে এবং অভূতপূর্ব সমর্থন আসতে থাকে। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বিশ তারিখে সরকার পরবর্তী এক মাসের জন্য ঢাকা জেলার সর্বত্র ১৪৪ ধারা জারি করে।[১৫৩] ফলে অসন্তোষ আরো বৃদ্ধি পায়। একুশ তারিখ সকালে শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আসতে থাকে। সেখানে গাজীউল হকের সভাপতিত্বে সাধারণ সভা হয় এবং ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১৫৪] দশজন দশজন করে ছাত্র গেটের বাইরে আসতে থাকে এবং পুলিশও গ্রেফতার করতে থাকে। এভাবে বেলা দুটো পর্যন্ত চলে। ক্রমে ক্রমে

---

১৪৮। ঐ, পৃঃ ১২৪ – ১২৬     ১৪৯। ঐ, পৃঃ ১২৮

১৫০। কবির উদ্দিন আহমদ, একুশের ইতিহাস, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), একুশে ফেব্রুয়ারী (সংকলন), ২য় সং (ঢাকা : পুঁথিপত্র প্রকাশনী, ১৯৬৫), পৃঃ ২২১

১৫১। ঐ, পৃঃ ২২২     ১৫২। ঐ, পৃঃ ২২২-২৩

১৫৩। ঐ, পৃঃ ২২৩     ১৫৪। ঐ, পৃঃ ২২৫

Dhaka University Institutional Repository



পুলিশ লাঠিচার্জ ও কাঁদুনেগ্যাস নিক্ষেপ শুরু করে এবং ছাত্ররা ইট-পাটকেল ছুড়ে এর উত্তর দেয়। বেলা তিনটার সময় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্যরা পরিষদ ভবনের দিকে আসতে শুরু করলে অবস্থা তীব্র আকার ধারণ করে এবং এক পর্যায়ে পুলিশ গুলি ছোড়ে। ঘটনাস্থলে আবদুল জব্বার ও রফিকউদ্দিন শহীদ হন এবং আরো ১৭ জনের মত গুরুতরভাবে আহত হন। তাদের মধ্যে রাত আটটায় আবুল বরকত শাহাদাৎ বরণ করেন।[৫৫]

গুলি চালনার সংবাদে পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হয়। সরকারী-বেসরকারী অফিসের কর্মচারীরা অফিস ত্যাগ করে বেরিয়ে আসে, শহরের মানুষ দলে-দলে হাসপাতালের দিকে আসতে থাকে। পরিষদ ভবনের অভ্যন্তরে কংগ্রেসী ও অন্যান্য বিরোধীদলীয় সদস্যরা অধিবেশন মুলতবী রাখার দাবি জানায়। বিক্ষুব্ধকণ্ঠে আবেগপূর্ণ বক্তৃতা দিয়ে একজন সদস্য, মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, পরিষদ-কক্ষ ত্যাগ করেন।[৫৬]

বাইশ তারিখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঢাকা শহরে পূর্ণ ধর্মঘট হয়। গ্রাম থেকেও দলে-দলে মানুষ এসে বিক্ষোভে অংশ নেয়। সকাল বেলা 'মর্নিং নিউজ' অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়, দুপুরে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে গায়েবী জানাজা হয় ও লক্ষাধিক লোকের মিছিল বের হয়। মিছিলে লাঠিচার্জ ও গুলিবর্ষণ করলে হাইকোর্টের কেরাণী শফিউর রহমান শহীদ হন ও অনেকে আহত হন। শহরের অবস্থা অত্যন্ত থমথমে হয়ে উঠে এবং যে-কোনো মুহূর্তে সরকার পতনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। গত্যন্তর না-দেখে সেনাবাহিনী ডাকা হয় ও সান্ধ্যআইন জারি করা হয়। সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী ঢাকা শহরে সেদিন ৫ জন শহীদ, ১২৫ জন আহত ও ৩০ জন বন্দী হয়। আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন সরকারী নীতির প্রতিবাদে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী দল বর্জন করেন।[৫৭]

তেইশ তারিখ থেকে প্রচণ্ড দমননীতি শুরু হয়। সারা শহরে ধরপাকড় চলে। সেদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিক্ষোভ ও ধর্মঘট হয়। মেডিকেল কলেজের পাশে ছাত্ররা নিজেরা শহীদ মিনার নির্মাণ করে। অনেক রাজনৈতিক কর্মী ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক গ্রেফতার হন। চব্বিশ তারিখ ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করা হয় এবং পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ও বন্ধ করে দেওয়া হয়।[৫৮] সেনাবাহিনী শহীদ মিনারটি ভেঙে ফেলে এবং হলে-হলে হানা দিয়ে কাগজপত্র ও মাইক্রোফোন কেড়ে নেয় ও ৮০ জনের মত কর্মীকে গ্রেফতার করে।[৫৯] কর্ম পরিষদ নতুন সভা করে সরকারকে ৭৫ ঘন্টার চরমপত্র দেয় ও ৫ই মার্চ প্রদেশব্যাপী 'শহীদ দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।[৬০] কিন্তু সেদিন শহীদ দিবস সফল হয়নি। তীব্র অত্যাচারের মুখে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। ৮ই মার্চ এক বাড়িতে হানা দিয়ে আত্মগোপনকারী ৯জন নেতার ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবদুল মতিন, মোহাম্মদ তোয়াহা ও অলিআহাদ।[৬১]

---

৫৫। ঐ, পৃঃ ২২৫–২৬

৫৬। ঐ, পৃঃ ২২৬–২৭

৫৭। ঐ, পৃঃ ২২৭–২৮

৫৮। ঐ, পৃঃ ২২৮–২৯

৫৯। ঐ পৃঃ ২৩০

৬০। ঐ, পৃঃ ২৩০

৬১। ঐ, পৃঃ ২৩১–৩২।

সাত

## সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলন

১৯৪৮ থেকে ১৯৫৪ সালের মধ্যে ঢাকা, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অধিকাংশই ছিল বেসরকারী উদযোগে এবং এগুলিতে মতাদর্শের ভিত্তিতে কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকরা একত্র হয়ে বিভিন্ন সমস্যাকে দেখবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। এদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারায় এগুলির ভূমিকা রয়েছে, তাই, অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

১

### পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন : ঢাকা

প্রাদেশিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী হবীবুল্লাহ বাহারের (১৯০৬-৬৬) উদ্যোগে ১৯৪৮ সালের ৩১-এ ডিসেম্বর ও ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী ঢাকার কার্জন হলে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে কবিতা, শিশু-সাহিত্য, ভাষাবিজ্ঞান, ইতিহাস, পুঁথি সাহিত্য ও লোকসাহিত্য, বিজ্ঞান-চিকিৎসা বিজ্ঞান ও শিক্ষা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন মূল সভাপতি।[১২২]

বিপুল জনসমাগমে সম্মেলন শুরু হয়। মাওলানা আবদুর রহিম কোরান পাঠ করেন, রেডিও পাকিস্তানের শিল্পীবৃন্দ 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' গান পরিবেশন করেন এবং কবি গোলাম মোস্তফা নবজাগ্রত রাষ্ট্রে নবচেতনা ও সাহিত্যিকদের নতুন দায়িত্ব সম্পর্কে আবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হবীবুল্লাহ বাহারের ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা। তাঁর মতে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অভিজাত ও গণমানুষের সংঘাতের ইতিহাস এবং এতে সর্বদা গণমানুষের বিজয় হয়েছে। মধ্যযুগে মুসলমান নরপতিগণ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন এবং সাহিত্যকে সাধারণ মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছিলেন। ইংরেজ আমলে বাংলা সাহিত্য সাধারণ মানুষের জীবনচ্যুত হয়ে মধ্যবিত্তদের অধিকারে চলে যায়, কিন্তু তিনি আশা করেছেন, পাকিস্তানে সাহিত্য পুনর্বার সাধারণ মানুষের জীবনের কাছাকাছি এসে যাবে।[১২৩]

---

১২২। সমকালীন উদয়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৪
১২৩। ঐ, পৃঃ ১৭৮-৭৯

Dhaka University Institutional Repository



মূল সভাপতি তাঁর বক্তৃতায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মত প্রকাশ করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে ও জীবনের সর্বস্তরে মাতৃভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বলেন। বাংলা ভাষার সংস্কারে উৎসাহ না-দেখিয়ে নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষর করে তোলার কাজে উদযোগী হতে তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন :

> আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালী। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছে যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাঁড়িতে ঢাকবার জোটি নেই।[১৬৪]

সভাশেষে বিশেষ অনুমতি নিয়ে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য দফতরের সচিব ফজলে আহমদ করিম ফজলী বক্তৃতা দিতে উঠে ডঃ শহীদুল্লাহর প্রবন্ধের অনেক সমালোচনা করেন এবং অনেক অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে আবোল-তাবোল বক্তৃতা রাখেন। এক পর্যায়ে হবীবুল্লাহ বাহারের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হয় এবং অশালীন বক্তৃতা বিনিময় হয়। অতঃপর উত্তেজিত শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোভাব আঁচ করে ফজলী সভাগৃহ ত্যাগ করে।[১৬৫] ক্ষুব্ধ হবীবুল্লাহ মন্তব্য করেন :

> আমি একজন মন্ত্রী, কিন্তু এই সেক্রেটারী নিয়েই আমাকে কাজ করতে হয়। একটু পরেই অধীর হয়ে বললেন, আমাদের জীবনে ও সমাজে যদি আমরা বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা না করতে পারি তবে আমাদের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যাবে।[১৬৬]

সম্মেলন চলাকালে এবং সম্মেলনের পরে ডঃ শহীদুল্লাহর বক্তৃতা নিয়ে আজাদ পত্রিকায় অত্যন্ত বিরূপ আলোচনা হয়। সাপ্তাহিক 'সৈনিক' পত্রিকায়ও অনুষ্ঠানের নানাদিক নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক রচনা প্রকাশিত হয়।

২

## পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন : চট্টগ্রাম

দেশ বিভাগের পর চট্টগ্রামের প্রগতিশীল সংস্কৃতি কর্মীরা পর-পর দুটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে — সংস্কৃতি পরিষদ ও প্রান্তিক। এদুটির উদযোগে ১৯৫১ সালের ১৬ই মার্চ তারিখে চট্টগ্রামের

---

১৬৪। ঐ, পৃঃ ১৭৯-৮০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত

১৬৫। ঐ, পৃঃ ৮০-৮১

১৬৬। অজিত কুমার গুহ, বাহার স্মৃতি, হাবীবুল্লাহ বাহার, আনোয়ারা বাহার চৌধুরী ও শওকত ওসমান সম্পাদিত, বাহারস্মৃতি কমিটি, ঢাকা বৈশাখ ১৩৭৭/ পৃঃ ৮৪

হরিখোলার মাঠে পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয় । অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে আবুল ফজল ও সায়ীদুল হাসান । সম্মেলনের খবর পেয়ে ঢাকার মর্নিং নিউজ ও আজাদ এদিকে কমিউনিস্টদের সম্মেলন বলে প্রচার করতে থাকে । ফলে ঢাকার অনেক সাহিত্যিক এতে অংশ নিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন । শেষ পর্যন্ত বেগম সুফিয়া কামালকে প্রধান অতিথি ও আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদকে মূল সভাপতি করে অনুষ্ঠান পরিচালিত হয় ।[১৫৭] কলকাতা থেকে এতে অংশ নিয়েছিলেন 'সত্যযুগ' সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার । আজাদ ও মর্নিং নিউজের প্রচারণা রোধ করার জন্য চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার এম,এম,খাঁ-কে দিয়ে চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়েছিল । কীর্তন, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও কবিগানের আয়োজন সম্মেলনকে সফলতা এনে দিয়েছিল । 'দুদিন ধরে সম্মেলনে এত অভূতপূর্ব লোক সমাগম হলো যে, পাশের সড়কেও তিল ধারণের জায়গা থাকতোনা' ।[১৫৮]

সম্মেলনে পূর্ব বাংলার সাহিত্যের ঐতিহ্য নির্ণয়ের চেষ্টা হয় । উদ্যোক্তাগণ সম্মেলন উপলক্ষে প্রচারিত ইশতাহারে নিজেদের প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও আধুনিক রবীন্দ্র নজরুল সাহিত্যের উত্তরাধিকারী বলে দাবি করেন । এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয় মূল সভাপতির ভাষণে । প্রবহমান ঐতিহ্য সম্পর্কে তিনি বলেন :

> ঐতিহ্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি খুব বড় জিনিস । ঐতিহ্যের অনুসরণ ও সেই স্রোতধারাকে চির বহমান করিয়া তোলাই সংস্কৃতিসেবীর কাজ ।... ঐতিহ্যের পটভূমির সহিত যাহাদের যোগ নাই, তুলনার ক্ষেত্রে যেমন পরভোজী শব্দ ব্যবহার করা হয় — এখানে ঐ জাতীয় ব্যক্তিদের জন্য তেমনি বিশেষণ আরোপ করা চলে ।... ঐতিহ্যকে স্বীকারের পর তার প্রবাহকে অনুসরণ করিয়া লইয়া যাইতে হইবে । সংস্কৃতি বিকাশের সার্থকতা সেইখানে ।[১৫৯]

সম্মেলনের মূল প্রস্তাব ছিল সমাজ-উন্নয়নে সাহিত্যের ভূমিকা সম্পর্কে । তাঁরা সাহিত্যকে এ-ক্ষেত্রে একটি প্রধান শক্তি হিসাবে বিবেচনা করেছেন ।

> আমরা বিশ্বাস করি সাহিত্য সমাজ-জীবনের নিছক প্রতিফলন নয়, সাহিত্য সমাজ-উন্নয়নের শক্তিশালী অবলম্বন । ক্ষুধা, বেকারী এবং ব্যাধির হাত থেকে সমাজ জীবনকে রক্ষা করা,

---

১৫৭। আবুল ফজল, পৃঃ ৩০০

১৫৮। ঐ, পৃঃ ৩০১

১৫৯। ধনঞ্জয় দাস, ৮৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ।

তার গতিশীলতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পবিত্র দায়িত্ব আজ শিল্পী সাহিত্যিকদের। মানুষের কল্যাণের জন্য যে-সাহিত্য, সমাজের গতিশীলতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে-সাহিত্য আমরা সে-সাহিত্যের প্রতি আস্থাশীল।[১৭০]

৩

## পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন : কুমিল্লা

'কুমিল্লা প্রগতি মজলিস' এর উদ্যোগে ১৯৫২ সালের ২২, ২৩, ও ২৪-এ আগস্ট তারিখে কুমিল্লা শহরে 'পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। ফরওয়ার্ড ব্লক, যুবলীগ, কমিউনিস্ট পার্টি ও রেভোলিউশনারী সোসালিস্ট পার্টির ন্যায় প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির কুমিল্লা শাখাসমূহ এতে সহযোগিতা করে। মোটামুটিভাবে বলা যায়, সরকার-বিরোধী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি এতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। সেজন্যে সরকারী কলেজের অধ্যাপক সম্মেলনে এসেও অংশগ্রহণের সুযোগ পাননি।[১৭১] প্রদেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চট্টগ্রামের প্রান্তিক শিল্পীসংঘ ও রেলওয়ে শিল্পীসংঘ, ঢাকার আর্ট দল, পূর্ব-পাক শিল্পীসংসদ, অগ্রণী শিল্পীসংঘ এতে অংশ গ্রহণ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক, ঢাকা বেতারের শিল্পী, Urdu Progressive Writers Association এর প্রতিনিধি, বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিদলও এতে অংশ নেয়।[১৭২]

সম্মেলন উপলক্ষে প্রচারিত 'আহ্বান' নামক পুস্তিকায় এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় :

> আমাদের প্রস্তাবিত সম্মেলনের প্রধান বিবেচ্য হইবে আত্মবীক্ষা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে আমরা এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছি, শিল্পে, সঙ্গীতে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে কি আমরা দিতে পারিয়াছি, কি পারি নাই তাহাই আমরা মোহমুক্তচিত্তে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই।[১৭৩]

সেজন্যে উদ্যোক্তাগণ জাতি-ধর্ম, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বিত্তহীন-বিত্তশালী নির্বিশেষে এবং 'যে বিশাল জনতা যুগ যুগ ধরিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কৃষি-শিল্প, বাণিজ্য ও নানাবিধ শ্রমজনক কার্যের দ্বারা নীরবে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বুনিয়াদ গঠন ও ধারণ করিয়া আসিতেছে' সবাইকে সম্মেলনে যোগদান করে 'এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে সাফল্য' দান করার জন্য।[১৭৪]

---

১৭০। ঐ, পৃঃ ১৭০

১৭১। সাদেক-উর রহমান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন : কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম, পাণ্ডুলিপি/খণ্ড ৬, ১৯৭৬, পৃঃ ৯১-৯২

১৭২। ঐ, পৃঃ ৯৪ - ৯৫ ১৭৩। ঐ, পৃঃ ৯৩ - ৯৪।

১৭৪। ঐ,

Dhaka University Institutional Repository



সম্মেলনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ছিল সাহিত্যালোচনা, সঙ্গীতানুষ্ঠান, চিত্র প্রদর্শনী ও পুঁথি প্রদর্শনী ।

অনুষ্ঠান শুরু হয় বাইশ তারিখে । অনুষ্ঠানে আগত সুধীবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে ভাষণ দেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অজিত নাথ নন্দী । ভাষণে তিনি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পুনর্বিন্যাস এবং 'ভদ্র সংস্কৃতি' ও 'লোক সংস্কৃতির' সমন্বিত রূপের উপর জোর দেন । ইংরেজ রাজত্বের ফলে 'পরাধীনতার অপরিহার্য বিকৃতি ও সংকীর্ণতাকে বহন করিয়া' শিক্ষিত অশিক্ষিতের ব্যবধানের মাধ্যমে যে ভদ্র-সংস্কৃতির জন্ম, তার বৈশিষ্ট্য তিনি নির্দেশ করেন এভাবে ঃ

> অনুকরণ ও অনুগ্রহ লিপ্সাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল । দেশের অতীতের যে প্রাণস্রোত প্রবহমান তাহার বেগ ও প্রবাহ হইতে এই সংকীর্ণ সংস্কৃতি নিজের কল্পিত শুচিতা বাঁচাইয়া নিজের দুর্ভাগ্যকে অভ্রভেদী করিয়া তুলিয়াছিল ।[১৭৫]

মূল সভাপতির ভাষণে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির তৎকালীন অবস্থা, রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত বিতর্ক, সাহিত্যে বিভিন্ন আদর্শের সংঘাত সম্পর্কে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ

> আজ দোষ হয় তাঁহারা দেশকে পাপে ডুবাইতে চাহেন, যাঁহারা প্রশ্ন তুলিয়াছেন বাংলা ভাষা আমাদের সংস্কৃতির বাহন হইতে পারেনা ।... সংস্কৃতি ধ্বংসের অনেক পথ আছে । জনসাধারণ বিরোধী ও সমাজ বিরোধী গোয়ার-নীতি তার অন্যতম উপায় বটে । কিন্তু তার পরিণাম ফল পারস্যে আরবদের ভাগ্যের মতই হইতে বাধ্য ।[১৭৬]

পরিশেষে 'সংস্কৃতি ধ্বংসের যে হীন আয়োজন নেপথ্যে চলিতেছে' তা ব্যর্থ করে দিতে তরুণ সংস্কৃতিসেবীদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান ।

তেইশ তারিখের এক অধিবেশনের সভাপতি মাহবুব-উল আলম বিভাগোত্তর সাহিত্য-সংস্কৃতি অগ্রগতির আলোচনা করেন । দেশের বিপরীত মুখী সামাজিক সাংস্কৃতিক শক্তিগুলির মধ্যে সংঘাতকে বিপ্লব অনিবার্য বলে তিনি মন্তব্য করেন, যার ফলে সমাজের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ভেঙে ধনবন্টনের নতুন সাম্য-নীতি প্রবর্তিত হবে এবং ধর্ম স্বীকৃত হবে মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার হিসাবে ।[১৭৭] চব্বিশ তারিখে সম্মেলন-সমাপ্তিতে অংশগ্রহণকারী সাহিত্যিকদের ধন্যবাদ

---

১৭৫। ঐ, ৯৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ।

১৭৬। ঐ, ৯৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ।

১৭৭। ঐ, পৃঃ ৯৮

Dhaka University Institutional Repository



জানান গৌর সভার সভাপতি যতীন্দ্র মোহন রায়। তিনি আশা প্রকাশ করেন এদেশের সংস্কৃতি গড়ে উঠবে 'মুক্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও সাম্যবাদের উপর ভিত্তি করে' এবং এই সম্মেলন তারই দিক নির্দেশক।[৭৮]

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নজরুল সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত, লোকগীত ও গণসঙ্গীত পরিবেশিত হয়। নাট্যাভিনয় হয়েছিল বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' ও লোক সঙ্গীতে গীত হয় 'যুদ্ধ নয় শান্তি' পালা।[৮০]

সম্মেলনের এক প্রস্তাবে দেশের সংস্কৃতি, তথা বাংলা ভাষা আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখার প্রচেষ্টার নিন্দা করা হয়। অপর প্রস্তাবে বলা হয়, যুদ্ধ সাংস্কৃতিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করে, অতএব যুদ্ধ বন্ধ করা ও শান্তির অনুকূলে প্রচার চালানো আবশ্যক। তাই, প্রগতি শান্তি ও জীবন সৃষ্টি করার জন্য সম্মেলন সর্বান্তিকরণে ঘোষণা করা হয়।[৮১]

কুমিল্লা সম্মেলন এদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে একটি দৃঢ় প্রাগ্রসর পদক্ষেপ নির্দেশ করে। এর মূল আবেদন ছিল অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী। পূর্ব বাংলার মুসলমান ঐতিহ্যে আস্থা রেখে, বৃহত্তর জনজীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে, অসাম্প্রদায়িক, মানবমুখী ও গণমুখী দৃষ্টি নিয়ে সাহিত্য-সংস্কৃতি সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করা দরকার — সম্মেলন এই মনোভাবকে পুষ্ট করেছে। সম্মেলনকে যারা মূল্যায়ন করেছেন তারা এ-বিষয়েই ইঙ্গিত করেছেন।[৮২]

৪

## ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন ঃ ঢাকা

তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে ঢাকায় ১৯৫২ সালের ১৭–২০ অক্টোবর তারিখে 'ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ ও আবদুল গফুর। অনুষ্ঠানটি সমাজবিজ্ঞান, ইসলামী আন্দোলন, লোকসংস্কৃ-

---

৭৮। ঐ, পৃঃ ৯৯
৮০। ঐ, পৃঃ ৮১
৮১। ঐ, পৃঃ ৮২
৮২। আহমদ শরীফ, এবারের সাংস্কৃতিক সম্মেলনে, দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ই আশ্বিন, ১৩৫৯।

Dhaka University Institutional Repository



সাহিত্য-অধিবেশন ও বিচিত্রানুষ্ঠান — এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল ।[৮৩] সম্মেলনের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয় ঃ

> আমরা যদি পাকিস্তানকে 'ইসলামী রাষ্ট্র' হিসাবে গড়ে তুলতে চাই তবে প্রথমে, 'ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপ' সম্বন্ধে আমরা পরিস্কার ধারণা করে নেবো । আমরা আধুনিক দুনিয়ার বিভিন্ন মতবাদ ও সমস্যাবলীর তুলনায় ইসলামকে যাচাই করে নিতে চাই । ইসলামই যে শ্রেষ্ঠতম মানবকল্যাণকর আদর্শ তা আমরা কোনো গোঁড়ামির না দিয়ে বুঝে নিতে এবং অন্যান্যদের বুঝিয়ে দিতে চাই ।[৮৪]

এই মনোভাবে চালিত হয়ে তাঁরা, যাঁরা ইসলাম সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেন তাঁদের, নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করার জন্য সম্মেলন আহ্বান করেছেন ।

সাহিত্যশাখার উদ্বোধন করেন কবি শাহাদাৎ হোসেন । তিনি নবীন সাহিত্যিকদের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পরামর্শ দেন এবং জোর দেন নবীন ও প্রবীণের চিন্তাধারার সমন্বয়ের উপর । অধিবেশনের মূল সভাপতি ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন বলেন, জীবনের অভিজ্ঞতার পরিধি বিস্তৃত করার জন্য, এবং সে-লক্ষ্যে লোক-সংস্কৃতি, লোকজ জীবন ও বাউল-সাঁই-মুর্শিদীর প্রতি কৌতূহলী হতে । ইসলামের শাশ্বত মূল্যবোধের স্বরূপ সেখানে আছে বলে তিনি জানান । গদ্যশাখার সভাপতি মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ আক্ষেপ করেন এজন্য যে, মুসলিম সাহিত্যিকরা যুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় সাহিত্যের নাস্তিকবাদিতা ও সোভিয়েট সাম্যবাদের দিকে ঝুঁকে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছে । এতদ্ব্যতীত সেদিন প্রবন্ধ পাঠে অংশ নেন কলকাতার সদ্য নবযুগ পত্রিকার সম্পাদক আলাউদ্দিন খান, সৈয়দ আলী আহসান, আবদুর রশিদ খান, মফজলুল হক সেলবর্ষী ও হাসান জামান । হাসান জামান 'ইসলামী তমদ্দুন' নামে প্রবন্ধে দেখান যে, ইসলামের মৌলিক ভাব ও নীতিবোধ মানবিক ও সর্বজনীন, এর সামাজিক ফল মঙ্গলজনক এবং এর মধ্য থেকে পাওয়া যেতে পারে অনাবিল আনন্দ এবং তা সৌন্দর্য ও মানসিক প্রবৃত্তি বিকাশের পক্ষে অনুকূল । তিনি তাই, ইসলামের ভিত্তিতে সংস্কৃতি পুনর্নির্মাণের আহ্বান জানান ।[৮৫]

সম্মেলনে বাংলা ও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ও যুদ্ধ-বিরোধী তৃতীয় ব্লক আন্দোলনের প্রতি সমর্থন দেওয়ার প্রস্তাব নেওয়া হয় । তা ছাড়া পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংযোগ

---

৮৩। সাঈদ-উর রহমান, তিনটি সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ডিসেম্বর ১৯৭৬, ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ২০৪ – ২০৮

৮৪। ঐ, পৃঃ ২০৭

৮৫। ঐ, পৃঃ ২০৮ – ২০৯ ।

Dhaka University Institutional Repository



ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করার জন্য 'ইসলামিক কালচারাল কনফারেন্স' নামে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠন করা, দেশিবিদেশি সকল প্রকার অশ্লীল যৌন প্রচার পত্রিকাকে পাকিস্তানে বেআইনী ঘোষণা করা, পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলায় ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন আহ্বান করে ইসলামী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাবও নেওয়া হয়। আরো একটি প্রস্তাবে সরকারের ইসলামের নাম ভাঙিয়ে শাসন করার নীতির নিন্দা করা হয়।[৮৬]

ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের দ্বারা তমদ্দুন মজলিশের সাংগঠনিক সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। সম্মেলনে জনসমাগম হয়েছিল বিপুল, আলোচক ও ছিলেন অনেক, 'কিন্তু তাঁদের কর্মসূচী সামন্তবাদ ভিত্তিক হওয়ায় বুর্জোয়া মূল্যবোধে বিশ্বাসী নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত মানসে এর প্রভাব গভীর হয়নি। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ হওয়ায় পূর্ব বাংলায় ইতিমধ্যে সামন্তবাদের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল'।[৮৭]

৫

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সম্মেলন, ঢাকা

১৯৫৩ সালের শেষের দিকে রাজনীতিতে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলির নির্বাচনী যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলে প্রদেশের সংস্কৃতিসেবীরাও ঐক্যবদ্ধভাবে সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানে উদ্যোগী হন। কয়েকবার তারিখ পরিবর্তিত হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসের তেইশ থেকে ছাব্বিশ তারিখ পর্যন্ত সময়ে। এর মূল সভাপতি ছিলেন ডঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, উদ্বোধন করেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।[৮৮]

সম্মেলনের মূল নীতি পাওয়া যায় ৭৮ জন শিল্পী-সাহিত্যিকের এক যুক্ত আবেদনপত্রে। তাঁরা ছিলেন বিভিন্ন সংবাদ পত্রও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। আবেদনপত্রে 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্য পূর্ব বাংলার শিল্পী সাহিত্যিকদের ব্যাপকতম ঐক্যকেই তাঁরা তাঁদের মূলমন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন, সঙ্গে-সঙ্গে পাকিস্তানের জন্য তাদের

---

৮৬। ঐ, পৃঃ ২০৯

৮৭। ঐ, পৃঃ ২১৯

৮৮। ঐ, পৃঃ ২১২

Dhaka University Institutional Repository



সাহিত্যের বিকাশের জন্যও তাঁরা বলেছিলেন। তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ও বিশ্বাস হিসাবে তাঁরা বলেছিলেন 'জাতীয় প্রগতি, বিশ্ব-শান্তি ও দেশবাসীর হিতার্থে' সৃষ্টি ক্ষমতাকে নিয়োজিত করা, 'বাংলা সাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যকে পুনরুত্থান ধারায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়া,' 'সকল রকম বিকৃতি, কুসংস্কার, কূপমণ্ডুকতা এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও সম্প্রদায়গত সকল প্রকার বৈরিতাদের বিরুদ্ধে মানবতার আদর্শকে সাহিত্যের উপজীব্য করা, এবং 'রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে'র ন্যায্য আসনের জন্য চেষ্টা করা।[১০৯] বিশে ডিসেম্বরের 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্য ব্যাপক ঐক্য গড়ে তুলুন' নামক অন্য এক বিবৃতিতে পূর্ব বাংলার সাহিত্যের সংকটের কারণ হিসাবে তাঁরা সাহিত্যিকদের অনৈক্য, দেশব্যাপী নিরক্ষরতা ও অজ্ঞানতা, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমাবনতি, পুস্তক প্রকাশের সমস্যা, রাজনৈতিক সংকীর্ণতা, বিদেশী নোংরা সাহিত্যের অনুপ্রবেশ প্রভৃতিকে দায়ী করেন।[১১০]

সম্মেলনে প্রায় সব জেলা থেকেই প্রতিনিধি এসেছিলেন; তাছাড়া এসেছিলেন পশ্চিম বাংলা থেকে নয়জন ও উর্দু সাহিত্যের বেশ কয়েকজন। সম্মেলনের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে ছিল আলোচনা অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী ও মুশায়েরা। আলোচনা অনুষ্ঠান কথা-সাহিত্য, কাব্য-সাহিত্য, মনন শাখা, সমসাময়িক শিল্প ও সাহিত্য, ভাষা ও সাহিত্য, বিজ্ঞান ও চারু-কারু শিল্প প্রভৃতি অংশে বিভক্ত ছিল।[১১১]

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর ভাষণে মুসলিম লীগ সরকারের সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নানা ভ্রান্ত-নীতি ও ষড়যন্ত্রের কথা খোলাখুলিভাবে আলোচনা করেন:

> ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট বহুদিনের গোলামীর পর যখন আযাদীর সূর্যোদয় হল, তখন প্রাণে আশা জেগেছিল যে এখন স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে বাংলা সাহিত্য তার সমৃদ্ধির পথ খুঁজে পাবে। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় যে সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশন হয়েছিল, তাতে সত্য আশাতেই বুক বেঁধে আমি অভিভাষণ দিয়েছিলুম। কিন্তু তারপর যে প্রতিক্রিয়া হয় তাতে হাড়ে-হাড়ে বুঝেছিলুম, স্বাধীনতার নূতন নেশায় আমাদের মতিচ্ছন্ন করে দিয়েছে। ... ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং অন্যান্য পশ্চিমবঙ্গের কবি ও সাহিত্যিকগণের কাব্য ও গ্রন্থ আলোচনা, এমনকি বাঙ্গালী নামটি পর্যন্ত যেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে কেউ কেউ মনে করতে লাগলেন।[১১২]

---

১০৯। ঐ, পৃঃ ২১০

১১০। ঐ, পৃঃ ২১০-১১

১১১। ঐ, পৃঃ ২১১

১১২। ঐ, ২১২-১৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

Dhaka University Institutional Repository



মূল সম্পাদকের রিপোর্টে আবদুল গনি হাজারীও এই পরিবেশের প্রতি ইঙ্গিত করেন :

> আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ছয় বছর আমাদের প্রতিটি মানুষের কেটেছে এক দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে। এই বন্যা আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনকে কীভাবে পর্যুদস্ত করেছে তা শুধু এইটুকু বললেই বোঝা যাবে যে, এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমরা বাংলা ভাষা যে আমার ভাষা, বাংলা সাহিত্য যে আমার সাহিত্য, বাঙালীর সংস্কৃতি যে আমার সংস্কৃতি — এই ঘোষণা পর্যন্ত করতে ভয় পেতাম।[১১৩]

## আলোচ্য পর্বের কবিতার গতি-প্রকৃতি

আলোচ্য সময়ে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভাবাদর্শ ও মতাদর্শগত যে-বিরোধ ও দ্বন্দ্ব দেখা যায়, তার প্রতিফলন পড়েছে কবিতার মধ্যেও। বিষয়গত বিচারে ইসলাম ও পাকিস্তানই এসময়ের কবিতায় মুখ্য স্থান দখল করেছে। ইসলামী বিষয়বস্তু অবলম্বনে কবিতা-রচনার রেওয়াজ শুরু হয়েছে বহু পূর্বে; লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর এতে রাজনৈতিক দিকটি প্রবল হয়ে ওঠে, আর পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার পর তা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। কালানুক্রমে গোলাম মোস্তফা, ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান, মুফাখখারুল ইসলাম, ছদরুদ্দিন, সুফী জুলফিকার হায়দার প্রমুখ ছিলেন এসময়ের এই আন্দোলনের প্রধান কবি ব্যক্তিত্ব। এঁদের অনেকে পাকিস্তানী আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলা সাহিত্যে একটি ইসলামমুখী ধারা প্রবর্তনের ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। বিভাগ-পূর্ব কালের পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি ও পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ-এর আদর্শকেই এঁরা বহন করেছিলেন। সাহিত্য-সাময়িকী প্রকাশের মাধ্যমেও এঁরা এই আদর্শকে এগিয়ে নিতে যত্নবান হয়েছিলেন। ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত মাসিক মাহে নও পত্রিকার লক্ষ্য ছিল 'পাকিস্তানের তাহজীব তমদ্দুনের ভিত্তিতে সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহ দেওয়া ও 'নয়া আজাদীর আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট নবীন লেখক লেখিকা সৃষ্টি করা'।[১১৪] ১৯৪৯ সালের মে মাসে প্রকাশিত মাসিক দিলরুবার ঘোষিত লক্ষ্য ছিল বাংলা ভাষায় ইসলামী

---

১১৩। ঐ, পৃঃ ২১৩-১৪

১১৪। আবদুল হক, বাংলা সাময়িক পত্র /ঢাকা : প্রনায়ন, ১৯৭৮, পৃঃ ২২-২৩

সাহিত্যের দৈন্য দূর করার চেষ্টা করা এবং পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের চিরকালীন 'ভাষাগত দৈন্য' স্বীকার করে নিয়ে 'পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যের গতিপথ নির্দেশের চেষ্টা করা'।[১১৫] কবি গোলাম মোস্তফার পরিচালনাধীন প্রকাশিত 'নওবাহার' 'সত্য সুন্দর ও মঙ্গলের প্রকাশ', পাকিস্তানের 'তাহজীব ও তমদ্দুনের রূপায়ন', ইসলামের আদর্শে 'নারী প্রগতির সাধনা' এবং কাশ্মিরকে রুখে দাঁড়ানোর কাজে ব্রতী ছিল।[১১৬]

পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক কবিতার সংকলন 'কাব্যবীথি'[১১৭] ও 'পূর্ব বাংলার কবিতা'[১১৮] এসময়ের দুটি উল্লেখযোগ্য সংকলন। এসময়ে প্রকাশিত এধারার কয়েকটি প্রধান কবিতার বই হচ্ছে 'পাকিস্তান বিষয়ক কবিতা', 'পাকিস্তানী গান', 'কায়েদে আজম', 'শালামার জেলা', 'পাকিস্তান কাব্যমঞ্জুরী', 'গুলগুলিস্তান', 'পূর্বাচলে পাকিস্তান', 'দিন আসবে ঐ কাশ্মির জয় করি', 'ঈদের চাঁদ' ও 'তওহীদ'। এই সময়ে প্রকাশিত কাব্যানুবাদগুলিও এই ধারার লক্ষ্যাকারী। 'নোশাহ্যাৎ-ই-উমর খৈয়াম', 'কাব্য কোরআন', 'কোরআন মঙ্গল', 'শিকওয়াহ ও জওয়াবে শিকওয়াহ', ও 'ইকবালের কবিতা' — এই কালপরিধির মধ্যেই প্রকাশিত হয়।

সাতচল্লিশ সালের পর ক্রমবর্ধিষ্ণু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীকে আশ্রয় করে সমাজে ও সাহিত্যে এক নতুন ভাবধারা বিকশিত হতে শুরু করে। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও ঢাকার সাহিত্যসম্মেলন, ভাষা আন্দোলন প্রভৃতির মাধ্যমে এই ধারার কবি-সাহিত্যিকগণ সংহত হন। তাঁরা পূর্ব বাংলার কবিতায় নিয়ে এলেন অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, দেশজ উত্তরাধিকারে আস্থা, বাংলা সাহিত্যের প্রবহমান ঐতিহ্যে বিশ্বাস, রোমান্টিক জীবনাগ্রহ ও মানবতাবাদী জীবনলগ্ন অনুভূতি। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে অর্জিত স্বাধীনতার মধ্যে অনেকে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন:

নতুন দেশের পরে হেসে যায় হায়েনার হাসি
দূর হোক বাঙালীর নামে এই ক্রূর পরিহাস।[১১৯]

কেউ-কেউ স্বাধীনতাকে নিয়ে বিদ্রূপ করেছেন:

চরণ দুখানি ঊর্ধ্বে তুলিয়া হাত ঠেকাইয়া জমিন পর
স্বাধীন দেশের মুক্ত হাওয়ায় আয়রে মাতাল হল্লা কর।

ছিন্নকন্থা কোমরেতে জড়া
জননী বিদায় আসমানে উড়া

---

১১৫। ঐ, পৃঃ ২৮–২৯ ১১৬। ঐ, পৃঃ ৩৩–৩৪

১১৭। আবদুল কাদির (সম্পাদক), পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৫৪

১১৮। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ও আবু হেনা মোস্তফা কামাল (সম্পাদক)

১১৯। আবদুর রশীদ খান, নিয়ত স্মরণে, নক্ষত্র মানুষ মন, ১ম সং (ত্রিপুরা, পাক বুক সাপ্লাই, ১৩৫৮), পৃঃ ৪৪

Dhaka University Institutional Repository



যেহেতু আমরা স্বাধীন থাকিবে, সেহেতু সবাই মৈত্রী কর
সেকাল থাকিল, কুত্তার লেজ সোজা কর তাই জীবন ভর।[২০০]

১৯৫০ সালে আশরাফ সিদ্দিকী ও আবদুর রশীদ খান-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'নতুন কবিতা'[২০১] কাব্যক্ষেত্রে এই শ্রেণীর নববার্তা ঘোষণা করেছে। এটি পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম কাব্য-সংকলন এবং সম্পাদকেরা বলেছেন 'যেখানে কবি আবদুল কাদির সাহেবের 'কাব্যমালঞ্চ' শেষ সেখান থেকেই আমাদের শুরু'। কবিতায় সে-মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে এভাবে :

অনেক ঘুরেছি অনেক উড়েছি আর নয়, আজ থামো
এবার আমার নগর মাটিতে নামো।[২০২]

সম্পাদকদ্বয় ব্যতীত এই সংকলনে আরো যাদের কবিতা ছিল তাঁরা হলেন হাবীবুর রহমান, মোফাখখারুল ইসলাম, মনোজ রায় চৌধুরী, চৌধুরী ওসমান, মযহারুল ইসলাম, মোহাম্মদ মামুন, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, শামসুর রাহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, হাসান হাফিজুর রহমান ও বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর। ১৯৫৩ সালে হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় প্রকাশিত প্রথম একুশের সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারী'[২০৩] এ-ধারার অগ্রগমনে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এই কবিদের অনেকেরই কবিতা সে-সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাছাড়া রয়েছে আবু জাফর ওবায়দুল্লা, জামালুদ্দিন, ফজলে লোহানী ও সৈয়দ শামসুল হকের কবিতা।

তৃতীয় এক ধারার কবিতাও কিছু কিছু পরিমাণে এসময়ে রচিত হয়েছিল। নজরুলের বিদ্রোহী ভাব ও সুকান্ত-র শ্রেণীচেতনার উত্তর সাধক ছিলেন এই ধারার কবিরা। আশরাফ সিদ্দিকীর 'তালেব মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা', আজিজুল হাকিমের 'বিদগ্ধ দিনের প্রান্তর', [illegible] 'নতুন পৃথিবীর জন্য' [illegible], [illegible] 'অগ্নি জল' এই চেতনার কবিতা। কিন্তু প্রবল আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিভার ন্যূনতা ও প্রতিকূল রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের জন্য তাঁরা বেশিদূর এগুতে পারেননি। কেউ-কেউ কবিতা রচনায় ইতি টানলেন, অন্যেরা শরণ নিলেন ভিন্ন আদর্শে।

---

২০০। আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, যেহেতু, যেহেতু / ঢাকা : নয়া দুনিয়া প্রকাশনী, ১৯৫৪/ পৃঃ

২০১। ঢাকা : অ্যাসী বুক সেন্টার, চৈত্র ১৩৫৬, ১ম সং

২০২। ঐ ভূমিকা, পৃঃ ৫

২০৩। ঢাকা : পুঁথিপত্র প্রকাশনী, [illegible]।
বিস্তৃত আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৪-১৯৫৮

১৯৫৪-১৯৫৮

# দ্বিতীয় অধ্যায়: ১৯৫৪-১৯৫৮

Dhaka University Institutional Repository

## রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ

### এক

### যুক্তফ্রন্ট সরকারের অবসান কথা

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল কেন্দ্রীয় সরকার, পূর্ব বাংলার অবাঙালী আমলা ও শিল্পপতিদের উদ্বিগ্ন করে তোলে। যুক্তফ্রন্টকে ক্ষমতা দিলে প্রশাসনিক অরাজকতা শুরু হবে, অবাঙালীদের জানমালের নিরাপত্তা থাকবেনা — এই মর্মে অবাঙালী আমলারা রিপোর্ট পাঠাতে থাকে। কোনো-কোনো উচ্চপদস্থ কর্মচারী পশ্চিম পাকিস্তানে সক্রিয় চেষ্টা চালায়।[1]

মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার পর চক্রান্ত ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ আরো বৃদ্ধি পায় এবং মন্ত্রী-সভা অপসারণ না-হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। এই সময়ের ঘটনাবলী কালানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে নিলে সেই ষড়যন্ত্রের রূপ স্পষ্ট হয়ে দেখা যায়। ১০ই মার্চ খুলনা দিয়াশলাই মিলে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়।[2] পরদিন নিউইয়র্ক টাইমস সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে যে, মুসলিম লীগের পরাজয় পূর্ব বাংলার জন্য ক্ষতিকর।[3] ২৩-এ মার্চ কর্ণফুলী কাগজের কলে বাঙালী-অবাঙালী দাঙ্গায় কারখানাসহ ১৩ জন নিহত ও ২৫ জন আহত হয়।[4] [illegible] শহীদ দিবস পালিত হয়।[5] পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েক জন নেতা বিবৃতি দেন যে, এ-ধরনের ঘটনা পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে মারাত্মক হবে।[6] পূর্ব বাংলার [illegible] দাবির [illegible] নিজের [illegible] উৎপাদন [illegible] সরকার সিদ্ধান্ত নেয়।[7]

এ-সময় আমেরিকার সঙ্গে সামরিক চুক্তি সম্পাদনের জন্য পাকিস্তান সরকার আলাপ শুরু করলে পূর্ব বাংলায় তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। যুক্তফ্রন্ট, গণতন্ত্রী দল ও কমিউনিস্ট পার্টি পৃথক-পৃথক সভা ও বিবৃতিতে চুক্তি বাতিলের দাবি করে।[8] যুক্তফ্রন্টের ১৬২ জন সদস্য এই চুক্তিকে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার পক্ষে বিপজ্জনক বলে অভিহিত করে বিবৃতি দেন।[9] তবু আলোচনা অব্যাহত থাকে এবং ১৯-এ মে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

---

১। [illegible], [illegible], খণ্ড ৩০, [illegible] : [illegible], ১৩৭৬, পৃঃ ৬১-৬২
২। মর্নিং নিউজ, মার্চ ১১, ১৯৫৪
৩। উদ্ধৃত, মর্নিং নিউজ, মার্চ ১২, ১৯৫৪
৪। ঐ, মার্চ ২৪, ১৯৫৪
৫। ঐ, মার্চ ২৭, ১৯৫৪
৬। ঐ, মার্চ ২৬, ১৯৫৪
৭। ঐ, মার্চ ২৬, ১৯৫৪
৮। ঐ, মার্চ ২৭, এপ্রিল ১১, এপ্রিল ১৭, — ১৯৫৪
৯। ঐ, এপ্রিল ২১, ১৯৫৪ এবং সংবাদ, জুলাই ২৬, ১৯৫৭

মে মাসের ৬ তারিখ সকালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের গেটে [illegible] আত্মীয় ও স্বজনদের লোকদের মধ্যে এক সংঘর্ষে ৫০ জন আহত হয়।[10] এই তারিখে সম্প্রসারিত মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণের সময় আদমজী মিলে বাঙালী-অবাঙালী শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে। দু-এক দিনের মধ্যে শীতলক্ষ্যা নদী থেকে ৩০০টি লাশ উদ্ধার করা হয়।[11] পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী এ-দাঙ্গার জন্য কমিউনিস্ট ও রাষ্ট্র বিরোধী লোকদের দায়ী করে বিবৃতি দেন।[12] ফজলুল হকের মুখ্যমন্ত্রীও অনুরূপ বিবৃতি দেন।[13] কেন্দ্রীয় [illegible] পূর্ব বাংলায় শাসনতন্ত্রের ৯২-ক ধারা জারি করার সুপারিশ করে।[14] পূর্ব বাংলার সরকার দাঙ্গাকারীদের [illegible] চেষ্টা চালায় এবং পরিস্থিতি মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে আসে। ফজলুল হক এক বিবৃতি দিয়ে বলেন, এই দাঙ্গার কারণ ষড়যন্ত্র এবং কমিউনিস্টরা এর জন্য দায়ী নয়।[15] মাওলানা ভাসানীও এক বিবৃতিতে জানান, জনপ্রিয় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন, [illegible] করতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে দাঙ্গা বাধানো হয়েছে।[16] ফজলুল হক করাচী গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেন। সে-সময় তাঁর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে নিউইয়র্ক টাইমসের সংবাদদাতা কালাহান লিখলেন ফজলুল হক পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা চান।[17] ফজলুল হক এর প্রতিবাদ করলেও কালাহান সংবাদ প্রত্যাহারে অসম্মত হয়।

৩০ তারিখে গভর্নর জেনারেল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করে প্রতিরক্ষা সচিব ইস্কান্দার মীর্জাকে /১৮৯৯–১৯৬৯/ পূর্ববঙ্গের গভর্নর করেন। [illegible] পাকিস্তানের বাঙালী প্রধান মন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বেতার ভাষণে ফজলুল হককে 'পাকিস্তানের বিশ্বাসঘাতক' বলে অভিহিত করেন। এবং কমিউনিস্টরা এ-দেশের [illegible] চালাচ্ছে বলে অভিযোগ আনেন।[18] নবনিযুক্ত গভর্নর এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে ঘোষণা করেন, পূর্ব বাংলায় কোনো কমিউনিস্টকে থাকতে দেবেন না[19] এবং ভাসানীকে গুলি করে হত্যা করবেন।[20]

---

১০। মর্নিং নিউজ, মে ৭, ১৯৫৪
১১। ঐ, মে ১৬, ১৯৫৪
১২। ঐ, মে ১৮, ১৯৫৪
১৩। ঐ, মে ১৮, ১৯৫৪
১৪। ঐ, মে ১৮, ১৯৫৪
১৫। ঐ, মে ২৭ ও ২৮, ১৯৫৪
১৬। ঐ, মে ২৯, ১৯৫৪
১৭। ঐ, মে. ২৩, ১৯৫৪
১৮। ঐ, জুন. ১, ১৯৫৪
১৯। ঐ, জুন ৬, ১৯৫৪
২০। আবুল মনসুর আহমদ, /আমার দেখা রাজনীতির ... / পৃঃ ২৬৯

Dhaka University Institutional Repository



সঙ্গে সঙ্গে চরম দমনকার্য শুরু হয়। ১১ই জুনের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৮২০ জনকে বন্দী করা হয়, ফজলুল হককে করা হয় গৃহে অন্তরীণ।[21] মাওলানা ভাসানী তখন ছিলেন বিদেশে। ৫ই জুলাই কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করায় প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। এক বিশেষ সম্পাদকীয়তে এদের মুখপত্র ঢাকার মর্নিং নিউজ বলেন ঃ

> East Pakistan arise ! Thy long night is over . A danger to the fair name of East Pakistan has been removed. ... This is a day too for prayer and thanksgiving to God for this act of divine mercy on the millions of the Prophets' followers in East Pakistan.22

নিউইয়র্ক টাইমস এক সম্পাদকীয়তে এই ব্যবস্থাকে সমর্থন জানায়।[23] অন্যদিকে আমেরিকার চাপের মুখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করে।[24]

---

২১। বিবিধ প্রসঙ্গ, মাসিক প্রবাসী, কলকাতা, আষাঢ় ১৩৬১, পৃঃ ২৬০—৬১

২২। মর্নিং নিউজ, মে ৩১, ১৯৫৪

২৩। উদ্ধৃত, ঐ, জুন ৫, ১৯৫৪

২৪। উদ্ধৃত, ঐ, জুন ২, ১৯৫৪

## দুই

## শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও পূর্ব বাংলার ভাষা-বিতর্ক

পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার প্রাথমিক প্রয়াস ও তার ব্যর্থতার কথা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এখানে উদ্যোগ নিলেন গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ /১৯৫১-১৯৫৫/। তিনি নতুন গণপরিষদ আহ্বান করলেন শাসনতন্ত্র রচনার জন্য। তবে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অতি স্পষ্ট : সমগ্র পাকিস্তানের রাজনীতিতে পাঞ্জাবের স্বার্থ বজায় থাকে এমন একটি শাসনতন্ত্র রচনা করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি দু'ভাবে কাজ করলেন : এক, পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলি লোপ করে একটি মাত্র প্রদেশ করা; দুই, যুক্তফ্রন্টের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে পূর্ব বাংলার ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে দুর্বল করা ও তার সুযোগে শাসনতন্ত্র পাশ করিয়ে নেওয়া। যুক্তফ্রন্ট সরকারের পদচ্যুতির পর পূর্ব বাংলায় সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা, হতাশা ও রাজনৈতিক পরিবেশের সুযোগ গ্রহণ করে তিনি এই দুই দিকে যথাযথ সাফল্য লাভ করলেন।

পাঞ্জাবী নেতারা পূর্ব থেকেই এধরনের শাসনতন্ত্রের কথা ভাবছিলেন। ১৯৫৪ সালের শেষ দিকে মমতাজ দৌলতানা পাঞ্জাবের নেতাদের পরামর্শে ও সহযোগিতায় 'এক ইউনিট' গঠন সম্পর্কে একটি দলিল প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি যুক্তি দিলেন এক ইউনিট গঠন না-করা গেলে পশ্চিমাঞ্চলের অন্য প্রদেশের সহযোগিতায় পূর্ব বাংলা পাঞ্জাবকে দমন করে দেবে এবং নিজের স্বার্থে পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলির মধ্যে বিক্ষুব্ধ ভাব ও সংশয় সৃষ্টি করে রাখবে। পূর্ব বাংলাকে মোকাবেলা করার জন্য, তাই, এক ইউনিটের দরকার।[1] এই প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, সোহরাওয়ার্দীকে এই ব্যাপারে রাজী করানো যাবে because he has the ambition and the intelligence to respond.[2] পাকিস্তানের সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আইউব খানও ১৯৫৪ সালের অক্টোবরে লন্ডনের এক হোটেলে বসে অনুরূপ পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন।[3]

---

1. Talukder Maniruzzaman, The politics of Development The case of Pakistan 1947-58, (Dacca : Green Book House Ltd., 1971), Appendix V, PP. 155-178.

2. 'Acceptance of one Unit by Western Leadership, who should be kept in place of power to consolidate the gains achieved, must be immediately and dramatically followed by the highest-level negotiations with the genuine leaders of Bengal, Primarily Suhrawardy because he has the ambition and the intelligence to respond'. Ibid, P. 173.

3. Ayub Khan, Friends Not Masters, (Karachi : Oxford University Press, 1967), pp. 186-88.

Dhaka University Institutional Repository



যুক্তফ্রন্টের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিতে গোলাম মোহাম্মদ সমর্থ হলেন। একদিকে আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান খানকে পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী ও সোহরাওয়ার্দীকে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী করার কথা হল, অপরদিকে আবুল কাশেম ফজলুল হককে বলা হল তাঁর কৃষক-শ্রমিক পার্টি পূর্ববাংলার প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে আওয়ামী লীগকে চ্যালেঞ্জ করতে রাজী হলে প্রদেশের শাসনভার তাদের দেওয়া হবে। দুই দলই ফাঁদে পা দিল ও গোলাম মোহাম্মদের Cabinet of Talents — এ যোগ দিল।[4] মাওলানা ভাসানী সে-সময় লন্ডনে নির্বাসিত জীবন যাপন করছিলেন। তিনি দেশে থাকলে এই ষড়যন্ত্র সফল হবে না আশংকা করে পাকিস্তান সরকার তাঁকে দেশে ফিরতে দিচ্ছিল না।[5] খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস বলেছেন:

> সংবাদপত্র পাঠ করে লন্ডনে মওলানা ভাসানীর দুই চোখে ছুটছিলো ক্রোধাগ্নি। গর্জিয়ে গর্জিয়ে বলতেন: সেও কুকুরের দল রাজনীতির এই সোজা চালটি ধরতে পারলে না। পূর্ব বাংলার সঙ্গে আমার বিশ্বাসঘাতকতা।[6]

১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে বড়লাট এক অর্ডিন্যান্স জারি করে কয়েকটি বিষয় সম্পাদনের ক্ষমতা গ্রহণ করলেন। এগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল: পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যবস্থা করা, পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশ গঠনের ব্যবস্থা করা ও পূর্ববাংলার নাম পূর্ব পাকিস্তান করা।[7] তিনি পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ৮০ জন সদস্যের এক গণপরিষদ গঠন করে তার বৈঠক ডাকলেন ৭ই জুলাই তারিখে। 'শহীদ সাহেবের প্রধান মন্ত্রিত্ব' — এই 'অলিখিত শর্ত' মেনে নিয়ে আওয়ামী লীগ সদস্যরা পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সঙ্গে শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে পাঁচ দফার সমঝোতায় উপনীত হলেন।[8] 'পাকিস্তানী জাতীয়তার বুনিয়াদী মসলা' এই মূলনীতিগুলি ছিল নিম্নরূপ:

১. পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট

---

৪। আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২৪, এবং কামরুদ্দীন আহমদ, পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৮–২৯।

৫। আবুল মনসুর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪৯।

৬। খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, ভাসানী যখন ইউরোপে, /ঢাকা, ১৯৫৭/ পৃঃ ২৫।

৭। G.W.Choudhury, Constitutional Development in Pakistan, 2nd Edn., (London, Longman, 1969), pp. 86–87.

৮। আবুল মনসুর আহমদ, পৃঃ ৩৬৬।

Dhaka University Institutional Repository



২. পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন

৩. সকল ব্যাপারে দুই অঞ্চলের মধ্যে সংখ্যাসাম্য

৪. যুক্ত নির্বাচন

৫. বাংলা ও উর্দু রাষ্ট্র ভাষা ।[৯]

এই মূলনীতির বিরুদ্ধে পূর্ববাংলায় প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ দেখা দেয় । শহীদ সাহেবের খাতিরে আওয়ামী লীগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে । আওয়ামী লীগের, বিশেষত সোহরাওয়ার্দীর, ক্ষমতাকাঙ্ক্ষার সমালোচনা করে আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন ঃ

> 'আর সব পার্টিই গণতন্ত্র ও পূর্ববাংলার স্বার্থে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইল । শুধু আওয়ামী লীগ চুপ করিয়া রহিল'।[১০]

কিন্তু এত করেও আওয়ামী লীগের বিশেষ লাভ হল না । প্রদেশে ক্ষমতা দেওয়া হল কৃষক-শ্রমিক পার্টিকে এবং কেন্দ্রে তাদের সমর্থনে ক্ষমতাসীন হল চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর (জন্ম ১৯০৫) প্রধানমন্ত্রীত্বে মুসলিম লীগ । আওয়ামী লীগ আবির্ভূত হল পরিষদে বিরোধী দল রূপে । এবং পূর্ববাংলার স্বার্থের প্রশ্নে কাজ করতে লাগল । ইতিমধ্যে মাওলানা ভাসানীও দেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন । ফলে সরকার-বিরোধী আন্দোলন ও বিক্ষোভ শক্তি অর্জন করে । কালো শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য ১৯৫৬ সালের ১৫ই জানুয়ারী ঢাকায় পল্টনময়দানে বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভাপতি মাওলানা ভাসানীর বক্তৃতার অংশ বিশেষ ছিল নিম্নরূপ ঃ

> পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী মানিয়া লউন । অন্যথায় আগত সমাজের মনে যদি অত্যাচার ও অবিচারের প্রতিশোধ গ্রহণ স্পৃহা সঞ্চার হয় এবং আমাদের মৃত্যুর পর যুবসমাজ নির্যাতনে অতিষ্ঠ হইয়া পশ্চিম পাকিস্তানের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদের দাবী উত্থাপন করিলে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই থাকিবে না । সুতরাং সমঝোতার মধ্যে ভালো শাসনতন্ত্র রচনা করুন ।[১০ক]

---

৯। ঐ, পৃঃ ৩৬৪-৬৬ ।

১০। ঐ, পৃঃ ৩৪৯-৫০ ।

১০ক। দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬.১.৫৬

Dhaka University Institutional Repository



গণপরিষদে আবুল মনসুর আহমদের বক্তব্যও ছিল প্রায় অনুরূপ।[11] কিন্তু এত করেও বিশেষ কিছু হলনা। শাসনতন্ত্র রচনার কাজ দ্রুত অগ্রসর হল। শেষদিকে সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী ও ফজলুল হক পূর্ববাংলার স্বার্থে একত্রে কাজ করতে একটি গোপন চুক্তি করেছিলেন কিন্তু তা-ও ব্যর্থ হয়ে যায়।[12]

১৯৫৬ সালের ২৩-এ ফেব্রুয়ারী শাসনতন্ত্র রচনা সম্পন্ন হল। প্রেসিডেন্ট ইসলাম ধর্মাবলম্বী, রাষ্ট্রভাষা বাংলা ও উর্দু, জাতীয় পরিষদের সদস্য সংখ্যায় ও কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীতে দুই প্রদেশের সংখ্যাসাম্য, পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট, পূর্ববাংলার নাম পূর্ব পাকিস্তান, যুক্ত নির্বাচন প্রশ্নে সিদ্ধান্তহীনতা ও সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যবস্থা, নিয়ে ১৯৫৬ সালের ২৩-এ মার্চ 'পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের' শাসনতন্ত্র জারি হল। ইস্কান্দার মীর্জা (১৮৯৯-১৯৬৯) হলেন প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট।

তিন

পূর্ব বাংলা সরকারের কার্যাবলী

প্রদেশ থেকে ৯২-ক ধারা উঠিয়ে নিলে কৃষক-শ্রমিক পার্টিকে ক্ষমতা দেওয়া হল। [illegible] আবু হোসেন সরকার ১৯৫৫ সালের ৬ই জুন সরকার গঠন করলেন।

প্রাদেশিক পরিষদে কৃষক-শ্রমিক পার্টির প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। ফলে মন্ত্রীত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য আবু হোসেন সরকারকে অনেক অবৈধ উপায় গ্রহণ করতে হল। তাঁর আমলে পরিষদের অধিবেশন ডাকা হয়নি, তাঁর কোয়ালিশন মন্ত্রীসভায় সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক মন্ত্রী ও পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী ছিল, তিনি সরকারী গুদামের চাল কমদামে সদস্যদের নিকট বিক্রি করে সে-চাল চড়াদামে খোলাবাজারে বিক্রির সুযোগ করে দিলেন।[13] এভাবে দেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা সৃষ্টি হলে আওয়ামী লীগ এর সুযোগ নিল। সভা অনুষ্ঠান,

---

১১। আবুল মনসুর আহমদ, পৃঃ ৩১৭ ।

১২। খোন্দকার আবুল হামিদ, বাংলার স্বার্থের প্রশ্নে শেরে-বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭.৪.৭৪

১৩। কামরুদ্দীন আহমদ, পৃঃ ১৩৫ ।

Dhaka University Institutional Repository



বিক্ষোভ মিছিল ও ভুখা মিছিল শুরু হল, মাওলানা ভাসানী শুরু করলেন অনশন ধর্মঘট। ২২-এ মে পরিষদের অধিবেশন বসে কিন্তু স্পীকার অর্থমন্ত্রীকে বাজেট উপস্থাপনের সুযোগ না দিলে অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করে প্রদেশে গভর্ণরের শাসন জারি করা হয়।[১৪] কদিন পর আবু হোসেন সরকার পুনরায় মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। জুলাই মাসের এক তারিখে খাদ্য-বন্টন ব্যবস্থা ও সরবরাহ সামরিক বাহিনীর উপর ন্যস্ত করা হয়।[১৫] অনেক গড়িমসির পর ১৩ই আগস্ট পুনরায় প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন আহবান করা হয়, কিন্তু গভর্ণর ফজলুল হক পরিষদে কৃষক-শ্রমিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাব বুঝতে পেরে অধিবেশন শুরুর কয়েক ঘন্টা পূর্বে পুনরায় প্রদেশে ৯৩ ধারা জারি করেন।[১৬]

ইতিমধ্যে খাদ্য-পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। প্রদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ভুখা মিছিলের খবর অনবরত আসতে থাকে। সেপ্টেম্বর মাসের চার তারিখে ঢাকায় ভুখা মিছিলের উপর পুলিশের গুলিতে ৪জন নিহত ও কমপক্ষে ৬০জন আহত হয়।[১৭] গত্যন্তর না দেখে গভর্ণর সেদিনই আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা গ্রহণের আহবান জানান এবং ৬ই সেপ্টেম্বর আতাউর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ও আরো কয়েকটি দলের সংযুক্ত মন্ত্রীসভা গঠিত হয়।[১৮]

আতাউর রহমান খান ক্ষমতা গ্রহণের পরদিন সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তি দিলেন। তাঁর এ-কাজ সর্বত্র প্রশংসিত হল এবং দেশবাসীর শুভেচ্ছা নিয়ে তিনি শাসনকার্য শুরু করলেন। তিনি ক্ষমতাসীন হওয়ার চারদিন পর সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হলেন। তখন থেকে কেন্দ্রের সহযোগিতায় পূর্ববঙ্গে কিছু কিছু জনকল্যাণমূলক কাজ শুরু হল, বিশেষত চরম দুর্ভিক্ষাবস্থা থেকে দেশ রক্ষা পেল। তাছাড়া অসাধারণ রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্পন্ন দুটি প্রস্তাবও এ-সময়ে পরিষদে পাশ হয় ঃ প্রথমটি কেন্দ্র ও প্রদেশের জন্য যুক্ত নির্বাচন প্রথা,[১৯] দ্বিতীয়টি, কেন্দ্রের আওতায় শুধু দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রাব্যবস্থা রেখে বাকিগুলি প্রদেশের হাতে দিয়ে দেওয়া।[২০] মোটামুটি নির্বিবাদে

---

১৪। দৈনিক ইত্তেফাক, মে ২৩–২৭, ১৯৫৬ । ১৫। ঐ, ১.৭.৫৬ । ১৬। ঐ, ১৪.৮.৫৬

১৭। ঐ, ৫.৯.৫৬ । ১৮। ঐ, ৭.৯.৫৬ ।

১৯। দৈনিক সংবাদ, ২.১০.৫৬

২০। ঐ, ৪.৪.৫৭

Dhaka University Institutional Repository

আতাউর রহমান খান শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন কিন্তু ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠিত হলে পরিষদে আওয়ামী লীগের শক্তি খর্ব হয় এবং প্রদেশে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে মুখ্যমন্ত্রী বাজেট পাস করাতে ব্যর্থ হলে গভর্নর আতাউর রহমান খানের মন্ত্রীসভাকে ৩১-এ মার্চ বরখাস্ত করে পরিষদে বিরোধী দলের নেতা জনাব আবু হোসেন সরকারকে মন্ত্রীসভা গঠন করতে আহ্বান জানান। জনাব আবু হোসেন সরকার সে-রাত্রেই মন্ত্রীসভা গঠন করেন। কিন্তু তার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার ফজলুল হককে গভর্নরের পদ থেকে অপসারিত করে চীফ সেক্রেটারী হামিদ আলীকে অস্থায়ী গভর্নর নিযুক্ত করেন। এবং তিনি পরদিন, ১লা এপ্রিল, আবু হোসেন সরকারের সরকারকে, মন্ত্রীসভা গঠন করার বার ঘন্টা পরে, বরখাস্ত করে আতাউর রহমান খানকে পুনরায় মন্ত্রীসভা গঠন করতে আহ্বান জানালেন।[২১]

১৮ই জুন খাদ্য পরিস্থিতির উন্নতি সাধনে সরকারের ব্যর্থতার নিন্দা করে উত্থাপিত এক ছাঁটাই প্রস্তাবের উপর বিরোধী দলের দাবী অনুসারে গৃহীত ভোটে পরাজিত হয়ে আতাউর রহমান খান পদত্যাগ করেন।[২১ক] ২০-এ জুন আবু হোসেন সরকার পুনরায় সরকার গঠন করেন। তিন দিনের মধ্যে আওয়ামী লীগ নিরপেক্ষ সদস্যদের সমর্থন আদায় করে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনে।[২২] ~~প্রস্তাবের~~ প্রস্তাব পাশ হওয়ায় আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রীসভার পতন হলে গভর্নর সুলতান উদ্দিন আহমদের প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশে দুই মাসের জন্য ৯৩ ধারা প্রবর্তন করে।

---

২১। মাসের খবর, মাসিক মোহাম্মদী, বৈশাখ ১৩৬৫ পৃঃ ৬৫০। এই নাটকীয় ঘটনার নেপথ্য-কাহিনী সম্পর্কে অমিতাভ গুপ্ত বলেছেন যে, আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভার আকস্মিক পদচ্যুতিতে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন রিপাবলিকান দলের সমর্থক শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নূনকে (জন্ম ১৮৯৩) গভীর রাতে টেলিফোনে ভয় দেখালেন, তিনি যদি আধ ঘন্টার মধ্যে ফজলুল হককে গভর্নরের পদ থেকে অপসারিত না করেন তবে তিনি নূন মন্ত্রীসভা থেকে তাঁর দলের সমর্থন প্রত্যাহার করবেন। উপায় না দেখে তিনি সোহ-রাওয়ার্দীর দাবির কাছে নতি স্বীকার করেন। (বাংলাদেশ, কলকাতা, নতুন সংস্করণ, ১৩৭৮, পৃঃ ৯৩-৯৪)।

২১ক। মাসের খবর, মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ ১৩৬৫, পৃঃ ৯৫৪।

২২। ঐ, । প্রস্তাবের উত্থাপক শেখ মুজিবুর রহমান আবু হোসেন সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তৃতায় 'নির্লজ্জ বেহায়া' প্রভৃতি অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ করলে তিনি অত্যন্ত আহত হন

Dhaka University Institutional Repository

গভর্ণরের শাসন উঠে গেলে আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতা লাভ করে। বিশে সেপটেম্বর বসে প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন। আওয়ামী লীগের চরম বিরুদ্ধাচরণে স্পীকার আবদুল হাকিম সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। পরিষদ তাকে 'মস্তিষ্ক উন্মাদ' ঘোষণা করে সেদিন প্রস্তাব নেয়।[২৪] ২৩-এ সেপটেম্বর অধিবেশনের প্রাক্কালে শেখ মুজিবুর রহমানের পরামর্শে আবুল মনসুর আহমদ ক্ষমতাসীন দলের অনুকূলে সভার কার্য পরিচালনার জন্য ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলীকে রাজি করান।[২৫] প্রবল উত্তেজনা ও গণ্ডগোলে অবস্থার মধ্যে সভা শুরু হয়। নির্বাচনী কমিশন কর্তৃক অযোগ্য ঘোষিত ছয় জন লীগ দলীয় সদস্যকে পরিষদে আসন গ্রহণ করার অনুমতি দিলে গোলমালের সূত্রপাত ঘটে। কিছুক্ষণের মধ্যে অহিংস প্রতিবাদ সহিংস রূপ লাভ করে এবং সদস্যরা হাতের নাগালে প্রাপ্ত সমস্ত কঠিন পদার্থ — পেপারওয়েট, মাইকের মাথা, মাইকের ডাণ্ডা, চেয়ারের হাতল এবং পায়া — স্পীকারের প্রতি নিক্ষেপ করতে শুরু করেন। এই এলোপাতাড়ি আক্রমণে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন এবং হাসপাতালে নীত হয়ে পরদিন মৃত্যুবরণ করেন।[২৬] ফলে চব্বিশে সেপটেম্বর থেকে পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী ঘোষিত হয়।

আওয়ামী লীগ সরকার সামরিক আইন জারি পর্যন্ত প্রদেশে ক্ষমতাসীন থাকে।

---

এবং আবেগ-মথিত ভাষায় তার উত্তর দেন। সে-বক্তৃতার অংশবিশেষ নিম্নরূপ ঃ

> আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছি যে আজ যদি বেশীর ভাগ মেম্বার আমার বিরুদ্ধে ভোট দেয় তাহলে অনতিবিলম্বে আমি গভর্ণরের কাছে Resignation দিব। আর যদি না দেয় তাহলে সে অন্য কথা। সেই stage আসবার আগে House কাছে আমার নিবেদন, এই motion এর mover শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব, the enthusiastic and aggressive young man - এর দ্বারা বাংলাদেশের politics হয়ত একটা উজ্জ্বল আকার ধারণ করবে কিন্তু বাংলা ভাষার Dictionary তে তিনি হয়ত ভাল ভাষা খুঁজে পাননা তাই বলেছেন, 'নির্লজ্জের মত আমার এখানে থাকা উচিত নয়।' এরকম ব্যবহার যদি তিনি ছেড়ে দেন তাহলে খুশী হব।

(East Pakistan Assembly Proceedings, Official Report, 23rd June, 1958, pp.339-43.

২৪। অমিতাভ গুপ্ত, পৃঃ ৯৭–৯৯ ।

২৫। আবুল মনসুর আহমদ, পৃঃ ৪২৬ ।

২৬। ঐ, পৃঃ ।

Dhaka University Institutional Repository



চার

## শাসনতন্ত্রের অধীনে কেন্দ্রে সরকার গঠন

শাসনতন্ত্র প্রাপ্তির একমাস পরে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ খান সাহেব রিপাবলিকান পার্টি গঠন করেন। মুসলিম লীগের বেশ কয়েকজন পরিষদ সদস্য এতে যোগ দিলে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। ৮ই সেপ্টেম্বর জাতীয় পরিষদের এক বৈঠকে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট লাভে ব্যর্থ হয়ে তিনি পদত্যাগ করেন এবং মুসলিম লীগের সদস্যপদও প্রত্যাহার করে নেন।[২৭]

রিপাবলিকান দলের সঙ্গে সমঝোতার ফলে শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হলেন। তাঁর শাসনামলে দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পরিষদের বৈঠকে আলোচনা করার রেওয়াজ সৃষ্টি করলেন; এমনকি পররাষ্ট্র নীতি ও আন্তর্জাতিক চুক্তির মত স্পর্শকাতর বিষয়েও তিনি পরিষদে বিতর্কের ব্যবস্থা করলেন। তিনি যুক্ত নির্বাচন প্রথাও আইনে পরিণত করলেন।[২৮] কিন্তু কোনো-কোনো বিষয়ে — যেমন আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন ও স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি — তিনি আওয়ামী লীগের নীতিবিচ্যুত হলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট সম্পর্কেও তিনি ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন। পশ্চিম পাকিস্তান পরিষদের তিনদলের পার্লামেন্টারী পার্টি এক ইউনিটের বিপক্ষে মত দিলেও তিনি এক ইউনিটের পক্ষে বক্তব্য রাখলেন এবং এক ইউনিট বিরোধীদের পাকিস্তানের অনিষ্টকারী বলে নিন্দা করলেন।[২৯] তাঁর এই নীতিবিচ্যুতির ফলে সংগঠনের পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি মাওলানা ভাসানীর সঙ্গে তাঁর তীব্র মত-পার্থক্য সৃষ্টি হল এবং পরিণামে মাওলানা নতুন দল গড়লেন। এদিকে রিপাবলিকান দলের বিশ্বাসভাজন হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীত্ব ত্যাগ করতেও তিনি বাধ্য হলেন।

১৯৫৭ সালের ১৭ই অক্টোবর মুসলিম লীগের আই,আই, চুন্দ্রীগড় প্রধানমন্ত্রী হলেন কিন্তু পৃথক নির্বাচন বিধি পরিষদে পাশ করাতে ব্যর্থ হয়ে পদত্যাগ করলেন ১১ই ডিসেম্বর।[৩০]

---

২৭। কামরুদ্দীন আহমদ, পৃঃ ১৩৪ ।
২৮। দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫.৪.৫৭
২৯। আবুল মনসুর আহমদ, পৃঃ ৫২৭ ।
৩০। চুন্দ্রীগড় ওজারতের বিদায়, সম্পাদকীয়, মাসিক মোহাম্মদী, পৌষ ১৩৬৪, পৃঃ ২৬২ ।

Dhaka University Institutional Repository



এবারে প্রধানমন্ত্রী হলেন রিপাবলিকান দলের মালিক ফিরোজ খান নুন। তাঁর কোয়ালিশন মন্ত্রীসভায় প্রথম দিকে ন্যাপ, কংগ্রেস ও তফসিলী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিও ছিলেন; এই মন্ত্রীসভার প্রতি সমর্থন ছিল আওয়ামী লীগেরও। তিনি সর্বদলীয় এক সম্মেলন ডেকে বিস্তৃত আলাপ-আলোচনার পর ১৯৫৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সাধারণ নির্বাচনের চূড়ান্ত তারিখ নির্ধারণ করেন।[৩১] ১৯৫৮ সালের ২রা অক্টোবর মন্ত্রীসভায় তিনি রদবদল করলেন। দলের ঊর্ধ্বতন নেতাদের পরামর্শ সাপেক্ষে শেখ মুজিবুর রহমান বাদে কয়েকজন লীগ সদস্যসহ মন্ত্রীসভায় যোগ দিলেন, কিন্তু তারা পদ পাওয়া গেলনা বলে পদত্যাগ করলেন ৭ই অক্টোবর।[৩২] সেদিন রাত্রেই দেশে সামরিক আইন জারি হল।

পাঁচ

কাগমারীতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন, ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির জন্ম

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ জন্মলগ্ন থেকেই পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবমুক্ত পররাষ্ট্র নীতির জন্য আন্দোলন করে আসছিল, কিন্তু ১৯৫৬ সালের শেষের দিকে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হয়ে সোহরাওয়ার্দী প্রকাশ্যে পাশ্চাত্য শক্তিজোটের সমর্থক হয়ে উঠলেন। তিনি আমেরিকাকে পাকিস্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ্য মিত্র হিসাবে ভেবে জাতীয় পরিষদে জানালেন:

> It would be in order, Sir, if I were to begin by stating that I am happy that our relations with the United States of America are more than cordial. In her we have a friend and an ally. It is good to have a country, powerful enough at your back which can gurrantee your territorial integrity and political Sovereignty.33

সোহরাওয়ার্দীর এই সংগঠন-বিরোধী কার্যকলাপে মাওলানা ভাসানীর সঙ্গে তাঁর তীব্র মত-

---

৩১। দৈনিক ইত্তেফাক, ২০.৭.৫৮

৩২। আবুল মনসুর আহমদ, পৃঃ ৫৬০

৩৩। National Assembly of Pakistan, Parliamentary Debates, Official Report, Govt. of Pakistan, 22nd February 1957, p.924.

Dhaka University Institutional Repository

পার্থক্য দেখা দিল। তা তীব্রতর হয় ১৯৫৬ সালের নভেম্বরে সুয়েজ যুদ্ধের সময়। মাওলানা মিসরের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে পূর্ব বাংলায় তীব্র সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাব জাগ্রত করলেন, অপরদিকে সোহরাওয়ার্দী বাগদাদ চুক্তিভুক্ত দেশগুলির সহায়তায় সুয়েজখালে ব্রিটেনের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করেন।[৩৪]

দলের অভ্যন্তরের এই দ্বন্দ্বের ফয়সালা করার জন্য মাওলানা ভাসানী সন্তোষ কাগমারীতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন আহবান করেন। তিনি সেখানে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি ও পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে তীব্র আবেগপূর্ণ বক্তৃতা দেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন ভবিষ্যতে এমন দিন আসতে পারে, প্রথম অভিযোগের প্রতিকার না হলে পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আলাইকুম সালাম' জানাবে।[৩৫] সোহরাওয়ার্দী তাঁর বক্তৃতায় পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির অনুকূলে যুক্তি দেন এবং ছোট-ছোট রাষ্ট্র-গুলির পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা অর্থহীন বলে মত প্রকাশ করেন। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে পূর্ব বাংলাকে শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়েছে, সুতরাং এ-ব্যাপারে দাবি উত্থাপন করা 'রাজনৈতিক ভাওতাবাজি' মাত্র।[৩৬]

যাহোক অধিবেশনে এ-সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়নি। মাওলানা ভাসানী দাবি করলেন কাউন্সিল নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বৈদেশিক নীতির পক্ষে রায় দিয়েছে,[৩৭] অপর দিকে সোহরাওয়ার্দী বললেন, উপস্থিত সদস্যদের শতকরা ৯৮জন তাঁর নীতির প্রতি সমর্থন জানিয়েছে।[৩৮] এই সিদ্ধান্তহীনতার বিশৃঙ্খলার মধ্যে অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

এর পর থেকে সোহরাওয়ার্দী আরো পাশ্চাত্যঘেঁষা হয়ে উঠলেন। তিনি ওমানে ব্রিটেনের সামরিক হামলাকে সমর্থন জানালেন[৩৯] এবং মধ্যপ্রাচ্যে প্রেসিডেন্ট নাসেরের নীতির বিরোধী হয়ে উঠলেন। পাকিস্তানের এ-সময়ের পররাষ্ট্র নীতিকে জনৈক লেখক অভিহিত করেছেন a Sewage tank of Imperialism.41 বলে।

---

৩৪। দৈনিক সংবাদ ১১.১১.৫৬ ও ২০.১১.৫৬

৩৫। দৈনিক আজাদ, ৮.২.৫৭ । ৩৬। ঐ,

৩৭। দৈনিক সংবাদ, ৯.২.৫৭ । ৩৮। ঐ, ১০.২.৫৭

৩৯। দৈনিক সংবাদ ৩১.৭.৫৭ ।

৪১। Tariq Ali, (Pakistan Military Rule ... ). Ibid, p. 77

Dhaka University Institutional Repository



এই পরিস্থিতিতে মাওলানা ভাসানীর পক্ষে আওয়ামী লীগ ত্যাগ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। ইতিপূর্বে পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা — পাঞ্জাবের মিয়া ইফতেখারউদ্দিন, সিন্ধুর জি,এম, সৈয়দ ও আবদুল মজিদ সিন্ধি, বেলুচিস্তানের আবদুস সামাদ আচকজাই এবং সীমান্ত প্রদেশের আবদুল গাফফার খান — ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তান ন্যাশনাল পার্টি নামক একটি দল গঠন করেছিলেন। এর প্রধান লক্ষ্য ছিল তিনটি — ভাষার ভিত্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ গঠন, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি গ্রহণ ও সামন্তবাদের উচ্ছেদ সাধন।[42] মাওলানা ভাসানী তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন এবং ১৯৫৭ সালের ২৫ ও ২৬-এ জুলাই ঢাকায় 'নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলন' আহবান করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করেন। দলের সভাপতি হন মাওলানা ভাসানী। এর মূল নীতি হিসাবে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ক্ষেত্রে ফেডারেল রাষ্ট্র পাকিস্তানের দুটি প্রদেশ স্বায়ত্তশাসিত হওয়া, কেন্দ্রের ক্ষমতা শুধু দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রাব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা, যুক্তনির্বাচন প্রথায় সর্বজনীন ভোটে আইন সভা গঠন করা, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা ও ভাষা-সংস্কৃতি-ভৌগোলিক সংলগ্নতার ভিত্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলির পুনর্গঠন করার কথা বলা হয়।[43]

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাংলা ও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা, মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান করা, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারের পথ বাধামুক্ত করার নীতি গৃহীত হয়। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে বলা হয় 'বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব হইতে মুক্ত থাকা'।[44]

পূর্ব বাংলার ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, কৃষকের হাতে জমি প্রদান, জমি পুনর্বন্টনের ক্ষেত্রে ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের অগ্রাধিকার দান, পাট ব্যবসা জাতীয়করণ করা প্রভৃতি ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য।[45]

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠনের সঙ্গে সঙ্গে এর উপর সরকারী, বিশেষত আওয়ামী লীগের হামলা শুরু হয়। ২৬-এ জুলাই পল্টন ময়দানে দলের প্রথম জনসভায় [illegible] গুণ্ডামী হয়।[46]

---

৪২। Talukder Maniruzzaman, p. 127.

৪৩। দৈনিক সংবাদ, ৬.৮.৫৭।  ৪৪। ঐ  ৪৫। ঐ

৪৬। দৈনিক সংবাদ, ২৭.৭.৫৭।

Dhaka University Institutional Repository



১৯ই আগস্ট পাবনায়, ২৫ই আগস্ট রাজশাহীতে, ১লা সেপ্টেম্বর ফরিদপুরে, ৩০-এ আগস্ট সিরাজগঞ্জে, ৪ঠা সেপ্টেম্বর খুলনায় দলের জনসভা বানচালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয় ও গুণ্ডাদের সাহায্যে আক্রমণ চালানো হয়। দলের মুখপত্র দৈনিক সংবাদের জামানতও জব্দ করা হয়।[৪৭] কিন্তু নানা নির্যাতনের মুখেও এর প্রসার ঘটে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত পূর্ব বাংলার সব জেলায় এর শাখা গঠিত হয়।[৪৮]

## ছয়

## পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির প্রতিষ্ঠা

১৯৫৮ সালের জানুয়ারী মাসের তিন ও চার তারিখে রংপুর জেলার ফুলছড়িতে মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে 'পূর্ব পাকিস্তান কৃষি ও কৃষক সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়।[৪৯] প্রায় তিন-চার হাজার কৃষক সভায় যোগদান করেন। মাওলানা ভাসানী তাঁর বক্তৃতায় বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, মহাজন ও সরকারী আমলার শাসন ও শোষণের কথা বর্ণনা করেন এবং এর অবসানের জন্য কৃষক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, মুসলিম লীগ, যুক্তফ্রন্ট কিংবা আওয়ামী লীগ কোনো আমলেই এই শোষণের বিরুদ্ধে কিছু করা হয়নি, বরং সামন্তবাদী শোষণ অব্যাহত রেখে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকেই বজায় রাখা হয়েছে। তিনি নিম্নরূপ নীতির ভিত্তিতে গ্রামে-গ্রামে কৃষক আন্দোলন গড়ার পরামর্শ দেন।

ক. সমস্ত সামন্ত শোষণের অবসান ও কৃষকের হাতে জমি। পানির উপর মৎস্যজীবীদের অধিকার।
খ. সবরকম খাজনা মওকুফ, ঋণ মওকুফ ও সস্তা ঋণের ব্যবস্থা।
গ. পাটসহ সমস্ত অর্থকরী ফসলের ন্যায্যমূল্যের ব্যবস্থা।
ঘ. ভাগচাষ প্রথার সংস্কার।
ঙ. খাজনার হার হ্রাস ও সার্টিফিকেট প্রথার অবসান।
চ. সুষ্ঠু সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, নদী-নালা-খাল-বিলের সংস্কার সাধন, অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি জনিত অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করা।
ছ. বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষের ব্যবস্থা, ভাল সার, উন্নত ধরনের বীজ ও দেশে উন্নত ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি প্রচলন।[৫০]

সম্মেলন শেষে মাওলানা ভাসানীকে সভাপতি করে 'পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি' গঠিত হয়। হাতেম আলী খান সাধারণ সম্পাদক এবং আবদুল হক ও আব্দুল মতিন যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন।[৫১]

---

৪৭। দৈনিক সংবাদ, ২৫.৮.৫৭

৪৮। M. Rashiduzzaman, The National Awami Party of Pakistan, Leftist Politics in Crisis, Pacific Affairs, Fall 1970, p. 395.

৪৯। দৈনিক সংবাদ, ৪.১.৫৮। ৫০। ঐ, ৫১। ঐ, ৫.১.৫৮।

# সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহ

এক

## কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন

কাগমারীতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নির্দেশ কাউন্সিল অধিবেশন উপলক্ষে সেখানে আরো কয়েকটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, সাংস্কৃতিক সম্মেলন ছিল তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

সম্মেলনে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের প্রায় শতাধিক সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীকে দাওয়াত দেওয়া হয়। সংবাদপত্রের মাধ্যমে সর্বশ্রেণীর লোককে আমন্ত্রণ জানানো হয় অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য। কাগমারীতে যাওয়ার জন্য হ্রাসকৃত ভাড়ায় বাসের ব্যবস্থা করা হয়। অতিথি-গণকে শিক্ষায়তন ও সরকারী গৃহে থাকতে অনুরোধ জানানো হয়। উদ্যোক্তাগণ তাদের খাওয়া-দাওয়া ও বাসস্থানের আয়োজন করেছিলেন।[৫২]

সম্মেলনকে একটি আন্তর্জাতিক রূপ দেওয়ার জন্য মাওলানা ভাসানী দূতাবাস মারফত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের দাওয়াত দিয়েছিলেন। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, মিসর ও ভারত প্রতিনিধি প্রেরণ করে, অন্যান্য রাষ্ট্র সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বাণী পাঠায়।[৫৩] পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট ভারতীয় দলের নেতৃত্ব করেন অধ্যাপক হুমায়ুন কবির। কাগমারীর পথে মীর্জাপুর থেকে সম্মেলনের স্থান পর্যন্ত বারো মাইল রাস্তায় পঞ্চাশটি সুদৃশ্য তোরণ নির্মিত হয়। দেশবিদেশের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের স্মরণে নির্মিত এই তোরণগুলির মধ্যে উল্লেখ্য ছিল জিন্নাহ্‌, জামালুদ্দিন আফগানী, তিতুমীর, জর্জ ওয়াশিংটন, লেনিন, গান্ধী, সেক্সপীয়র ও রবীন্দ্রনাথের নামের তোরণগুলি।[৫৪] মাওলানা ভাসানী নিজেই এই সম্মেলনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন — কাগমারী সড়ক, শিল্প সাহিত্য ও স্বাধীনতার সড়ক।[৫৫]

---

৫২। দৈনিক ইত্তেফাক, ৫.২.৫৭

৫৩। দৈনিক সংবাদ, ৬.২.৫৭

৫৪। দৈনিক ইত্তেফাক, ৪.২.৫৭

৫৫। অমিতাভ গুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৪

Dhaka University Institutional Repository



৮ই ফেব্রুয়ারী ডঃ কাজী মোতাহার হোসেনের সভাপতিত্বে সম্মেলন শুরু হয়। উদ্বোধন করেন আতাউর রহমান খান। তিনি উল্লেখ করেন, এদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অতীব সমৃদ্ধ এবং জনগণের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হলে তাদের সাংস্কৃতিক জীবনেও জাগরণ আসবে।[৫৬] স্বাগত ভাষণ দেন মাওলানা ভাসানী। পাকিস্তানের বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক ও পৃথিবীর রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সমঝোতার ভাব সৃষ্টিই এ-সম্মেলনের লক্ষ বলে তিনি বলেন। তিনি আরো বলেন এদেশের সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অসাম্যের কারণগুলি খুঁজে বের করা দরকার।[৫৭] সভাপতি তাঁর বক্তৃতায় দেশে-দেশে বিরাজিত আপাত বিরুদ্ধ সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত ঐক্যের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার ভিত্তিতে সর্বজনীন ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানান।[৫৮]

সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়ার লালন ফকিরের দল সংগীতানুষ্ঠান এবং ঢাকা জেলার মুকুল চাঁদের দল 'সৎমা' যাত্রাভিনয় করে। আমেরিকার প্রচার দফতর Hungary Fights for Freedom দেখাতে শুরু করলে পুলিশ প্রতিবাদের দরুণ সেটা বন্ধ করে দিতে হয়।[৫৯]

নয় তারিখের প্রাতঃকালীন অধিবেশন নির্দিষ্ট ছিল সাহিত্যালোচনার জন্য। এতে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) 'পাকিস্তানের ভাষা' ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক (জ. ১৯০৬) 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম প্রভাব' পেশোয়ারের মাওলানা আব্দুল কাদের 'পুশতু কাব্যের সাহিত্যের পরিক্রমা', সিকান্দার হাসান হাশমী 'ঐতিহাসিক ইরানে হাফিজের হামাসী', যুক্তরাষ্ট্রের ডেভিড গার্থ 'আমেরিকার সাংস্কৃতিক জীবন' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ভারতীয় দলের পক্ষে বক্তৃতা দেন অধ্যাপক হুমায়ুন কবির। তিনি বলেন, পাকিস্তান ও ভারতের সংস্কৃতিতে অনেক ক্ষেত্রে মৌলিক ঐক্য রয়েছে এবং একালে বিজ্ঞান যখন বিভিন্ন জাতিকে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ করছে, তখন মানুষে-মানুষে বিভেদ সম্পর্কে তারাও বিমুক্ত।[৬০]

দুপুরে অনুষ্ঠিত হয় লাঠি, তলোয়ার ও রায়বেঁশে খেলা। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় উন্মুক্ত মঞ্চে। সেখানে যাত্রাগান, কাঞ্চন মালাভিনয়, ছড়াগান ও জারিগানের আসর বসে। অন্য একটি মঞ্চে বুলবুল, কৃষ্টিসংঘ ও রেডিও পাকিস্তানের শিল্পীরা সংগীতানুষ্ঠানে অংশ নেয়।[৬১]

---

৫৬। দৈনিক সংবাদ, ৯.২.৫৭ ৫৭। ঐ, ৫৮। ঐ

৫৯। ঐ, ৬০। ঐ, ১০.২.৫৭ ৬১। ঐ,

Dhaka University Institutional Repository



দশ তারিখের সাহিত্যালোচনায় যুক্ত বিদেশের অতিথিরা অংশ নেন। তারশেষে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ব বাংলার যুবকদের আত্মত্যাগের উচ্ছসিত প্রশংসা করেন :

'মাতৃভাষা ও সাহিত্যের জন্য সন্তানের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। পূর্ব বাংলার মানুষ এই ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা পূর্ব বাংলার মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। প্রেম অহিংসা ও সত্যের বাণী সঙ্গে লইয়া সংস্কৃতির মুক্তিতীর্থে আমাদের দীর্ঘ যাত্রাপথ। এই সুদূর যাত্রা পৌঁছিতে পারিলেই আমাদের সাংস্কৃতিক সাধনার সার্থকতা।'[৬২]

পাকিস্তানের তৎকালীন প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশে কাগমারী সম্মেলনের আয়োজন কর্মসূচি ও সাফল্য অনিবার্যভাবে গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। মুসলিম লীগের 'ডন', 'মর্নিং নিউজ', 'আজাদ', সোহরাওয়ার্দী-ঘেষা আওয়ামী লীগের রক্ষণশীল অংশের 'দৈনিক ইত্তেফাক', তমদ্দুন মজলিসের সাপ্তাহিক 'সৈনিক' মিলিতভাবে আক্রমণ করে মাওলানা ভাসানীকে। সম্পাদকীয়তে, সুনামে-বেনামে প্রকাশিত প্রবন্ধে, চিঠিপত্রে ও ব্যঙ্গ কবিতায় অনবরত আক্রমণ চলতে থাকে সম্মেলনের আয়োজন ও সাফল্যকে অবলম্বন করে। দৈনিক আজাদের নিম্নোদ্ধৃত সম্পাদকীয় মন্তব্যকে এই সমস্ত আক্রমণের সার-সংক্ষেপ বলা যেতে পারে :

কাগমারী সম্মেলনের বিভিন্ন দিক লইয়া আমরা দুইদিন আলোচনা করিয়াছি। এই সম্মেলন ও তার সকল সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে যা স্পষ্ট হইয়া উঠে, তা হইল একটি দলের কুচক্রী হাতের খেলা। তারা মুষ্টিমেয় হইতে পারে এবং সাধারণভাবে আওয়ামী লীগ তার সাথে লিপ্ত নাও থাকিতে পারে কিন্তু এই কুচক্রীরা একটি সুনির্ধারিত পরিকল্পনা লইয়া অগ্রসর হইয়াছিল। যারা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পাকিস্তানের চাইতে ভারতীয় নীতির বেশি ভক্ত, যারা কাশ্মীরের দাবী তুলিলে মিথ্যা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয় দেখাইয়া নিরস্ত করিতে চায়, যারা সাহিত্য এবং তমদ্দুন বলিতে পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্য ও তমদ্দুনকেই বুঝিয়া থাকে এবং যাদের মুখে 'পূর্ব পাকিস্তান' কথাটাই অসতর্ক মুহূর্ত ছাড়া উচ্চারিত হয়না এবং যারা 'পূর্ব বাংলা' বলিতে অজ্ঞান, যুক্ত বাংলার সাহিত্য ও 'সংস্কৃতির' ঢোল পিটা এবং অহরহ যাদের হাতে বাজে, তাদের কুচক্রই কাগমারীতে সিদ্ধিলাভ

৬২। দৈনিক সংবাদ, ১১. ২. ৫৭

Dhaka University Institutional Repository



> জন্য বিস্তার করিয়াছিল। তাদের মতলব ছিল ঘরে ও বাইরে পাকিস্তানী স্বার্থের আঘাত। ... সম্প্রতি এই কুচক্রীরা পাকিস্তানের দেশাত্মবোধ, জাতীয়তা ও সংহতিকে আর চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়াছে। তবে আমরা বিশ্বাস রাখি, জাতির জাগ্রত দেশপ্রেমের বন্যার মুখে এই সব কুচক্রী কুটা ও আত্মপ্রবঞ্চনার মতই ভাসিয়া যাইবে।[৬৩]

কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন মূলত তিনটি দিক দিয়ে এদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে: প্রথমত, সম্মেলনের সমস্ত আয়োজনে ও অনুষ্ঠানে অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী চিন্তাভাবনার প্রকাশ লক্ষ করা গেছে। উদ্যোক্তাগণ কোনো প্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দ্বারা যে আচ্ছন্ন চিত্ত ছিলেন না তা লক্ষ করার মত। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল বাঙালীর মিলিত প্রয়াসে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটবে এবং 'দুই বঙ্গের' সাহিত্য মূলত এক, সম্মেলন এই ধারণাকে পুষ্ট করেছে। দ্বিতীয়ত, শহরে সংস্কৃতি ও গ্রামীণ সংস্কৃতিকে মেলাবার যে-প্রয়াস এখানে প্রকাশিত হয়েছে তা-ও উল্লেখযোগ্য। সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে বেগবতী করতে হলে শহরের বিদগ্ধ সংস্কৃতিকে মূল ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত ও প্রাণরসে ভরপুর গ্রামের অবাঞ্ছিত সংস্কৃতির সঙ্গে সমন্বিত করা দরকার — এই ধারণা সম্মেলনের সমস্ত কাজকর্মে প্রতিফলিত হয়েছে। তৃতীয়ত, সাহিত্যকে পূর্ণতায় উন্নীত হতে হলে আন্তর্জাতিকতাবাদে পুষ্ট হতে হবে — এ মনোভাবও অনুষ্ঠানে পরিলক্ষিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের শিল্পীরা মিলিত হয়ে নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যকে বিচার বিশ্লেষণ করে নিজেদের অভিজ্ঞতার পরিধিকে প্রসারিত করবেন — এটা হয়ত তাঁদের মনে প্রচ্ছন্ন ছিল।

## দুই

### সিপাহী বিপ্লব শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান

১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে ঢাকার কয়েকটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী সিপাহী বিপ্লবের /১৮৫৭/ শতবার্ষিকী পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। অধ্যাপক হাসান জামান ছিলেন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক। অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারী গোষ্ঠীগুলি ছিল পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশ,

---

৬৩। কাগমারী সম্মেলন /৩/, সম্পাদকীয়, দৈনিক আজাদ ১৪.২.৫৭ ।

Dhaka University Institutional Repository



পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, পাকিস্তান মজলিশ, পাকিস্তান ছাত্রশক্তি, পূর্ব বঙ্গ লেখক সংঘ, পাক-বাংলা সাহিত্য মহফিল, শিল্প-সংস্কৃতি পরিষদ, পাকিস্তান সাহিত্য মজলিশ, এছলামী সংস্কৃতি পরিষদ, নিখিলবঙ্গ সংস্কৃতি পরিষদ, পেশোয়ারিয়া কালচারাল ফোরাম ও পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে তোলাবা।[৬৪] অনুষ্ঠান চলেছিল তিনদিন — শুরু হয় ২৯-এ মার্চ, শতবর্ষ পূর্বে যেদিন সিপাহীরা বিদ্রোহ শুরু করেছিল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান এবং মূল সভাপতি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মোহাম্মদ ইব্রাহিম।

২৯-এ মার্চ সকাল দশটায় কোরান তেলাওয়াত, 'গণগণিদারী' 'নারায়ে তকবীর আল্লাহু আকবার। পাকিস্তান জিন্দাবাদ! সিপাহী বিদ্রোহ জিন্দাবাদ' ধ্বনি এবং পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' গীতের মধ্য দিয়ে কার্জন হলে অনুষ্ঠান শুরু হয়। উদ্বোধক বক্তৃতায় বলেন ঃ

> আজাদী সংগ্রামের অমর শহীদেরা আমাদের তমদ্দুন, সভ্যতা ও ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই আত্মত্যাগ করেছেন। আমরা যদি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হই তবে ইতিহাসের পাতায় একটা অকৃতজ্ঞ জাতিরূপে আমরা চিহ্নিত থাকব।... ১৮৫৭ ছিল আজাদী আন্দোলনের পথ নির্দেশক বৎসর, কিন্তু আজাদীর সংগ্রাম এরও বহুপূর্বে শুরু হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবী মুজাহিদ সৈয়দ আহমদ শহীদই ছিলেন আমাদের আজাদী সংগ্রামের মূল উদগাতা।[৬৫]

মূল সভাপতি শতবার্ষিকী উদযাপনের তাৎপর্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে জানান যে, 'যে আদর্শ, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধসমূহের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধাবশতঃ বীর মুজাহিদগণ অকাতরে রক্তদান করেছেন তার প্রতি আজো যদি আমরা উদাসীন থাকি তবে আমাদের নবলব্ধ রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ ব্যর্থ প্রমাণিত হবে'।[৬৬]

তিনদিনের আলোচনা-অনুষ্ঠানে সাহিত্য সংস্কৃতি-ইতিহাস বিষয়ক অনেকগুলি প্রবন্ধ পঠিত হয়। প্রবন্ধগুলি ধর্মীয় তথা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত। এগুলির মধ্যে প্রধান ছিল সিপাহী বিপ্লবের পটভূমি /আবদুল মওদুদ/, সাহিত্যে জাতীয় চেতনা / দেওয়ান আবদুল হামিদ/,

৬৪। দৈনিক আজাদ, ১১.৩.৫৭
৬৫। সাপ্তাহিক সৈনিক, ৫.৪.৫৭ ৬৬। ঐ

Dhaka University Institutional Repository

সিপাহী বিপ্লবের পটভূমি (হাসান জামান), পাকিস্তান আন্দোলনে ইসলামের প্রভাব (ডঃ গোলাম মোয়াজ্জেম চৌধুরী), আশা নিরাশার যুগ, ১৯০৬-১৯৩৬ (সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী), বাংলা সাহিত্যে জাতীয় চেতনা (কাজী দীন মোহাম্মদ), বাংলা সাহিত্যের মুসলিম অবদান (আমিনুল ইসলাম), সিপাহী জিহাদোত্তর মুসলিম রেনেসাঁ (আশরাফ ফারুকী), ও পাকিস্তান আন্দোলন (আব্দুল গফুর)।[৬৭]

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আজাদী সংগ্রামের পটভূমিকায় নজরুল ইসলাম ও ফররুখ আহমদ প্রমুখ কবির রচিত সঙ্গীত সমবায়ে একটি গীতিবিচিত্রা পরিবেশিত ও আসকার ইবনে শাইখের নাটক (১৮৫৭) অভিনীত হয়। তাছাড়া ছিল কবি সম্মেলনী। এতে বেগম সুফিয়া কামাল, আহসান হাবীব, মোঃ মাহফুজুল্লাহ, আশরাফ সিদ্দিকী প্রমুখ অংশ নেন। অনুষ্ঠানের শেষের দিন অংশগ্রহণকারী সুধীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান শত বার্ষিকী কমিটির পক্ষ থেকে অধ্যাপক মাহফুজুল হক। অনুষ্ঠান সম্পর্কে তিনি বলেন, যে-সমস্ত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ রক্ষার্থে সিপাহী বিপ্লব সংঘটিত ও পরবর্তীকালে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তার পুনরুজ্জীবনের প্রয়াসই ছিল অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য।[৬৮]

তিন

রওনক সাহিত্য-সংস্থা

১৯৫৮ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে আবুল কালাম শামসুদ্দিন, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ ও মতীনউদ্দিন আহমদ মিলে 'রওনক' নামক একটি সাহিত্য-সংস্থা গঠন করেন। সংস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল 'পাকিস্তানের জাতীয় ভিত্তিতে তমদ্দুন গঠনে সহায়তা করার জন্য সর্বপ্রকার সাহিত্যিক ও তামদ্দুনিক প্রচেষ্টা চালানো'।[৬৯] সংস্থাকে তাঁরা সমমতাবলম্বী শিল্প-দৃষ্টিসম্পন্ন সদস্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন। প্রথম কার্যপরিষদে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (সভাপতি),

---

৬৭। ডঃ হাসান জামান (সম্পাদিত), কোথায় কি আছে, শতাব্দী পরিক্রমা, (ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৫)

৬৮। সাপ্তাহিক সৈনিক, ৫.৪.৫৭

৬৯। দৈনিক আজাদ, ২৭.৪.৫৮

Dhaka University Institutional Repository

ইব্রাহিম খাঁ ও গোলাম মোস্তফা (সভাপতি) এবং আবুল কালাম শামসুদ্দিন (সম্পাদক) ছিলেন। তাঁরা কর্মসূচি হিসাবে নিয়েছিলেন প্রতিমাসে একজন সদস্যের বাসায় একটি করে আলোচনা অনুষ্ঠান করার। সেখানে একজন সদস্য প্রবন্ধ পড়বেন, অন্য কয়েকজন আলোচনা করবেন। যাঁর বাসায় সভা হবে তিনি উপস্থিত সদস্যদের ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করবেন।[৭০]

১১ই মে প্রথম সভা হয় গোলাম মোস্তফার বাসায়। তিনি 'পাক-বাংলা ভাষা' নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। আলোচনার ধারায় এই সিদ্ধান্ত হয় যে, অতীতের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রজালের ফলে বাংলা ভাষায় হিন্দুভাবধারা সমন্বিত সংস্কৃত শব্দের অনাবশ্যক বাহুল্য ঘটেছে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এদের বর্জন করা আবশ্যক।[৭১] জুলাই মাসের সাহিত্য-সভায় 'পাক বাংলা ভাষার অভিধান' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়েন আবদুর রশিদ ওয়াসেকপুরী। প্রবন্ধ-পাঠক ও আলোচকেরা একমত হন, পাক-বাংলার অভিধান অবিলম্বে প্রণয়ন করা আবশ্যক। তার জন্য প্রচলিত সংস্কৃত শব্দ, পুঁথি সাহিত্য ও আঞ্চলিক লোক সাহিত্যের উপর নির্ভর করা উচিত। প্রয়োজনবোধে অধুনা অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দসমূহ বাদ দিতে তাঁরা সুপারিশ করেন। তাঁরা আরো বলেন, পাক-বাংলা ভাষার অভিধান পাক-বাংলা সাহিত্যের অনুসারী হবে এবং অন্যান্য বাংলা ভাষারও সংস্কার সাধন করতে হবে।[৭২] আগস্ট মাসের সভায় 'পাক-বাংলা সাহিত্যে উপমা' নামক প্রবন্ধ পড়েন খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন। সেদিনের আলোচনা ও প্রবন্ধের সারমর্ম হল, পাক-বাংলা সাহিত্যের উপমা প্রয়োগের প্রচলিত ধারার পরিবর্তন প্রয়োজন, কেননা প্রচলিত উপমাগুলি প্রধানত রাঢ় বাংলার সংস্কৃত রীতি অনুসারী ও পাকিস্তানের জাতীয় তমদ্দুনের পরিপন্থী।[৭৩]

১৯৫৯ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত সভায় ইকবাল ও রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনের উপর আলোচনা হয়। প্রবন্ধ পাঠক গোলাম মোস্তফার মতে, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী, আর ইকবাল জোর দিতেন মানুষ হিসাবে আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার উপর। সেদিনের সভাপতি অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ বলেন, উভয়েই মহৎ কবি ছিলেন, তবে ইকবাল ছিলেন কর্মযোগী এবং সেজন্য তাঁর লেখায় আত্মজাগরণের ডাক খুঁজে পাওয়া যায়না।[৭৪] জুলাই মাসের বৈঠকে আমীর খসরুর

৭০। আবুল কালাম শামসুদ্দিন, অতীত দিনের স্মৃতি, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৮/[illegible] পৃঃ ৩৬৬—৬৯

৭১। দৈনিক আজাদ, ১৩.৫.৫৮ ৭২। ঐ, ২২.৭.৫৮

৭৩। ঐ, ১৯.৮.৫৮

৭৪। ঐ, ১৩.৫.৫৯

Dhaka University Institutional Repository



সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনা হয়। পাক-ভারত উপমহাদেশের কৃষ্টি শাখায় ইসলামী ভাবধারার প্রচার আমীর খসরু থেকেই শুরু হয় এবং পাকিস্তানের এই সন্ধিক্ষণে, যখন সাহিত্য-সংস্কৃতি এক নৈরাজ্যের মুখে আবর্তিত হচ্ছে তখন আমীর খসরু প্রতিষ্ঠার আলোচনা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ছে — এই ছিল সেদিনের আলোচনার সারকথা।[৭৫]

বাংলা পরিভাষার উপর আলোচনা হয় আগস্ট মাসের সভায়। জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও তামদ্দুনিক বুনিয়াদকে স্মরণ রেখে, পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্যের পরিপ্রেক্ষিতে পরিভাষা প্রণয়ন করা দরকার এবং প্রয়োজনবোধে আরবী-ফারসী শব্দ অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত বলে সবাই মত প্রকাশ করেন।[৭৬] বিদেশী সাহিত্য-পুস্তক আমদানীর উপর আলোচনা হয় ডিসেম্বর মাসে। সকলেই বিদেশী সাহিত্য, বিশেষত পশ্চিম বাংলার সাহিত্য-পুস্তক আমদানীর উপর বিধিনিষেধ আরোপের কথা বলেন। কারণ হিসেবে তাঁরা উল্লেখ করেন যে, ঐ জাতীয় পুস্তক পুস্তিকা — যা পাকিস্তানের আদর্শবিরোধী ভাবধারায় পুষ্ট — এদেশের কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের বিভ্রান্ত করে দিচ্ছে এবং পাকিস্তানী লেখক-লেখিকাদের অবহেলিত ও অপরিচিত করে তুলছে।[৭৭]

ধীরে-ধীরে সংসদের কাজকর্ম অনিয়মিত হয়ে পড়ে। নিজেদের বাসায় সভার আয়োজন করতে অনেকেরই আপত্তি দেখা যায়। অবশেষে এর অকাল-মৃত্যু ঘটে।

সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির অবদান তাৎপর্যপূর্ণ নয়। গুরু গম্ভীর আলোচনার দিক থেকে অগ্রসর না-হলেও আলোচনা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় বিস্তৃত পরিবেশে এর প্রভাব পড়েনি। এদেশের সমাজ রাষ্ট্রে এক বিশেষ পর্যায়ে পাকিস্তানবাদী শিল্পী-সাহিত্যিকরা কিভাবে সংঘবদ্ধ হবার চেষ্টা করেছিলেন এটুকু মাত্র জানা যায় এই প্রতিষ্ঠানটির ইতিহাস থেকে।

---

৭৫। ঐ, ১৫.৭.৫৯

৭৬। ঐ, ১১.৮.৫৯

৭৭। ঐ, ১৫.১২.৫৯

Dhaka University Institutional Repository



## চার

### ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে পূর্ব বাংলার সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা

১৯৫৮ সালের প্রথম দিকে রকফেলার ফাউন্ডেশান পূর্ব বাংলার সমসাময়িক সাহিত্য-সম্পর্কে পর্যায়ক্রমিক আলোচনার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৩৫০০ ডলার সাহায্য দেয়।[৭৮] ইংরেজি বিভাগ এই দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই জন্য প্রতিমাসে একটি করে মোট আটটি আলোচনা সভা বসেছিল। প্রতি সেমিনারে এক বা একাধিক প্রবন্ধ পঠিত ও তার ভিত্তিতে আলোচনা হত। অধিবেশন হত বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হল মিলনায়তনে, আলোচনা চলত ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষায়।

সাতাশে ফেব্রুয়ারী আলোচনা সভা আরম্ভ হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিম এর উদ্বোধন করেন। তিনি এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন যে, আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যের মূল্যায়ন করা, বিদেশে বাংলা সাহিত্যের পরিচয় ঘটানো এবং অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধনই সেমিনার অনুষ্ঠানের মূল প্রেরণা।[৭৯]

সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধগুলি ছিল 'বাংলা সাহিত্যে ভাবালুতা', 'সমকালীন কথাসাহিত্যে ও নাটকে ভাবালুতা', 'বাংলা কথা সাহিত্যে সমাজচেতনা', ~~বিমূর্ত~~ 'বিমূর্ত চিন্তার বাহন হিসাবে বাংলা গদ্য', The present standard of Bengali criticism in East Pakistan, Qualities and Deficiencies of Poetry in East Pakistan, Satire in Bengali Prose and Poetry, The treatment of sex in Fiction, Qualities and deficiencies of contemporary East Pakistan Drama, contemporary Fiction in East Pakistan and in the United States, এবং The Divergence Between contemporary writing in England and East Pakistan. প্রবন্ধ পাঠে অংশ নিয়েছিলেন আবু রুশদ মতিনউদ্দিন, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, নূরুল মোমেন, রশিদ করিম, আবুল হোসেন, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ডঃ সরওয়ার মুর্শিদ, হাসান জামান, মুনীর চৌধুরী, আশকার ইবনে শাইখ, জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, কবীর চৌধুরী ও ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন।[৮০]

---

৭৮। দৈনিক আজাদ, ১৪.১.৫৮

79। S. Sajjad Hussain (Editor), Report : Dacca University Seminars on contemporary Writing in East Pakistan (Dept. of English, Dacca University), p. 2

80। Report.

Dhaka University Institutional Repository



এই সেমিনারগুলিতে মোটামুটিভাবে এদেশের প্রতিনিধিস্থানীয় সকল সাহিত্যিক ও সাহিত্যসমালোচক অংশ নিয়েছিলেন এবং সমসাময়িক সাহিত্যের বিভিন্ন দিকে নিয়ে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন। এক একজন এক এক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়কে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করেছিলেন এবং সাহিত্যের সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। তবে আলোচনা ছিল সর্বাংশে একাডেমিক পর্যায়ের এবং তাঁরা সাহিত্যের মূল সমস্যাকে ধরতে চেষ্টা করেননি; যদিও কোনো কোনো আলোচনায় সে-প্রসঙ্গ এসে পড়েছিল। সমকালীন কবিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রবন্ধলেখক মিজানুর রহমান সিদ্দিকী পূর্ব বাংলার কবিতার ঐতিহ্য নিয়ে বিতর্কের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছিলেন যে, এ বিষয়ে বাদানুবাদ নিরর্থক, কেননা ইসলাম ধর্মী ধারা ও বহমান বাংলা ঐতিহ্যের ধারার সার্থক সমন্বয়ের উপরই এদেশের সাহিত্যের মুক্তি নিহিত।[৮১] তাঁর এ বক্তব্য অনেকেরই মনঃপূত হয়নি।

> Mr. Hassan Zaman and Mr. Abdur Rashid Khan felt that the controversy over diction, far from being futile, was serving to crystalige thought on the relation between national and literary Tradition. The aim of the writers in East Pakistan was, or, in the opinion of some of the speakers, ought to be the creation of a characteristically national literature and to this broad purpose everything else was to be submitted.[82]

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে পূর্ব বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ ও প্রভাব বিস্তার করছে, এ-সেমিনার থেকে তার কৌতূহলজনক খবর পাওয়া যায়।

---

৮১। ঐ, পৃঃ ১৭-২০ ।

৮২। ঐ, পৃঃ ১৭ ।

Dhaka University Institutional Repository



পাঁচ

## পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন : চট্টগ্রাম *

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য মাহফিলের উদ্যোগে চট্টগ্রামে, 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রামের 'বিখ্যাত দেশকর্মী, বিরাট ব্যবসায়ী' রফিউদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী, তাঁর পুত্র সাইফুদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী ও 'বিজনেস ম্যাগনেট' এ,কে,খান এই সম্মেলনের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন।[৮২ক] সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন আবদুর রহমান।

সম্মেলনের পটভূমি বর্ণনা করতে গিয়ে আবদুর রহমান তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন :

> যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে সাহিত্য ও সংস্কৃতি, শিল্প ও সঙ্গীত, ভাস্কর্য ও চিত্রাঙ্কনে ইতিপূর্বে যে ইসলামিক আদর্শ রূপায়নের প্রবৃত্তি চলছিল, তা বাধাপ্রাপ্ত হল। তথাকথিত স্বাধীন চিন্তানায়কদের সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার ছদ্মাবরণে বৃহত্তর বাংলার সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক একীকরণের অভিশপ্ত প্রচেষ্টা জোরদার হয়ে ক্রমশঃ পাকিস্তানী আদর্শকে ম্লান ও দুর্বল করতে লাগল। ঢাকা, কুমিল্লা ও কাগমারীতে পাকিস্তানের স্বাতন্ত্র্যের আদর্শকে চিন্তা ও কর্মের সমুদয় ক্ষেত্রে খতম করার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ করে আনা হয়েছিল। এর প্রতিবাদে আমরা জনকয়েক মিলে স্থানীয় কর্মীদের উৎসাহে ও সহযোগিতায় পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামের জন্মভূমি ইসলামাবাদ বা চাটগাঁয়ে পাকিস্তানী আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রকৃত দেশহিতৈষীদের কি করা কর্তব্য, সে সম্বন্ধে উপায় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনদিন ব্যাপী এক সাহিত্য মাহফিলের আয়োজন করি। ... পূর্ব পাকিস্তানের

---

* বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন, সাঈদ-উর রহমান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম, পাণ্ডুলিপি, খণ্ড ৬, ১৯৭৬, পৃঃ ৯১-১১৮ ।

৮২ক। মইনুদ্দীন, চট্টগ্রামে সাড়ে তিনদিন, মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ ১৩৬৫, পৃঃ ৮৯৮ ।

Dhaka University Institutional Repository



সমগ্র পাকিস্তানী আদর্শে বিশ্বাসী লেখক লেখিকা, কলা-শিল্পী ও গুণীজনের নানাক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ এতে যোগদান করেন।[৮৩]

যাত্রামোহন সেন হলে অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। হলের প্রবেশপথে আল্লাহ, রসুল, ইকবাল ও কায়েদে আজম তোরণ নির্মিত হয়েছিল। পেছনে পূর্ব পাকিস্তানের বিরাট মানচিত্র, নজরুল–ইকবাল–কোরান–হাদিস থেকে উদ্ধৃতি ও বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা চিত্র দিয়ে মঞ্চ সজ্জিত ছিল। আলোচনায় ছিল চারটি শাখা — পাক বাংলার আদর্শ ও সাহিত্য, পাক-বাংলার ভাষা ও কালচার, পাক-বাংলা মনন ও পাক-বাংলার চিত্রশিল্প। মাওলানা আকরাম খাঁ ছিলেন সম্মেলনের মূল সভাপতি।[৮৪]

১লা মে বিপুল জনসমাগমের মধ্যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সম্মেলনের মূল আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের জন্যই পাকিস্তান হাসেল করা হয়েছিল, কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর সবাই সে-আদর্শ ভুলে ব্যক্তিগত উচ্চাশা চরিতার্থ করার দিকে মন দিল। চিরদিনের 'সম্পদবঞ্চিত' সাহিত্যসেবকরাও 'মস্কো অভিমুখী কাফেলার মিছিলে' শামিল হয়ে বামপন্থী দলে ভিড়ে গেলেন, কিন্তু তাঁদের স্মরণ রাখতে হবে পাকিস্তানের আদর্শের কথা। এখন সবাইকে নিজ নিজ ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের ধারণা ত্যাগ করে পাকিস্তানের আদর্শে ভাবতে হবে। কারণ 'এখন আমি আর বাঙালী নই।' 'আমি মুসলমান এবং আমি পূর্ব পাকিস্তানী'। এই পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্য-সাধনা করতে তিনি সাহিত্যিকদের প্রতি আহ্বান জানান।[৮৫] অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকও দেশে প্রকৃত জাতীয় সাহিত্য গড়ে না উঠায় ও বিদেশী ইজমের অনুপ্রবেশে দুঃখ ও শঙ্কা প্রকাশ করেন এবং এই সম্মেলনের মাধ্যমে 'দিকে দিকে অপরিণামদর্শী ও জাতীয়তার বিরোধী তথাকথিত যুবক-তরুণ সম্মেলনের' উদ্যোগকে প্রতিরোধ করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন।[৮৬]

---

৮৩। আসদুর রহমান, যতটুকু মনে পড়ে /চট্টগ্রাম ১৯৭৯/, পৃঃ ৪৮২ ।
৮৪। আজাদ, এপ্রিল ২৪, ১৯৫৮, এবং মঈনুদ্দীন, চট্টগ্রামে সাড়ে তিনদিন, পৃঃ ৮৯৯ ।
৮৫। মাসিক মোহাম্মদী, সাহিত্য সম্মেলন সংখ্যা, পৃঃ ৮৫৭–৬০ ।
৮৬। ঐ, পৃঃ ৮৬৪ ।

Dhaka University Institutional Repository



সম্মেলনে কবি গোলাম মোস্তফা 'পাক বাংলার কাব্য সাহিত্য' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধে তিনি বাংলা ভাষার উদ্ভব, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পূর্ব বাংলার সমসাময়িক কবিতা, ভবিষ্যতের সাহিত্যের ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা করেন। বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, বাংলা ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষা নয়, বরং সেমিটিক জাতীয় ভাষা এবং 'যেহেতু সেমিটিক, কাজেই মুসলমানদের ধ্যানধারণা ও আদর্শ এ ভাষার সঙ্গে বিজড়িত আছে'। তিনি আরো বলেন, মধ্যযুগে মুসলমান কবিরা আরবী ফারসী শব্দ বহুল পরিমাণে ব্যবহার করে এক চমৎকার কাব্যভাষা নির্মাণ করেছিলেন এবং 'আর কিছুর জন্য না হোক বাংলা ভাষাকে এমন চমৎকার ইসলামী রূপ যে তারা দিতে পেরেছেন এই কীর্তি তাদের অক্ষয় হয়ে থাকবে'। কিন্তু পরবর্তী কালে হিন্দু পণ্ডিত ও ইংরেজ মিশনারীরা এই ভাষা বিকাশকে ব্যাহত করে। বর্তমানে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পুঁথির ভাষার হুবহু অনুকরণ সম্ভব নয়, তবে 'গঙ্গাতীর থেকে পদ্মা-কর্ণফুলীর তীরে আমাদের মুখ ফিরাতে হবে' এবং 'তার উপর ভিত্তি করে আমাদের ভাষাকে মার্জিত পাকিস্তানী রূপ দিতে হবে'। মোট কথা তিনি ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের ভিত্তিতে ঐতিহ্য পুনর্নির্মাণ, ভাষা সংস্কার ও কাব্যবস্তু আহরণের কথা বলেছেন।[৮৭]

> কাজেই আমরা যদি ইসলাম বা পাকিস্তানের আলোকে ও আদর্শে আমাদের সাহিত্য রচনা করি, তাতে অগৌরবের কিছু নেই। আমাদের সাহিত্যের বক্তব্য হবে পাকিস্তানবাদ। এর ভিতরেই সব আদর্শ আমাদের ধরা পড়বে।[৮৮]

সম্মেলনে 'পাক বাংলার কালচার ও ভাষা' নামক একটি প্রবন্ধ পড়েছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। তিনি ইসলামকেই পূর্ব বাংলার সংস্কৃতির একমাত্র নিয়ামক শক্তি হিসাবে গণ্য করেননি। পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব বাংলার কৃষ্টি ও ভাষার পার্থক্য স্বীকার করে নিয়ে পূর্ব বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষা পুনর্গঠনের উপর তিনি জোর দেন। বাঙালীদের ধর্মে ও সমাজ জীবনে বিশ্বাসে-ঈমানে, আচারে-ব্যবহারে, জন্ম-মৃত্যুতে, বিয়ে-শাদিতে, পোষাকে-আশাকে, আদব-কায়দায়, খেলাধূলায়, আর্ট-সাহিত্যে, নাচে-গানে এক গৌরবময় কালচার ছিল। ইংরেজ শাসনে সেটা অবশ হয়ে গিয়েছিল, তার পুনরুদ্ধার ও পরিমার্জনা করে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে

---

৮৭। ঐ, পৃঃ ৭৮৭ – ৯০ ।

৮৮। ঐ, পৃঃ ৭৮৭ ।

Dhaka University Institutional Repository



ভাষা সম্পর্কে তাঁর মত ছিল যে, পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সাহিত্যের ভাষা আলাদা হবে, ভাষা-সাহিত্যের উপর কলকাতার বদলে ঢাকার প্রভাব পড়বে।[৮৯]

> আমি আগেই বলছি আমরার রাজধানীর তথা অন্যান্য শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙালী ভদ্রলোকের কথ্য ভাষা হবে আমরার সাহিত্যের ভাষা। তারা তারার অফিসে-আদালতে, ক্লাবে-বৈঠকখানায়, স্কুলে-কলেজে যে ভাষায় কথা কয়, যে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে, সেইটাই আমরার সাহিত্যের ভাষা। এ ভাষা এখন কর্ষিত হবে।[৯০]

সম্মেলনের আরো একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রবন্ধ ছিল মোহাম্মদ আজরফের 'আমাদের তামদ্দুনীন পুনর্গঠন'। তিনি ভারতবর্ষে ইসলামী আন্দোলনের পর্যায়সমূহ বিশ্লেষণ করে দেখান যে, পাকিস্তানে তিনটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন ক্রিয়াশীল আছে — জামাতে ইসলামী আন্দোলন, তমদ্দুন মজলিসের আন্দোলন এবং বিশ্বভারতী-মস্কোপন্থী আন্দোলন। প্রথম আন্দোলনের প্রবক্তারা শিক্ষা ও চারুকলা সম্পর্কে নীরব থাকায় সে-আন্দোলনের প্রভাব সীমাবদ্ধ; সে-তুলনায় তমদ্দুন মজলিসের আন্দোলন অধিকতর ব্যাপক, আর

> বিশ্বভারতী বা মস্কোপন্থী আন্দোলন — এ রাষ্ট্রের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয় এবং এ আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে মোটেই মঙ্গলজনক নয়।[৯১]

উপসংহারে তিনি ইসলামী ভাবধারা প্রচারের জন্য ফার্সী-উর্দুর মত বাংলাকেও একটি আরবী ভাষায় পরিণত করার আহ্বান জানান।

> ইসলামের বিস্তৃতির ফলে ইসলামী তমদ্দুনের সংস্পর্শে এসে পর ফারসিতে ইসলামী ভাবধারা প্রকাশের জন্য তাকে নতুন ঢং-এ ঢেলে গঠন করা হয়। তার ফলে ফার্সি দ্বিতীয় আরবী ভাষায় পরিণত হয়। তেমনি তুর্কি বা উর্দু তৃতীয় আরবী ভাষায় পরিণত হয়েছে। বাংলাকে তেমনি আর একটি আরবী ভাষায় পরিণত করতে হবে। তবেই আমাদের তামদ্দুনীন পুনর্গঠন সম্ভবপর হবে।[৯১ক]

---

৮৯। ঐ, পৃঃ ৭৬ ।
৯০। ঐ পৃঃ
৯১। ঐ, পৃঃ ৮০২
৯১ক। ঐ

Dhaka University Institutional Repository

সম্মেলনে আরো অনেক প্রবন্ধ পঠিত হয়। সেগুলি হল 'আমাদের সাহিত্যে পাকিস্তানী আদর্শ /ইব্রাহিম খাঁ/, 'আজাদী-উত্তর পূর্ব-পাকিস্তানের কাব্য-সাহিত্য' /আশরাফ সিদ্দিকী/, 'এবার ফিরাও মোরে' /মঈনুদ্দীন/, 'পাক-বাংলা ভাষার লেখ্য ও কথ্যরীতি' /আজহারুল ইসলাম/, 'পাক বাংলা মনন ধারার পটভূমি' /আবুল কালাম শামসুদ্দিন/, 'পাক-বাংলার চিন্তাধারার বিবর্তন' /মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ/, 'আধুনিক পুনর্গঠন' /আবদুস সোবহান খাঁ/, 'সংস্কৃতি সেবীদের প্রতি' /মাহবুবুল হক/, 'বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা' /সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী/, 'রেনেসাঁর পথে' / মোজাফ্ফর আহমদ/ 'পূর্ব-পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক পটভূমি' / মযহারুল ইসলাম/, 'সঙ্গীত ও জাতীয় জীবন' /আবদুল মান্নান/, এবং 'আমাদের শিল্পকলা' /জয়নুল আবেদীন/।

সম্মেলনে বিভিন্ন প্রস্তাব নেওয়া হয়। 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য মজলিস' নামক স্থায়ী সংস্থা গঠন করা, সরকারী সাহায্য পুষ্ট সমবায় প্রকাশনীর মাধ্যমে দেশের সাহিত্যিকদের গ্রন্থাদি প্রকাশ করা, বাংলা একাডেমীর মাধ্যমে উপযুক্ত সাহিত্য গ্রন্থাদির জন্য প্রতি বছর পুরস্কার প্রদান করা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মিশনে সাহিত্যিকদের অন্তর্ভুক্ত করা, মুনাফা-শিকারী প্রকাশকদের শোষণ ও প্রতারণা থেকে সাহিত্যিকদের রক্ষা করা — প্রভৃতি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৯২]

৫ই মে সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশন বসে। মাওলানা আকরাম খাঁ সুধীজনের সকল ও সম্মেলনের প্রস্তাবসমূহ কার্যকর করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান ও দোয়া করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে বক্তৃতা দেন।[৯৩]

ঢাকা সম্মেলনের একটি সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছে এদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি চিন্তায়। সম্মেলনে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেকটা বৈচিত্র্য ছিল। কেউ কেউ বলেছিলেন দেশ-কালের ঊর্ধ্বে উঠে ইসলামের মৌলিক আদর্শগুলির ভিত্তিভূমিতে

---

৯২। আজাদ, মে ৭, ১৯৫৮।

৯৩। ঐ

Dhaka University Institutional Repository



দাঁড়িয়ে সংস্কৃতি-সাধনার কথা, যেই জীবনাদর্শের 'স্বপ্নসৌধে' আকৃষ্ট হয়ে ইকবাল-কায়েদ পাকিস্তানের দুর্গম সাধনায় লিপ্ত হয়েছিলেন', কেউ প্রয়াস করেছিলেন বাংলাকে নির্মাণ করতে এক নতুন আরবী ভাষারূপে, আবার কেউ-কেউ মনে করেছিলেন পশ্চিম বাংলার সাহিত্য প্রভাব মুক্ত হয়ে পূর্ব বাংলার জনজীবনের ভিত্তিতে রচিত হবে এদেশের সাহিত্য এবং সেজন্য সৃষ্টি করতে হবে এক নতুন সাহিত্যিক-ভাষার। সম্মেলনের মাধ্যমে এই চিন্তাধারার এক সমন্বিত রূপের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পশ্চিমবাংলার সাহিত্যাদর্শ থেকে পৃথক থেকে, এদেশীয় ঐতিহ্যের ও জীবনাচরণের যেই উপকরণগুলি মুসলমানদের আচার-বিশ্বাসের পরিপন্থী নয় সেগুলির ভিত্তিতে গড়ে তুলতে নতুন সাহিত্যিক আদর্শ — 'পাক-বাংলা' সাহিত্যাদর্শ।

> এছলাম পাকিস্তানবাদের মূল ধারায় আবেহায়াতের যে অমৃত যুক্ত করিয়া দিয়াছে, তা হইতে আমাদের বিচ্যুতি চলেনা। সে বিচ্যুতির অর্থ আত্মহত্যার শামিল। চাটগাঁও সম্মেলনের বিভিন্ন ভাষণে, বিভিন্ন প্রবন্ধে ও আলোচনায় বৈচিত্র্য আছে যথেষ্ট। ... কিন্তু তাদের সকল বৈচিত্র্য বিভিন্নতাকে ছাপাইয়া যে সুরটি পাঠকের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, তা হইল পাক বাংলার বৈশিষ্ট্যের কথা, তার স্বাতন্ত্র্যের কথা ও তার সিরাতুল মোস্তাকিমের কথা। এই ঘোষণার আজ প্রয়োজন ছিল।[১৪]

---

১৪। সাহিত্য সম্মেলন সংখ্যা, পৃঃ ৭৫০-৫১।

Dhaka University Institutional Repository



## আলোচ্য পর্বের কবিতার গতি-প্রকৃতি

এ-সময়ে প্রকাশিত কাব্যগুলির এক উল্লেখযোগ্য অংশের পটভূমি ধর্মীয় ও পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ। কাব্যগুলি হচ্ছে এস,কে,এম, মুনীর আলীর 'আবির্ভাবে পাকিস্তান' /১৯৫৫/, গোলাম মোস্তফার 'বনি আদম' /১৯৫৮/, তালিম হোসেনের 'দিশারী' /১৯৫৬/, আ,ন,ম, বজলুর রশীদের 'মধুর্ব' /১৯৫৬/, আবদুল লস্করের 'আমাদের আজাদী' /১৯৫৬/, সনবুলীনের '১৪ই আগস্ট' /১৯৫৬/, মীর আবদুল মতীনের 'আজাদী উৎসবে' /১৯৫৭/, সৈয়দা আসমানতারাবালা সিরাজীর 'তুর্যনাদ' /১৯৫৮/ ও সিরাজুল ইসলাম খানের 'জয়নিশান' /১৯৫৮/। তাছাড়া রয়েছে ইকবালের কবিতার দুটি অনুবাদ ঃ আবুল কালাম মুহম্মদ আবদুল হক কৃত 'রুমুজ-ই-বেখুদী' এবং গোলাম মোস্তফার 'কালাম-ই-ইকবাল'।

এই কাব্য গুলোর অধিকাংশই শৈল্পিক মানদণ্ডে গণনীয় নয়, ব্যতিক্রম শুধু গোলাম মোস্তফার 'বনি আদম' এবং তালিম হোসেনের 'দিশারী'।

বনি আদম এর পরিকল্পনা মহাকাব্যিক কিন্তু শৈল্পিক অনুভূতি কাহিনী কাব্যিক। আল্লাহ কর্তৃক আদম-হাওয়ার সৃষ্টি, শয়তান কর্তৃক নতি-স্বীকারে অস্বীকৃতি ও তার চক্রান্তে আদম হাওয়ার মর্ত্যে আগমন — বাইবেল ও কোরানের এই সুপরিচিত কাহিনীই বনি আদম এর বিষয় বস্তু। দিশারীর শিল্পমূল্য উৎকৃষ্টতর। জমাজী বেগকোঁ [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনের সাফল্যের যে-সম্ভাবনায় কবি প্রাক্-পাকিস্তান আমলে বিহ্বলিত ছিলেন, তার স্পর্শে কবিতাগুলি প্রাণবন্ত। সংকলিত কবিতাগুলি সেকালেরই রচনা। হযরত মোহাম্মদ /সাঃ/-ই কবির দিশারী। তাঁর প্রদর্শিত পথেই মানবতার প্রকৃত মুক্তি ও কল্যাণ আসতে পারে বলে কবির বিশ্বাস। বিভিন্ন কবিতায় তাঁর সে বিশ্বাস সরল আবেগে উৎসারিত হয়েছে। এই কাব্যের পাকিস্তান-বিষয়ক কবিতাগুলিতে পাকিস্তান আদর্শ রাষ্ট্র হবে বলে কবি উল্লেখ করেছেন।

আমাদের অভিশাপ
পরাধীনতার পাপ
পাকিস্তানের হাম্মামে ধুয়ে হয়ে যাবে পাক সাফ।
কাফেলা চলেছে বরাবর সেই পাকিস্তান —
ইসলাম যার অবলম্বন, মুনসেফ যার পাক কোরআন।[১৪]

ইকবালের কবিতা অনূদিত হয়েছে প্রচলিত সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেই। গোলাম মোস্তফা বলেছেন, পাকিস্তানীদের 'আধুনিক সংগঠনের পক্ষে তাঁর চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, আদর্শ ও পয়গামের খুবই প্রয়োজন। ... তাঁর চিন্তা ও ভাবের আর্শিতে জাতির আকাঙ্ক্ষা প্রতিবিম্বিত হইয়াছে'।[১৪ক]

অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী ধারার পর্যায়ভুক্ত করা যায় বেশ কয়েকটি কাব্যকে। এগুলির মধ্যে রয়েছে আশরাফ সিদ্দিকীর 'বিষকন্যা' /১৯৫৫/, 'সাত ভাই চম্পা' /১৯৫৫/ ও 'উত্তর আকাশের তারা' /১৯৫৮/, মুযহারুল ইসলামের 'মাটির ফসল' /১৯৫

---

১৪। পাকিস্তান, দিশারী (ঢাকা: মৌসুমী পাবলিশার্স), পৃঃ ৩৫

১৪ক। অনুবাদকের আরয, কালাম-ই-ইকবাল।

Dhaka University Institutional Repository



এম,এ, হাফিজের 'চৈত্রের দুপুর' /১৯৫৫/, সানাউল হকের 'নদী ও মানুষের কবিতা' /১৯৫৬/, মঈনুদ্দীনের 'পালের নাও' /১৯৫৬/, 'আর্জমান' /১৯৫৮/ ও 'হে মানুষ' /১৯৫৮/, মতিউল ইসলামের 'সপ্তকন্যা' /১৯৫৭/, সুফিয়া কামালের 'মন ও জীবন' /১৯৫৭/, আবদুল খালেকের 'মাটি ও মানুষ' /১৯৫৮ এবং হরিনারায়ন নন্দীর 'আকাশ মাটি মানুষ' /১৯৫৮/। কাব্যগুলির নাম থেকে বোঝা যায় মাটি, মানুষ ও প্রকৃতি — এই ত্রিকোণ পৃথিবীই কবিদের মূল অবলম্বন। মুহম্মদুল ইসলাম তাঁর কাব্যের ভূমিকায় বলেছেন: 'আকাশ আর মাটি — মাঝে বিচিত্র জগত। মাটির শ্রেষ্ঠ জগত মানুষ। একান্তভাবেই মাটিতে দাঁড়িয়ে এই মানুষ আর নীলাময় বিশ্বপ্রকৃতিকে আমি দেখতে চেষ্টা করেছি'।[১৫৫] সানাউল হকের অভীষ্ট দেশকে ও দেশের মানুষকে আবিষ্কার এবং নিজের চেতনায় তার অর্জন। তিতাসের তীরে ছায়াশীতল গ্রামের ও তার মানুষদের যে-ছবি তাঁর বাল্যকালের মনে চিরকালের জন্য সুস্থির আবেশ নিয়ে মুদ্রিত হয়ে গেছে সে-অভিজ্ঞতাই তার কবিতার ভিত্তিভূমি। 'মন ও জীবন' কাব্যে সুফিয়া কামাল ধারণ করেছেন বিশ্বপ্রকৃতি, তার বিপুল বৈচিত্র্য এবং দুঃখ তাপদগ্ধ বিত্তসংগ্রামশীল মানুষের আবেগ-অনুভূতিকে। এম,এ, হাফিজের দৃষ্টি প্রধানত নিরন্ন শোষিত মানুষের সংগ্রামের দিকে। শোষণের অবসান তিনি কামনা করেন প্রবলভাবে।

আলো দেখা যায় ক্ষুধার মিছিল
অস্থি কংকাল-সার যেন প্রেতমূর্তি।
চারিদিকে ফুঁসিছে ক্ষুব্ধ রোষ
সভ্যতার সেতুজাল ছিন্ন করে।

/ইতিহাস/

অপর পক্ষে আশরাফ সিদ্দিকী 'উত্তর আকাশের তারা'তে রোমান্টিক — যে রোমান্টিকতা আধ্যাত্মিকতার কাছাকাছি। তাঁর দৃষ্টি উত্তর আকাশের ধ্রুব নক্ষত্রের দিকে। বিভিন্ন কবিতায় এটি মনুষ্যত্ব, শান্তি ও সৌন্দর্যের পূর্ণতার প্রতীক হিসাবে উপস্থাপিত।

---

১৫৫। (ঢাকা: নিপ্যাকত পাবলিসিং কোং, ১৯৫৩)

Dhaka University Institutional Repository



যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী ঐক্যবদ্ধ শক্তি যে-পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, পরবর্তীকালে তা ভেঙে যায়। তার পরিবর্তে রাজনৈতিক সন্ত্রাস, শঠতা, সামাজিক দুর্নীতি সর্বব্যাপী হয়ে দাঁড়ায়। এই পটভূমিতে জন্ম নেয় ব্যঙ্গ কবিতার একটি ধারা। অনেক ব্যঙ্গ কবিতা রচিত হলেও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে শুধু আব্দুল হাকিমের 'আমাজিন নামা' /১৯৫৬/। বইয়ের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন :

> এই দেশের সাধারণ মানুষ আজ আর কাঁদেনা। সমস্যা বিপীড়ন — জর্জরিত জীবন নিয়ে সত্যাবর্জিতের পিচ্ছিল পথে দাঁড়িয়ে তারা আজ সব কিছুকেই কেমন সহজ করে। একটা বিরাট জাতির এই সর্বব্যাপক অধঃপতন শুধু রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতা, সন্ত্রাস এবং ভীরুতা ও হতাশা দিয়ে ভরা, আর তারই এক জ্বালা-করুণ স্বাক্ষর এই আমাজিন নামা।

আমাজিন-নামার কবিতাগুলি শিল্পগুণসমৃদ্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

# তৃতীয় অধ্যায়ঃ ১৯৫৮–১৯৬৫

Dhaka University Institutional Repository



## রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ

### এক

### ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি

প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা সামরিক আইন জারির কারণ হিসাবে তার ৭ই অক্টোবরের বেতার-ভাষণে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, রাজনীতিবিদদের অসাধুতা, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি, পররাষ্ট্র নীতির ব্যর্থতা, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ধর্মের যদৃচ্ছা ব্যবহার প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেছিলেন। তাছাড়া, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র কাজের অনুপযোগী ও গোঁজামিলে ভর্তি, ১৯৫৯ সালের প্রস্তাবিত নির্বাচনে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও দুর্নীতির হবার আশঙ্কা, নির্বাচনের দ্বারা স্থায়ী ও শক্তিশালী সরকার গঠনের অনিশ্চয়তা-র কথাও তিনি উল্লেখ করেছিলেন।[১]

ইস্কান্দার মীর্জার এধরনের অভিযোগ মূলত তাঁর ক্ষমতা দখলের সাফাই এর নামান্তর। তাই প্রকৃত কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করতে হবে অন্যভাবে।

১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের ফলে যেসব নেতা পাকিস্তানে হিজরত করেছিলেন তাঁদের নিজেদের কোনো নির্বাচনী এলাকা ছিলনা। প্রত্যক্ষ নির্বাচন হলে তাঁদের সবাইকে রাজনীতি থেকে অবসর নিতে হত। ফলে তাঁরা কোনোদিন আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচন কামনা করেননি, বরং নির্বাচন ও শাসনতন্ত্র ছাড়াই দেশ শাসন করতে চেয়েছিলেন।[২] এই কাজে তাঁরা সাহায্য পেয়েছিলেন আমলা ও সেনাবাহিনীর। জিন্নাহ্‌র অনুসৃত নীতির দরুণ আমলা-তন্ত্র দেশে সর্বেসর্বা হয়ে উঠে এবং এক যুগে তিনজন প্রধান আমলা — চৌধুরী মোহাম্মদ

---

১। Friends Not Masters (FNM) (Karachi, Dacca : Oxford University Press, 1967) Appendix II

২। কামরুদ্দীন আহমদ, 'পূর্ব বাংলার সমাজ ...', পৃঃ ৯৮–৯৯।

Dhaka University Institutional Repository



খান, গোলাম মোহাম্মদ ও ইসকান্দার মীর্জা — পাকিস্তানের রাজনীতির ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে বসেন।[৩] শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন আমলাদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর যোগসূত্র।

দেশবিভাগের পর বিভিন্ন সময়ে বেসামরিক প্রশাসনের সাহায্যে সামরিক বাহিনী নিয়োগ করার ফলে বেসামরিক ক্ষেত্রে এদের প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। গোলাম মোহাম্মদের মন্ত্রিসভায় দেশরক্ষা মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেছিলেন সেনাবাহিনী প্রধান আইউব খান। তাঁর চেষ্টায় গোলাম মোহাম্মদের মৃত্যুর পর ইসকান্দার মীর্জা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হন। মীর্জা প্রস্তাবিত ১৯৫৯ সালের নির্বাচনের পর প্রেসিডেন্ট থাকতে পারবেন কিনা সন্দেহমুক্ত হতে না-পেরে ষড়যন্ত্র শুরু করেন।[৪]

অভ্যুত্থানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগ ছিল, এমন সন্দেহও কেউ-কেউ করেছেন। সোহরাওয়ার্দীর উপর তাঁদের আস্থা থাকলেও নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি কি হবে, সে-সম্পর্কে তারা নিশ্চিত হতে পারেনি। নির্বাচনের মুখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্পষ্ট সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ পাকিস্তানস্থ আমেরিকার রাষ্ট্রদূত জেমস ল্যাংলি ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে বিচলিত করে তুলেছিল।[৫] আমেরিকান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা /সি,আই,এ/-র সংশ্লিষ্ট থাকার ইঙ্গিত করেছেন আইউবখানের ভ্রাতা মুসলিম লীগের নেতা সর্দার বাহাদুর খানও।[৫ক] অভ্যুত্থানের পূর্বদিন এক জনসভায় তিনি বিদেশী দূতাবাসসমূহের পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।[৫খ] সামরিক আইন জারির পর নিউইয়র্ক টাইমসে এর সমর্থনে সম্পাদকীয় লেখার কথাও এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়।[৬]

---

৩। ঐ, পৃঃ ৯৭।

৪। আবুল মনসুর আহমদ /আমার দেখা রাজনীতির ... / পৃঃ ৫৯০–৯১।

৫। 'আমার সন্দেহ, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হইয়াও আমেরিকানরা এই কারণে এই সময়ে পাকিস্তানের আসন্ন নির্বাচনের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলেন।... এমন কি সি,আই, এর হাত থাকাও অসম্ভব নয়'। আবুল মনসুর আহমদ, পৃঃ ৫৬৫–৬৬।

৫ক। Tariq Ali, (Pakistan : Military Rule ... ) P.88। অন্যান্য D.Wise & T.B. Ross কর্তৃক সি,আই,এর কার্যাবলীর উপর লিখিত CIA : The Invisible Government, (U.S.A., Rahdam House, Inc. 1964) বইয়ে এসম্পর্কে কিছু বলা হয়নি

৫খ। 'No Interferfence in internal affairs', Dawn, Oct. 7, 1958)

৬। New York Times, Octover 12, 1958, cited in Tariq Ali, p. 88

Dhaka University Institutional Repository



অধিকন্তু, ১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে ইরাকে ও সেপটেম্বর মাসে বার্মায় সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখল পাকিস্তানী বাহিনীকে অনুপ্রাণিত করে থাকতে পারে ।

এসব সম্মিলিত কারণেই ৬ই সেপটেম্বর তারিখে পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রবর্তনের জন্য দায়ী । কিছুদিন পরে ২৭-এ অকটোবর তারিখে আইউব খান মীর্জাকে সরিয়ে নিজেই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেন ।

দুই

আইউবখানের কার্যাবলী

পাকিস্তানের বিভিন্নমুখী সমস্যার সমাধান সম্পর্কে আইউব খানের নিজস্ব চিন্তাভাবনা ছিল । ১৯৫৪ সালে লণ্ডনের এক হোটেলে বসে তিনি সেগুলি লিপিবদ্ধ করেন[৭] এবং এ-ও ধারণা করা যেতে পারে যে সময়ই তিনি ক্ষমতাদখলের ভাবনাও করেছিলেন । ক্ষমতাসীন হয়ে তিনি পূর্ণোদ্যমে কাজে অগ্রসর হলেন ।

সামরিক শাসন জারি করে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ, সকল প্রকার রাজনৈতিক দল ও কার্যক্রম বাতিল করা হয় । সকল প্রকার মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখা হয় এবং সভা ও মিছিলের উপর নিষেধাজ্ঞা এবং সংবাদপত্রের উপর সেন্সরশীপ আরোপ করা হয় । অনেক রাজনৈতিক নেতাকে কারারুদ্ধ ও এবডো (Elective Bodies Disqualification ordinance, 1959) আইনের মাধ্যমে প্রায় ৭০০০ নেতা ও কর্মীকে রাজনীতি থেকে সাময়িকভাবে অবসর করানো হয় । সরকারী কর্মচারীরাও অব্যাহতি পেলনা । ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসের মধ্যে ৮১৩ জনকে বরখাস্তসহ ১৬৬২ জনকে নানা শাস্তি দেওয়া হয় ।[৮]

---

৭। FRM, p.186.

৮। Karl Von Vorys, Political Development in Pakistan, (Princeton, New Jersey, USA : Princeton University Press, 1965) pp.189-90.

Dhaka University Institutional Repository



আইউব খান তাঁর এই ক্ষমতাদখলকে 'বিপ্লব' বলে মনে করতেন এবং সবসময় এই নামে আখ্যায়িত করতে চাইতেন। আত্মজীবনীতে 'বিপ্লবের' দুটি উদ্দেশ্যের কথা তিনি বলেছেন: তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত ও দক্ষ করে তোলা। তিনি দাবি করেছেন এক্ষেত্রে তিনি সফল হয়েছেন এবং ছয় মাসের মধ্যে আমলাতন্ত্র তার কর্মদক্ষতা পুনরুদ্ধার করে। দীর্ঘস্থায়ী লক্ষ্য ছিল দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার করে তার উন্নতি সাধন এবং এক পর্যায়ে উপযুক্ত শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করে দেশে শাসনতান্ত্রিক জীবন পুনঃপ্রবর্তিত করা।[৯]

এই লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি কমিশন স্থাপন করা হয়। ১৯৬৫ সালের মধ্যে মোট সাতাশটি কমিশন স্থাপিত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ভূমি সংস্কার কমিশন, আইন সংস্কার কমিশন, জাতীয় শিক্ষা কমিশন, খাদ্য ও কৃষি কমিশন, বেতন ও চাকুরি কমিশন, শাসনতন্ত্র কমিশন ও সামাজিক অনাচার কমিশন। ১৯৪৯ সালের স্থাপিত পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটির রিপোর্ট ও ১৯৫৪ সালের মুসলিম বিবাহ ও পারিবারিক আইন কমিশনের রিপোর্ট ও এসময়ে প্রকাশিত হয়।[১০] এগুলির মধ্যে শেষোক্ত কমিশনের রিপোর্টই বহুলভাবে প্রশংসিত হয়েছে। অন্য কমিশনের রিপোর্ট অনেকক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়নি, প্রকাশিত হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয়নি, আর শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের সুপারিশ বাস্তবায়ন শুরু করার পর সেটি প্রত্যাহার করতে হয়।

কেন্দ্রের সঙ্গে প্রদেশের, বিশেষ করে পূর্ব বাংলা, সম্পর্ক নিয়েও আইউব খান বেশ ভেবেছিলেন। একটি সংহত পাকিস্তানী জাতি গড়তে হলে 'আদিম, অসভ্য ও চির পরাধীন জাতির বংশধর' পূর্ব বাংলার মুসলমানদের সমান অংশীদারত্ব ও সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া দরকার বলে তিনি ১৯৫৪ সালের দলিলে উল্লেখ করেছিলেন; এমনকি আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগ, দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে রেখে বাকিগুলি প্রদেশের এখতিয়ারে দেবার সুপারিশও তার সে দলিলে দেখা যায়।[১১] ১৯৫৮ সালের অবশ্য তার ঐ মনোভাব ছিলনা কিন্তু পূর্বের তুলনায় পূর্ব বাংলাকে কিছু-কিছু সুবিধা দেওয়া হয়। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে

---

৯। FRW, pp. 77-78

১০। Ibid, Appendix V

১১। Ibid, pp. 187-91.

এই প্রদেশে বাঙালী অফিসার নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। ১৯৬৩ সালে কমিশনার অতিরিক্ত কমিশনার, অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার প্রভৃতি ৬১টি পদের মধ্যে ৫৩টিতেই বাঙালীরা অধিষ্ঠিত ছিল।[১২] কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন পানিবিদ্যুৎ উন্নয়ন সংস্থা, রেলওয়ে, পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন সংস্থা প্রভৃতিকে বিভক্ত করে প্রাদেশিক শাখার ভার প্রদেশের নিয়ন্ত্রণে অর্পিত হয়। পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করে জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলকে পুনর্গঠিত করা হয়। পূর্ব বাংলার অসন্তোষের অন্যতম কারণ হিসাবে আন্তঃপ্রাদেশিক অর্থনৈতিক বৈষম্যকে মেনে নিয়ে এর নিরসনেও দৃষ্টি দেওয়া হয়। ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে এ-বিষয়ে একটি ধারা সংযুক্ত করে ১৯৮৫ সালের মধ্যে অর্থনৈতিক সমতা আনয়নের সংকল্প নেওয়া হয়। এ-বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল: কর ও শুল্ক বাবদ প্রাপ্ত অর্থ কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে বন্টনের নীতির পুনর্বিন্যাস, বার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারী খাতে ক্রমশঃ পূর্ব বাংলার জন্য অধিক অর্থ বরাদ্দ করা ও ওয়ার্কস প্রোগ্রামের দ্বারা গ্রামীণ অর্থনীতির বুনিয়াদ শক্ত করে তোলা।[১৩]

কিন্তু প্রকাশ্যত এই পরিবর্তন সত্ত্বেও প্রকৃত অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। বেসরকারী খাতে এই প্রদেশে পুঁজি বিনিয়োগে উন্নতি না হওয়ায়, পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য পরিকল্পনার বাইরে অর্থ বরাদ্দ রাখায় /সিন্ধু অববাহিকার উন্নয়নে ১৯৬০-৭০ সালে ৫৭১ কোটি টাকা/ আন্তঃ-প্রাদেশিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৯-৬৫ সময়ে পূর্ব বাংলার মাথাপিছু বার্ষিক আয় বৃদ্ধি হয় ৩৯ টাকা, পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানে তা হয় ৯১ টাকা।[১৪]

এই পটভূমিতে পূর্ব বাংলার অর্থনীতিবিদগণ ও রাজনীতিবিদেরা দুই প্রদেশের জন্য দুই অর্থনীতির তত্ত্ব প্রচার করতে থাকেন এবং ধীরে ধীরে এই প্রদেশে এর প্রতি সমর্থন বৃদ্ধি পায়।[১৫]

জাতীয় সংহতি জোরদার করার আরো যে-সমস্ত পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পূর্ব বাংলা থেকে কিছু কৃষক পরিবারকে পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাস করতে

---

১২। Khalid B. Sayeed, The Political system of Pakistan, (Boston: Houghton Mifflin, 1967), pp. 154-55, cited in Rounaq Jahan, Pakistan : Failure in Nation Integration, (Dacca : Oxford University Press 1973) pp. 101-2.

১৩। Rounaq Jahan, pp. 67-68.

১৪। মতিলাল পাল, 'সংলাপে: অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত', রক্তাক্ত বাংলা, (মুক্তধারা: ১৯৭২) পৃ: ১৫৫

১৫। Rounaq Jahan, pp. 85-89.

Dhaka University Institutional Repository



নিয়ে যাওয়া, জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার (স্থাপিত ১৯৫৯ সনের জানুয়ারী) মাধ্যমে জাতীয় সংহতি উদ্দীপক বই পুস্তক প্রকাশ করা, ছাত্র-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের আন্তঃপ্রাদেশিক ভ্রমণের ব্যবস্থা করা, প্রভৃতি। দুইটি রাষ্ট্রভাষাকে মিলিয়ে একটি জাতীয় ভাষা তৈরীর প্রচেষ্টার কথাও উল্লেখযোগ্য। (এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হয়েছে)।

আইয়ুব খান তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি অনেকদিন ধরে এমন একটি রাজনৈতিক দর্শনের কথা ভাবছিলেন যা পাকিস্তানের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও 'জনগণের প্রতিভার' উপযোগী হবে এবং যা ইসলামের মূল আদর্শের ও ইসলামের ইতিহাসের শিক্ষার পরিপন্থী হবেনা। অনেক ভেবে তিনি দেখলেন, সংসদীয় গণতন্ত্র কার্যকর করার জন্য জনগণের অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত যে-মান থাকা দরকার এদেশে তা নেই, সুতরাং এখানে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকারই অধিকতর উপযোগী ও উপকারী হবে। তিনি আরো লক্ষ্য করলেন শাসকের হাতে প্রভূত ক্ষমতা থাকাই ইসলামের ইতিহাসের ঐতিহ্য। সুতরাং প্রেসিডেন্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, প্রভূত শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার অধিকারী প্রেসিডেন্ট ও প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকারই হবে পাকিস্তানের জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থা।[১৬]

তার পরে চিন্তা করে তিনি মৌলিক গণতন্ত্রের ধারণায় উপনীত হলেন। অভিজ্ঞতা তাঁকে শিক্ষা দিল যে, এদেশের 'অজ্ঞ' জনগণ নিজেদের চারপাশের সাধারণ সমস্যার অতিরিক্ত কিছু বোঝেনা। এদের হাতে শুধু স্থানীয় পর্যায়ে নেতা নির্বাচনের অধিকার দিলে সর্বাধিক সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, জাতীয় স্তরে নেতা নির্বাচনের সুযোগ দিলে বিভ্রান্ত হবার আশঙ্কা বেশি। তাই তিনি মৌলিক গণতন্ত্রকে পাকিস্তানীদের প্রতিভার উপযোগী বলে ঘোষণা করলেন এবং ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে পশ্চিম পাকিস্তানে, ১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাসে পূর্ব পাকিস্তানে 'Pak Jamhuriat Special' ট্রেনে ভ্রমণ করে সর্বত্র এই ব্যবস্থার অভিনবত্ব ও গুণাবলী প্রচার করে বেড়ালেন।[১৭]

---

১৬। F N M, pp. 204-5

১৭। Herbert Feldman, Revolution in Pakistan (London & Oxford University PRESS, 1967), pp. 158-59.

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথমদিকে পুনরায় উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচন সম্পন্ন হয় এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারী এদের ৯৫.৬ শতাংশের আস্থা ভোট পেয়ে আইউব খান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। দুদিন পর 'পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট' হিসাবে শপথগ্রহণ করে শাসনতন্ত্র রচনার জন্য তিনি একটি কমিশন গঠন করেন। কমিশনের কাজের রূপরেখা তিনি নির্দেশ করেন এভাবে ঃ

ক. কেন পাকিস্তানে সংসদীয় গণতন্ত্র সাফল্যে ব্যর্থ হল এবং যেজন্য শেষপর্যন্ত ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বাতিল করতে হল তার কারণ অনুসন্ধান করা এবং কি ব্যবস্থা অবলম্বন করলে ভবিষ্যতে এধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবেনা সেসম্পর্কে সুপারিশ করা।

খ. পাকিস্তানীদের প্রতিভা, তাদের শিক্ষার সাধারণ মান ও রাজনৈতিক বিচার-বুদ্ধি, জাতীয়তার বর্তমান অবস্থা, দেশে অব্যাহত উন্নতির প্রয়োজনীয়তা এবং গত কয়েকমাসে দেশে শাসনতান্ত্রিক ও প্রশাসনিক যে পরিবর্তন হয়েছে তার প্রভাব পর্যালোচনা করে শাসনতন্ত্রের জন্য প্রস্তাব পেশ করা, এবং

গ. সুপারিশগুলি এমন হওয়া দরকার যাতে নিম্নের উদ্দেশ্যগুলি সবচেয়ে ভাল ভাবে সিদ্ধ হয় ঃ এক, এমন গণতন্ত্র সৃষ্টি করা যা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খায় এবং সাম্য ন্যায়-বিচার ও সহিষ্ণুতার ইসলামী আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, দুই, জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি দৃঢ় হয় এবং তিন, একটি শক্তিশালী ও স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৮]

কমিশন রিপোর্ট দাখিল করে ১৯৬১ সালের মে মাসে। এতে প্রভূত ক্ষমতাশালী একজন প্রেসিডেন্টের অনুকূলে মত প্রকাশ করা হয়, তবে আরো বলা হয় তিনি জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন।[১৯] এই রিপোর্টকে পর্যালোচনা করার জন্য একাধিক কমিটি স্থাপন করা হয়। একটি কমিটি পরোক্ষ নির্বাচনের অনুকূলে মত প্রকাশ করে এবং সেটি প্রেসিডেন্টের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়।[২০]

---

১৮। F N M, pp. 210-11

১৯। G.W.Choudhury, (Documents and Speeches ... ) p. 638

২০। Ibid, p. 933

Dhaka University Institutional Repository



মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে জাতীয় পরিষদ এবং মে মাসে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচন সমাপ্ত হয়। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসে জুন মাসে এবং পূর্বদিন সামরিক আইন তুলে নেওয়া হয়। প্রেসিডেন্ট পরিষদে তাঁর নিজস্ব দল গড়তে সচেষ্ট হলেন। রাজনৈতিক দলের অনুপস্থিতিতে সদস্যদের কোন নির্দিষ্ট দল ছিল না, তবে অধিবেশনের শুরুতে তাঁরা প্রদেশের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়েছিলেন।[21] প্রেসিডেন্ট পশ্চিমাঞ্চলের [illegible] সমর্থনের আশ্বাস পেলেন।[22] পূর্বাঞ্চলের অনেক সদস্যও তাঁর সঙ্গে ভিড়তে আগ্রহী ছিলেন কিন্তু এ-প্রদেশে শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা ইতস্তত শুরু করেন। তরুণ সদস্যরা চারটি শর্তের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলাপ শুরু করেন।

ক. পাকিস্তানের সকল অঞ্চলের রাজ-বন্দীদের মুক্তিদান,

খ. শাসনতন্ত্রের গণতন্ত্রায়ন,

গ. শাসনতন্ত্র প্রসঙ্গে যে-সমস্ত আইনকানুন তৈরী হবে এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা গৃহীত হবে তাদের যাথার্থ্য নির্ধারণের ভার হাইকোর্ট ও সুপ্রীমকোর্টের উপর ন্যস্ত করা, ও

ঘ. দেশের বিশেষত পূর্ব বাংলার, সুষম অর্থনৈতিক উন্নতি।[23]

প্রবীণ সদস্যরাও প্রেসিডেন্টের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে চাইলেন। তরুণ সদস্যদের কঠোর শর্তের মুখে তাদের বেশ সুবিধা হল, তবে তাঁরাও চাপ দিয়ে বিশেষ সুবিধা আদায়ে সচেষ্ট হলেন।[24] প্রেসিডেন্ট রাজি হলেন এবং এভাবে আটাশ জন সমর্থক পেলেন। এভাবে তাঁর সমর্থকরা পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেন কিন্তু তা যথেষ্ট প্রমাণিত না হওয়ায় আরো সতের জন পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নিয়োগ করে নিরবচ্ছিন্ন সংখ্যা-গরিষ্ঠতা সৃষ্টি করা হল।[25]

---

২১। Rashiduzzaman, The Pakistan National Assemby under the 1962 Constitution, Pacific Affairs, Winter 1969-70, P. 487.

২২। Karl Von Vorys, P. 246

২৩। Ibid, p. 247

২৪। 'The more senior members, therefore urged the President to make a least some token concessions, otherwise their position in the Province would be extremely precarious! , Ibid.

২৫। Ibid, 248-49.

Dhaka University Institutional Repository



প্রেসিডেন্ট তাঁর শাসনতন্ত্রের আরো অনেক পরিবর্তন করেন। ফলত শেষ পর্যন্ত এটি একটি তাৎপর্যহীন দলিলে পরিণত হল।

> They led to the popular belief in Pakistan that the constitution over which Ayub Khan had mediated for so long was simply a plastic instrument in his hands, to be shaped and moulded by him as circumstandes and convenience might dictate.26

আইউব খানের নয়া রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের পরিবর্তে ক্রমশঃ ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও ভূম্যধিকারী উচ্চমধ্যবিত্তরা রাজনৈতিক নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৪ সালের মৌলিক গণতন্ত্রীদের মধ্যে গ্রামে ৮০.৮৯% ছিল কৃষক ও শহরে ৭৩.৬১% ছিল ঠিকাদার ও ব্যবসায়ী।[২৭] কৃষক গণতন্ত্রীদের ৬৩.২৬% এসেছিল ধনী কৃষক শ্রেণী থেকে, সারা দেশের কৃষকদের মধ্যে যারা ছিল সংখ্যায় ১১%।[২৮] এভাবে দেখা যায়, ১৯৬৪ সালের মধ্যে মৌলিক গণতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে গ্রাম্য ও শহুরে বিত্তশালী শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এর প্রতিক্রিয়া প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের নির্বাচনেও পড়ে। ১৯৫৫ সালে মোট সদস্যের অর্ধেক এসেছিল ব্যবহারজীবী শ্রেণী থেকে, ১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালে সে-সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৬% ও ৪০%। ভূস্বামী ও ব্যবসায়ী শিল্পপতির সংখ্যা এই তিন বছরে ছিল যথাক্রমে ৭.৫%, ১৭.৩% ও ৩৬%।[২৯]

সামরিক সরকার ১৯৫৮ সালে পূর্ব বাংলার জন্য ভূমিরাজস্ব কমিশন স্থাপন করে পরিবার পিছু সর্বোচ্চ জমির পরিমাণ পূর্ববর্তী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ৩৩ একর থেকে ১২০ একরে উন্নীত করে।[৩০] এর ফলে বিলীয়মান আধা-সামন্তবাদী শ্রেণী পূর্ববাংলায় পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে নতুনভাবে বিকশিত হয়।

---

২৬। Herbert Feldman, From Crisis to Crisis, Pakistan 1962-69 (London : Oxford University Press, 1972), pp. 32-33.

27. Rehman Sobhan, Basic Democracies works programme and Rural Development in East Pakistan (University of Dacca; Bureau of Economic Research, 1964), Table 2.5, p. 82.

28. Ibid, Table 2.12, p. 98.

29. Rounaq Jahan, ১৮৬ ও ১৮৭ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত তালিকা থেকে এই তালিকাটি তৈরী করা হয়েছে।

30. FWM, P. 91

Dhaka University Institutional Repository



## তিন

## ছাত্র আন্দোলন

১৯৬২ সালের পূর্বার্ধে নতুন শাসনতন্ত্র জারি হয়ে সামরিক শাসন উঠে যাবে, সামরিক সরকারের এই ঘোষণায় পূর্বদেশের রাজনীতিসচেতন জনগণের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সোহরাওয়ার্দী ঢাকা এসে তাঁর পুরানো সহকর্মীদের সঙ্গে সম্মিলিত কার্যক্রমের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করলেন।[৩১] কিন্তু তিনি করাচী প্রত্যাবর্তন করলে ৩০-এ জানুয়ারী রাষ্ট্রবিরোধী কাজের অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হল।[৩২] এই ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় কয়েক বছর শান্ত থাকার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। পরবর্তী কয়েকদিনে তারা ধর্মঘট ও মিছিল করে, ঐতিহাসিক আমতলায় জমায়েত হয়ে সরকারের নিন্দাসূচক প্রস্তাব নেয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একজন পুলিশের চর ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী মনজুর কাদিরকে নাজেহাল করে। উপাচার্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এক মাসের জন্য বন্ধ করে ছাত্রদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেন। যেদিন সকালে এই নির্দেশ প্রচারিত হল, সেদিন ছাত্ররা দলে-দলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হল, পুলিশের উপর হামলা করল, বাসে আগুন ধরিয়ে দিল, যারা আগুন নেভাতে এল তাদের তাড়া করল এবং প্রথমবারের মত সামরিক শাসন তথা আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে অপমানজনক শ্লোগান দিল। ফলে পুলিশ মিছিলে লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। বহু ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয় এবং সবাইকে সামরিক বিধির ভয়াবহতা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আন্দোলন ব্যাহত হবার কোনো লক্ষণ দেখা গেলনা বরং ঢাকা, বরিশাল, দিনাজপুর, সিলেট, খুলনা, নোয়াখালী ও কুমিল্লায় ছড়িয়ে পড়ে।[৩৩] ধরপাকড়ও বাড়তে থাকে এবং ৭ই ফেব্রুয়ারী ও ৯ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় মোট ২২৯ জনকে গ্রেফতারের খবর পাওয়া যায়।[৩৪]

---

৩১। আতাউর রহমান খান, স্বৈরাচারের দশ বছর, পৃঃ ৬০-৬২ ।

৩২। Karl Von Vorys, pp. 53-54.

৩৩। ঐ, পৃঃ ৫৪-৫৫

৩৪। আজাদ, ফেব্রুয়ারী ৮ ও ৯, ১৯৬২ ।

ছুটির পর ছাত্ররা পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আসে এবং নতুন করে আন্দোলনের প্রস্তুতি নেয়। তখন থেকে তাদের দাবি-দাওয়া একটি নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। বন্দী ছাত্রদের মুক্তি, ছাত্রদের বিরুদ্ধে হুলিয়া প্রত্যাহার, পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন, বাক স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার দান, বন্দী রাজনীতিবিদদের মুক্তি ও বাংলা হরফের রদবদল না-করা প্রভৃতি দাবির ভিত্তিতে এপ্রিল মাসের প্রথমদিকে ধর্মঘট সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে এসব পূরণের জন্য সাতদিনের চরমপত্র দিলে কর্তৃপক্ষ পুনরায় ৩১-এ মে পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি ঘোষণা করে।[৩৫]

ইতিমধ্যে ছাত্রদের দাবিদাওয়া বিশেষত বন্দী ছাত্রদের মুক্তির প্রশ্নে, প্রদেশব্যাপী জনমত প্রবল হয়ে ওঠে। রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী এমন কি কৃষক প্রতিনিধিরা পর্যন্ত বন্দীমুক্তির জন্য দাবি করতে থাকেন, ফলে মে মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে অধিকাংশ ছাত্রকে মুক্তি দেওয়া হয়।[৩৬]

জুন মাসে বিশ্ববিদ্যালয় খুললে কর্তৃপক্ষ যথাসময়ে পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তুতি গ্রহণ করে কিন্তু ছাত্ররা পরীক্ষা বর্জন করে এবং সভা-করে অন্তত একমাসের ব্যবধানে পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করতে ও অবশিষ্ট ছাত্রদের মুক্তি দেওয়ার দাবি জানায়।[৩৭] বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ ১১ই আগস্ট থেকে পরীক্ষার নতুন তারিখ ঘোষণা করে এবং দুইজন ছাত্রের উপর থেকে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে।[৩৮]

আগস্ট মাস থেকে পুনরায় আন্দোলন শুরু হয়। প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই শিক্ষা আন্দোলনের শুরু বলে গণ্য করা হয়। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিল, বর্ধিত ছাত্র বেতন হ্রাস, পাঠ্যপুস্তকের মূল্য হ্রাস, তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স বাতিল এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর প্রবর্তন না করা প্রভৃতি দাবির ভিত্তিতে ১৫ই আগস্ট প্রদেশব্যাপী হরতাল পালন করা হয়[৩৯] এবং ২৮-এ তারিখ পর্যন্ত

---

৩৫। দি পাকিস্তান অবজারভার, এপ্রিল ৫, ১৯৬২

৩৬। ঐ, মে ৪, ১৯৬২

৩৭। দৈনিক আজাদ, জুন ১০, ১৯৬২

৩৮। আজাদ, জুন ১৪ এবং ২৮, ১৯৬২

৩৯। ঐ, আগস্ট ১৭, ১৯৬২

A170569

ধর্মঘট, বিক্ষোভ ও মিছিল অব্যাহত থাকে। ২৩ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আগস্ট মাসের মধ্যে দাবি মানা না-হলে পহেলা সেপ্টেম্বর থেকে পুনরায় আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।[৪০]

এই সময়ে অন্য প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররাও দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলনে নামে। প্রদেশের বিভিন্ন মেডিক্যাল স্কুলকে মেডিক্যাল কলেজে রূপান্তর, মেডিক্যাল স্কুলে ছাত্রভর্তি বন্ধ করা, সর্বশেষ এম বি বি এস কোর্সে ছাত্র সংখ্যা ২৫০ থেকে ৩০০-তে উন্নীত করা, মিটফোর্ড, ময়মনসিংহ ও সিলেট হাসপাতালে সরকারী চিকিৎসকদের পুনর্বহাল করা প্রভৃতি দাবি নিয়ে বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকগণ ১৪ই জুলাই থেকে ধর্মঘট শুরু করে এবং ১০-এ আগস্ট থেকে একজন ডাক্তার ও দুইজন ছাত্র অনশন ধর্মঘটের আশ্রয় নেয়।[৪১] অধিকাংশ দাবি মেনে নেওয়া হলে ৩রা সেপ্টেম্বর ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়। ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের ছয়জন ছাত্রও স্বীকৃতি ও চিকিৎসালয়ের দাবিতে ২৪-এ আগস্ট থেকে অনশন শুরু করে। ৯ই সেপ্টেম্বর প্রাদেশিক সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ও আইনমন্ত্রীর দাবি মানার আশ্বাস দিলে ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়।[৪২]

পহেলা সেপ্টেম্বর থেকে বিচ্ছিন্নভাবে ধর্মঘট শুরু হয়। দশ তারিখে ঢাকা শহরের স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল ও হরতাল পালন করে এবং সতের তারিখের মধ্যে দাবি মানার জন্য সরকারের প্রতি চরমপত্র দেয়।[৪৩] কিন্তু দাবি মানার কোনো সম্ভাবনা দেখা না দেওয়ায় সতের তারিখে প্রদেশব্যাপী হরতাল পালন করা হয়। সেদিন বিভিন্ন স্থানে ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে খণ্ড-খণ্ড সংঘর্ষ ঘটে এবং এক পর্যায়ে পুলিশের গুলিবর্ষণে ইপিআরটিসি (East Pakistan Road Transport Corporation)-এর কন্ডাক্টর গোলাম মোস্তফা নিহত ও আরো ২৫০ জন আহত হয়।[৪৪] পরদিন আহতদের একজন, গৃহভৃত্য কিশোর ওয়াজিউল্লাহ, হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করে।[৪৫] পরদিন এক প্রেসবিজ্ঞপ্তি জারি

---

৪০। আজাদ, আগস্ট ২৪, ১৯৬২
৪১। ঐ, আগস্ট ২১, ১৯৬২
৪২। ঐ, সেপ্টেম্বর ৯, ১৯৬২
৪৩। ঐ, সেপ্টেম্বর ১১, ১৯৬২
৪৪। ঐ, সেপ্টেম্বর ১৮, ১৯৬২
৪৫। ঐ, সেপ্টেম্বর ২০, ১৯৬২

Dhaka University Institutional Repository



করে সরকার এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করলে, নিহতদের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার, পুলিশবর্ষণের কারণ অনুসন্ধানের জন্য তদন্ত কমিশন স্থাপন ও ছাত্রদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের না-করার প্রতিশ্রুতি দিলে সাতাশ তারিখ থেকে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।[৪৬] কিন্তু সেদিন চট্টগ্রামের সরকার হাটে ছাত্রদের উপর পুলিশবর্ষণের সংবাদ ঢাকায় এসে পৌঁছলে চব্বিশ তারিখ থেকে পুনরায় ধর্মঘট শুরু করা হয়। চট্টগ্রামের ব্যাপারেও তদন্ত কমিশন গঠনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলে আটাশ তারিখ থেকে ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[৪৭] সেদিন এক সভায় ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক এনায়েতুর রহমান প্রকাশ করেন যে, গত আট মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ৯৮দিন পুরোপুরি ক্লাশ হয়েছে এবং ১৯০০ ছাত্রকে বিভিন্ন সময়ে বন্দী করা হয়েছে।[৪৮] একত্রিশ তারিখে কেন্দ্রীয় সরকার দুই বছরের ডিগ্রী কোর্স পুনঃপ্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়।[৪৯]

সতেরো সেপ্টেম্বরের পর থেকে ঢাকার অন্যান্য বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ধর্মঘট শুরু করে। ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্রগণ ১৮ই সেপ্টেম্বর থেকে একটানা ধর্মঘট চালিয়ে যায়, ১৯-নভেম্বর তারিখে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের দপ্তরে আক্রমণ করে এবং ২৭-এ তারিখে জনশিক্ষা পরিচালকের অফিসের সামনে ধর্মঘট করে। ফলে জনশিক্ষা পরিচালক অনির্দিষ্ট কালের জন্য ইনস্টিটিউটে ছুটি ঘোষণা করেন। ২৭ তারিখের মধ্যে গ্রেফতার হয় মোট ১০৮ জন ছাত্র।[৫০] অনুরূপ পরিস্থিতিতে তেজগাঁ কৃষি কলেজও অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়।[৫১] টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের ছাত্ররাও ধর্মঘট করে এবং ১লা ডিসেম্বর তারিখে তাদের ধর্মঘটের উনপঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হয়।[৫২]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এদের সমর্থনে ধর্মঘট করে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন, ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, শিক্ষকদের দাবি দাওয়া পূরণ, দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র কায়েম ও উভয় প্রদেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্য উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রদেশব্যাপী [illegible] গঠন করা হয়।[৫৩]

---

৪৬। আজাদ, সেপ্টেম্বর ১৯, ১৯৬২
৪৭। ঐ, সেপ্টেম্বর ২৬, ১৯৬২
৪৮। ঐ, সেপ্টেম্বর ২৯, ১৯৬২
৪৯। ঐ, অক্টোবর ১, ১৯৬২
৫০। ঐ, নভেম্বর ২৪ ও ২৭, ১৯৬২
৫১। ঐ, নভেম্বর ২৮, ১৯৬২
৫২। ঐ, ডিসেম্বর ২, ১৯৬২
৫৩। ঐ, ডিসেম্বর ২০, ১৯৬২

Dhaka University Institutional Repository



ছাত্র আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০-এ ডিসেম্বর অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব বাতিল করা হয়। সাতাশ তারিখে প্রদেশের নবনিযুক্ত গভর্নর আব্দুল মোনায়েম খান শিক্ষাসপ্তাহের উদ্বোধন করতে ঢাকা হলে যখন আসেন ছাত্ররা কালোপতাকা প্রদর্শন করে। সেখানে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ হয় এবং কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়।[৫৪] এর প্রতিবাদে ৩১-এ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়।

১৯৬৩ সালের শুরুতে মাদ্রাসার ছাত্ররা ধর্মঘটের প্রস্তুতি নেয়। প্রদেশে একটি আরবী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, কামেল পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগের স্বীকৃতি, দ্বিতীয় বিভাগের নিম্নতম নম্বর ৫০% থেকে ৪৫% করা, ছাত্রদের জন্য প্রচুর পরিমাণে বৃত্তি, বিভিন্ন পরীক্ষায় গ্রেস, সেটার ও স্টার মার্কের প্রবর্তন করা প্রভৃতি সাতটি দাবির ভিত্তিতে ধর্মঘট ও বিক্ষোভ মিছিল একটানা চালিয়ে গেলে সরকার জানুয়ারী প্রথমটি ব্যতীত অন্য দাবি মেনে নেওয়া হয়।[৫৫]

ঈদ-সহ শীতকালীন ও রমজানের ছুটি একত্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৩রা মার্চ পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়। এই সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হচ্ছে ডঃ মাহমুদ হোসেনের স্থলে উপাচার্য পদে ডঃ ওসমান গনিকে নিযুক্ত করা। নবনিযুক্ত উপাচার্য প্রাদেশিক গভর্নরের বিশ্বস্ত লোক হিসাবে পরিচিত হন এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত নতুন ছাত্র সংগঠন 'জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের' (এন এস এফ) সহযোগিতায় ছাত্র আন্দোলনে ফাটল ধরাতে প্রয়াসী হন।

তেসরাই মার্চ প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা দাবী করে দমননীতি প্রত্যাহার, ছাত্রদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার, বন্দী ছাত্রদের মুক্তি, ঢাকা কলেজ ও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের তের জন ছাত্রের উপর থেকে রাস্টিকেশন আদেশ প্রত্যাহার, বিভিন্ন স্থানে ছাত্রদের উপর ভাড়াটিয়া গুণ্ডাদের অত্যাচার বন্ধ ও দোষীদের শাস্তি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয় জন ছাত্রনেতার উপর থেকে বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার, সরকারী দলে ছাত্রসমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি বন্ধ করা এবং করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে উর্দু সহ বাংলার যথাযোগ্য মর্যাদা দান — প্রভৃতি বিষয়ে প্রস্তাব নেয়।[৫৬]

---

৫৪। আজাদ, ডিসেম্বর ১৮, ১৯৬২
৫৫। ঐ, জানুয়ারী ১৮, ১৯৬৩
৫৬। ঐ, মার্চ ১৪, ১৯৬৩

Dhaka University Institutional Repository



এর দু একদিনের মধ্যেই সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ছবি অপসারণ নিয়ে দুই দল ছাত্রের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এন এস এফ-এর ছাত্ররা নির্বাচনে লোহার রড, হকি স্টিক ও ড্যাগার ব্যবহার করে। পরদিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে প্রতিবাদ সভা হলে সেখানেও তারা হামলা চালায় এবং তিনদিন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম রাখে।[৫৭] নভেম্বর মাসে কায়েদে আযম কলেজে শহীদ মিনার নির্মাণ, সরাসরি ছাত্র সংসদের নির্বাচন, কলেজ গ্রন্থাগারের ও বিজ্ঞান গবেষণাগারের উন্নতি সাধন প্রভৃতি দাবি নিয়ে ধর্মঘট করলে সেখানেও দুদলে সংঘর্ষ বাধে এবং প্রায় দেড়মাস ধর্মঘটের পর একুশে ডিসেম্বর কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়।[৫৮] ঢাকা ও সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলিও ২৮-এ ডিসেম্বর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়।[৫৯]

আবদুল মোনায়েম খান চাঁদপুর সফর করতে গেলে ছাত্ররা কালোপতাকা প্রদর্শন করে ও বিক্ষোভ মিছিল বের করে। সেখানে পুলিশের গুলিবর্ষণে দুজন ছাত্র নিহত ও চল্লিশ জন আহত হয়।[৬০]

১৯৬৪ সালের ৪ঠা মার্চ ছজন ছাত্রনেতা এক বিবৃতিতে দলনির্বিশেষে একত্র হয়ে পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার তথা প্রত্যক্ষ নির্বাচন, সর্বজনীন ভোটাধিকার ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন শুরু করার আহ্বান জানান।[৬১] আন্দোলনের অংশ হিসাবে পনের থেকে উনিশে মার্চ পর্যন্ত কালো পতাকা উত্তোলন, বিক্ষোভ মিছিল ও সভা করা হয়। শেষ দিনে পুলিশ তেইশ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করলে প্রতিবাদে পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়।[৬২]

বাইশে মার্চ ছিল সমাবর্তন-উৎসবের দিন। কার্জন হলে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়, কিন্তু ছাত্ররা চ্যান্সেলর আবদুল মোনায়েম খানের কাছ থেকে সনদপত্র নিতে অস্বীকার করে এবং বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। ক্রমে-ক্রমে বিক্ষোভ চরমাকার ধারণ করে

---

৫৭। আজাদ, এপ্রিল ৮, ১৯৬৩

৫৮। ঐ, নভেম্বর ২৮, ১৯৬৩ এবং ডিসেম্বর ২২, ১৯৬৩

৫৯। ঐ, ডিসেম্বর ২৯, ১৯৬৩,

৬০। ঐ, নভেম্বর ২৩, ১৯৬৩

৬১। ঐ, মার্চ ৫, ১৯৬৪। এই ছাত্র নেতারা ছিলেন ডাকসুর সহসভাপতি রাশেদ খান মেনন, সাধারণ সম্পাদক মতিয়া চৌধুরী, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হায়দার আকবর খান, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল আলম খান, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের মাহবুবুল হক এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র শক্তির নেয়াজিম হক সরকার।

৬২। আজাদ, মার্চ ২০, ১৯৬৪।

Dhaka University Institutional Repository



এবং ছাত্র-পুলিশে সংঘর্ষ বাধে। বেগতিক দেখে চ্যান্সেলর সভা ত্যাগ করেন এবং নির্বিচারে গ্রেফতার শুরু হয়। পুলিশ রাত্রে ছাত্রাবাসে হানা দিয়ে মোট দেড়শ জনকে ধরে নিয়ে যায় এবং বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষিত হয়।[৬৩] এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালে ঢাকা কলেজ ও ঢাকা আর্ট কলেজের সাত জন ছাত্রকে রাস্টিকেট করা হয়।[৬৪] এই সময় ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশ না-করার জন্য সংবাদপত্রের উপর নির্দেশ জারি করা হয়। পূর্ণাঙ্গ সংবাদ জানা না গেলেও এটুকু জানা যায়, এপ্রিল মাসের মধ্যে দুজন ছাত্রের এম-এ ডিগ্রি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়, চার জনকে পাঁচ বছর, ছয় জনকে তিন বছর ও চৌদ্দ জনকে দুই বছরের জন্য রাস্টিকেট করা হয় ও বিশ জনকে সদাচরণের মুচলেকা দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়।[৬৫] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই নির্যাতনের প্রতিবাদে প্রদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয় এবং কর্তৃপক্ষ একে একে এগুলিতে ছুটি ঘোষণা করে। প্রদেশে মোট ৭৪টি কলেজ ও ১৪০০টি স্কুল বন্ধ ঘোষণা করা হয় এবং ১২০০ ছাত্রকে নানা অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়।[৬৬]

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানেও গোলমাল হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়[৬৭] কিন্তু খবরের কাগজে এ-সম্পর্কিত কোনো সংবাদ প্রকাশিত হয়নি, এমনকি প্রাদেশিক পরিষদে এ-সম্পর্কে আলোচনার সুযোগও দেয়া হয়নি।[৬৭ক]

৮ই মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। চার তারিখে ছাত্রনেতৃবৃন্দ শিক্ষা-জীবনে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পূর্বে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্র বহিষ্কার ও ছাত্রদের ডিগ্রি প্রত্যাহার বন্ধ করা, ছাত্রদের বিরুদ্ধে হুলিয়া প্রত্যাহার করা, গভর্ণরের পরিবর্তে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অথবা একজন সর্বজনমান্য শিক্ষাবিদকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর পদে নিয়োগ করা এবং উপাচার্য পদ থেকে ডঃ ওসমান গনিকে অপসারণ করার দাবি জানিয়ে এক বিবৃতি প্রদান করেন এবং সরকারের উপর চাপ প্রয়োগের জন্য ৮ - ১২ তারিখ পর্যন্ত ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানায়।[৬৮]

---

৬৩। আজাদ, মার্চ ২৩, ১৯৬৪ ৬৪। ঐ, মার্চ, ২৬, ১৯৬৪
৬৫। ঐ, এপ্রিল ১৮, ১৯৬৪
৬৬। ঐ, এপ্রিল ৫, ১৯৬৪
৬৭। ঐ, মে ৩, ১৯৬৪
৬৭ক। ঐ,

৬৮। আজাদ, মে ৫, ১৯৬৪

Dhaka University Institutional Repository



জুনমাস থেকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি কলেজের ছাত্ররা তাঁদের দুই দফা দাবি — কৃষি ডিগ্রিধারীদের গেজেটেড পদমর্যাদা ও অনুযায়ী বেতন — আদায়ের জন্য আন্দোলন শুরু করে। আঠার তারিখে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং ৫২ জনকে বন্দী করে।[৬৯] ২৪শে জুন থেকে ১৩-ই জুলাই পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি ঘোষণা করে ছাত্রদের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ছাত্রাবাস ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তারা আদেশ অমান্য করতে থাকলে পানি-বিদ্যুত সরবরাহ বন্ধ করে তাদের তাড়ানো হয় এবং ৪১জন ছাত্রকে বহিষ্কার ও বৃত্তি বন্ধ করে দেওয়া হয়।[৭০] ৯ই আগস্ট তারিখে আরো সাত জন ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়।[৭১] একই পরিস্থিতিতে তেজগাঁ কৃষি কলেজও ৩১-জুলাই পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়।[৭২] পরবর্তী সময়ে সেপ্টেম্বর মাসের অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষা ছাত্ররা বর্জন করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উপলক্ষে বহিষ্কৃত ছাত্রদের একজন হাইকোর্টে মামলা দায়ের করলে বিচারপতিগণ সর্বসম্মতভাবে এ-আদেশকে অবৈধ ও বেআইনী বলে রায় প্রদান করে।[৭৩] পুলিশ ছাত্রদের নিরস্ত্র মিছিলে হামলা চালিয়ে অনেককে আহত করে।

১৮ই আগস্ট প্রদেশের চল্লিশজন ছাত্রনেতা তের দফা দাবি পেশ করে। এগুলির মধ্যে ছিল: কৃষি ছাত্রদের দুই দফা দাবি মেনে নেওয়া, ঢাকা-রাজশাহী-ময়মনসিংহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপর থেকে বহিষ্কারাদেশ ও হুলিয়া প্রত্যাহার করা, ডিগ্রি প্রত্যর্পণ করা, ছাত্রদের বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেওয়া, আটক ছাত্রদের মুক্তি দান ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। দাবি আদায়ের জন্য ২৯ তারিখ থেকে প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট করার আহ্বান জানানো হয়।[৭৪]

২৯ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ বাধে। ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে গেলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ঘন্টাখানেক সংঘর্ষের পর ১৫/১৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়।[৭৫] পরদিন ঢাকা কলেজ থেকে দুজন ছাত্রনেতাকে বহিষ্কার করা হয়।[৭৬]

---

৬৯। আজাদ, জুন ১১, ১৯৬৪

৭০। ঐ, জুন ২৫, ১৯৬৪ এবং জুলাই ২৮, ১৯৬৪ ।

৭১। ঐ, আগস্ট ৯, ১৯৬৪

৭২। ঐ, জুন ২৬, ১৯৬৪

৭৩। ঐ, জুলাই ৮, ১৯৬৪ ৭৪। ঐ, আগস্ট ১৯, ১৯৬৪ ৭৫। ঐ, আগস্ট ৩০, ১৯৬৪

Dhaka University Institutional Repository



৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিরা মিলে বাইশ দফা দাবি তৈরী করে। এতে ছাত্রদের বিভিন্নমুখী দাবিগুলি সংযুক্ত আকার নেয়। দাবিগুলি প্রধানত শিক্ষা-সম্পর্কিত হলেও উল্লেখ করা হয় যে, দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তন না হলে এগুলির বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাই প্রস্তাবের মুখবন্ধে একনায়কত্বমূলক শাসনব্যবস্থার অবসান করে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করা, জনগণের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত করা, প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার দেওয়া, মৌলিক অধিকার প্রত্যর্পণ করা, প্রদেশসমূহের পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া ও সংসদীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করার দাবি জানানো হয় এবং রাজবন্দীদের মুক্তিদান, খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের ঊর্ধ্বগতিরোধ ও বন্যানিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করার আহ্বান জানানো হয়। শিক্ষা সংক্রান্ত ২২ দফার মধ্যে ছিল: স্কুল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, চিকিৎসা শিক্ষা, নারী শিক্ষা, কৃষি শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা ও সামরিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করা, বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা, বৃত্তি ও গবেষণা সুযোগ সৃষ্টি করা, দুই প্রদেশের শিক্ষার বৈষম্য হ্রাস করা, শিক্ষকদের সমস্যার সমাধান করা ও শিক্ষাক্ষেত্রে অধিক অর্থ বরাদ্দ করা, শিক্ষাবিদ, ছাত্র প্রতিনিধি ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিদের সমবায়ে শিক্ষা কমিশন গঠন করা, ছাত্রদের বিরুদ্ধে নির্যাতনমূলক যে-সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেগুলি তুলে নেওয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ ওসমান গনি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মমতাজউদ্দিন আহমদ এবং প্রদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে গণবিরোধী শিক্ষকদের অপসারণ করা এবং চ্যান্সেলরের পদে বিশেষ রাজনৈতিক দলের সদস্য প্রাদেশিক গভর্নরের স্থলে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বা একজন সর্বজনমান্য শিক্ষাবিদকে নিয়োগ করা। তাছাড়া একুশে ফেব্রুয়ারী ও সতেরো সেপ্টেম্বরকে শহীদ দিবস ও শিক্ষাদিবস হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে সরকারী ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করার দাবিও বাইশ দফার মধ্যে ছিল।[৭৭]

সতেরই সেপ্টেম্বর থেকে আন্দোলন দুর্বার আকার ধারণ করার লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে ১৮ তারিখে প্রদেশের সমস্ত স্কুল কলেজ,[৭৮] ১৯ তারিখে ঢাকা, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়[৭৯] এবং আন্দোলন-সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশ না করার জন্য

---

৭৬। আজাদ, আগস্ট, ৩১, ১৯৬৪
৭৭। ঐ, সেপ্টেম্বর ৯, ১৯৬৪
৭৮। ঐ, সেপ্টেম্বর ১৯, ১৯৬৪
৭৯। ঐ, সেপ্টেম্বর ২১, ১৯৬৪

সংবাদপত্রের উপর কঠোর আদেশ জারি হয়। এর পর থেকে আন্দোলন সম্পর্কিত কোনো পূর্ণাঙ্গ খবর পাওয়া যায়নি। উনত্রিশে সেপ্টেম্বর বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক নেতাদের আহ্বানে প্রদেশে পূর্ণ হরতাল হয়। সেদিন প্রদেশের সমস্ত যানবাহন, অফিস আদালত,দোকান পাট বন্ধ থাকে, এমনকি 'ঢাকার ঘড়িগুলিও ঠিক ঠিক বন্ধ করে দেয়'। বিকেলে পল্টন ময়দানে মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে লক্ষাধিক লোকের সভা হয়।[৮০]

তার পর থেকে ছাত্র-আন্দোলনে ভাটা পড়ে। আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে উপলক্ষ করে রাজনীতির প্রবাহ তখন অন্য খাতে বইতে শুরু করে।

তিন

## রাজনৈতিক দলসমূহের কার্যক্রম

সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যে-ছাত্র আন্দোলনের সূচনা হয় তা রাজনৈতিক অঙ্গনকেও প্রভাবিত করে। ১৯৬২ সালের ২৫-এ জুন পূর্ব বাংলার নয় জন নেতা রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর এক দীর্ঘ বিবৃতিতে নিজেদের বক্তব্য রাখলেন। এই নেতারা ছিলেন আতাউর রহমান খান শেখ মুজিবুর রহমান, মোহন মিয়া, হামিদুল হক চৌধুরী, নূরুল আমীন, আবু হোসেন সরকার, মাহমুদ আলী, সৈয়দ আজিজুল হক ও পীর মোহসেনউদ্দীন। তাঁরা বললেন, সত্যিকার গণ-প্রতিনিধি ব্যতীত কেউ শাসনতন্ত্র রচনার অধিকারী নয়, জনগণই ক্ষমতার উৎস ও জনগণই সার্বভৌম। তাদের ইচ্ছানুযায়ী শাসনতন্ত্র রচনা করতে হবে। সামরিক সরকার প্রবর্তিত শাসনতন্ত্র এ-বৈশিষ্ট্য বর্জিত বলে তা অন্তঃসারশূন্য। যথাসম্ভব দ্রুত নির্বাচনের মাধ্যমে একটি বিশেষ সংস্থা গঠন করে, দেশবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র তৈরীর জন্য তার হাতে ক্ষমতা দেওয়া আবশ্যক। এবং ৬ মাসের মধ্যেই তা-করা সম্ভব। অন্তর্বর্তীকালের জন্য ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকারগুলি এই শাসনতন্ত্রে সংযোজিত করে তা আদালতের এখতিয়ারভুক্ত

---

৮০। দি পাকিস্তান অবজারভার, সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯৬৪।

Dhaka University Institutional Repository



করতে হবে। বর্তমান পরিষদের উপর সরকারের আস্থা স্থাপন করতে হবে, বিনাবিচারে আটক রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হবে এবং রাজনৈতিক দল গঠনের পথে সব প্রকার প্রতিবন্ধকতা অপসারিত করতে হবে। বিবৃতিতে আরো বলা হয় শাসনতন্ত্র ফেডারেল ধরনের হবে, জনসাধারণ সংসদীয় গণতন্ত্রে অভ্যস্ত বলে তা তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে। সর্বশেষে, দুই প্রদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক বৈষম্য হ্রাস করার জন্য বিবৃতিতে দাবি করা হয়।[৮১]

এই বিবৃতির পর প্রতিক্রিয়ায় দলমতনির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনের সম্ভাবনা দেখা দিল। সরকার এর মোকাবিলা করল রাজনৈতিক ভাবে। জাতীয় পরিষদে রাজনৈতিক দল গঠনের নীতিমালাসহ নতুন আইন গৃহীত হলে জামাতে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম দল পুনরুজ্জীবিত করা হল। আইউব খানের সহকর্মীরা করাচীতে মুসলিম লীগারদের কনভেনশন ডেকে নতুন পাকিস্তান মুসলিম লীগের /কনভেনশন/ গঠন করল সেপ্টেম্বর মাসে, বাকি সদস্যরা খাজা নাজিমুদ্দিনকে সভাপতি করে সৃষ্টি করল 'পাকিস্তান মুসলিম লীগ /কাউন্সিল/'। এভাবে গণঐক্যে বিভেদ সৃষ্টি শুরু হল।

সোহরাওয়ার্দী মুক্তি পেলেন ১৯৬২ সালের উনিশে আগস্ট তারিখে। তিনি নয় নেতার বিবৃতি সমর্থন করলেন এবং ৪ঠা অক্টোবর দুই প্রদেশের চুয়ান্ন জন নেতার স্বাক্ষরযুক্ত এক বিবৃতির মাধ্যমে দলহীন সংস্থা — জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট — সংক্ষেপে এন ডি এফ — গঠনের সিদ্ধান্ত নিলেন। বিবৃতিতে বলা হয়, এটি কোনো রাজনৈতিক দল নয়, বরং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম বিশেষ, শাসনতন্ত্রের গণতন্ত্রায়নই যার মূল লক্ষ্য।[৮২]

জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট পাকিস্তানে, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে, উল্লেখযোগ্য সমর্থন পেল কিন্তু ১৯৬৩ সালের প্রথম দিকে সোহরাওয়ার্দী অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য বৈরুতে গমন করলে তাঁর অবর্তমানে আন্দোলনে ভাটা পড়ে। ১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে মাওলানা ভাসানীকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হলে এর অগ্রগতি আরো ব্যাহত হয়। তিনি ১৯৬৩ সালের আগস্ট মাসে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাত করে রাজবন্দীদের মুক্তির সর্তে তার সঙ্গে সহযোগিতায় সম্মত হলেন।[৮৩]

---

৮১। দি পাকিস্তান অবজারভার, জানুয়ারী ২৫, ১৯৬২

৮২। ঐ, অক্টোবর ৫, ১৯৬২

৮৩। আজাদ, সেপ্টেম্বর ২৪, ১৯৬৩

Dhaka University Institutional Repository



সেপ্টেম্বর মাসে সরকারী দলের নেতা হিসাবে বিপ্লববার্ষিকীতে যোগ দেবার জন্য তিনি সমাজতান্ত্রিক চীন সফর করলেন এবং মাও সে-তুং এর পরামর্শে আইউব খানের বিরোধিতা না-করার সিদ্ধান্ত নিলেন।[৮৪] পূর্ব বাংলায় প্রত্যাবর্তন করে তিনি ঘোষণা করলেন, আইউব খানের সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর কোনো বিরোধ নেই, কেননা পাকিস্তান সরকারের বৈদেশিক নীতি নিরপেক্ষ। তিনি সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর প্রস্তাবিত গণআন্দোলনের কর্মসূচী প্রত্যাহার করে নিলেন এবং ব্যাপক ও নির্দিষ্ট কর্মসূচীর অভাবে এন ডি এফ সফল বিরোধী দল হিসাবে ব্যর্থ হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন।[৮৫]

শেখ মুজিবুর রহমানও এন ডি এফ-এর কার্যকলাপে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর / ডিসেম্বর ৫, ১৯৬৩/ ১৯৬৪ সালের ২৫-এ জানুয়ারী তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করলেন।[৮৬] পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি পুনরুজ্জীবিত হল ২৯-এ ফেব্রুয়ারী। এখানে গণঐক্যে বড় ফাটল দেখা দিল।

তারপর থেকে প্রত্যেক দলই বিচ্ছিন্নভাবে গণতন্ত্র ও মৌলিক অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য জনসভা করতে ও খবরের কাগজে বিবৃতি দিতে লাগল। মার্চ মাসের পনের তারিখে এন ডি এফ, আঠার তারিখে আওয়ামী লীগ, উনিশ তারিখে ন্যাপ এবং বাইশ তারিখে মুসলিম লীগ/কাউন্সিল/ দাবি দিবস পালন করল। এখানে প্রকট হয়ে দেখা দিল রাজনৈতিক দল সমূহের বিচ্ছিন্নতা, দলাদলি ও অনৈক্য।

## চার

### ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট-নির্বাচন

১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে তিন বছর পর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল।

---

৮৪। Tariq Ali, P. 140
৮৫। আজাদ, ডিসেম্বর ২, ১৯৬৩
৮৬। আতাউর রহমান খান, পৃঃ ২৭২ ।

Dhaka University Institutional Repository



আইয়ুব খান এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য উদগ্রীব ছিলেন, কেননা এতে তাঁর শাসনতন্ত্রের স্থায়িত্ব লাভের সম্ভাবনা ছিল। নিজের নির্বাচনের জন্য তিনি সম্ভাব্য সকল প্রকার সাবধানতা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। প্রচারের সুবিধার্থে প্রেসট্রাস্ট গঠন করা হল এবং টেলিভিশন চালু করা হল। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের কাছ থেকে মুসলিম লীগ (কনভেনশন) দলের কাজের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে চাঁদা সংগ্রহ করা হল। শুধু সম্ভ শিল্প ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে পাওয়া গেল প্রায় দেড়কোটি টাকা।[৮৭] শাসনতন্ত্রও এমনভাবে সংশোধন করা হল যাতে পুরানো জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা নির্বাচনের সময় সদস্য থাকতে পারেন।[৮৮] এই সংশোধনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট তাঁর অনুগত সদস্যদের দ্বারা নবনির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রীদের প্রভাবিত করতে চেয়েছিলেন। বিরোধী দলের মধ্যে ন্যাপ-এর সাহায্যে তিনি বিরোধ বাঁধিয়ে রেখেছিলেন। এ-দলের চেষ্টায় সম্ভাব্য শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী জেনারেল আজম খান বিরোধীদলের মনোনয়ন পেলেন না।[৮৯]

১৯৬৪ সালের ১৯ই আগস্ট মুসলিম লীগের (কনভেনশন) কার্যনির্বাহী কমিটি আইয়ুব খানকে দলের প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করে। পরে পরেই তিনি নির্বাচনী কর্মসূচী প্রকাশ করেন। এটি তাঁর নিজস্ব কর্মসূচী হিসাবে প্রচারিত হয়। আমি বিশ্বাস করি, আমি মনে করি, আমি দায়িত্ব নিচ্ছি, আমি আহ্বান জানাই — এই চারভাবে তিনি তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেন।[৯০]

আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য সম্মিলিত বিরোধীদল — জামাতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ — সেপ্টেম্বর মাসে করাচীতে বৈঠক করে সর্বসম্মতিক্রমে কুমারী ফাতিমা জিন্নাহকে মনোনীত করে।[৯১] এন ডি এফ-ও এক বিবৃতিতে এই মনোনয়নকে সমর্থন জানায়। সম্মিলিত বিরোধী দলের পক্ষ নয়দফা কর্মসূচীর পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়। পাকিস্তানের সংহতি বজায় রেখে পূর্ণ প্রাদেশিক

---

৮৭। Herbert Feldman,(From Crisis,to Crisis...) P. 75

৮৮। ঐ, পৃঃ ২৭—৩০ ।

৮৯। ঐ, পৃঃ ৭১—৭৩ —

৯০। F N M পৃঃ ২২৬—২৩ ।

৯১। আজাদ, জুলাই ২৩, ১৯৬৪

Dhaka University Institutional Repository



স্বায়ত্তশাসন, দশ বছরের মধ্যে দুই প্রদেশের বৈষম্য দূর করা, সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পরিষদসমূহের সদস্য নির্বাচন, জনগণের মৌলিক অধিকার সমূহের নিশ্চয়তাবিধান-কারী গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, মুসলিম রাষ্ট্র গুলোর সঙ্গে ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক রেখে স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ, রাজনৈতিক দলসমূহের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, রাজবন্দীদের মুক্তি, নিরাপত্তা আইন প্রত্যাহার, মুসলিম পারিবারিক আইন সংশোধন, বন্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্রুগ মিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন, ব্যক্তিমালিকানায় সর্বোচ্চ জমির পরিমাণ পশ্চিম পাকিস্তানের সেচ এলাকায় ১২ একর, সেচ-বহির্ভূত এলাকায় ২৫ একর ও পূর্ব বাংলায় ২৫ বিঘা করা, বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস অর্ডিন্যান্স বাতিল করা, কতিপয় ব্যক্তির হাতে জাতীয় সম্পদ কুক্ষিগত না-করে সবার মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা এবং সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো এমনভাবে পরিবর্তন করা যাতে খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা রাষ্ট্র মিটাতে পারে — প্রভৃতি নয় দফার অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৯২]

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারা দেশে অসাধারণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। আইউব খান ও ফাতিমা জিন্নাহ নির্বাচন অভিযানে অবতীর্ণ হলেন। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম থেকে নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচন পর্যন্ত আইউব খান ৫৬টি ও ফাতিমা জিন্নাহ ২৫টি প্রধান নির্বাচনী বক্তৃতা দেন।[৯৩] উভয়ে রাজনৈতিক পদ্ধতির উপর বিশেষ জোর দেন। ফাতিমা জিন্নাহ সরকারের একনায়ক প্রথার দোষত্রুটি ও সর্বব্যাপী দুর্নীতির বর্ণনা দিয়ে গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার, সংসদীয় গণতন্ত্রের, মৌলিক অধিকার ও সর্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন। আইউব খান, অন্যপক্ষে, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির যৌক্তিকতা, ক্রমান্বয়ে নির্বাচনী কলেজের সম্প্রসারণ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রয়োজনীয়তাও তাঁর বিভিন্ন সংস্কার প্রয়াসের সুফল প্রভৃতির উপর বক্তব্য রাখেন।[৯৪]

নভেম্বর মাসে মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচন সম্পন্ন হয়। নির্বাচন দলীয় ভিত্তিতে না-হওয়ায় দলীয় সমর্থক সংখ্যা নির্ধারণ করা যায়নি। পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিম লীগের/কনভেনশন/ সভাপতি সে-প্রদেশের শতকরা ৮৩.১ জন গণতন্ত্রীকে নিজেদের দলে দাবি করেন, অন্যপক্ষে বিরোধী দল দাবি করেন শতকরা ৬৫ জনকে। পূর্ব বাংলায় উভয় দল শতকরা ৮৫ জনকে

---

৯২। আযাদ, জুলাই ২৫, ১৯৬৪
৯৩।
৯৪। ঐ, পৃঃ ২৩১; Karl Von Vorys, p. 278

Dhaka University Institutional Repository



নিজেদের দলে দাবি করে। তবে এক ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেল যে, জনগণের এক বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বিরোধী দলের সমর্থক।[৯৫]

এর পরে নির্বাচনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হল – বিরোধী দল মিছিল ও সভা পূর্বের মতই করে চলল। এ–পর্যায়ে ফাতিমা জিন্নাহ ৩৮টি প্রধান নির্বাচনী ভাষণ দেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে আইউব খানের প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। এ–সময় তিনি ১৭টি নির্বাচনী বক্তৃতা দেন, তবে অধিকাংশই নির্বাচকমণ্ডলী ও দলীয় কর্মী সমাবেশে।[৯৬]

১৯৬৫ সালের ২রা জানুয়ারী নির্বাচন হয় এবং ৮ তারিখে সরকারীভাবে ফলাফল ঘোষণা করা হয়। পূর্বাঞ্চলে ফাতিমা জিন্নাহ ১৮,৪৩৪টি ও আইউব খান ২১,০১২টি ভোট পান। পশ্চিম পাকিস্তানে তা ছিল যথাক্রমে ১০,২৫৭টি এবং ২৮,৯৩৯টি। অপর দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী — মিয়া বশির আহমদ ও কে,এম, কামাল যথাক্রমে সর্বমোট ৬৫টি ও ১৮৩টি ভোট পান। মোট ভোটের ৬৩.৩১ শতাংশ আইউব খান ও ৩৬.৩৬ শতাংশ ফাতিমা জিন্নাহ লাভ করেন।[৯৭]

আইউব খান ঢাকা ও করাচী শহরে পরাস্ত হন। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাঁর পুত্র ক্যাপ্টেন গওহর আইউব অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে লরী ট্রাক মিছিল নিয়ে করাচীর লিয়াকতাবাদ, নাজিমাবাদ, গোলিমার প্রভৃতি মুহাজির – অধ্যুষিত এলাকায় হামলা চালায় ও নির্বিচারে অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ করে। এ–সম্পর্কে কোনো খবর পাকিস্তানের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি, তবে ২০ জনের মৃত্যুর খবর শোনা গিয়েছিল। এ–সম্পর্কিত সংবাদ প্রেরণ করায় নিউইয়র্ক টাইমসের সংবাদদাতা জেকুইস নেভার্ড পাকিস্তানী সরকারের নির্যাতনের শিকার হন।[৯৮]

নির্বাচনের ফলাফলে গণতান্ত্রিক মহলে গভীর নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়। পরবর্তী পর্যায়ে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে তারা বিশেষ আগ্রহ দেখান নি, ফলে সে–দুটিতে সরকারী দল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

---

৯৫। ঐ, পৃঃ ৮৩

৯৬। ঐ, পৃঃ ৮৫

৯৭। F W M , Appendix VII

৯৮। Herbert ~~HR~~ Feldman, (From Crisis to Crisis...) p. - 81-83

Dhaka University Institutional Repository



## সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহ

### এক

### রোমান হরফ প্রবর্তন ও জাতীয় ভাষা সৃষ্টির উদযোগ

সামরিক সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর থেকেই পাকিস্তানের জন্য একটি জাতীয় ভাষা তৈরীর চেষ্টা করে। পরিকল্পনা ছিল বাংলা ও উর্দুকে মিলিয়ে এ-ভাষা তৈরী করা ও সংশোধিত রোমান হরফে লেখা। মন্ত্রীসভার বৈঠকে,[৯৯] সাংবাদিক সম্মেলনে,[৯৯ক] সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সঙ্গে আলোচনায়[৯৯খ] আইউব খান এ-বিষয়ে ইঙ্গিত দেন। একসরকারী প্রেসনোটে বলা হয়েছিল, দেশবাসীর পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে সমগ্র দেশের লোক বলতে পারে এমন একটি ভাষার স্বাভাবিক পদ্ধতিতে বিকাশ সাধনই সরকারের লক্ষ্য।[৯৯গ] এ-সম্পর্কে আইউব খান তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন:

> এটা আমার কাছে অত্যন্ত পরিষ্কার যে দুটি জাতীয় ভাষা নিয়ে আমরা এক-জাতি রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারবনা; আমরা দ্বি-জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে থেকে যাব। আমি এর বিরুদ্ধে যুক্তি দিচ্ছি না আমি একটি বাস্তব ঘটনা তুলে ধরছি যা স্বীকার করতেই হবে।... এটাও সমানভাবে সত্য যে যদি জনগণ—তা পূর্ব পাকিস্তান বা পশ্চিম পাকিস্তান যেখানেই থাকুক না কেন — নিজেদের মধ্যে সংহতি গড়ে তুলতে চায় তবে তাদের অবশ্যই পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় যোগ্য একটি মাধ্যম থাকতে হবে। এ-ধরনের মাধ্যম উদ্ভব করতে হলে আমাদিগকে বাংলা ও উর্দুর সাধারণ উপাদানগুলি চিহ্নিত করতে হবে এবং সেগুলিকে একটি সাধারণ লিপির মাধ্যমে বিকশিত হবার ব্যবস্থা করতে হবে।[১০০]

---

* ৯৯ এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: সাঈদ-উর রহমান, আইউব খানের আমলে জাতীয় ভাষা সৃষ্টির চেষ্টা ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃঃ ৯৫-২০৩।

৯৯। F W M, P. 102 ৯৯ক। ইত্তেফাক, জানুয়ারী ২৯, ১৯৬০

৯৯খ। G.W.Chowdhury(Documents & peeches)..), p. 713

৯৯গ। আজাদ, এপ্রিল ২, ১৯৬০

১০০। F W M, p. 102

Dhaka University Institutional Repository



প্রেসিডেন্টের এই সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করার জন্য 'শিক্ষা কমিশন' ও বাংলা একাডেমী চেষ্টা চালায়। কমিশনের প্রস্তাব ছিল দুটি : প্রথমত, 'যে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রোমক বা রোমান হরফের উদ্ভাবন ও বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে' তাদের আর্থিক আনুকূল্য করা; দ্বিতীয়ত, মুদ্রণযোগ্য আদর্শ উর্দু বর্ণমালা নির্ণয় করা, বাংলা বর্ণমালার সংস্কার করা এবং বাংলা ও উর্দুর উপযোগী রোমান হরফের উদ্ভাবন করার জন্য ভাষাবিদদের সমন্বয়ে কমিটি স্থাপন করা। কমিশন বলে যে, এই সমস্ত প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে 'সিদ্ধান্ত' নেওয়ার সময় আসবে।[৮১]

এই সময়ে সরকার ১৯৫৯ সালের পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই রিপোর্টে বাংলাকে বিভিন্নভাবে সংস্কার করার প্রস্তাব ছিল।

১৯৬২ সালে বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে 'Bengali and Urdu : A literary Encounter' শিরোনামে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের একত্র করে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে পাকিস্তানের জাতীয় সংহতির পথ সুগম করা। ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য পরিচালক সৈয়দ আলী আহসান নিম্নরূপ কর্মপন্থা নির্দেশ করেন : এক, ব্যাপক অনুবাদের ব্যবস্থা করা, দুই, পূর্ব বাংলার স্কুলে উর্দু ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্কুলে বাংলা ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, তিন, উর্দু ও বাংলার সাধারণ শব্দগুলি খুঁজে বের করে জন-প্রিয় করা। তৃতীয়, সূত্রটি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, বাংলা ভাষার আরবী ফারসী উর্দু ও তুর্কী শব্দের ভাষার একটি অভিধান ও উর্দু ভাষার সংস্কৃত পালি ও বাংলা শব্দের একটি অভিধান তৈরী করলে দুই রাষ্ট্রভাষার ব্যবধান ক্রমশঃ হ্রাস পাবে।[৮২]

সেমিনারের উদ্বোধন করেছিলেন প্রাদেশিক গভর্নর আজম খান। তিনি দুই প্রদেশের ভাষাগত বিভেদ ও অনৈক্যের ব্যাপারে 'একটি কার্যকর-সমাধানে' উপনীত হতে সবার প্রতি আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, দুটি ভাষারই ইসলামিক উৎপত্তি রয়েছে, সুতরাং আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে এ-ব্যাপারে সমাধানে পৌঁছুতে বিলম্ব হবেনা।[৮৩]

---

৮১। জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট, পাকিস্তান সরকার, শিক্ষা দফতর, জানুয়ারী-আগস্ট ১৯৫৯, পৃঃ ৩০

৮২। Bengali And Urdu, A literary Encounter : A seminar(Dacca : Bengali Academy, 1964), p. 9

৮৩। ঐ, পৃঃ ৮-৯

Dhaka University Institutional Repository



সেসময়েই বাংলা ভাষা সংস্কারের জন্য বাংলা একাডেমী একটি কমিটি স্থাপন করে। পরিচালক সৈয়দ আলী আহসান ছিলেন কমিটির সভাপতি। ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরে যে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কমিটির সুপারিশসমূহ ব্যাখ্যা করা হয়। রিপোর্টে বাংলা বর্ণমালা থেকে ঈ, ণ, ঋ, ৯, ৎ, ঞ, ঃ, ষ, ঐ, ঔ, ঊ, ঙ বর্জন করা সহ আরো অনেক সংস্কার প্রস্তাব দেওয়া হয়।[১০৪] একাডেমীর চতুর্থ বার্ষিক সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে পরিচালক এই প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ, প্রকাশনা-সংস্থা ও সংবাদপত্র-সমূহের প্রতি আহ্বান জানান।[১০৪ক] সে-সভায় উপস্থিত গভর্নর মোনায়েম খান একাডেমীর এই প্রয়াসকে স্বাগত জানান এবং এ-বিষয়ে একটি 'নীতিমালায়' উপনীত হতে সুধীদের অনুরোধ করেন।[১০৪খ]

সরকারের এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে অনেক প্রতিবাদ উত্থিত হয়। শিক্ষাকমিশনকে রোমান হরফ সম্পর্কে মতামত দেবার নির্দেশ দিলে 'দৈনিক ইত্তেফাক' 'হরফ পরিবর্তন প্রসঙ্গে' শীর্ষক পর-পর দুদিন সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এর প্রতিবাদ করে।[১০৫] মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকাও প্রতিবাদ জানায়।[১০৫ক] ১৯৫৯ সালে একুশে ফেব্রুয়ারী পালন উপলক্ষে বিভিন্ন ছাত্রদলের সম্মিলিত উদ্যোগে আয়োজিত সভায় রোমান হরফের প্রস্তাবটি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করা হয়। সভায় সভাপতি ছিলেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।[১০৫খ] অধ্যাপক আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে আয়োজিত আরো একটি সভায় রোমান হরফ প্রবর্তনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব নেওয়া হয়।[১০৫গ] ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকও রোমান হরফের প্রবর্তনের বিরোধিতা করেন।[১০৫ঘ] অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাইও একটি প্রবন্ধে রোমান হরফের অবৈজ্ঞানিকতা, বাংলা হরফের তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব, এবং হরফ পরিবর্তিত হলে সাংস্কৃতিক জীবনে যে-ব্যাপক বৈনাশ্য ও শূন্যতার সৃষ্টি হবে সে-সম্পর্কে আলোচন করেন।[১০৫ঙ] ফেরদৌস খানের মতামতও ছিল অনুরূপ।[১০৫চ]

---

১০৪। বাংলা একাডেমী এ পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭০, পৃঃ ১১৪-১৬
১০৪ক। ঐ, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭০, পৃঃ ১৩৭
১০৪খ। ঐ, পৃঃ ১১৬
১০৫। ইত্তেফাক, ফেব্রুয়ারী ১৯ ও ২০, ১৯৫৯
১০৫ক। সম্পাদকীয়, মাসিক মোহাম্মদী, চৈত্র ১৩৬৫, পৃঃ ৪০১
১০৫খ। ইত্তেফাক, ফেব্রুয়ারী ২২, ১৯৫৯
১০৫গ। ঐ, ফেব্রুয়ারী ২৭, ১৯৫৯
১০৫ঘ। মাসিক সওগাত, চৈত্র ১৩৬৫, পৃঃ ৪৭০-৭২
১০৫ঙ। ঐ, পৃঃ ৪৬২-৬৯
১০৫চ। ঐ, ফাল্গুন ১৩৬৫, পৃঃ ৪৬১

Dhaka University Institutional Repository



১৯৬০ সালের শহীদ দিবসেও ছাত্ররা রোমান হরফ প্রবর্তনের চেষ্টার নিন্দা করে।[১০৬] ১৯৬২ সালের ছাত্র-আন্দোলনে ছাত্রদের অন্যতম বক্তব্য ছিল রোমান হরফের বিরুদ্ধে।

রোমান হরফ প্রবর্তনের বিরোধিতার পাশাপাশি ভাষা-সংস্কার প্রস্তাবের ও বিরোধিতা করা হয়। পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটির সুপারিশের বিরোধিতা করা হয় বাংলা একাডেমীর এক সভায়। এতে সভাপতিত্ব করেছিলেন মুহম্মদ আবদুল হাই।[১০৭] বাংলা একাডেমীর সংস্কার-প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। অধ্যাপক ইসলাম 'বাংলা বানান বনাম বাংলা একাডেমী' নামক এক প্রবন্ধে প্রস্তাবসমূহের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন।[১০৭ক]

দুই

## পাকিস্তান লেখক সংঘের প্রতিষ্ঠা

পাকিস্তান সরকারের শিক্ষাসচিব কুদরতুল্লাহ শাহাব এবং আরো কয়েকজন উর্দু লেখকের উদ্যোগে ১৯৫৯ সালের উনত্রিশে, ত্রিশে ও একত্রিশে জানুয়ারী করাচীর গোয়ার্নাম হলে পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষার কবি সাহিত্যিকদের এক সমাবেশ ঘটে। সম্মেলনের খরচ বাবদ বাংলা একাডেমী, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিটি ফাণ্ড ও লাহোর-করাচীর কয়েকজন ব্যবসায়ী প্রায় অর্ধলক্ষ টাকা দান করে।[১০৮] প্রেসিডেন্ট আইউব খান সভায় বক্তৃতা করেন। তিনি লেখকদের উদ্যম এবং পাকিস্তানের সংহতি সাধানের জন্য তাঁদের আগ্রহ দেখে অকৃত্রিম সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং 'আধুনিক মনে ভাষা ও ভাবধারায় এছলামের আদর্শ' প্রচারে যত্নবান হতে উপদেশ দেন।[১০৯]

---

১০৬। ইত্তেফাক, ফেব্রুয়ারী ২২, ১৯৬০

১০৭। ঐ, এপ্রিল ২৯, ১৯৫৯

১০৭ক। মাসিক পরিক্রম, ভাদ্র ১৩৭০, পৃঃ ৮-৯

১০৮। মোহাম্মদ নাসির আলী, করাচী লেখক সম্মেলন, মাসিক মোহাম্মদী ফাল্গুন ১৩৬৫, পৃঃ ৩৭৯

১০৯। জেনারেল মোহাম্মদ আইউব খান, পাকিস্তানের সংহতি ও লেখকদের ভূমিকা, ঐ পৃঃ ৩৫০

Dhaka University Institutional Repository



কুদরতুল্লাহ শাহাব লেখকদের দায়িত্ব নির্দেশ করেন এভাবে : লেখক কোনক্রমেই আইনের ঊর্ধ্বে নহেন, তিনি একদেশে বাস করে অন্যদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে পারবেন না, এবং তিনি এরূপ আদর্শ প্রচার করে ভিন্নরূপ আদর্শে বিশ্বাস স্থাপনের সাহিত্যিক সম্পদ গ্রহণ করতে পারেন না। লেখকদের পাকিস্তানী আদর্শের প্রতি অনুগত হতে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন :

> আমাদেরকে নিয়ে এক বিদেশীয় দ্বন্দ্ব ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয়েছে। আমাদের চিন্তাধারার উপরে মস্কো, ওয়াশিংটন ও কলকাতা-মুখী করার চেষ্টা চলছে। এদের মতলব পৃথক। মস্কো ও কলকাতা চায় আমাদের বিপথগামী করতে, ওয়াশিংটন চায় অন্য পথে নিতে। কিন্তু মনে রাখবেন আমাদের চিন্তাধারার ভিত্তিভূমি পাকিস্তান, অন্য কোনখানেও নয়। পাকিস্তানী লেখকরা বিশ্বরাজনীতির গুটি হাসাদের পিপিলিকা হিসেবে ব্যবহৃত হতে চায়না। আমরা দরিদ্র এবং সংগ্রামী কিন্তু আমাদের নিজস্ব মানসিক ও সাংস্কৃতিক দিগন্ত রয়েছে।[১১০]

পরিশেষে তিনি সামরিক সরকার কর্তৃক লেখকদিগকে প্রাক-সামরিক আমলে অস্বীকৃত প্রকৃত স্বাধীনতা দেবার জন্য আইউব খানকে ধন্যবাদ জানান। সম্মেলনে আরো বক্তৃতা দেন ডঃ জাবিদ ইকবাল বার এট-ল। তিনি লেখকদের তাঁদের সাহিত্যে শ্রেণীবাদ, প্রাদেশিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা-বিরোধী আদর্শ অবলম্বন ও ইসলামী আদর্শের রূপায়ণ করতে আহ্বান জানান।[১১১]

সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে 'পাকিস্তান লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠা করা হয়। কুদরতুল্লাহ শাহাব মনোনীত হন সেক্রেটারী জেনারেল রূপে। কেন্দ্রীয় কমিটিতে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধি ছিলেন এগার জন। তাঁরা হলেন — অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ, গোলাম মোস্তফা, জসীমউদ্দীন, আবদুল কাদির, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ, আবুল হোসেন, ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, দেওয়ান মোঃ আজরফ, আশকার ইবনে শাইখ ও মোঃ আবদুল হাই।[১১২]

---

১১০। কুদরতুল্লাহ শাহাব, লেখক ও লেখকের স্বাধীনতা, ঐ, পৃঃ ৩৫

১১১। ডাঃ জাবিদ ইকবাল বার এট-ল, লেখকদের জাতীয়তা ও ধর্মনিরপেক্ষতা, ঐ, পৃঃ ৩২–৩৬

১১২। মহিউদ্দীন, দেখে এলাম করাচী, মাসিক মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬, পৃঃ ৬৫–৭০

Dhaka University Institutional Repository



করাচী সম্মেলনে লেখক সঙ্ঘের নিম্নরূপ শপথপত্র গৃহীত হয় ঃ

> দেশের প্রচলিত সকল ভাষার প্রতিনিধি আমরা পাকিস্তানের লেখকগণ আমাদের মাতৃভূমির সর্বাঙ্গীন উন্নতি, মর্যাদা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক শান্তি এবং মানব ব্যক্তির বিকাশের স্বার্থে আত্মোৎসর্গের শপথ গ্রহণ করছি ।
>
> জাতিসংঘ স্বীকৃত মানবাধিকারের সনদে আমরা বিশ্বাসী । লেখক হিসাবে স্বাধীনভাবে মতামত জ্ঞাপন ও প্রচারের অধিকার আমাদের একটা মৌলিক অধিকার । এ অধিকার অক্ষুন্ন রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর, কারণ এ-অধিকারের অভাবে সৃষ্টি-ধর্মী রচনা অর্থহীন ও বৈশিষ্ট্যহীন হয়ে পড়ে ।
>
> সত্যের যথাযথ রূপায়ণ, দেশাত্মবোধের অনুশীলন, আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছা ও সহযো-গিতা বৃদ্ধি এবং মানবের মধ্যে উন্নততর সম্পর্ক স্থাপন করার মহান কর্তব্য সম্বন্ধে আমরা সজাগ, কারণ মানব ব্যক্তির মর্যাদা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পারস্পরিক সহযোগিতা ও উন্নততর সম্পর্কের উপরই নির্ভরশীল ।
>
> লেখক হিসাবে আমরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে এমন একটি সুখী ও সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করছি যেখানে সকলের জন্য অবাধে সমান সুযোগ সুবিধা থাকবে এবং যার ফলে ঔদার্য ও ক্ষমতা মানসিক গুণাবলী ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা বিকাশের সহায়ক হবে । কাজেই আমরা বিজ্ঞানের উন্নতিকে পৃথিবীতে শান্তি ও সম্প্রীতির উপায় বলে বিশ্বাস করি ।[১১৩]

প্রথম বছর সরকার সঙ্ঘকে বিনাসুদে এক লক্ষ টাকা ধার দেয় । এই টাকায় সঙ্ঘ অনেকগুলি কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করে । সেগুলি ছিল ঃ করাচী লাহোর ও ঢাকায় নিজস্ব পাবলিশিং হাউস স্থাপন করা, ষাট বছরের কম সদস্যদের জন্য পাঁচ হাজার টাকার জীবন বীমার ব্যবস্থা, সদস্যদের অর্ধেক ভাড়ায় রেল স্টীমারে যাতায়াতের সুবিধা, প্রতি বছর বিদেশে আমন্ত্রণিক মিশন প্রেরণ, পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষায় সদস্যদের রচনার অনুবাদ প্রকাশ করা, লেখকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ পুস্তক প্রকাশ করা । সঙ্ঘের মুখপত্র স্বরূপ পত্রিকা বের করা ।[১১৪]

---

১১৩। পাকিস্তান লেখক সঙ্ঘের ঘোষণাপত্র, লেখক সঙ্ঘ পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

১১৪। ঐ, , , শিল্প সংবাদ, পূবালী, শ্রাবণ ১৩৬৭, পৃঃ ৩৮-৩৯

Dhaka University Institutional Repository



লেখক সংঘের মুখপত্রের নাম ছিল 'পূরবী'। পূরবীর সাধনা ছিল মাটির স্বদেশকে অতিক্রম করে বৃহত্তর মানব-প্রেমের সাধনা করা, মুসলমানদের জাতীয়তার লক্ষ্য যা।[১১৫] পরবর্তীকালে এর নতুন নামকরণ হয় 'লেখক সংঘ পত্রিকা'।

লেখক সংঘের চেষ্টায় বিভিন্ন প্রকার সাহিত্য-পুরস্কারের ব্যবস্থা হয়। এগুলির মধ্যে ছিল শিল্পপতি আদমজীর অর্থানুকূল্যে আদমজী পুরস্কার /প্রতিষ্ঠা ১৯৬০/, শিল্পপতি দাউদের অর্থানুকূল্যে দাউদ পুরস্কার /১৯৬৩/, ন্যাশনাল ব্যাংক কর্তৃক ন্যাশনাল ব্যাংক পুরস্কার/১৯৬৪/। এতদ্ব্যতীত সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর-পরই প্রবর্তিত হয় সাহিত্য-শিল্পের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার Presidents Award for Pride and Performance.

## তিন

### রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন

১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মের শত বর্ষপূর্তি উপলক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উৎসবের আয়োজন শুরু হয়। পূর্ব বাংলায় তখন ছিল ভিন্ন পরিস্থিতি। এ-ব্যাপারে সামরিক সরকারের কোনো প্রকাশ্য বিরোধিতা না-থাকলেও কিছুকাল পূর্বে নানা অজুহাতে আলাউদ্দিন আল আজাদ, কে,জি, মোস্তফা ও আনোয়ার জাহিদ প্রমুখ সংস্কৃতিসেবীদের গ্রেফতার করা হয়।[১১৬] ফলে ঢাকার সংস্কৃতি-অঙ্গনে এক থমথমে ভাব বিরাজ করছিল। এ-অবস্থায় মফস্বলের কিছু কিছু আয়োজনের খবর সংবাদপত্রে বের হতে শুরু করে, এমনকি বগুড়া এবং ফরিদপুরের শতবার্ষিকী উদযাপন কমিটির সভাপতি হিসাবে জেলা প্রশাসকদের নামও দেখা যায়।[১১৭] এভাবে ধীরে-ধীরে সংস্কৃতিসেবীদের অস্বস্তি ও আশঙ্কার ভাব কেটে গিয়ে তৎপরতা শুরু হয়। প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিনিয়ত উৎসব-আয়োজনের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে শুরু করে। ঢাকায়ও ছোট-বড় অনেক প্রতিষ্ঠান এ-বিষয়ে কর্মসূচী গ্রহণ করে।

---

১১৫। সম্পাদকীয়, পূরবী, ঐ, পৃ: ৪০

১১৬। আলাউদ্দীন-আল আজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার (৫.৮.৭৪)

১১৭। আজাদ, মার্চ ৬ ও ৩১, ১৯৬১

Dhaka University Institutional Repository



কিন্তু সামরিক সরকার নিশ্চুপ থাকলেও পাকিস্তানবাদী বাঙালী বুদ্ধিজীবীগণ চুপ থাকেন নি। তাঁরা এই সুষ্ঠুপূর্ব অনুষ্ঠানাদিতে মুকুলনীয় প্রবণতার নিশানা এবং পাকিস্তানী আদর্শ ও ইসলামী ঐতিহ্য বিরোধী শক্তির সমাবেশ দেখতে পেলেন এবং প্রাণপণে এর বিরোধিতা শুরু করলেন। দৈনিক আজাদ এদের মুখপত্রে পরিণত হল। ১লা বৈশাখ, এক সম্পাদকীয় লিখে আজাদ সবাইকে সাবধান করে দেয়।

> তোমরা জান, রবীন্দ্রনাথের দোহাই তুলিয়া খণ্ড বাংলার আত্মাকে আমাদের তামদ্দুনিক জীবনের বিশুদ্ধ ভাবধারা আবার সংযোগ দেওয়া চলিবে না। একদল লোক পশ্চিম বাংলার সাহিত্যের অন্ধ অনুসারী ও ভক্ত। তাদের রবীন্দ্রভক্তি বিপদের কারণ হইতে পারে এবং বাইরের যারা পাকিস্তানকে দ্বিধাহীন মনে গ্রহণ করে নাই, তারা এই সুযোগে তামদ্দুনিক অনুপ্রবেশের খেলায় মাতিতে পারে।

১২ই বৈশাখের 'রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ব পাকিস্তান' সম্পাদকীয়তে বলা হয় যে, রবীন্দ্র শত-বার্ষিকীর অনুষ্ঠান মুসলমানদের কাছে 'কোহেকেদার' ডাকের সমান। এবং 'এ ডাকে সাড়া দিলে তার নিশ্চিত মৃত্যু'। দুদিন পরে আরো একটি সম্পাদকীয়তে বলা হয়, রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের জাতীয় আদর্শ, ভাষা ও সাহিত্যের 'প্রতি ছিলেন বিরূপ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসহিষ্ণু'। সুতরাং এ-বিষয়ে সাবধান হতে পত্রিকাটি সবাইকে আহ্বান জানায়। এই তিনটি প্রবন্ধ ছাড়াও বৈশাখ মাসের মধ্যে আরো তেইশটি প্রবন্ধ ও অনেক চিঠি আজাদে প্রকাশিত হয়। প্রতিটিতে নানাভাবে ও নানা যুক্তিতে রবীন্দ্র সাহিত্যের সীমাবদ্ধতা, মুসলমানদের নিকট এর অগ্রহণযোগ্যতা এবং শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্যোক্তাদের পাকিস্তান-বিরোধী মানসিকতার উপর সবিস্তারে আলোচনা হয়।

পাকিস্তানী দৃষ্টিভঙ্গিতে রবীন্দ্রসাহিত্যকে মূল্যায়নের জন্য এদের উদ্যোগে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ফেনীতে কয়েকটি আলোচনার ব্যবস্থা হয়। ২৮শে বৈশাখ ঢাকা জেলা কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত এ-ধরনের একটি সভায় বক্তৃতা করেন ফজলুল হক সেলবর্সী, কবি মঈনুদ্দীন, দেওয়ান আবদুল হামিদ, বিশ্বেশ্বর চৌধুরী, অধ্যাপক গোলাম আজম, মাওলানা মহিউদ্দীন ও হাফেজ হাবিবুর রহমান। '[illegible]' ও '[illegible] উৎসব' আবৃত্তি করেন যথাক্রমে [illegible] ভূঁইয়া ও আবদুল মান্নান তালিব। বক্তারা রবীন্দ্রনাথকে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের

বিরোধী, বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরসাধক ও প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শের অনুসারী বলে অভিহিত করে সর্বসম্মতিক্রমে কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন ঃ

এক. পাকিস্তানের ইসলাম ভিত্তিক জাতীয়তা ও রাষ্ট্রকে খণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে এবং ভারত ও রামরাজ্যের স্বপ্নদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথকে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় কবি হিসাবে চালু করার জন্য একশ্রেণীর তথাকথিত সংস্কৃতিসেবী প্রদেশ-ব্যাপী যে সাংস্কৃতিক অপচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে, এই সভা তাহাদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা জ্ঞাপন করিতেছে।

দুই. পাকিস্তানের বদৌলতে অকল্পিত সুখসম্পদের অধিকারী হইয়াও যাহারা বিদেশী বিজাতীয় কৃষ্টি ও মতবাদের ধ্বজা নাড়িয়া বেড়াইতেছে এবং পূর্ব পাকিস্তানকে ভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট বিকাইয়া দেওয়ার স্বপ্ন দেখিতেছে তাহাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য এই সভা প্রত্যেক দেশাত্ম-বোধ সম্পন্ন পাকিস্তানী ও সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইতেছে।

তিন. পূর্ব পাকিস্তানের বেতারকেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন একাডেমীকে বিজাতীয় সঙ্গীত সাহিত্যের অভিশাপমুক্ত করিয়া জাতীয় ঐতিহ্য ও আদর্শের অনুসারী করার জন্য এবং পূর্ব পাকিস্তানের শিশু ও কিশোর মনকে জাতীয় কৃষ্টির অনুবর্তী করিয়া গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে বাস্তব গঠনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এই সভা পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শে বিশ্বাসী সরকার, সুধীসমাজ ও জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাইতেছে।[১৮]

কিন্তু সরকারের ভ্রূকুটি কিংবা গোষ্ঠী বিশেষের প্রচারণা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। ফাল্গুন-চৈত্র-বৈশাখ ব্যাপী নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রদেশব্যাপী সেমিনার, সাহিত্য-প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি-সঙ্গীতানুষ্ঠান, গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্য-নাটক মঞ্চায়ন চলতে থাকে এবং সুদীর্ঘদিনের জড়তা ও নিস্তব্ধতা কেটে গিয়ে সংস্কৃতিক্ষেত্রে প্রবল প্রাণস্পন্দনের সৃষ্টি হয়। ঢাকা শহরে এতে উদ্যোগ নিয়েছিল তিনটি প্রধান কমিটি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংসদের উদ্যোগে এগারোই বৈশাখ কার্জন হলে প্রধান অনুষ্ঠান হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বেগম সুফিয়া কামাল। তিনি রবীন্দ্রনাথকে সকল রাজনৈতিক বিবেচনার ঊর্ধ্বে অবস্থিত

---

১৮। আজাদ, মে ৮, ১৯৬১

মহান কবি হিসেবে আখ্যায়িত করেন। গীতিনাট্য, আবৃত্তি ও সঙ্গীত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সভা শেষ হয়। দ্বিতীয় দিনের আলোচনা-অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই। বিভিন্ন বক্তা রবীন্দ্রসাহিত্যের সর্বজনীনতা, জনসাধারণের সমস্যা পর্যালোচনায় তাঁর সহানুভূতি এবং তাঁর সাহিত্যে পূর্ব বাংলার জনজীবন ও প্রকৃতির অবদানের কথা উল্লেখ করেন।[119]

ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি এস.এম. মুর্শেদকে সভাপতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক ডঃ খান সারওয়ার মুর্শেদকে সম্পাদক করে রবীন্দ্র-জন্মশত বার্ষিকীর কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়েছিল। পঁচিশে বৈশাখ কারিগরি মিলনায়তনে কমিটির উদ্যোগে চারদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ইমাম হোসেন চৌধুরী। তিনি রবীন্দ্রসাহিত্যকে বিশ্বমানবের জন্য বিশেষ সম্পদ বলে বর্ণনা করেন এবং মতবাদ-আকীর্ণ আধুনিক বিশ্বে কবির চিন্তাধারা উপকারে আসতে পারে বলে মন্তব্য করেন। সভাপতি রবীন্দ্রসাহিত্যকে জাতীয়তা ও প্রাদেশিকতার ঊর্ধ্বে অবস্থিত ও পাক-ভারতের ঐতিহ্য লালিত বলে উল্লেখ করেন। ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, আহসান হাবীব, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান প্রমুখের কবিতার মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতানুষ্ঠান ও রবীন্দ্ররচনা পাঠের মধ্য দিয়ে প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।[120] দ্বিতীয় দিনের আলোচনা-অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই। সেদিনের এক প্রবন্ধে ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন রবীন্দ্রনাথকে চসার, শেকসপীয়ার, বালজাক, তলস্তয়ের মতো 'সমগ্র পৃথিবীরই চিন্তাশীলদের শ্রদ্ধার পাত্র' বলে মত প্রকাশ করেন।[121] অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা ও রাজা ও রাণী মঞ্চস্থ হয়।

ঢাকার প্রেসক্লাবে তরুণ শিল্পী সাহিত্যিক-সাংবাদিক-বিজ্ঞানীদের সমবায়ে 'রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন কমিটি' গঠিত হয়েছিল। সিম্পোজিয়াম, নাটক মঞ্চায়ন, চিত্র-পুস্তক প্রদর্শনী, শিশুদের অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে কমিটি রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাদের শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করে।[122]

---

১১৯। আজাদ, এপ্রিল ২৩ ও ২৪, ১৯৬১
১২০। ঐ, মে ৮, ১৯৬১
১২১। 'রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ব পাকিস্তান', সমকাল, রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬৮, পৃঃ ৮৭৬
১২২। আজাদ, মার্চ ২৯, ১৯৬১

Dhaka University Institutional Repository



চার

## ছায়ানটের প্রতিষ্ঠা

রবীন্দ্র-জন্মশত বার্ষিকী সাফল্যজনকভাবে সমাপ্ত হলে কোনো-কোনো কর্মী সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করার জন্য স্থায়ী সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। ঢাকা ও জয়দেবপুরে দুটি ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হয়ে তাঁরা এ-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিলেন। এভাবেই 'ছায়ানট'-এর প্রতিষ্ঠা ঘটে। বেগম সুফিয়া কামাল ও ফরিদা হাসান যথাক্রমে এর প্রথম সভানেত্রী ও সাধারণ সম্পাদিকা ছিলেন।[১২৩]

ছায়ানট মূলত একটি সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠান। এর প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃতি ও সঙ্গীত-চর্চায় এদেশের ঐতিহ্য ও প্রকৃতি-মুখী হওয়া। ঢাকার কারিগরী মিলনায়তনে 'হাজার বছরের বাংলা গানের আসর' ছিল প্রতিষ্ঠানটির প্রথম প্রকাশ্য অনুষ্ঠান। এর অন্যান্য নিয়মিত অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল রবীন্দ্র-নজরুল জন্মতিথি, বর্ষবরণ, বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব ও বসন্তোৎসব পালন।[১২৪] বর্ষবরণ ও শারদোৎসবের অনুষ্ঠান হত যথাক্রমে রমনার বটমূলে ও বলধা গার্ডেনে। অনুষ্ঠানে নানাভাবে দেশজ পরিবেশ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হত। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নির্বাচিত গানের মধ্যে 'আবার তোরা মানুষ হ / অনুকরণ খোলস ভেদি কায়মনে বাঙালী হ' — গানটি বিশেষ স্থান দখল করেছিল।

১৯৬৩ সালের সঙ্গীত শিক্ষার জন্য ছায়ানটের উদ্যোগে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

---

১২৩। সনজীদা খাতুন, ছায়ানট, ছায়ানট সঙ্গীত বিদ্যায়তন পত্রিকা / ঢাকা : ১৩৮০ /, পৃঃ ৭-৮

১২৪। ঐ, পৃঃ ৮-১১

Dhaka University Institutional Repository



পাঁচ

## ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে ও কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড ও পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার আর্থিক আনুকূল্যে ১৯৬৩ সালের ২২–২৮ সেপ্টেম্বর সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার মিলনায়তনে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' উদযাপিত হয়।[১২৫] অনুষ্ঠানের মূলপ্রেরণা ছিল বাংলা বিভাগের ছাত্র ও শিক্ষকদের অভিজ্ঞতাকে 'চার দেয়ালের পরিধি, পুঁথির পরিবেষ্টন ও গবেষণার অনুশীলন থেকে বিস্তৃত করে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে' দিয়ে 'ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে দেশবাসীর কৌতূহল, শ্রদ্ধা আর চেতনা সৃষ্টি' করা।[১২৬]

সমস্ত আয়োজনটিকে আলোচনা, কবিতা–গদ্য–নাটক থেকে পাঠ, সঙ্গীতানুষ্ঠান ও প্রদর্শনী এই কয়ভাগে বিন্যাস করা হয়। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের উপর আলোচনায় মূল প্রবন্ধ পড়েন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক ও সৈয়দ আলী আহসান। হাজার বছরের বাংলা কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, বাংলা গানের অনুষ্ঠান পরিচালনায় আর হেনা মোস্তফা কামাল। নাটক থেকে পাঠের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মুনীর চৌধুরী ও গদ্য থেকে পাঠের পরিচালনা করেন ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম।[১২৭]

প্রদর্শনীর দায়িত্বে ও ব্যবস্থাপনায় ছিলেন জয় কাজী দীন মুহম্মদ ও আহমদ শরীফ। এর শাখা ছিল চারটি : ভাষার বিবর্তন, সাহিত্যের বিকাশ, লিপির পরিবর্তন ও মুদ্রণের ইতিহাস। চার্ট, রেখাচিত্র, স্থির চিত্র, হস্তলিখিত পুঁথি, প্রথম যুগের মুদ্রিত গ্রন্থ প্রভৃতির সাহায্যে

---

১২৫। মুহম্মদ আবদুল হাই (সম্পাদক), ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ, (ঢাকা : বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৭০), পৃঃ ৮৯

১২৬। ঐ পৃঃ ১

১২৭। ঐ, পৃঃ ৯৮–৮৮

Dhaka University Institutional Repository



প্রদর্শনীকে উপভোগ্য ও সর্বসাধারণের সহজবোধ্য করে তোলা হয়। চিত্রগুলির মধ্যে ছিল বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের বাংলা সাহিত্যচর্চা, মুসলমানদের বাংলাদেশে আগমন, বৈষ্ণব সাহিত্য, রোসাঙ্গ রাজদরবার, ইংরেজদের বাংলাদেশ বিজয় প্রভৃতি। এ-ছাড়া ছিল মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, কায়কোবাদ, মীর মশাররফ হোসেন, লালন শাহ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী ও নজরুলের ছবি। আলাওলের পদ্মাবতী কাহিনীর একটি চিত্ররূপও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[১২৮] প্রদর্শনীর প্রবেশপথে একটি পোস্টারে শোভা পাচ্ছিল সতের শতকের কবি আবদুল হাকিমের বিখ্যাত চরণ কয়টি ঃ

যে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ ন যায়।।
মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।

বাইশে সেপ্টেম্বর সকাল নটায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। বিভাগীয় অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তন হয়েছিল পূর্ব বাংলায়, উপমহাদেশের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম স্বতন্ত্র বাংলা বিভাগ চালু হয়, বাংলা রাষ্ট্রভাষা হয়েছে এদেশেই এবং বাংলা ভাষা-সাহিত্যের গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা এখানেই হয়েছে। এর একটা অদৃশ্য ইঙ্গিত হচ্ছে যে, 'বাংলা ভাষার যাবতীয় উন্নতি ও উৎকর্ষ বিধানের ভার বিধাতা এদেশের মানুষের হাতেই তুলে দিয়েছেন'। শিক্ষাদানের বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিশেষ দায়িত্ব হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন, 'দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য, আত্মিক বিশ্বাস এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার রক্ষণাবেক্ষণ, তার বিকাশ ও রূপায়ণে' সহায়তা করা।[১২৯]

'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' সেকালের সাংস্কৃতিক জগতে একটি সাড়া-জাগানো অনুষ্ঠান ছিল। প্রতিদিন হাজার-হাজার লোক অকৃত্রিম কৌতূহল ও আগ্রহ নিয়ে প্রদর্শনী দেখেছে, আলোচনা শুনেছে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপভোগ করেছে। ঢাকার প্রতিটি দৈনিক ও সাপ্তাহিক এর উপর প্রতিবেদন ও সম্পাদকীয় রচনা করেছে।

---

১২৮। ঐ, পৃঃ ৬
১২৯। ঐ, পৃঃ ১৮–২০

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন ধারণা দেওয়ার মধ্যে অনুষ্ঠান-টির গুরুত্ব নিহিত। কোনোরূপ সাম্প্রদায়িক চিন্তা উদযোক্তাদের কাজকর্মে প্রতিফলিত হয়নি, যদিও অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মধ্যযুগের মুসলমানদের সাহিত্যকর্মের উপর। এই অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা সেকালের পক্ষে নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

ছয়

## পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান

বাংলা নববর্ষের দিন বাঙালীদের কাছে অত্যন্ত গর্বের দিন। নানা অনুষ্ঠান-উৎসবের মাধ্যমে দিনটিকে পালন করা বাঙালী সংস্কৃতির অতি প্রাচীন রীতি। ব্যবসায়ীরা এদিনে হালখাতা খোলে ও গ্রামে-গঞ্জে মেলা বসে। পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকে দিনটি ক্রমশঃ গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছিল এবং নববর্ষ পালনের ধরনও ধীরে-ধীরে কমে আসছিল। কিন্তু ১৯৬১-র পরবর্তী বছরগুলিতে আবার সর্বস্তর অনুষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৯৬৪ সালে তথা ১৩৭১ সালে পহেলা বৈশাখ প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হয়। প্রাদেশিক সরকার এ-দিনটিকে ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করে এবং সেদিন ঢাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অভূতপূর্ব জনসমাগম দেখা যায়। সেবছর বাংলা একাডেমী, সাহিত্যসংসদ, ছায়ানট, অগ্নি মজলিশ, নিক্কণ ললিতকলা কেন্দ্র, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্রসংসদ, ইনজিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদ, সমাজকল্যাণ কলেজ ছাত্রসংসদ, গীতিকলা সংসদ, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গনে ঐকতান গোষ্ঠীর অনুষ্ঠানে এত দর্শক-শ্রোতা ছিল যে, ভীড়ের চাপে বেশ কয়েকজন আহত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে হাঙ্গামা হবার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দর্শক-সংখ্যা দেখে কোনো-কোনো পত্রিকায় বিস্ময় প্রকাশ করা হয়।[১৩০]

---

১৩০। দি পাকিস্তান অবজারভার, এপ্রিল ১৫, ১৯৬৪

Dhaka University Institutional Repository



## কবিতার গতি-প্রকৃতি

ইসলাম ধর্মসম্পৃক্ত বিষয় অবলম্বনে কেউকেউ কবিতা রচনা করেছেন এসময়ে। রওশন ইজদানীর 'খাতামুন নবীঈন' এর বিষয়বস্তু শেষ নবী মোহাম্মদের /দঃ/ জীবন-কাহিনী। এটি পুঁথির ঢং-এ লেখা, তবে কোথাও কোথাও কবির সহজ কবিত্বের পরিচয় আছে। তালিম হোসেনের 'শাহীন' শিল্পগুণে সমৃদ্ধতর, কিন্তু অত্যুক্ত ভাবে কবিতার প্রসাদগুণ ব্যাহত হয়েছে। সুফী জুলফিকার হায়দারের 'ফের নাবাও মুসলমান'-এ কবির আবেগ, আন্তরিকতা ও ভাবোচ্ছ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। ইকবাল, জিন্নাহ, লিয়াকত আলী ও আইউব খানের প্রশস্তি ও চিন্তাধারার বিবরণ আছে তাঁর দ্বিতীয় কবিতা-সংকলন 'সুপ্ত যার, জাগলো যে পড়লো বারাদি মধ্যে।

ইসলাম ও পাকিস্তানের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নজরুল ও ইকবালের কবিতাকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা হয়েছে এ-পর্বে। 'নজরুলের ইসলামী কবিতা', 'ইনতেখাব', 'ইকবালের কাব্যসঞ্চয়ন', 'ইকবালিকা', 'বালে জিবরিল', 'ইকবাল নজরুল নামাহ', 'শিকওয়াহ ও জওয়াবে শিকওয়াহ' প্রভৃতি অনূদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলির কথা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

এ-সময়ে প্রকাশিত অধিকাংশ কবিতা উদারনৈতিক মানবতাবাদের লক্ষ্যাক্রান্ত। এদিকে মুক্তভাবে সিদ্ধান্ত করা যায়। প্রেম-প্রকৃতি ও মানুষকে নিয়ে সরল রোমান্টিক ভাবোচ্ছ্বাসে প্রদীপ্ত প্রথম পর্যায়ের কবিতাবলি। মনিরুজ্জামানের একটি কবিতার অংশ বিশেষ উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

> শুধু মনে হয়: সব যেন তুমি তুমি।। তুমি যেন
> মৃন্ময় অন্বয়, মধুর মদির ওই
> নম্রতা মধুপনভারে মুগ্ধ মাধবীর লতা
> যার আঁখি স্বপ্নঘন পীনায়িত মধুপের মত। [১৩১]

---

১৩১। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সনেট যে গান, দুর্লভ দিন, (ঢাকা: সমকাল প্রকাশনী, ১৯৬১)
পৃ: ৬৬

Dhaka University Institutional Repository



এধারার আরো কয়েকটি কাব্যসংকলন হচ্ছে আবুল কালাম শেখ নূর মোহাম্মদের 'শোনো মেঘ কথা কয়', মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর 'জুলেখার মন', ওমর আলীর 'এদেশে শ্যামল রং রমণীর সুনাম শুনেছি', কাদের নওয়াজের 'নীল কুমুদী', মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার 'মন ও মৃত্তিকা', শামসুর রহমানের 'সৃষ্টি কথা গান', ইনামুল হকের 'অনুরাগ', জাহানারা আরজুর 'নীল স্বপ্ন', মোহাম্মদ মামুনের 'প্রেম পড়েছি কৃষ্ণচূড়ার' এবং আতাউর রহমানের 'একদিন প্রতিদিন' প্রভৃতি। দ্বিতীয় পর্যায়ের পড়ে সে-কবিতাগুলি, যেগুলি সমকালীন জীবনের গ্লানি ব্যর্থতা ও হতাশাকে অবলম্বন করে উদার-নৈতিক মানবতাবাদের সমস্যা-দ্বন্দ্ব ও অনস্থাকে প্রকাশ করেছে:

আমার হৃদয় যেন অতীতের নিঃস্ব নগর
যেখানে প্রেতের মতো ভাঙা প্রাণে নিশাচর হাওয়া
মাথা কোটে অনিবার, শূন্যতায় তারার চৈতন।[১৩২]

শামসুর রাহমানের এটি ও 'রৌদ্র করোটিতে' সংকলিত অন্য যে-সমস্ত কাব্য এ-পর্যায়ে পড়ে সেগুলি হল হাসান হাফিজুর রহমানের 'বিমুখ প্রান্তর', আবদুল গণি হাজারীর 'সামান্য ধন' ও 'সূর্যের সিঁড়ি', আহসান হাবীবের 'সারা দুপুর', আল মাহমুদের 'লোক লোকান্তর', সৈয়দ শামসুল হকের 'একদা এক রাজ্যে', এবং সৈয়দ আলী আহসানের 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত' ও 'অনেক আকাশ'।

আরো এক ধারার কবিতা-রচনা শুরু হয়েছে এ-পর্বে, যাতে ধরা পড়েছে পূর্ব বাংলার ভূগোল-ইতিহাস-ঐতিহ্য ও প্রকৃতি ভিত্তিক কবিমনের বিশেষ রূপ। বিশেষ আবেগ-অনুভূতি নিয়ে কবিরা তাকাতে শুরু করেছেন স্বদেশের দিকে। সানাউল হকের 'সম্ভবা অনন্যা' ও সূর্য অন্যতর হতে এ-দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবনে স্মরণীয়। কবিমানস ও বাংলা-প্রকৃতি পরস্পর সমানুপাতে প্রভাবিত হয়ে কবি-প্রকৃতিকে প্রকাশ করেছে বিভিন্ন কবিতায়। ১৯৬১ সালে জন্মশতবার্ষিকী পালনের সময় রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ করে যে-সমস্ত কবিতা রচিত হয়েছিল তাতেও লক্ষ করা গেছে একটি বিশেষ দেশাত্মবোধ। এভাবে ধীরে ধীরে কবিতায় বাঙালী জাতীয়তাবাদের অস্ফুট বিকাশ ঘটতে শুরু করে।

আলাউদ্দিন আল আজাদের 'মানচিত্র' ও হোসেনে আরার 'মিছিল' এ-সময়েই প্রকাশিত হয়। এগুলিতে ধরা পড়ে কবিতা-রচনার নতুন দিক। সমাজের অত্যাচারিত শ্রেণীর পক্ষাবলম্বন করেছেন তাঁরা। কবিতাকে তাঁরা সমাজ-পরিবর্তনের লক্ষ্যে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। সংকলন দুটির মধ্যে আজাদের সাফল্যই অধিকতর।

---

১৩২। শামসুর রাহমান, 'একান্ত সোনাটা', প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (ঢাকা: বার্ডস এ্যান্ড বুকস, ১৯৬০), পৃ: ৪০

Dhaka University Institutional Repository



# চতুর্থ অধ্যায়: ১৯৬৫- ১৯৬৯

Dhaka University Institutional Repository



## ১. রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ

### এক

### পাক-ভারত সম্পর্ক ও ছয় দফার প্রশ্ন

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সাফল্যলাভের পর জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে আইউব খান আভ্যন্তরীণ রাজনীতি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হন এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অধিকতর উৎসাহ দেখাতে থাকেন। তিনি ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে চীন ও এপ্রিল মাসে রাশিয়া সফর করেন এবং জুন মাসে লণ্ডনে কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদান করেন। মে মাসে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে পাকিস্তানের সহযোগিতার চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং এর ফলে স্বল্পকালের জন্য চীন-পাকিস্তান-ইন্দোনেশিয়া অক্ষ গড়ে উঠে।[1] এই সময়ে শাসনতন্ত্রের ৩৫৬ এবং ৩৫৭ ধারা প্রয়োগ করে ভারত কাশ্মীরকে চিরস্থায়ীভাবে তার অঙ্গরাজ্যে পরিণত করতে প্রয়াসী হয়।[2] এর প্রতিক্রিয়ায় আইউব খান কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তা শুরু করেন। ইতিপূর্বে ১৯৬২ সালে চীনের সঙ্গে যুদ্ধে ভারতের চরম পরাজয়, ১৯৬৫ সালে কচ্ছের রানের যুদ্ধে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর পরাক্রম-প্রদর্শন তাঁকে অত্যন্ত সাহসী করে তুলেছিল। একই সময়ে শেখ আবদুল্লার গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে ভারত-অধিকৃত কাশ্মীরে উত্তেজনা ও অসন্তোষ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল। পাকিস্তান এই সুযোগে সেখানে সৈন্য অনুপ্রবেশ করিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। নয়ই আগস্ট জম্মু ও কাশ্মীরে একটি বিপ্লবী পরিষদ গঠিত হয় এবং এদের বাহিনী আজাদ কাশ্মীরের সৈন্যদের সহায়তায় ভারত-অধিকৃত এলাকায় অভিযান শুরু করে।[3] ফলে যুদ্ধ বিস্তৃত করার জন্য ভারত ৬ই সেপ্টেম্বর অতর্কিতে সীমানা লাহোর আক্রমণ করলে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। বাইশে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তুমুল যুদ্ধ চলার পর জাতিসংঘের নির্দেশে পরদিন যুদ্ধবিরতি সম্পন্ন হয়।

---

১। Herbert Feldman, (From Crisis to Crisis,...) p.149

২। ঐ, পৃঃ ১৩৮

৩। ঐ, পৃঃ ১৪২

দুই পক্ষের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি তবে কোনো পক্ষই নিশ্চিত-শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে পারেনি। তুলনামূলকভাবে পাকিস্তানের শক্তি ভারতের চেয়ে কম হওয়ায় ক্ষতির তীব্রতা পাকিস্তানেই বেশি হয়।

১৯৬৬ সালের ৩রা জানুয়ারী রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের আমন্ত্রণে আইউব খান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী (১৯০৪-৬৬) তাসখন্দে গমন করেন। সপ্তাহব্যাপী আলাপ-আলোচনার পর উভয়ে নয় দফার এক শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তিতে জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী উক্ত প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের কথা বলা হয়। এবং ~~দুই নেতা জম্মু ও কাশ্মীর সম্পর্কে মত বিনিময় করেন।~~[৪] জম্মু ও কাশ্মীর সম্পর্কে 'উভয় পক্ষ নিজ নিজ মতামত জ্ঞাপন করে'।[৪]

যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া পাকিস্তানের দুই প্রদেশে দুই রকমের হল। যুদ্ধের সতের দিন পূর্ব বাংলা ছিল সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন। প্রতিরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় নিরাপত্তার জন্য তাকে সম্পূর্ণভাবে ভারতের করুণার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়। ভারত পূর্ব বাংলা আক্রমণ করেনি এবং পাকিস্তান সরকার প্রচার করলেন চীনের ভয়েই ভারত এতে বিরত থেকেছে। এই বক্তব্য পূর্ব বাংলার সচেতন জনগণের কাছে চরম অপমানজনক বলে বিবেচিত হল এবং তারা পাকিস্তানের সামগ্রিক কাঠামোতে নিজেদের নৈরাশ্যজনক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হল।[৫] দ্বিতীয়ত, যুদ্ধের পশ্চিম পাকিস্তান থেকে রপ্তানী বন্ধ থাকায়, শিল্পজাত ও অন্যান্য দ্রব্যাদির অভাবে পূর্ব-বাংলায় গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়। ধান-চাল প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দামও এই সময়ে বেশ বেড়ে যায়।[৬] তৃতীয়ত, যুদ্ধে বাঙালী সৈনিকদের কৃতিত্ব, বিশেষত লাহোর রণাঙ্গণে ও আকাশযুদ্ধে তাদের অপরিসীম সাহস ও শৌর্যবীর্য, বাঙালীদের মনে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা এনে দেয়। বাঙালীরা অসামরিক ও কাপুরুষ জাতি — পাকিস্তানের দীর্ঘ দিনের প্রচারণাও স্পষ্টভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হয়।[৭]

---

৪। 'তাসখন্দের ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্র', দৈনিক ইত্তেফাক, জানুয়ারী ১১, ১৯৬৬

৫। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে শেখ মুজিবুর রহমানের লিখিত জবানবন্দী'; আবুল কাসেম ফজলুল হক, মুক্তিসংগ্রাম, /ঢাকা : বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭২/ পৃঃ ৪১৪

৬। ন্যাপের ১৪ দফা ও জাতীয় মুক্তি কর্মসূচী, যুগ্ম সম্পাদক মহিউদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত, /পুস্তিকা/, /প্রকাশের তারিখ নেই/, পৃঃ ৬।

৭। আতাউর রহমান খান, স্বৈরাচারের দশ বছর, পৃঃ ৩৪৬

Dhaka University Institutional Repository



পশ্চিম পাকিস্তানের পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। যুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের অপরিসীম ক্ষতি সাধিত হয়, অসংখ্য জল-অফিসার প্রাণ হারায়, কোটি কোটি টাকার যুদ্ধাস্ত্র নষ্ট হয় এবং বিরাট এলাকা ভারতের দখলে চলে যায়। সর্বোপরি তাসখন্দ চুক্তিতে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান সম্পর্কে কোনো কথা থাকেনি। ফলে পাকিস্তানে সেখানে এই চুক্তি অপমানজনক বলে গণ্য হল এবং চুক্তির শর্তাদি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রবল অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দেখা দেয়।[৯] বিক্ষোভ দমনের ব্যাপারে স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয় ও ধরপাকড় শুরু হয়। এই অসন্তোষকে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিরোধী দলীয় নেতারা ১৯৬৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী লাহোরে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর বাসভবনে মিলিত হন। নেজামে ইসলাম, জামাতে ইসলাম, মুসলিম লীগ (কাউন্সিল) অধিবেশনে যোগ দেয়, এন ডি এফ যোগ দিতে অস্বীকার করে এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবুর রহমান প্রথমে ইতস্তত করে পরে এক বিরাট দলবল সহ সেখানে উপস্থিত হন।[১০]

সম্মেলনে শেখ মুজিব দাবি করেন, আন্দোলনের কর্মসূচীতে পূর্ব বাংলার দাবি-দাওয়াও থাকা দরকার এবং পূর্ব বাংলার দাবি হিসাবে ছয়টি দফা পেশ করেন।[১১]

---

৯। আতাউর রহমান খান, পৃ: ৩৫৪-৫৫     ১০। ঐ, পৃ: ৩৫০-৫৬

১১। পরবর্তী কালে ছয় দফা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করলে এর রচনা ও রচয়িতা সম্পর্কে নানা মত দেখা দেয়। আওয়ামী লীগ থেকে বলা হত এগুলির উদ্ভাবন ও প্রণয়নের কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে শেখ মুজিবুর রহমানের নিজের। (ড: মযহারুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, ঢাকা, বাংলা একাডেমী ১৯৭৪, পৃ: ২৭৩-২৭৪)। এক কালে শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক সহকর্মী ও পরবর্তী কালে প্রতিদ্বন্দ্বী আতাউর রহমান খান বলেছেন, সেপ্টেম্বর যুদ্ধের পর কয়েকজন বাঙালী অফিসার পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব বাংলার সম্পর্কের ব্যাপারে সাত দফার একটি দলিল প্রস্তুত করেন। তার ভিত্তিতে আন্দোলন করার জন্য পূর্ব বাংলার বিরোধী দলীয় নেতাদের কাছে তা প্রেরণ করেন। শেখ মুজিব এর প্রথম ছয়টি দফা গ্রহণ করে নিজের নামে প্রচার করে দেন। (স্বৈরাচারের দশ বছর, পৃ: ৩৫৬)। Herbert Feldman লিখেছেন, এগুলি রচনার জন্য যে ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা থাকা দরকার শেখ মুজিবের তা ছিল না। প্রাথমিকভাবে রচনা করেছিলেন কয়েকজন বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও উচ্চপদস্থ সরকারী আমলা, এবং দফার সংখ্যা ছিল চার। (From Crisis to Crisis, p.) পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধী দলীয় নেতারা প্রচার করতেন এগুলি স্বয়ং আইয়ুব খানের তথ্য সচিব আলতাফ গওহরের রচনা; আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনে ভাঙন ধরানোর জন্য তিনি এগুলি রচনা করে মুজিবের মাধ্যমে সম্মেলনে উপস্থাপিত করেন। ফলে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে ফাটল ধরে। (Tariq Ali, Pakistan : Military Rule..., p.130) পিকিংপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি থেকে বলা হত, এগুলির প্রণয়নে ও প্রচারে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের হাত ছিল। (ন্যাপ কার্যনির্বাহক কমিটির সভায় গৃহীত প্রস্তাবের ভূমিকা, দৈনিক পাকিস্তান, এপ্রিল ১১, ১৯৬৬)। 'ছ দফা আন্দোলনের সময় অনেক আওয়ামী লীগ নেতাই বিশ্বাস করতো যে, একটা ভাল রকমের হাঙ্গামা লাগাতে পারলেই মার্কিন সাহায্যে তাদের আশা পূর্ণ হবে, একথা আমি প্রত্যক্ষভাবেই অবহিত' — লিখেছেন বাংলাদেশের একজন প্রবীণ সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী (দরবার-ই-জহুর, সংবাদ, জানুয়ারী ১, ১৯৭৮)।

ইদানিং কালে অধিকাংশই মেনে নিয়েছেন যে, বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও সরকারী কর্মচারীই এগুলি প্রণয়ন করেছিলেন, তবে এগুলি জনপ্রিয় করার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব শেখ মুজিবুর রহমানের ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের।

Dhaka University Institutional Repository



কিন্তু অন্যান্য নেতা এ-বিষয়ে আলোচনা করতে অসম্মত হন। এতে পূর্ব বাংলার স্বার্থের প্রশ্নে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের চিরাচরিত উদাসীনতার পুনঃপরিচয় পেয়ে তিনি সম্মেলন ত্যাগ করেন, তারপর চুক্তির প্রতি সমর্থন জানান, এবং ছয় দফার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ হতে বাঙালীদের প্রতি আহ্বান জানান।[12] ১৯৬৬ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে ছয় দফার প্রতি 'অকুণ্ঠ সমর্থন' জানান হয়[13] এবং পরবর্তী কাউন্সিল বৈঠকে /১৮-২০ মার্চ/ এটাকে দলের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করা হয়।[14] দফাগুলির মূল বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

১ লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র গঠিত হবে, সরকার হবে সংসদীয় ধরনের, প্রত্যক্ষ সর্বজনীন ভোটে নির্বাচিত বিধান সভার ক্ষমতা হবে সার্বভৌম।

২ ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা শুধু দেশরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, অন্যান্য বিষয়ে অঙ্গরাজ্যগুলির ক্ষমতা হবে নিরঙ্কুশ।

৩ সমগ্র দেশের জন্য দুটি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে, অথবা, বর্তমান নিয়মে সমগ্র দেশে শুধু একটি মুদ্রাই চালু থাকবে তবে সেক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে এমন ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে পুঁজি পাচার বন্ধ হয়।

৪ কর ধার্যের ব্যাপারে প্রদেশের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে। এ-ব্যাপারে কেন্দ্রের কোনো ক্ষমতা থাকবেনা। একই হারে অঙ্গরাষ্ট্রগুলির করের অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে।

৫ ফেডারেশন ভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব থাকবে এবং অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকার তা থেকে নির্দিষ্ট হারে বৈদেশিক মুদ্রার অংশ পাবে। অঙ্গরাষ্ট্রগুলির মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদি চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা অন্য জাতীয় কোনো বাধা নিষেধ থাকবে না। বিদেশে বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণের বা বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা অঙ্গরাজ্যগুলির থাকবে।

---

১২। Herbert Feldman, p. 179

১৩। দৈনিক ইত্তেফাক, ফেব্রুয়ারী ২২, ১৯৬৬

১৪। 'আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে ৬ দফা অনুমোদন' ঐ, মার্চ ২০, ১৯৬৬

Dhaka University Institutional Repository



৬ আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে স্বীয় কর্তৃত্বে আধা-সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হবে।১৫

আওয়ামী লীগ ছয়দফার পক্ষে ব্যাপক তৎপরতা শুরু করে। শেখ মুজিব প্রদেশের বিভিন্ন শহরে জনসভা করে ছয় দফা প্রচার করেন। তাঁর লিখিত 'আমাদের বাঁচার দাবী ছয়-দফা কর্মসূচী' নামক পুস্তিকাটি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

আন্দোলনের গতি ও তীব্রতা দেখে সরকার প্রমাদ গুণল এবং এর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে প্রচারণা শুরু করল। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের আইনমন্ত্রী ছয় দফাকে রাষ্ট্রদ্রোহী ব্যক্তিদের কার্যকলাপ বলে অভিহিত করলেন,[১] কেন্দ্রীয় সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো শেখ মুজিবের সঙ্গে ছয় দফার ব্যাপারে প্রকাশ্য বিতর্কের চ্যালেঞ্জ দিলেন।১৭ মার্চ মাসে পূর্ব বাংলা সফরের সময় আইউব খান এই কার্যকলাপকে দেশের সংহতি বিনষ্টকারী বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ও বৃহৎ বাংলার চেষ্টা বলে আখ্যায়িত করলেন,১৮ এমনকি এক সভায় অধিবেশনে একে দমনের জন্য গৃহযুদ্ধেরও হুমকি দিলেন।১৮ক প্রকাশ্যত এভাবে আন্দোলন ধ্বংস করার চেষ্টা চলল, অন্যদিকে গোপনে লাইসেন্স-পারমিট দিয়ে আওয়ামী লীগ সদস্যদের আন্দোলন বিমুখ করার চেষ্টা হল। এ-ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট কিছু কিছু সফলতা লাভ করলেন।১৯

১৯৬৬ সালের ১৮ই এপ্রিল শেখ মুজিবকে যশোরে বন্দী করা হল। জামিনে তাঁকে মুক্তি দিয়ে ২৫শে এপ্রিল পুনরায় জামিন-অযোগ্য ওয়ারেন্টে বন্দী করা হল। পরবর্তী দুবছরে তাঁকে একের-পর-এক নানা অভিযোগে বন্দী করা হতে থাকে এবং জেল-গেটে-জেলে ধরা নাটক চলে। এই ধারাবাহিক অব্যাহত থাকে আগরতলা মামলায় জড়ানো পর্যন্ত।২০ কিন্তু আন্দোলন বন্ধ হয়নি। ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন এর সমর্থনে সাফল্যজনকভাবে হরতাল পালিত হয় এবং সেদিন সরকারী মতে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ১১জন,২১ ——— পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। তাছাড়া ১৯৬৬ সালের ৩রা আগস্টের মধ্যে কারারুদ্ধ করা হয় প্রায় ৩০০০ জনকে।[২৩] প্রেসিডেন্ট সে-বছর আগস্ট ও ডিসেম্বর মাসে ঢাকা আসেন এবং আওয়ামী লীগের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালান,[২৪] ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে পুনরায় প্রদেশ সফরে এসেও তিনি অনুরূপ বক্তব্য রাখেন।

এভাবে অতি অল্পকালের মধ্যে ছয় দফার আহবান পূর্ব বাংলার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ল।

---

১৫। নুরুল ইসলাম (সম্পাদক)- ছয় দফা, (পুস্তিকা), (ঢাকা : ১৫ নং পুরানা পল্টন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পক্ষে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত), আবুল কাসেম ফজলুল হকের গ্রন্থে (মুক্তি সংগ্রাম) উদ্ধৃত, পৃঃ ৬১-৬৩

১৬। 'দেশদ্রোহিতার নামান্তর', দৈনিক ইত্তেফাক, ফেব্রুয়ারী ১৫, ১৯৬৬।

১৭। 'শেখ মুজিবের প্রতি ভুট্টোর চ্যালেঞ্জ', দৈনিক ইত্তেফাক, মার্চ ২১, ১৯৬৬

১৮। 'বৃহত্তর স্বাধীন বাংলা গঠনেরই পরিকল্পনা' ৬-দফা সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট আইউবের হুশিয়ারী, ঐ, মার্চ ১৭, ১৯৬৬

১৮ক। 'জাতিকে গৃহযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে', ঐ, মার্চ ২১, ১৯৬৬

১৯। Herbert Feldman, p. 183

২০। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বিশেষ ট্রাইবুনালে শেখ মুজিবুর রহমানের লিখিত জবানবন্দী,' পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪১৮-১৯

২১। দৈনিক আজাদ, জুন ৮-১০, ১৯৬৬

২২।

২৩। Herbert Feldman, p. 182

২৪। Pakistan Chronology, 1966 (Rawalpindi : Press Information Department, Ministry of Information & Broadcasting, Govt. of Pakistan, 1967), p. 55 and 89.

Dhaka University Institutional Repository



## দুই

### ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিভক্তি

১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে মাওলানা ভাসানী কিউবার হাভানায় 'ত্রিমহাদেশীয় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংহতি' সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন। এপ্রিল মাসে এক বিবৃতিতে তিনি ছয় দফা আন্দোলনকে সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব পুষ্ট ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীর অভাবে অসম্পূর্ণ বলে মন্তব্য করেন।[26] তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ঐ জুন মাসের ৬-৭ তারিখে ঢাকায় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভা বসে ও নতুন কর্মসূচী গৃহীত হয়। 'জনগণের ঐক্য, প্রদেশসমূহের স্বায়ত্তশাসন, পাকিস্তানের সংহতি, বৃটেনের ধরনের পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র, সর্বপ্রকার স্বৈরাচারী একনায়কত্বের উচ্ছেদসাধন ও সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রগতির স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদ্দেশ্যে' ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনের জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দাবী সম্বলিত ১৪ দফার একটি বিস্তৃত কর্মসূচী প্রণীত হয়। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সার্বভৌম বিধান সভা গঠন, কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও মুদ্রা রেখে অন্য বিষয়গুলি প্রদেশের হাতে ছেড়ে দেওয়া, পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ভেঙে দেওয়া প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দাবি। তাছাড়া স্বাধীন নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করা, দেশরক্ষার ব্যাপারে পূর্বাঞ্চলকে স্বনির্ভর করে তোলা, নৌবাহিনীর সদর দফতর এখানে স্থানান্তর করা, ব্যাংক, বীমা, পাট ব্যবসা, বৃহৎ শিল্প ও সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি রাষ্ট্রায়ত্ত করার কর্মসূচীও গৃহীত হয়। ব্যক্তিগত মালিকানায় পূর্ব বাংলায় সর্বোচ্চ ৩৩ একর ও পশ্চিম পাকিস্তানে ১০০ একর জমি রাখার প্রস্তাবও নেওয়া হয়।[27]

১৯৬৭ সালে মাওলানা ভাসানী কৃষক সমিতির মাধ্যমে তাঁর দলের কার্যকলাপ সম্প্রসারিত করেন। সাতাশে জানুয়ারী টাঙ্গাইলে 'পূর্ব পাকিস্তান পাট চাষী কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয়। 'যে জমি চাষ করে, সে হবে জমির মালিক', জোতদারী ও মহাজনী প্রথার উচ্ছেদসাধন,

---

২৬। দৈনিক পাকিস্তান, ৮।৪।৬৬; মাওলানা ভাসানী ইঙ্গিত করেছিলেন আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের দিকেই।

২৭। ন্যাপের ১৪ দফা, পুস্তিকা, পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository



পাট শিল্প ও বাংলা জাতীয়করণ করা সম্পর্কিত প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয়।[২৮] সেপ্টেম্বরেই সন্তোষে পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির এক বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশনে পাকিস্তান থেকে 'সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিন-সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বড় ধনিকদের তথা স্বৈরাচারী আইয়ুব শাহীকে উচ্ছেদ করিয়া' সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েমের আন্দোলনের আহ্বান জানানো হয়।[২৯]

ইতিমধ্যে দলের ভেতরে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনের জন্য ছয়-দফা পন্থী আওয়ামী লীগের সঙ্গে সহযোগিতা, গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য আইউব খানের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক ঐক্যফ্রন্ট গঠন ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেয়ে প্রথমে জাতীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া প্রভৃতি প্রশ্নে পূর্ব বাংলা শাখার এক প্রভাবশালী অংশ অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের নেতৃত্বে আলাদা কাউন্সিল বৈঠক আহ্বান করে[৩০] এবং পরে পশ্চিম পাকিস্তানের সমমতাবলম্বী নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে ১৯৬৮ সালের ৩০শে জুন ও ১লা জুলাই তারিখে পেশোয়ারে আলাদা কাউন্সিল বৈঠকে আলাদা 'ন্যাপ' গঠন করে।[৩১] ওয়ালী খান কেন্দ্রীয় কমিটির ও অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ পূর্ব বাংলা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন।

ন্যাপের দ্বিধাবিভক্তি আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অন্তর্দ্বন্দ্বেরই পরিণতি। ওয়ালী খান পরিচালিত ন্যাপ সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্য রাশিয়ার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকেই যুক্তি-সঙ্গত বলে মেনে নিয়ে সাধারণ্যে 'মস্কো-ন্যাপ' হিসাবে পরিচিতি লাভ করে; অপরপক্ষে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন 'ন্যাপ' প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চীন সরকারের বৈদেশিক নীতির পোষকতা করে 'পিকিং ন্যাপ' হিসাবে আখ্যায়িত হয়।

---

২৮। পূর্ব পাকিস্তান পাটচাষী কনফারেন্সে (টাঙ্গাইল) সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর অভিভাষণ, (পুস্তিকা) পৃঃ ৬

২৯। প্রাদেশিক কৃষক সমিতির কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর অভিভাষণ, পুস্তিকা, পৃঃ ১০

৩০। সৈয়দ আলতাফ হোসেন, (সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি), 'ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রশ্নে মতভেদ' ও 'ন্যাপের দ্বিধাবিভক্তি', বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, (ঢাকা, লেখক কর্তৃক প্রকাশিত) পৃঃ ৫৮-৬৩

৩১। ঐ, এবং M. Rashiduzzaman, The National Awami Party of Pakistan : Leftist Politics in Crisis, Pacific Affairs, Fall 1970, pp.398-401

Dhaka University Institutional Repository



## তিন

### পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের (পি ডি এম) জন্ম

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লাহোরে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর বাসভবনে বিরোধী দলীয় নেতাদের যে-বৈঠক হয়, তাতে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনের প্রশ্নে মোটামুটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর পরেও বিক্ষিপ্ত পর্যায়ে আলোচনা চলে কিন্তু বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়নি। ইতিমধ্যে পূর্ব বাংলায় ছয়দফার আন্দোলন অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে এই নেতারা আবার তৎপর হয়ে ওঠেন ও তিরিশে এপ্রিল ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচীর ব্যাপারে ঐকমতে উপনীত হন। মে মাসে ঢাকায় এক বৈঠকে তাঁরা 'পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের' আট দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন। মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), নেজামে ইসলাম, জামাতে ইসলাম, এন ডি এফ ও আওয়ামী লীগের একাংশ এতে যোগ দেয়, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও ছয় দফা পন্থী আওয়ামী লীগ বাইরে থাকে।[32]

পি ডি এম-কর্মসূচীর মধ্যে সর্বজনীন ভোটের ভিত্তিতে সার্বভৌম আইনপরিষদ ও সংসদীয় সরকার গঠন করা, কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, মুদ্রা এবং আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগ ও বাণিজ্য রেখে অন্যান্য বিষয়ে প্রদেশকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া, দুই প্রদেশের মধ্যে দশ বছরের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও কেন্দ্রীয় চাকুরীতে বৈষম্য দূর করা, দেশরক্ষার ব্যাপারে সমতা আনা ও দুই প্রদেশের সমান সংখ্যক সদস্যের সমন্বয়ে দেশরক্ষা পরিষদ গঠন প্রভৃতি ছিল গুরুত্বপূর্ণ।[33]

ছয় দফার আন্দোলনকে দুর্বল করতে আইউব খান বিরোধী দলের নেতাদের পি ডি এম গঠনে উৎসাহিত করেছিলেন — এমন অনুমান কেউ কেউ করেছেন। পি ডি এম গঠিত হলেই ক্ষমতায় অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে, এধরনের আশ্বাসও তিনি দিয়েছিলেন।[34] কিন্তু কার্যত, আশ্বাস বাস্তবায়িত হয়নি এবং আন্দোলনও ঝিমিয়ে পড়ে।

৩২। দি পাকিস্তান অবজারভার, মে ১, ১৯৬৭
৩৩। আজাদ, মে ১, ১৯৬৭
৩৪। দৈনিক পাকিস্তান, 'রাজনীতি কোন পথে — ২' জানুয়ারী ৩, ১৯৬৯

Dhaka University Institutional Repository



## চার

### উন্নয়ন দশক পালন

১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাস থেকে আইউব খানের রাজত্বের দশমবর্ষ শুরু হয় এবং তখন থেকে পরবর্তী এক বছর ব্যাপী চলে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও রাজত্বের মহিমাকীর্তন করে বিরামহীন প্রচারণা। ১৯৫৮—৬৮ মধ্যবর্তী সময়ে দেশের অর্থনীতিতে বিরাট উন্নতি হয়েছে, পররাষ্ট্র নীতিতে এসেছে অভাবনীয় সাফল্য, দেশের পশ্চাৎপদ সমাজ-কাঠামো পড়েছে ভেঙে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পাকিস্তানের ইমেজ বেড়েছে সহস্রগুণ, এবং এর সবই সম্ভব হয়েছে সৈনিক-রাজনীতিবিদ আইউবের গতিশীল নেতৃত্ব ও মহিমময় ব্যক্তিত্বে — মহাকবি ইকবাল যার স্বপ্ন দেখেছিলেন, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যার ভিত গেঁথে ছিলেন, সেই পাকিস্তানের সার্থক রূপকার হলেন ফিল্ড মার্শাল আইউব খান — এই ছিল সমস্ত প্রচারণার সার কথা।

প্রচারণা নানাভাবে চলে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে — রেলওয়ে, বিদ্যুৎ, শিল্প, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, যোগাযোগ, প্রভৃতি — এই আমলে যে-উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তার ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা ছিল অন্যতম উপায়। তাঁর কৃতিত্ব প্রচারে সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করে ১৯৬৮ সালের সাতাশে অক্টোবরের, দশম বিপ্লব বার্ষিকীর, পত্রিকাগুলি। সেদিন করাচী থেকে প্রকাশিত 'ডন' পত্রিকায় ৮০১ বার বিভিন্ন প্রেসিডেন্টের ছবি ছাপা হয়।

অন্যভাবেও প্রচারণা চলে। সরকারী কাগজপত্র, লেফাফা, স্ট্যাম্প, টেলিগ্রাম, মানিঅর্ডার ফর্ম ইত্যাদির উপর উন্নয়ন দশকের ছাপ দেওয়া হয়, রেডিও টেলিভিশন থেকে কণিকা প্রচারিত হয়, সরকারী পর্যায়ে নানা-রকম পুস্তিকা ছাপিয়ে বিতরণ করা হয়। তাছাড়া ছিল নামজাদা শিক্ষাবিদদের দিয়ে ঘন ঘন সেমিনার ও আলোচনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা। পাকিস্তান কাউন্সিলের ঢাকাস্থ শাখার এমনি এক অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক বলেন, পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য আইউব খান ছিলেন 'আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ'।[৩৬]

---

৩৬। 'Gen Ayub was Godsend', Says D.U. lecturer (K.M.A. Munim) see Pakistan Observer, August 12, 1968

Dhaka University Institutional Repository



'উন্নয়ন দশক' পালনের উদ্দেশ্য ছিল দুটি : বিরামহীন পাশ্চাত্য প্রচারণার দ্বারা আইউব খানের এক মহিমময় ভাবমূর্তি দেশবাসীর সামনে গড়ে তোলা, এবং এর দ্বারা ১৯৬৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচন ও ১৯৭০ সালের জানুয়ারী মাসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে প্রভাবিত করা।[৩৭]

এই দশক পালন সমাপ্ত হলে পাকিস্তানের রাজনীতিতে আইউব খানের স্থায়িত্বকে সবাই একরূপ ধরেই নিয়েছিলেন, কিন্তু দু-এক মাসের মধ্যে যে বিরাট গণঅভ্যুত্থান শুরু হয় তাতে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ থেকে তিনি চিরদিনের জন্য বিতাড়িত হন।

## পাঁচ

### আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে আইউব খান পূর্ব বাংলা সফরে আসেন এবং [illegible] তারিখে [illegible] এক বক্তৃতায় ন্যাপ ও আওয়ামী লীগকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' বলে অভিহিত করেন।[৩৮] কিছুদিনের মধ্যে এই দুই দলের বেশ কয়েকজন নেতাকে পর-পর গ্রেফতার করা হয়। তখন বিচ্ছিন্নভাবে জল্পনাকল্পনা ও গুজব চলছিল যে, কিছু সংখ্যক বাঙালী সামরিক অফিসার ও সরকারী কর্মচারীকে ঢাকা সেনানিবাসে আটকে রাখা হয়েছে। ১৯৬৮ সালের ১লা জানুয়ারী কেন্দ্রীয় সরকারের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয়, জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার অভিযোগে কতিপয় রাজনীতিবিদ ও সরকারী চাকুরেকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং এদের পরিকল্পনা সরকার বানচাল করে দিয়েছেন।[৩৯] ৬ই জানুয়ারী কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র

---

৩৭। Herbert Feldman, p. 227

৩৮। বর্ষপঞ্জী : দেশীয় রাজনৈতিক ঘটনাবলী, দৈনিক পাকিস্তান, জানুয়ারী ১, ১৯৬৮

৩৯। 'জাতীয় স্বার্থবিরোধী কতিপয় ব্যক্তি গ্রেফতার', ঐ, জানুয়ারী ২, ১৯৬৮

Dhaka University Institutional Repository



দপ্তর থেকে প্রচারিত আরো একটি প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে জানা যায় বন্দীদের সংখ্যা ২৮ এবং তাঁরা ভারত সরকারের সমর্থনে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটিয়ে স্বাধীন পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী পি এন ওঝা এই পরিকল্পনায় জড়িত ছিলেন। অভিযুক্তদের কয়েকজন আগরতলায় গিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর লেঃ কর্ণেল মিশ্র এবং মেজর মেননের সঙ্গে অর্থ ও অস্ত্রের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন।[40] ১৮ তারিখে আরো জানান হল, নিরাপত্তা আইনে বন্দী শেখ মুজিবুর রহমান ষড়যন্ত্রের 'পরিকল্পনা ও পরিচালনার' সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।[41] এর পরে আরো কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হল এবং বন্দীদের সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়াল ৩৫-এ। এঁদের তিনজন ছিলেন পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের উচ্চপদস্থ অফিসার, বাকি অধিকাংশ ছিলেন পাকিস্তান স্থল বিমান ও নৌবাহিনীর সৈনিক।

২২-এ এপ্রিলে পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি এস,এ, রহমানকে চেয়ারম্যান ও বিচারপতি এম,এ, রহমান ও বিচারপতি মকসুমুল হাকিমকে সদস্য করে এক বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। মামলার বিচার শুরু হয় ১৯-এ জুন, ঢাকা সেনানিবাসে। সরকার পক্ষে কৌশুলী নিযুক্ত হন প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মনজুর কাদির। সরকার পক্ষে বিবৃতি ও রাজসাক্ষীদের বক্তব্য থেকে যা জানা গেল তার সারাংশ হচ্ছে অভিযুক্তরা পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলকে ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্রের সহায়তায় বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। কর্মসূচীর মধ্যে ছিল প্রতিরক্ষা বিভাগের কেন্দ্রগুলিকে পঙ্গু করে দেওয়া, সেনাবাহিনীর প্রাক্তন কর্মচারী ও বেসামরিক কর্মচারীদের দলভুক্ত করা, ভারত থেকে অস্ত্র আমদানী করা, সাধারণ ভাবে দেশে রাজনৈতিক অসন্তোষ জাগ্রত করা ও নির্দিষ্ট দিনে ক্ষমতা দখল করে নেওয়া। ষড়যন্ত্র শুরু হয় ১৯৬৪ সালে করাচীতে এবং পরবর্তী কালে এর কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয় ঢাকায়। ১৯৬৫ ও ১৯৬৬ সালে ঢাকায় ও চাটগাঁয় বেশ কয়েকটি সভা হয় এবং ১৯৬৭ সালের ১২ই জুলাই আগরতলায় এক বৈঠক বসে। বিলাত থেকেও কিছু যন্ত্রপাতি ও অর্থ সংগৃহীত হয়।[42]

---

৪০। 'পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র : ভারতীয় কূটনীতিক বহিষ্কার' দৈনিক পাকিস্তান, জানুয়ারী ৭, ১৯৬৮।

৪১। 'শেখ মুজিব আগরতলা ষড়যন্ত্রের অন্যতম হোতা', ঐ, জানুয়ারী ১৯, ১৯৬৮

৪২। আতাউর রহমান খান, /স্বৈরাচারের .../, পৃঃ ৪১৯-২০

Dhaka University Institutional Repository



আসামীগণ বিচারের সময় এক-একটি লিখিত বক্তব্য পেশ করেন। তাঁদের সমস্ত বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে :

ক. তাঁদের কেউই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেননি, তাঁরা নির্দোষ।

খ. বন্দী থাকার সময় স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তাঁদের উপর অমানুষিক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে। বৈরী ঘোষিত রাজসাক্ষী কামালউদ্দিন বলেন, তাঁর শরীরে বৈদ্যুতিক শক দেওয়া, পায়ে পেরেক, নখে সুঁই ও গুহ্যদ্বারে বেয়োনেট ঢুকিয়ে দেওয়া, বরফের মধ্যে দীর্ঘকাল শুইয়ে রাখা প্রভৃতি অবিরাম চলছে।

গ. অভিযুক্তদের মধ্যে যাঁরা সৈনিক ও আমলা ছিলেন তাঁরা কখনো রাজনীতি করেননি এবং রাজনৈতিক অভিযুক্তদের চিনেন না।

ঘ. আহমদ ফজলুর রহমান জানান, তিনি অর্থ দফতরের উপসচিব হিসাবে দুই প্রদেশের মধ্যে সমদৃষ্টিতে কাজ করার চেষ্টা করেছেন এবং পূর্ব বাংলার প্রতি যাতে অবিচার না হয় সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এজন্য তাঁকে মামলায় জড়ানো হয়েছে।

ঙ. শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জবানবন্দীতে বলেন, গত দুই বছর যাবত তিনি প্রায় সব সময় জেলে ছিলেন। তাঁর প্রতি প্রতিহিংসা বশতঃ তাঁর দলকে 'লাঞ্ছিত অপমানিত ও কুখ্যাত' করার জন্য এবং পূর্ব বাংলার ন্যায্য দাবি দাওয়া আদায়ের পথে বিঘ্ন সৃষ্টির জন্য এই মামলা সাজানো হয়েছে। তিনি আরো জানান যে, তিনি তাসখন্দ চুক্তির সমর্থন জানিয়েছিলেন।[৪৩]

বিচার চলাকালীন সময়ে সরকার যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করলেও কোনো গোপনীয়তা রক্ষা করেনি। প্রতিদিন সংবাদপত্রে মামলার বিবরণ, সাক্ষীদের জেরা বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হয় এবং সারা প্রদেশে তা-ই প্রধান আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়। ক্লাসে রেস্তোরাঁয় স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাঠে ময়দানে সর্বত্র মামলা সম্পর্কে আলোচনা চলে। রাজসাক্ষীদের জেরার যে বিবরণ বের হয় তাতে দেখা যায় প্রকাণ্ড একটি ধাপ্পাবাজীকে মামলা হিসাবে দাঁড় করানো হয়েছে এবং সম্পূর্ণ মামলাটিই বানোয়াট মিথ্যা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। অধিকন্তু বন্দীদের উপর স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য ভয়াবহ দৈহিক নির্যাতনের

---

৪৩। Herbert Feldman, পৃঃ ৬৮, এবং পূর্বোক্ত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে শেখ মুজিবুর রহমানের লিখিত জবানবন্দী'।

Dhaka University Institutional Repository



বিবরণ পাঠে সারা প্রদেশের মানুষ ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে পড়ে। অভিযুক্ত নিপীড়নের এই ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই এই অঞ্চলের মানুষকে চরমপন্থা গ্রহণের দিকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। দিনের পর দিন সঞ্চিত সামরিক অত্যাচার বিস্ফোরিত হয় কয়েকমাস পরের গণঅভ্যুত্থানে। শেষমেষ এই মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

এই মামলা দ্বারা আইউব খান চারটি উদ্দেশ্য হাসিল করতে চেয়েছিলেন ঃ এক, পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে স্তব্ধ করা; দুই, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মধ্যে এই মনোভাব জাগিয়ে দেওয়া যে বাঙালীরা কখনোই বিশ্বাসযোগ্য নয়, তিন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী-দের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি করে বিভেদ ও ব্যবধান আরো বাড়িয়ে দেওয়া, চার, শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনীতি থেকে নির্মূল করা।[৪৪] কিন্তু এই অপচেষ্টা সার্থক হয়নি, বরং বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনা এককভাবে সবচেয়ে বেশি শক্তি অর্জন করেছে এই ঘটনা থেকে। আইউব খানও তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে শোচনীয় পরাজয় ও অপমান পেয়েছেন এখানেই।

## ছয়

## উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সামরিক আইন জারি

### ১ পশ্চিম পাকিস্তানে আন্দোলনের সূত্রপাত

১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসে পিন্ডির গর্ডন কলেজের একদল ছাত্র লান্ডিকোটাল থেকে কিছু বিলাসদ্রব্য ক্রয় করে ফেরার পথে পুলিশ কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়। এর প্রতিবাদে পরদিন, ৭ই নভেম্বর, কলেজের ছাত্ররা ধর্মঘট করে, ডেপুটি কমিশনারকে অপদস্থ করে, আইউব খানের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয় ও বিক্ষোভ মিছিল সহকারে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে দেখা করতে যায়। পুলিশ তাদের তাড়িয়ে দেয়। সেদিনই শহরের অদূরে

---

৪৪। Tariq ali, পৃ: ১৮২ এবং Herbert Feldman (From Crisis to Crisis), পৃ: ১৮৯

Dhaka University Institutional Repository



পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে বিক্ষোভরত ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণে একজন ছাত্র নিহত হয়। পরদিন শহরের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হলেও ছাত্ররা দলে-দলে শহরের মধ্যস্থলে জমায়েত হয়ে বড় মিছিল বের করে। তারা আইউব-বিরোধী শ্লোগান দেয়, বিভিন্ন বিপণীকেন্দ্র থেকে তার ছবি নামিয়ে পুড়িয়ে ফেলে ও সারা শহর প্রদক্ষিণ করে। প্রকৃতপক্ষে সেদিন সারা শহর ছাত্রদের দখলে চলে যায়। কিছুদিনের মধ্যে আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে করাচী লাহোর পেশোয়ার হায়দারাবাদ ও ঝিলাম শহরে। দশ তারিখে আইউব খান পেশোয়ারে সভা করতে গেলে তাকে উদ্দেশ্য করে গুলি নিক্ষিপ্ত হয়। সেদিন নওশেরাতে পুলিশের গুলিবর্ষণে একজন ছাত্র নিহত হয়। গোলযোগ দমনের আশায় সরকার ভুট্টো ও ওয়ালী খানকে গ্রেফতার করে কিন্তু উত্তেজনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২৬শে নভেম্বর ছাত্ররা পেশোয়ারে আমেরিকান অ্যাকেডেমির গ্রন্থাগার পুড়িয়ে দেয়, মুসলিম লীগের /কনভেনশন/ অফিস তছনছ করে ও এবোটাবাদে প্রেসিডেন্টের গ্রীষ্মাবাসে আগুন ধরিয়ে দেয়। ২৯ তারিখে পিন্ডিতে সাফল্যজনকভাবে হরতাল পালিত হয় এবং বিক্ষুব্ধ জনতা বিভিন্ন থানা আক্রমণ করে অনুরূপ দুটিকে জ্বালিয়ে দেয়। অনন্যোপায় হয়ে সরকার সামরিক বাহিনী তলব করে।[৪৫]

২ পূর্ব বাংলায় আন্দোলনের প্রসার

পশ্চিম পাকিস্তানে যখন ছাত্র নির্যাতন চলছিল, পূর্বাঞ্চল তখন মোটামুটিভাবে নিশ্চুপ ছিল। সাধারণভাবে দু-একটা বিক্ষোভ ও ধর্মঘট ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা তখনো দেখা দেয়নি। ডিসেম্বর মাসের ৬ তারিখে পল্টন ময়দানে 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালন উপলক্ষে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয় মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে। সভাশেষে তিনি এক বিরাট মিছিল নিয়ে গভর্নর হাউস ঘেরাও করতে যান এবং মিছিলওয়ালাদের উপর পুলিশের নির্যাতনের প্রতিবাদে পরদিন ঢাকা শহরে সাধারণ হরতাল আহ্বান করেন।[৪৬] হরতাল সাফল্যলাভ করে ও পুলিশের দ্বারা তিন জন নিহত, অর্ধ শতাধিক আহত ও পাঁচশতাধিক বন্দী হয়।[৪৭] ৯ তারিখে বায়তুল মোকাররমে গায়েবী জানাজা সম্পন্ন করে মাওলানা একটি

---

৪৫। Tariq ali, 'The Beginning of the End', (Pakistan Military Rule ...), pp. 156-171.

৪৬। আবুল কাসেম ফজলুল হক, মুক্তিসংগ্রাম, পৃঃ ৩৯

৪৭। আজাদ, ডিসেম্বর ৮, ১৯৬৮

Dhaka University Institutional Repository



বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন। পুলিশ সেখানেও লাঠিচার্জ করে ও প্রায় দুশ জনকে গ্রেফতার করে।[৪৮] এই পটভূমিতে অন্যান্য বিরোধী দলও আন্দোলনে শরিক হয় এবং সব দলের আহ্বানে ১৩ তারিখে সারা প্রদেশে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। পুলিশের গুলিবর্ষণে সেদিন চট্টগ্রামে ২৬ জন আহত হয়, বন্দী করা হয় রাজশাহীতে ১৭ জন, চট্টগ্রামে ১৫৭ জন ও ঢাকায় সহস্রাধিককে।[৪৯] এভাবে আন্দোলন বিস্তৃত হয় সারা দেশে এবং ১৯৬৯ সালের ২৫-এ মার্চ আইয়ুব খানের পদত্যাগ ও সেনাবাহিনী প্রধান ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতারোহণ পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। ভুট্টো-ভাসানীর পর অন্য দলগুলি আন্দোলনে যোগ দিলে এতে দুটি স্পষ্ট ধারা দেখা দেয়: একটি সহিংস আন্দোলনের, অপরটি নিয়মতান্ত্রিক অহিংস আন্দোলনের।

পিকিংপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি তার অঙ্গদল কৃষক সমিতি ও শ্রমিক ফেডারেশনের সঙ্গে মিলিতভাবে আন্দোলনকে একটি সশস্ত্র সাধারণ আন্দোলনে পরিণত করার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা চালায়। এই উদ্দেশ্যে ন্যাপ আসন্ন নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয় ও গণআন্দোলন ও ঘেরাও পদ্ধতি অনুসরণের ইঙ্গিত দেয়।[৫০] জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদে এই দলের তিনজন প্রতিনিধি পদত্যাগ করেন।[৫১] কৃষক সমিতি আন্দোলনকে গ্রামমুখী করার চেষ্টা চালায় এবং ২৯শে ডিসেম্বর ঢাকার অদূরে হাতিরদিয়া বাজারে কৃষকদের হরতাল পালিত হয়। সেখানে পুলিশের গুলিতে তিনজন মৃত্যুবরণ করে।[৫২] এই ব্যাপারে পুলিশ যে-মামলা দায়ের করেছিল তার অন্যতম আসামী ছিলেন পরবর্তীকালে শাহাদাৎ বরণকারী ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান। নোয়াখালী জেলায় এক জনসভা থেকে দলের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ তোয়াহাকে পুলিশ বন্দী করলে জনতা থানা আক্রমণ করে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে আসে।[৫৩]

---

৪৮। আজাদ, ডিসেম্বর ৯, ১৯৬৮
৪৯। ঐ, ডিসেম্বর ১৪, ১৯৬৮
৫০। 'রাজনীতি কোন পথে – ১', দৈনিক পাকিস্তান, জানুয়ারী ২, ১৯৬৯
৫১। 'ন্যাপ দলীয় তিনজন সদস্যর আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ', ঐ, ফেব্রুয়ারী ১৩, ১৯৬৯
৫২। 'দর্পণে : দেশীয় রাজনৈতিক ঘটনাবলী', ঐ, জানুয়ারী ১, ১৯৬৯
৫৩। 'ন্যাপ নেতা তোয়াহার গ্রেফতার প্রসঙ্গে', ঐ, জানুয়ারী ২, ১৯৬৯

Dhaka University Institutional Repository



মাওলানা ভাসানীও শহর ত্যাগ করে গ্রামাঞ্চলে গমন করেন এবং কুষ্টিয়া[৫৪], খুলনা[৫৫], ও যশোর[৫৬] জেলার গ্রামে-গ্রামে আন্দোলনকে সংগঠিত করতে থাকেন। এভাবে আন্দোলন গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থানে-স্থানে থানা আক্রমণ, মুসলিম লীগ অফিস ধ্বংস করা ও গ্রামের জনসাধারণের শত্রু চোর-ডাকাত-জোতদার-মহাজন হত্যা শুরু হয়। দেশের বিভিন্নাঞ্চল থেকে মৌলিক গণতন্ত্রীদের পদত্যাগের খবরও ঢাকায় আসতে থাকে। প্রকৃত পক্ষে শহর-এলাকার বাইরে মুসলিম লীগের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়।

শ্রমিকদের আন্দোলনও পূর্ণোদ্যমে শুরু হয়। মার্চ মাস থেকে আরম্ভ হয় ঘেরাও আন্দোলন। নারায়ণগঞ্জের আদমজী মিল[৫৭], খুলনার মিল সমূহ[৫৮], টঙ্গীর কয়েকটি কারখানা[৫৯], ঢাকার প্রাদেশিক সরকারের সচিবালয়[৬০], ওয়াপদা-র[৬১] মত প্রতিষ্ঠানসমূহ ঘেরাও-এর ফলে অচল হয়ে পড়ে। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারীরাও দাবী-দাওয়া পেশ করতে থাকে এবং সরকার - নিয়ন্ত্রিত সংবাদ পত্র 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী মার্চ মাসের প্রথম ২৫ দিনে প্রতিদিন এই প্রদেশে গড়ে সাতটি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা তাদের দাবীদাওয়া কর্তৃপক্ষের কাছে হাজির করে।

পরিস্থিতির বিকাশ দেখে আইউব খান বিচলিত হন এবং বিরোধী দলীয় নেতাদের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনা করার প্রস্তাব দেন। মাওলানা ভাসানী বৈঠকের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে মুজাফ্ফর আহমদও বৈঠকে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানান। মাওলানা বলেন যে, বৈঠকের উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসাধারণের দৃষ্টিকে তাদের

---

৫৪। দৈনিক পাকিস্তান, মার্চ ১, ১৯৬৯
৫৫। 'মাওলানা ভাসানীর খুলনা যাত্রা', ঐ, ফেব্রুয়ারী ৯, ১৯৬৯
৫৬। ঐ,
৫৭। 'আদমজী মিলে ঘেরাও', ঐ, মার্চ ১৩, ১৯৬৯
৫৮। 'খুলনার তিনটি মিল ঘেরাও', ঐ, মার্চ ১০, ১৯৬৯
৫৯। 'টঙ্গী শিল্প এলাকায় ঘেরাও', ঐ, মার্চ ১২, ১৯৬৯
৬০। 'ঘেরাও ধর্মঘট মিছিল', ঐ, মার্চ ১৯, ১৯৬৯
৬১। 'ওয়াপদার বিদ্যুৎ সরবরাহ অফিস ঘেরাও : কর্মচারী ধর্মঘট', ঐ, ফেব্রুয়ারী ২৫, ১৯৬৯

Dhaka University Institutional Repository



মূল শত্রু সামন্তবাদ, একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের দিক থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে পুঁজিবাদের সুরক্ষা করা ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে সংহত হওয়ার সুযোগ দেওয়া।[৬২] কিন্তু তবুও বিরোধীদলের অন্য নেতারা বৈঠকে যোগ দেয়। বৈঠকের সময় ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তান গমন করেন এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা ভুট্টোর সঙ্গে তিনদফার ভিত্তিতে কাজ করতে সম্মত হন:

ক. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী জনসাধারণের স্বীকৃত দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে পাকিস্তানে জনগণের গণতন্ত্র কায়েম করা,

খ. পাকিস্তানী আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমাজতন্ত্র কায়েম করা,

গ. বিদেশী শোষণের অবসান, সিয়াটো সেন্টো চুক্তি বাতিল, সকল প্রকার উপনিবেশবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা।[৬৩]

পশ্চিম পাকিস্তানে তিনি ব্যাপকভাবে সশস্ত্র আন্দোলনের পক্ষে বক্তৃতা দেন এবং ঘোষণা করেন যে, পূর্বাহ্নে ছাত্র-জনতার দাবিসমূহ মেনে নেওয়া না-হলে নির্বাচন হতে দেওয়া হবেনা ও ভোটপ্রার্থীদের বাড়িঘরও ভস্মীভূত করে দেওয়া হবে। ৮ই মার্চ সারা পশ্চিম পাকিস্তানে হরতাল সাফল্যজনকভাবে পালিত হয়। মাওলানা আবারো ঘোষণা করেন, তিনি প্রয়োজনবোধে গৃহযুদ্ধের জন্য তৈরী আছেন এবং আগামী দুমাসের মধ্যে শ্রমিকদের দাবিসমূহ মেনে নেওয়া না-হলে তারা কলকারখানা দখল করে নেবে। কৃষক-শ্রমিকদের প্রতিনিধি নিয়ে জাতীয় সরকার গঠনেরও তিনি দাবি জানান।[৬৪]

ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে আন্দোলনে গতি সঞ্চারিত হলে মধ্যপন্থী ও ডানপন্থী দলগুলিও সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে Democratic Action Committee বা সংক্ষেপে DAC /ডাক/ গঠন করে। 'জনসাধারণের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারের

---

৬২। 'কৃষক শ্রমিক ও মেহনতী মানুষের প্রতিনিধি নিয়ে সরকার গঠনের দাবী' লাহোরের জনসভায় ভাসানী — দৈনিক পাকিস্তান, মার্চ ১০, ১৯৬৯
৬৩। 'জনগণের গণতন্ত্র কায়েমের জন্য ভাসানী-ভুট্টো চুক্তি', ঐ, মার্চ ৫, ১৯৬৯
৬৪। দৈনিক পাকিস্তান, মার্চ ১০, ১৯৬৯

Dhaka University Institutional Repository



মহান দায়িত্ব পালনের জন্য সর্বস্তরের আন্দোলনকে ব্যাপকতর ও সমন্বিত করে অহিংস, সংঘবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য' ডাক আট দফার একটি কর্মসূচী গ্রহণ করে। এগুলি ছিল প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা কায়েম করা, জরুরী আইন প্রত্যাহার করে পূর্ণ নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, ১৪৪ ধারার আওতায় জারিকৃত সকল নির্দেশ প্রত্যাহার করা, রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তি দেওয়া, শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা ও সংবাদপত্রের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা বাতিল করা।[৬৫] ডাক-এর অন্তর্ভুক্ত দলগুলি ছিল ন্যাপ /মস্কোপন্থী/, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, আওয়ামী লীগ /৬ দফা পন্থী/, পি ডি এম-এর অন্তর্ভুক্ত নেজামে ইসলাম, আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ /কাউন্সিল/, এন ডি এফ ও জামাতে ইসলাম।[৬৬]

এ-সময় তিনটি ছাত্র প্রতিষ্ঠান, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের দুই গ্রুপ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সঙ্গে মিলিতভাবে আন্দোলনের প্রস্তুতি নেয় এবং এগার দফার একটি বিস্তৃত কর্মসূচী গ্রহণ করে। তখন ডাকসুর সহসভাপতি ছিলেন তোফায়েল আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন নাজিম কামরান চৌধুরী। শেষোক্ত ছাত্রনেতা সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিনিধি হলেও আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন এবং তার সঙ্গে এই দলের এক শক্তিশালী অংশ মাহবুবুল হক দোলনের নেতৃত্বে আন্দোলনে যোগ দেয়। এগার দফার প্রথম দফায় বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স ও হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, ছাত্রবেতন হ্রাস, চাকুরীর নিশ্চয়তা, নতুন শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন ও সুচ্ছল কলেজসমূহকে প্রাদেশিকীকরণনীতি পরিত্যাগের দাবি সন্নিবেশিত হয়। দ্বিতীয় দফায় প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারী সরকার গঠন, তৃতীয় দফায় আওয়ামী লীগের ৬-দফার ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান, চতুর্থ দফায় পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনসহ সাব ফেডারেশন গঠন, পঞ্চম দফায় ব্যাংক-বীমা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ, ষষ্ঠ দফায় কৃষকদের খাজনা হ্রাস, বকেয়া খাজনা মাফ ও আখ পাটের ন্যায্য মূল্যদান, সপ্তম দফায় শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী ও ধর্মঘটের অধিকার দেওয়া, অষ্টম দফায় পূর্ব বাংলার বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা, নবম দফায় জরুরী আইন ও নিরাপত্তা আইন প্রত্যাহার করা, দশম দফায় জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ এবং একাদশ দফায় আগরতলা মামলা প্রত্যাহারসহ সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দেওয়ার দাবি জানানো হয়।[৬৭]

---

৬৫। দৈনিক পাকিস্তান, জানুয়ারী ৯, ১৯৬৯।
৬৬। ঐ, জানুয়ারী ৯, ১৯৬৯।
৬৭। এগার দফা উপলক্ষে প্রকাশিত প্রচারপত্র — সংগ্রামী ছাত্র সমাজের ডাক: এগার দফার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলুন'।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতপক্ষে এই কর্মসূচীতে নতুন কিছু ছিল না। শিক্ষা সম্পর্কিত কিছু দাবি, আওয়ামী লীগের ৬-দফা ও ন্যাপের ১৪-দফার প্রধান প্রধান বক্তব্যগুলিই সমন্বয়ে এই কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল। তবে, এখানে এক সমন্বিত কর্মসূচী তৈরী হওয়ায় সর্বশ্রেণীর জনগণের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয় ও বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

ডাক-এর আহবানে ১৭ই জানুয়ারী সারা প্রদেশে সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল পালিত হয়। সেদিন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদও বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট ও ছাত্রসভা করে। পুলিশ ছাত্রদের উপর অত্যাচার করলে এর প্রতিবাদে পরদিন পুনরায় ধর্মঘট পালিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সেদিন সারা দুপুর পুলিশ-ছাত্রে 'খণ্ডযুদ্ধ' হয় এবং ছাত্ররা একটি ডবল ডেকার বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়।[৬৮] বিকেলে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস বাহিনী ছাত্রাবাসে হানা দিয়ে ৩৪ জনকে ধরে নিয়ে যায়। ২০ তারিখে পুনরায় ছাত্র-পুলিশে সংঘর্ষ বাধে এবং এক পর্যায়ে পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান শহীদ হন। তাঁর মৃত্যুতে আন্দোলনের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পায় এবং ২৪-এ জানুয়ারী রাজধানীতে গণঅভ্যুত্থান ঘটে। সচিবালয়ে পিকেটিং রত বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি করলে অকুস্থলে ৫ জন প্রাণ হারায়। বিক্ষোভকারীরা দুজনের লাশ নিয়ে মিছিল বের করে, জাতীয় প্রেসট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণাধীন পত্রিকা 'দৈনিক পাকিস্তান' ও মুসলিম লীগ সমর্থক পত্রিকা 'মর্নিং নিউজ' ভবনে আগুন ধরিয়ে দেয়, গভর্ণর মোনায়েম খানের পুত্র-পরিচালিত দৈনিক 'পয়গাম' পত্রিকার অফিস তছনছ করে, সরকার দলীয় জাতীয় পরিষদ সদস্য এম. এ. লতিফের বাড়ি অগ্নিদগ্ধ করে এবং নওয়াবপুর রোডে আগরতলা মামলার রাজসাক্ষীর হোটেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। সন্ধ্যার সময় সান্ধ্যআইন জারি করলে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে।[৬৯]

এই পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব দিলেন। ডাক নেতারা আলোচনার পূর্বশর্ত হিসাবে তাদের আট দফা মেনে নিতে ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করতে বললেন।[৭০] এ সমস্ত শর্ত নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে এবং ডাক-এর আহবায়ক নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান ঢাকা সেনানিবাসে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করেন। এক পর্যায়ে আভাস পাওয়া গেল শেখ মুজিব প্যারোলে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে সম্মত আছেন।[৭১] কিন্তু পরিস্থিতি অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তিত

---

৬৮। 'ছাত্র-পুলিশে সংঘর্ষ : লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ'
দৈনিক পাকিস্তান, জানুয়ারী ১৯, ১৯৬৯

৬৯। '২৪শে জানুয়ারী', ঐ, ফেব্রুয়ারী ৭, ১৯৬৯

৭০। ঐ, ফেব্রুয়ারী ১১, ১৯৬৯

৭১। আতাউর রহমান খান, /স্বৈরাচারের দশ বছর/, পৃঃ ৪২৬

Dhaka University Institutional Repository

পৌঁছল। ১৪ই ফেব্রুয়ারী সারা প্রদেশে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হল, পল্টন ময়দানের বিরাট জনসভায় আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবি উঠল।[72] ১৫ তারিখে মামলার আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা করা হয়। প্রতিবাদে পল্টনে বিরাট জনসভা হল মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে। এক তীব্র উত্তেজক বক্তৃতা দিয়ে তিনি 'জ্বালো, জ্বালো আগুন জ্বালো' স্লোগান দিলেন এবং সভার পর-পরই আগরতলা ট্রাইব্যুনালের সভাপতি এস এ রহমানের বাস-ভবন সরকারী অতিথিভবন, কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন, তার ছোট ভাই খাজা নওয়াব আসকারীর বাসভবন ভস্মীভূত ও দুজন প্রাদেশিক মন্ত্রীর বাড়ি তছনছ করা হল।[73] রাতে সান্ধ্য আইন অগ্রাহ্য করে মিছিল বেরোল। ১৮ তারিখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডঃ শামসুজ্জোহা সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হলেন। এই সংবাদ ঢাকায় পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ সান্ধ্য আইন অগ্রাহ্য করে রাস্তায় নেমে এল। সারারাত ধরে স্লোগানের ও বুলেটের আওয়াজে শহর মুখর হল। নিহতদের প্রকৃত সংখ্যা জানা সম্ভব হয়নি, তবে সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকার মতে তা ছিল ৩৯।[74] পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি দেখে আইউব খান সেনাবাহিনীর জেনারেলদের সঙ্গে সামরিক আইন জারি সম্পর্কে আলোচনা করলেন। কিন্তু তাতে ঢাকা শহর ব্যতীত অন্যান্য এলাকা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে — ঢাকা সেনানিবাস থেকে এই মর্মে সংবাদ পেয়ে সেনাবাহিনী প্রধান ইয়াহিয়া খান আইউব খানের প্রস্তাবের অস্বীকৃতি জানান এবং তাঁকে ডাক-এর দাবি মেনে নিতে পরামর্শ দেন।[75] অনন্যো-পায় হয়ে আইউব খান ২১ ফেব্রুয়ারী এক বেতার বক্তৃতায় পরবর্তী নির্বাচনে তাঁর প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী না-হওয়ার 'অপরিবর্তনীয়' সিদ্ধান্ত, এবং জরুরী অবস্থা ও আগরতলা মামলা প্রত্যা-হারের কথা ঘোষণা করলেন।[76] শেখ মুজিব মুক্ত মানুষ হিসাবে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিলেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারী বৈঠক শুরু হয়ে প্রাথমিক আলোচনার পর ১০ই মার্চ পর্যন্ত মুলতবী

---

৭২। 'সারাদেশে সর্বাত্মক হরতাল', দৈনিক পাকিস্তান, ফেব্রুয়ারী ১৫, ১৯৬৯

৭৩। ঐ, ফেব্রুয়ারী ১৭, ১৯৬৯

৭৪। ঐ, ফেব্রুয়ারী ২০, ১৯৬৯

৭৫। Tariq Ali, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৯-১০

৭৬। দৈনিক পাকিস্তান, ফেব্রুয়ারী ২৩, ১৯৬৯

Dhaka University Institutional Repository



হয়ে যায়। ১০ তারিখে ডাক-নেতারা সর্বসম্মতক্রমে দুটি দাবি—প্রত্যক্ষ সর্বজনীন ভোটে নির্বাচন ও পার্লামেন্টারী সরকার — প্রেসিডেন্টের কাছে পেশ করলেন ও তিনি তা মেনে নিলেন।[৭৭] ৬-দফা আদায় করতে ব্যর্থ হয়ে শেখ মুজিব ঢাকা ফিরলেন, ডাকের সঙ্গে তার সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করলেন[৭৮] এবং শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য আহ্বান জানালেন।[৭৮ক] কিন্তু আন্দোলন ক্রমশঃ সশস্ত্র রূপের দিকে এগিয়ে গেল। ছাত্র-ভাসানী ঐক্যফ্রন্টের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি ঐক্যবদ্ধ হল এবং সারাদেশে গৃহ যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হল। শেষ পর্যন্ত আইউব খান দুই প্রদেশের গভর্ণরদের অপসারণ করে নতুন দুজনকে গভর্ণর নিযুক্ত করলেন, কিন্তু পরিস্থিতি তাতেও নিয়ন্ত্রণে এলনা। শেষ পর্যন্ত তিনি পদত্যাগ করলেন এবং ২৫শে মার্চ সেনাবাহিনী প্রধান ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে পুনরায় দেশে সামরিক আইন জারি হল।

---

৭৭। 'গোলটেবিল বৈঠকে ডাক এর দুদফা প্রস্তাব পেশ', দৈনিক পাকিস্তান, মার্চ ১১, ১৯৬৯

৭৮। 'ডাকের সাথে মুজিবের সম্পর্কচ্ছেদ', ঐ, মার্চ ১৪, ১৯৬৯

৭৮ক। 'শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংগ্রামের আহ্বান', ঐ, মার্চ ২৩, ১৯৬৯

Dhaka University Institutional Repository



# সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহ

## এক

### পাক-ভারত সংঘর্ষের প্রভাব

১৯৬৫ সালের সেপটেম্বর মাসের পাকিস্তান-ভারত সংঘর্ষের ফলে সাময়িকভাবে হলেও বাঙালীদের মধ্যে এক প্রবল পাকিস্তানী জাতীয়তার বোধ জাগ্রত হয়। অনেক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী নানা গল্পে-প্রবন্ধে-কবিতায়-গানে-নাটকে ভারতীয় আক্রমণের নিন্দা করে সাহিত্য রচনা করে দেশে জেহাদী জোশ জাগিয়ে তোলার প্রয়াস পান। রেডিও পাকিস্তান এ-সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের জাগরণে সচেষ্ট হয়। শিল্পী-সাহিত্যিকদের এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা দেখে সরকার খুব খুশি হয় এবং এ-মনোভাবকে স্থায়ী করতে চেষ্টা করে। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাস থেকে রেডিও পাকিস্তানের নতুন নীতিমালা গৃহীত হয় এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য সংহতি ও নতুন জাতীয় জাগরণ, পারস্পরিক পার্থক্য ও সংকীর্ণ মনোভাবের অবসান, পাকিস্তানের আদর্শ, প্রগতিশীল মুসলিম সমাজের গতিশীল শক্তি হিসাবে ইসলাম, রাজনৈতিক সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনে পথপ্রদর্শক হিসাবে পবিত্র কোরান, জাতীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য গৌরববোধ, জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের প্রতি পাকিস্তানের অকুণ্ঠ সমর্থন, জম্মু ও কাশ্মীর সমস্যার মোকাবিলার জন্য দীর্ঘ সংগ্রামের প্রস্তুতি, সাহসী ও সম্মানিত জাতি এবং ন্যায়নীতির সমর্থক হিসাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান মর্যাদা অনুধাবন, দেশরক্ষাবাহিনীর নজিরবিহীন বীরত্ব, ইসলামের ইতিহাসের গৌরবপূর্ণ কাহিনীসমূহ ও মৌলিক গণতন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি তুলে ধরার নির্দেশ দেওয়া হয়।[৭১] যুদ্ধের সময় রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, পরবর্তী পর্যায়েও এই নির্দেশ বলবৎ থাকে।

---

৭১। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, মাসিক মাহে নও, জানুয়ারী ১৯৬৬, পৃঃ ৬৬

Dhaka University Institutional Repository



কেন্দ্রীয় সরকারের আঞ্চলিক প্রকাশনা, তথ্য ও বেতার দপ্তরও 'ভারতীয় নগ্ন হামলার অসারতা, জম্মু ও কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্তানের দাবির ন্যায্যতা, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গুরুত্ব, প্রেসিডেন্টের অভয়বাণী, রণক্ষেত্রে পাকিস্তানী, পররাষ্ট্র মন্ত্রীর তৎপরতা, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের যুদ্ধ সম্পর্কিত বিবৃতি' ইত্যাদি বিষয়ে অনেক পুস্তিকা, পোস্টার, ক্যালেন্ডার ও সিনেমা স্লাইড প্রকাশ করে। তাছাড়া দেশাত্মবোধক কবিতা ও গান, কোরান ও হাদিসের বাণী সংকলন করেও প্রকাশ করা হয়।[৮০]

শিল্পী-সাহিত্যিকদের সংঘবদ্ধ তৎপরতাও শুরু হয়। 'গানে কবিতায়, সাহিত্যে ইসলামী ভাবাদর্শের পুনরুপ চিহ্নিত করা ও প্রত্যেকটি জনগণকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য' গঠিত হয় National Writers War Front Abd Allah Academy - এবং 'সংগ্রামী লেখক সংঘ সমিতি'। প্রথম সংস্থাটি 'জেহাদের ডাক', 'জেহাদের শপথ' ও 'জেহাদের তাৎপর্য' নামক তিনটি পুস্তক ও 'আম্রপালি' নামক একটি মাসিক পত্র প্রকাশ করে।[৮১] তাছাড়া পাকিস্তান পাবলিকেশন্স পঁয়ত্রিশ জন কবি ও গীতিকারের ৫১টি গান সংবলিত জাতীয় অনুপ্রেরণামূলক গীতি সংকলন 'চির দুর্জয়', পাকিস্তান কাউন্সিল বিশ জন পূর্ব পাকিস্তানী কবির ২০টি কবিতার এবং উর্দু-পশতু-সিন্ধী-বেলুচী-কাশ্মিরী-পাঞ্জাবী ২৫টি কবিতার বাংলা অনুবাদের সংকলন 'চির উন্নত শির' এবং জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা ৩৪ জন কবি ও গীতিকারের ১১৭টি গান-সংকলিত দুই খণ্ডে সমাপ্ত 'আমার সোনার দেশ' প্রকাশ করে।[৮২]

বিভিন্ন আলোচনা অনুষ্ঠান ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধকে ধরে রাখার চেষ্টা হয়। ১৯৬৫ সালের ৭ই অক্টোবর ঢাকার পাকিস্তান কাউন্সিল মিলনায়তনে কেন্দ্রীয় তথ্য সেক্রেটারী ও পাকিস্তান কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আলতাফ গওহরের সভাপতিত্বে বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী সাহিত্যিকগণ 'ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানী' বোধ

---

৮০। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, মাসিক মাহে নও, নভেম্বর ১৯৬৫, পৃঃ ৩৬-৪০

৮১। ঐ,

৮২। কিতাব মহল, মাসিক মাহে নও, অক্টোবর ১৯৬৬, পৃঃ ৭৭-৭৮

Dhaka University Institutional Repository



রক্ষার উপায় সম্পর্কে আলোচনায় মিলিত হন।[৮৩] সে-মাসের ১৭ তারিখে ইসলামিক একাডেমী মিলনায়তনে বিভিন্ন চিন্তাবিদ 'জেহাদের তাৎপর্য ও এর নানান কার্যকারিতা' সম্পর্কে আলোচনা করে ঐকমত্যে উপনীত হন যে, পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জেহাদ ফি সাবিলিল্লাহ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে এবং এখন সবাইকে অস্ত্র নিয়ে জেহাদে অবতীর্ণ হতে হবে।[৮৪] ডিসেম্বর মাসে কারিগরী মিলনায়তনে নিক্কন ললিতকলা একাডেমীর উদযোগে 'কাশ্মীর' নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হয়। নাটকটিতে সাম্রাজ্যবাদী ভারত কর্তৃক কাশ্মীরকে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার বিরুদ্ধে জনগণের গণঅভ্যুত্থান, মুজাহিদ বাহিনী গঠন, শিশু-বৃদ্ধ-নারী নির্যাতন ও পুলিশী জুলুম দেখানো হয়।[৮৫] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও একটি বাংলা ও উর্দু কবিতার আবৃত্তির আসরের আয়োজন করে। সেখানে বাংলা ও উর্দুভাষী কবিগণ স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশ নেন।[৮৬] ইসলামিক একাডেমী 'কেন আমি পাকিস্তান চেয়েছি' শীর্ষক একটি বক্তৃতামালার আয়োজন করে ১৯৬৬ সালের শেষের দিকে। আবুল হাশিম, নূরুল আমিন, খাজা শাহাবুদ্দিন, খান আবদুস সবুর, আবদুল জব্বার খদ্দর, শাহ আজিজুর রহমান, মাহমুদ আলী, ফরিদ আহমদ প্রমুখ এতে অংশ নেন। বক্তারা একমত ছিলেন যে, ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তি চেয়ে হিন্দু জাতীয়তাবাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামী মূল্যবোধ ও আদর্শের আলোকে পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষাই ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের মর্মকথা।[৮৭]

অন্যভাবেও যুদ্ধোদভূত চেতনাকে প্রসারিত ও লালিত করার চেষ্টা হয়। যুদ্ধের পর দেশ কয়েকজন বাঙালী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীকে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন রণাঙ্গণে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্র দেখে যুদ্ধের অনুভূতি লাভের চেষ্টা করেন। পাকিস্তান লেখক সংঘও সক্রিয় হয়ে উঠে এবং ১৯৬৭ সালে বাংলা ও উর্দু সাহিত্যের জন্য '৬ই সেপ্টেম্বর' পুরস্কার প্রবর্তন করে। পাকিস্তানের জাতীয় বীরদের গুণ বা কার্যাবলীর ভিত্তিতে রচিত অথবা পাকিস্তানের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষায় সহায়তাকারী গ্রন্থই পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হত।[৮৮] বাংলা সাহিত্যে এই পুরস্কার প্রথম লাভ করেন হাসান হাফিজুর রহমান 'সীমান্ত শিবির' গ্রন্থের জন্য।

---

৮৩। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, মাসিক মাহে নও, নভেম্বর ১৯৬৫, পৃঃ ৩৮-৪০
৮৪। ঐ,
৮৫। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, মাসিক মাহে নও, জানুয়ারী, ১৯৬৬, পৃঃ ৬২
৮৬। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, মাসিক মাহে নও, ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬, পৃঃ ৪৯-৫০
৮৭। মাসিক মাহে নও, মার্চ, ১৯৬৭, পৃঃ ১৪৩-১৪৪
৮৮। Literary Prizes in Pakistan, 2nd edn.(Dacca :National Book Centre,1969)p.42

Dhaka University Institutional Repository



## দুই

## নজরুল একাডেমীর প্রতিষ্ঠা ও কার্যকলাপ

১৯৬৪ সালের কয়েকজন সাহিত্যিক মিলিত হয়ে 'নজরুল একাডেমী সংগঠনী কমিটি' গঠন করেন। তিন বছর পরে ১৯৬৭ সালের ১৭-ই আগস্ট একাডেমীর গঠনতন্ত্র গৃহীত হয়। বিচারপতি আবদুল মওদুদকে সভাপতি, আবুল কালাম শামসুদ্দিনকে অন্যতম সহ-সভাপতি ও তালিম হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে একাডেমীর প্রথম কার্যনির্বাহক পরিষদ গঠিত হয়।[৮৯] গঠনতন্ত্রে একাডেমীর লক্ষ্য স্থির হয় তিনটি :

ক. মুসলিম বাংলার রেনেসাঁর অগ্রদূত হিসাবে নজরুল-ভূমিকাকে চির জাগরূক রাখা,

খ. পাকিস্তানী জীবনাদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আধুনিক ও প্রগতিশীল ভাবধারার সকল উপাদানকে আত্মস্থ করা,

গ. মুসলিম ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে পাকিস্তানী সংস্কৃতির সংহতি ও বিকাশ সাধন করা।[৯০]

একাডেমীর কার্যক্রম ছিল নজরুল ইসলামের সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রচার ও সংরক্ষণ করা, বাঙালী মুসলমানদের নবজাগরণের অগ্রপথিক হিসাবে তাঁর অবদান পর্যালোচনা করা, পাকিস্তানী ও ইসলামী সংস্কৃতি বিষয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কিণ্ডারগার্টেন স্কুল ও সঙ্গীতকলা বিষয়ক বিদ্যায়তন স্থাপন করা, পত্রিকা ও গ্রন্থ প্রকাশ করা। একাডেমীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল জাতীয় ব্যক্তিত্ব, ঘটনা ও পর্বসমূহ বিশেষত ঈদ ও নবী-দিবস পালন করা।[৯১]

১৯৬৮ সালের ২৪-এ মে একাডেমীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও নজরুল জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। দু'দিন পরে নজরুলের স্মৃতিজড়িত দরিরামপুরে নজরুল জন্মোৎসব পালিত হয়। 'আদালতে যার

---

৮৯। তালিম হোসেন, নজরুল একাডেমী, নজরুল একাডেমী পত্রিকা, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা/গ্রীষ্ম ১৩৭৬, পৃঃ ৩

৯০। ঐ, পৃঃ ৫

৯১। ঐ, পৃঃ ৬ক

Dhaka University Institutional Repository



পূর্ণ ঈমান, কোথা সে মুসলমান' এই উদ্বোধনী গানটি দিয়ে, অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয় ও রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত চলে।[৯২] সে-বছর ২রা জুলাই ঢাকার কারিগরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় 'হামদ-নাত জলসা'। সেখানে নজরুলের আঠারটি হামদ ও নাত একক ও সমবেত কন্ঠে পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন গভর্ণর আবদুল মোনায়েম খাঁ।

> গভর্ণর বলেন যে, আমাদের রাষ্ট্রের নবীন নাগরিকদের পবিত্র দায়িত্ব হলো পাকিস্তানের আদর্শকে সঠিকভাবে তুলে ধরা এবং একে অক্ষুন্ন রাখা। এই আদর্শ হলো ইসলামী আদর্শ।[৯৩]

পরবর্তী ২৪-এ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সম্মানে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন হয়। উদ্ভ্রান্ত মুসলমানকে নজরুল ইসলাম যে আলোর সন্ধান দিয়েছিলেন, তাকে সঠিকভাবে কাজে লাগালে প্রাত্যহিক জীবনের অন্ধকার, নৈরাশ্য ও কাপুরুষতা দোষ থেকে এক শীর্ষমান জাতি গড়ে উঠবে — এই ভাবটি নৃত্যের মাধ্যমে দেখানো হয়। শেষাংশে 'দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠিছে দীন ইসলামী লাল মশাল' গান গেয়ে নব অভ্যুদয়ের অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা হয়।[৯৪]

অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পাকিস্তানে এক জাতি, এক সংস্কৃতি ও এক ভাষা গড়ে তোলার আহ্বান জানান। /এ-সম্পর্কে একটু পরে আলোচনা করা হয়েছে।/

একাডেমীর কার্যক্রম আর বিশেষ এগুতে পারেনি। গণঅভ্যুত্থানের সময় এর তৎপরতা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

---

৯২। 'নজরুল একাডেমীর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা', দৈনিক পাকিস্তান, জুন ১, ১৯৬৮
৯৩। দৈনিক পাকিস্তান, জুলাই ২, ১৯৬৮
৯৪। 'নজরুল একাডেমীর একটি স্মরণীয় সন্ধ্যা', মাসিক মাহে নও, কার্তিক ১৩৭৫, পৃঃ ৮১-৮২

Dhaka University Institutional Repository



## তিন

### রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কিত বিতর্ক

১৯৬৭ সালের জুন মাসে পিন্ডিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশনের সময় পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি ও এতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্থান নিয়ে পরিষদের ভেতরে সরকারি দলীয় ও বিরোধী দলীয় সদস্যদের মধ্যে এক উত্তপ্ত বাক-বিতণ্ডা চলে। ক্রমে-ক্রমে এটা পরিষদের বাইরে বুদ্ধিজীবী মহলেও প্রসারিত হয় এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রশ্নে গুরুতর বিতর্কের সূচনা করে।

২০-এ জুন পরিষদে ভাষণ দিতে গিয়ে সরকারী দলের নেতা খান আবদুস সবুর খান বলেন, ইদানীং পূর্ব বাংলায় সাংস্কৃতিক-পুনরুজ্জীবনের এক অশুভ তৎপরতা তিনি উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন। পহেলা বৈশাখ ও রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপনের নামে বিদেশী সংস্কৃতি এদেশে অনুপ্রবেশ করে ইসলামী জীবনাদর্শের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তানের মূলে আঘাত হানছে। তাছাড়া সাধারণ নির্বাচনের পর এধরনের কার্যকলাপ এদেশে আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি না রাখলে ভবিষ্যতে পাকিস্তানের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হতে পারে।[৯৫]

২২ তারিখের অধিবেশনে জনৈক সদস্য তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিনকে প্রশ্ন করে জানতে পারেন যে, রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্র থেকে সপ্তাহে দুবার রবীন্দ্রনাথের গান প্রচারিত হয়। এই পর্যায়ে জনাব মোখলেসুজ্জামান খান জানতে চান, যেখানে পরিষদের নেতা রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করেন সেখানে রেডিও পাকিস্তান থেকে তা প্রচারের কি হেতু থাকতে পারে। উত্তরে মন্ত্রী জানান, তিনি পরিষদ সদস্যদের মনোভাব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং সেজন্য ভবিষ্যতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার আরো কমিয়ে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এই প্রসঙ্গে ডঃ আলীম আল রাজীর প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের প্রচার যথাসম্ভব কমিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর যে রচনা পাকিস্তানের আদর্শের পরিপন্থী বলে বিবেচিত হবে, তার প্রচার ভবিষ্যতে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হবে।[৯৬]

---

৯৫। National Assembly of Pakistan Debates, Official Report, জুন ২০, ১৯৬৭, পৃঃ ৮০১-২

৯৬। ঐ, জুন ২২, ১৯৬৭, পৃঃ ৮৪০

Dhaka University Institutional Repository



খাজা শাহাবুদ্দিনের ঘোষণা পত্রিকায় প্রকাশিত হলে ঢাকার বিদ্বৎসমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এর সমর্থনে ও প্রতিবাদে বিবৃতি প্রদান ও সভা করা শুরু হয় এবং সে-সূত্রে পরিষদে পুনরায় রবীন্দ্র প্রসঙ্গ ফিরে আসে। ২৭ তারিখের বিতর্কে অংশ নিয়ে অধ্যাপক ইউসুফ আলী বলেন, সরকারের এই নীতি অনুসৃত হলে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রচার কমতে-কমতে একদিন শূন্যের কোঠায় নেমে যাবে। ছয় কোটি বাঙালীর এক নিজস্ব সাংস্কৃতিক সত্তা রয়েছে। যুগ-যুগের সাধনায় তা বর্তমান স্তরে এসে পৌঁছেছে; নিছক শক্তির জোরে একে ধ্বংস করে নতুন সংস্কৃতি চালু করতে চাইলে তা ভ্রান্তির পথে আত্মঘাতী হবে। তিনি কর্তৃপক্ষকে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করার আহ্বান জানান।৯৭

বিতর্কে সরকারি দলীয় আরো কয়েকজন অংশ নেন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কোনো-কোনো কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাতে চেষ্টা করেন, তিনি মুসলমানদের যথাসাধ্য হীনবর্ণে চিত্রিত করেছেন সেজন্য তাঁর রচনা পাকিস্তানীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।৯৮ এই পর্যায়ে বিরোধী দলীয় সদস্য এ,কে, সুলায়মান সরকারী সদস্যদের এই বক্তব্যসহ ঢাকা শহরে পদার্পণ করার চ্যালেঞ্জ দিলে পরিষদে হট্টগোলের সৃষ্টি হয়।৯৯

বাজেট আলোচনার ইতি টানতে গিয়ে জনাব সবুর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের উপর বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, মুসলমান সুলতানদের বিশেষত, হোসেন শাহের, পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। সেসময় বাংলা ভাষায় প্রচুর আরবী ফারসী শব্দ ছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিদ্যাসাগর মাইকেল ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকের চেষ্টায় তা সংস্কৃত শব্দবহুল হয়ে পড়ে। তিনি এই প্রক্রিয়াকে দুঃখজনক বলে অভিহিত করেন। এই প্রসঙ্গেই 'ডঃ রবীন্দ্রনাথ'কে নিয়ে যারা আন্দোলন করছে সেসব 'howling idiot' - দের প্রতি তার কোনো সহানুভূতি নেই বলে তিনি ঘোষণা করেন।১০০

---

৯৭। ঐ, জুন ২৭, ১৯৬৭, পৃঃ ২২৩৬

৯৮। জনাব আক্তারুদ্দিন চৌধুরী, জনাব আজমল আলী চৌধুরী ও জনাব এ,কে, সুলায়মানের বক্তৃতা, ঐ, জুন ২৭ ও ২৮, ১৯৬৭, পৃঃ ২২৪০, ২২৭৪,২২৯৭-২৩০০ ও ২৩০৫-২৩০৯

৯৯। ঐ, জুন ২৮, ১৯৬৭, পৃঃ ২২৯৯

১০০। ঐ, জুন ২৯, ১৯৬৭, পৃঃ ২৩৬১-৮৩

Dhaka University Institutional Repository



খাজা শাহাবুদ্দিনের ঘোষণা সমর্থন করে কিছু কিছু বক্তব্য বিবৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১৯ জন বুদ্ধিজীবীর প্রদত্ত বিবৃতির বিরোধিতা করে পর-পর দুটি বিবৃতি দেওয়া হয়। একটি ছিল '১৮ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি — বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন শিক্ষক কর্তৃক মতানৈক্য প্রকাশ'[৮১], অপরটি ছিল 'রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্পর্কে ১৮ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি আপত্তিকর' শীর্ষে ৪০ জনের বিবৃতি।[৮২] তা ছাড়া ছিল সরকারী সিদ্ধান্তের সরাসরি সমর্থন করে ৩০ জনের একটি বিবৃতি। দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা আকরম খাঁ ছিলেন এই বিবৃতির প্রথম স্বাক্ষরকারী। বিবৃতির ভাষা ছিল নিম্নরূপ:

> পাকিস্তান একটি আদর্শ বাস্তবায়নের সুস্পষ্ট কর্মসূচী লইয়া দুনিয়ার বুকে জন্মলাভ করিয়াছে। আমরা পাকিস্তানীরা তাই স্বকীয় তামদ্দুন অর্জনের পরিপন্থী কোন প্রচেষ্টাই বরদাশত করিতে পারিনা। রবীন্দ্রনাথ বহু সঙ্গীতে মুসলিম অস্তিত্বকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া হিন্দু সংস্কৃতির জয়গান গাহিয়াছেন। সুতরাং পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম দিন হইতেই এই সকল সঙ্গীতের আবর্জনা হইতে রেডিও টেলিভিশনকে পবিত্র রাখা প্রয়োজন ছিল। তাই বিলম্বে হইলেও সরকার এই সঙ্গীত পরিবেশন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া জনগণের প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন। আমরা সরকারের এই মহৎ প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাইতেছি।[৮৩]

দৈনিক আজাদের এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে শুধু বেতারে নয় পাঠ্যপুস্তক থেকেও রবীন্দ্র রচনাকে বাদ দেবার সুপারিশ জানানো হয়।[৮৪]

কিন্তু সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ ছিল সর্বজনীন, বলিষ্ঠ ও সোচ্চার। প্রথম ঐতিহাসিক

---

৮১। আবুল কাসেম ফজলুল হক, মুক্তি সংগ্রাম, পৃঃ ১৯-২০

৮২। ঐ, পৃঃ ২০-২১

৮৩। আজাদ, জুলাই ১, ১৯৬৭

৮৪। ঐ, জুন ৩০, ১৯৬৭

Dhaka University Institutional Repository



বিবৃতিটি ১৯ জন বুদ্ধিজীবীর। তাঁরা সরকারের সিদ্ধান্তকে 'দুঃখজনক' বলে অভিহিত করে বলেন :

> রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলা ভাষাকে যে ঐশ্বর্য দান করেছে, তাঁর সঙ্গীত আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা ও তীক্ষ্ণতা দান করেছে তা রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে।
>
> সরকারী নীতি নির্ধারণের সময় এই সত্যের গুরুত্বকে মর্যাদা দান করা অপরিহার্য।[১০৬]

তাছাড়া মাওলানা ভাসানী,[১০৭] ঢাকার এগার জন উর্দু কবি,[১০৮] তিনটি উর্দু প্রতিষ্ঠান,[১০৯] প্রাদেশিক পরিষদে স্বতন্ত্র দলের নেতা আসাদুজ্জামান খান,[১১০] খুলনার সতের জন বুদ্ধিজীবী,[১১১] সরকারী নীতির তীব্র বিরোধিতা করেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্রান্তি,[১১২] ছায়ানট,[১১৩] সৃজনী,[১১৪] অগ্রণী সংসদ,[১১৫] ঐকতান,[১১৬] সংস্কৃতি সংসদ,[১১৭] [illegible],[১১৮] পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ),[১১৯] আমরা কজনা,[১২০] বাংলা ভাষা সংগ্রাম পরিষদ,[১২১] নাগীচক্র,[১২২] পূরবী[১২৩] ও খুলনার চৌদ্দটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের [illegible] জন সদস্য[১২৪] যুক্ত বিবৃতিতে এর প্রতিবাদ করে ও রবীন্দ্র সাহিত্যকে বাঙালীদের ঐতিহ্যের অন্তর্গত বলে দাবি করে।

---

১০৬। বিবৃতি দাতাদের প্রকৃত সংখ্যা ছিল ১৯, কিন্তু কোনো কোনো পত্রিকায় সর্বশেষ স্বাক্ষরকারী শহীদুল্লা কায়সারের নাম বাদ পড়ে যায়। সেজন্য বিবৃতিটি ১৮ জনের বিবৃতি নামে খ্যাত হয়েছে। এই ১৮ জন ছিলেন — ডঃ মুহম্মদ কুদরত-ই-খোদা, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, জনাব জয়নুল আবেদীন, জনাব এম,এ, বারি, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, ডঃ খান সরওয়ার মুরশিদ, জনাব সিকান্দার আবু জাফর, জনাব মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ডঃ আহমদ শরীফ, ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম, জনাব শামসুর রহমান, জনাব হাসান হাফিজুর রহমান, জনাব ফজল শাহাবুদ্দীন, ডঃ আনিসুজ্জামান, জনাব রফিকুল ইসলাম ও মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।

১০৭। দৈনিক পাকিস্তান, জুন ২৮, ১৯৬৭।

১০৮। দি পাকিস্তান অবজারভার, জুন ৩০, ১৯৬৭। ১০৯। ঐ, জুলাই ৩, ১৯৬৭

১১০। ঐ, জুন ২৬, ১৯৬৭। ১১১। ঐ, জুলাই ১, ১৯৬৭। ১১২। ঐ, জুন ২৭, ১৯৬৭।

১১৩। ঐ, জুন ২৮, ১৯৬৭। ১১৪। ঐ, জুন ২৯, ১৯৬৭। ১১৫। ঐ, জুন ২৯, ১৯৬৭।

১১৬। ঐ, জুলাই ১, ১৯৬৭। ১১৭। ঐ, জুন ২৫, ১৯৬৭। ১১৮। ঐ, জুন ২৫, ১৯৬৭।

১১৯। ঐ, জুন ২৫, ১৯৬৭। ১২০। ঐ, জুন ২৬, ১৯৬৭। ১২১। ঐ, জুন ২৭, ১৯৬৭।

১২২। ঐ, জুন ২৮, ১৯৬৭। ১২৩। ঐ, জুন ২৮, ১৯৬৭। ১২৪। ঐ, জুন ৩০, ১৯৬৭।

Dhaka University Institutional Repository



বিবৃতি দানের পাশাপাশি সভা-সমিতি-মিছিলের মাধ্যমেও প্রতিবাদ জানানো হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করে সংস্কৃতি বিষয়ক পর-পর তিনদিন প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিল বের করে।[১২৬] কবি জসীম-উদ্দিনের সভাপতিত্বে ঢাকার বিভিন্ন শিল্পী সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সমবায়ে প্রতিরোধ আন্দোলনের কমিটি গঠিত হয়।[১২৭] পরদিন 'ছায়ানট'-এর উদ-যোগে ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ঢাকা প্রেসক্লাবে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভানেত্রীত্ব করেন বেগম সুফিয়া কামাল ও বক্তৃতা করেন অধ্যাপক মনসুরউদ্দিন, কে জি মুস্তাফা প্রমুখ। বক্তারা রবীন্দ্রসঙ্গীত ও পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানকে বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে বর্ণনা করেন। সংস্কৃতিকে তাঁরা ভূগোল ও ইতিহাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে ব্যাখ্যা করেন এবং বঙ্গসংস্কৃতির উপর হামলা ১৯৫২-র ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারে বলে মত প্রকাশ করেন।[১২৮] স্থানীয় কারিগরী মিলনায়তনে শহরের বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের আরো একটি সভা হয়। ডঃ কুদরত-ই-খোদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ-সভায় আবুল হাশিম, বদরুদ্দীন উমর, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ আলোচনা করেন। তাঁরা বলেন, সংস্কৃতির উপর আক্রমণ মূলত অর্থনীতি ও রাজনীতির উপর আক্রমণ এবং পাকিস্তান সরকার ইসলাম ও পাকিস্তানের সংহতির নামে তা নিয়মিতভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা আরো বলেন, পাকিস্তান একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র এবং এর প্রত্যেকটি অঞ্চলের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রয়েছে। সভায় ডঃ খোদাকে সভাপতি করে 'সাংস্কৃতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা পরিষদ' গঠন করা হয়।[১২৯] খুলনাতেও অনুরূপ 'সংস্কৃতি সংরক্ষণ পরিষদ' গঠিত হয়।[১৩০]

পূর্ববঙ্গে আন্দোলনের বিকাশ ও তীব্রতা সরকারকে বিচলিত করে। ৪ঠা জুলাই জাতীয় পরিষদে বিবৃতির মাধ্যমে খাজা শাহাবুদ্দিন তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেন। আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি বলেন, তাঁর বক্তব্য সংবাদপত্রে বিকৃত করে পরিবেশন করা হচ্ছে। তিনি কখনো বলেননি, সব রবীন্দ্র সঙ্গীত পাকিস্তানের আদর্শের পরিপন্থী। তিনি শুধু অনেক উর্দু কবির মত এটুকু বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও কোনো গান যদি পাকিস্তানী আদর্শের পরিপন্থী হয় তবে তা রেডিও পাকিস্তান থেকে প্রচারিত হবে না।[১৩১]

---

১২৫। সংবাদ, জুলাই ৪, ১৯৬৭।
১২৬। দি পাকিস্তান অবজারভার, জুলাই ২, ১৯৬৭।
১২৭। ঐ, জুলাই ২, ১৯৬৭।
১২৮। ঐ, জুলাই ৩, ১৯৬৭।
১২৯। ঐ, জুলাই ১৩, ১৯৬৭।
১৩০। ঐ, জুলাই ৪, ১৯৬৭।
১৩১। National Assembly of Pakistan Debates, Official Report, জুলাই ৪, ১৯৬৭, পৃঃ ২৬৬৩

Dhaka University Institutional Repository



## চার

## বাংলা ভাষা সংস্কার ও জাতীয় ভাষা সৃষ্টির চেষ্টা[১৩২]

### ১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগ গ্রহণ

বাংলা একাডেমী কর্তৃক বাংলা ভাষা সংস্কার প্রচেষ্টার কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এই প্রস্তাবসমূহ কার্যকর করার ক্ষমতা একাডেমীর ছিলনা, সুতরাং পরবর্তী পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক একাডেমীর প্রস্তাবসমূহ পাশ করিয়ে নিয়ে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-পর্ষদ এ ব্যাপারে একটি উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর সঙ্গে সরকারের যোগাযোগের খবর পাওয়া যায়।

উদ্যোগ শুরু হয় শিক্ষা-পর্ষদের সদস্য ডঃ শহীদুল্লাহর/১৩২ক/ একটি চিঠির ভিত্তিতে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের নিকট লিখিত একটি চিঠিতে পর্ষদের পরের বৈঠকে বিবেচনার জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি প্রেরণ করেন :

> The University of Dacca is requested to form a committee for the reformation of the Bengali Langu ge, script ~~andxxxxx~~ spelling and direct the Colleges affiliated to it to adopt the reformed Bengali.[১৩২খ]

এই চিঠি মোতাবেক ১৯৬৭ সালের ২৮-এ মার্চ তারিখের বৈঠকে ভাষা সংস্কারের জন্য শিক্ষা-পর্ষদ একটি উপসংঘ মনোনীত করে। বাংলা ভাষা সংস্কারের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে যেসব প্রতিষ্ঠান — বিশেষত বাংলা একাডেমী — প্রতিবেদন প্রস্তুত কালে তাদের কামকর্মের

---

১৩২। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : সাঈদ-উর রহমান, আইউব খানের আমলে জাতীয় ভাষা সৃষ্টির চেষ্টা ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃঃ ১৮৫–২০৩

১৩২ক। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর আগ্রহ ছিল একাডেমিক ও ভাষাতাত্ত্বিক। তিনি আন্তরিকভাবেই আশা করতেন যে, শিক্ষা-বিস্তারের জন্য বাংলা ভাষাকে সহজ-সরল করা দরকার; তবে পাকিস্তান-আমলে ভাষা-সংস্কার নিয়ে যে-রাজনীতি শুরু হয় তাতে তাঁর কোনো সমর্থন ছিল না।

১৩২খ। ফাইল নং ২৯/২-১২/৬৬-৬৭/, সম্পুট নং ২৬/বি/রেজিস্ট্রারের বিভাগ, সাধারণ শাখা, চুক্তি নং

IA

পর্যালোচনা করার জন্যও উপসংঘকে নির্দেশ দেওয়া হয়। উপসংঘের সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ।[১৩২ঘ]

উপসংঘ সঙ্গে-সঙ্গে কাজ শুরু করে। এর শেষ বৈঠক বসে ১৯৬৬ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী। সে বৈঠকে একটি সুপারিশ গৃহীত হয়। তিনজন সদস্য — ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই ও অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী — এর বিরোধিতা করেন ও বিস্তারিতভাবে ভিন্নমতপোষক টীকা পেশ করেন ২৪ই ফেব্রুয়ারী। তাঁরা মত প্রকাশ করেন, বাংলা ভাষা সংস্কারের আশু প্রয়োজন নেই, এ কাজে হাত দিলে বাংলা নিশ্চিতরূপে বিভ্রান্তিতে পতিত হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষার দ্রুত উন্নয়ন বিশেষভাবে ব্যাহত হবে।[১৩২ঙ]

শিক্ষাপর্ষদের অন্য আপত্তি, ১৯৬৮ সালের বৈঠকে সম্পূর্ণ বিষয়টি আলোচিত হয়। দুজন সদস্য — বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই ও ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের অধ্যক্ষ এ,কে,এম, কবির /কবীর চৌধুরী/ — সংস্কার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন কিন্তু অল্প সামান্য অদল-বদল করে সুপারিশগুলি গৃহীত হয়।[১৩২চ] এই সুপারিশগুলি বাংলা একাডেমীর সুপারিশেরই অনুরূপ, তবে এর মধ্যে 'ক্ষ'র পরিবর্তে 'খ্য' লেখার পরামর্শ দেওয়া হয়।[১৩২ছ]

সুপারিশসমূহ গৃহীত হলে শিক্ষা-পর্ষদের সে বৈঠকেই এগুলির প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের জন্য ডঃ কাজী দীন মুহম্মদকে আহবায়ক করে একটি উপসংঘ গঠিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই তৎপরতার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় সাংস্কৃতিক মহলে। বেশ কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবী এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানান। বাংলা

---

১৩২ঘ। Minutes of the Academic Council (D.U.) held on 28.3.67

১৩২ঙ। ঐ, ভিন্নমতপোষক টীকা

১৩২চ। Minutes of the Academic Council (D.U.) held on 3.8.68

১৩২ছ। ঐ

Dhaka University Institutional Repository



ভাষা অবৈজ্ঞানিক, মুদ্রণযন্ত্রে এর ব্যবহারে অসুবিধা অনেক, সুতরাং দ্রুত শিক্ষাবিস্তার ও আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্রুত প্রসারের জন্য এর সংস্কার অপরিহার্য — মোটামুটিভাবে এই ছিল এঁদের বক্তব্য। আবুল কালাম শামসুদ্দিন, আবুল মনসুর আহমদ, ইব্রাহিম খাঁ, আবুল কাসেম, তালিম হোসেন, মীর ফখরুজ্জামান প্রমুখ ৫৮ জন বুদ্ধিজীবী প্রথমে এর সমর্থনে বিবৃতি দেন।[১৩২ক] 'ভাষাকে আমরা জনগণের শিক্ষার উপযোগী সহজ সরল ভাষারূপে দেখতে চাই' এই শিরোনামে আরো একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয় ২৫ জনের।[১৩২খ] বিবৃতির স্বাক্ষরকারীদের অধিকাংশ ছিলেন ঢাকার বাংলা কলেজের অধ্যাপক। বিবৃতি প্রদান ছাড়াও সংবাদপত্রের সূত্রে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় স্বনামে ও বেনামে।

সংস্কার প্রস্তাবের সমর্থনে কোনো প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসেনি কিন্তু এর বিরোধিতা করেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ছাত্রসংগঠন ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী। 'বাংলা হরফের রদবদল বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করবে' — এই শিরোনামে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয় ৪১ জন বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবীর।[১৩২গ] হরফ বদলের বিরোধিতা করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের উদ্যোগে সর্বদলীয় সভা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায়। সভাশেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে।[১৩২ঘ] পূর্ব পাকিস্তান নীহারিকা সংসদ[১৩২ঙ], সংস্কৃতি সংসদ,[১৩২চ] ঐকতানের সাংস্কৃতিক পরিষদ[১৩২ছ] বিবৃতি দিয়ে এই উদ্যোগের বিরোধিতা করে। আওয়ামী লীগ নেতা মাওলানা তর্কবাগীশও এই প্রচেষ্টার নিন্দা করেন।[১৩২জ] প্রস্তাবের বিপক্ষে অনেক প্রবন্ধও প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়।

## ২ বাংলায় রোমান হরফ প্রবর্তনের চেষ্টা

১৯৬৮ সালের প্রথম দিকে বাংলায় রোমান হরফ প্রবর্তনের পক্ষে প্রচারণা শুরু হয়। ৮ই

---

১৩২ক। দৈনিক পাকিস্তান, সেপ্টেম্বর ৮, ১৯৬৮
১৩২খ। পয়গাম, আগস্ট ২৭, ১৯৬৮
১৩২গ। সংবাদ, সেপ্টেম্বর ১, ১৯৬৮
১৩২ঘ। ঐ, আগস্ট ১৩, ১৯৬৮
১৩২ঙ। সংবাদ, আগস্ট ২০, ১৯৬৮
১৩২চ। ঐ, আগস্ট ২০, ১৯৬৮
১৩২ছ। ঐ, আগস্ট ২৫, ১৯৬৮
১৩২জ। ঐ, সেপ্টেম্বর ২৪, ১৯৬৮

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারী পশ্চিম পাকিস্তানের হাজারা জেলায় উচ্চপদস্থ নেতাদের উপস্থিতিতে এক জনসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট-তনয় ক্যাপটেন গওহর আইউব পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সংহতি আনয়নের জন্য পূর্ব বাংলায় উর্দু ও পশ্চিম পাকিস্তানে বাংলা বাধ্যতামূলকভাবে শেখানোর পরামর্শ দেন। ২৭ তারিখে ঢাকা থেকে প্রকাশিত দি পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকায় চিঠি লিখে তিনি তাঁর প্রস্তাব বাংলা ভাষীদের বেদমতে পেশ করেন। ২রা মার্চ তারিখে অপর একটি চিঠিতে ঢাকার এক প্রকৌশলী এ আর এম ইনামুল হক বাংলা ভাষা রোমান হরফে লেখার জন্য সুপারিশ করেন। পরদিন মোজিবুল হক নামক জনৈক ডাক্তার Roman Script for Bengali – প্রবন্ধে অনুরূপ মত ব্যক্ত করেন। ২৩-এ মার্চ আরো একটি চিঠিতে জনাব ইনামুল হক উর্দুকেও রোমান হরফে লেখার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু এই প্রস্তাবগুলি কোনো অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়নি। মার্চ ও এপ্রিল মাসে অনেক চিঠি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় রোমান হরফ প্রবর্তনের বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়ে। কোনো-কোনো পত্র লেখক বলেন, সংহতি শুধু রাষ্ট্রভাষার লিপি পরিবর্তন করলেই আসেনা, তার জন্য জাতীয় জীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিকেও সৎ ও আন্তরিক প্রয়াস চালানো দরকার।

এর পরে এ-সম্পর্কে কোনো লেখা আর প্রকাশিত হয়নি।

৩ প্রেসিডেন্ট কর্তৃক পুনরায় পাকিস্তানী ভাষা সৃষ্টির সুপারিশ

রাষ্ট্রযন্ত্রে দলমর্দ পুষ্টিত প্রেসিডেন্ট পুনরায় পাকিস্তানী-ভাষার পক্ষে বক্তব্য রাখতে শুরু করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ভাষা-সংস্কারের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় তার সমর্থনের অনুকূলে পট-ভূমিও সৃষ্টি হয়েছিল।

১৯৬৮ সালের ২৪-এ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ঢাকার নজরুল একাডেমীর অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষার সমন্বয়ে একটি পাকিস্তানী ভাষা গড়ে তোলার আহ্বান জানান। ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক পাকিস্তানে মূলত একই সংস্কৃতি থাকায় সে-কাজ দুঃসাধ্য হবেনা বলে তিনি মন্তব্য করেন।[১০২৩] কদিন পরে পিণ্ডিতে আন্তঃপ্রাদেশিক ছাত্র সমিতির

---

১০২৩। নজরুল একাডেমীর একটি স্মরণীয় সন্ধ্যা, মাসিক মাহে নও, কার্তিক ১৩৭৫, পৃঃ ৮১-৮২

বার্ষিক ম্যাগাজিনের জন্য প্রদত্ত এক বাণীতেও তিনি অনুরূপ মত প্রকাশ করেন।[১৩২ফ] অক্টোবর মাসের প্রথম তারিখের বেতার ভাষণে তিনি তার বক্তব্য আরো প্রসারিত করেন। সে-বক্তৃতায় তিনি আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে মত দেন এবং বলেন, পাকিস্তানে সংস্কৃতি এক এবং ভবিষ্যতে ভাষাও এক হবে।

> আমাদের সকলের চিন্তাধারা এক এবং কর্মপদ্ধতি অভিন্ন। আমাদের ইতিহাস এবং আদর্শ এক। আমাদের এসকল জিনিস অভিন্ন হলে তমদ্দুন কিভাবে ভিন্ন হতে পারে। আমাদের তমদ্দুনকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাবেনা কেননা আমাদের তমদ্দুনের ভিত্তি হলো ইসলাম এবং ইসলাম মানব জাতিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেনা।
>
> ভাষা ও পোশাক পরিচ্ছদের বিভিন্নতা নিতান্তই কৃত্রিম ব্যাপার। আমাদের ভাষাগুলো একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেলে এবং জনগণের মধ্যে অধিকতর মেলামেশা হলে এটা অত্যন্ত সম্ভবপর যে, আমরা সকল আঞ্চলিক ভাষা একত্রিত করে যৌথভাবে একটি মহান পাকিস্তানী ভাষা উদ্ভাবন করতে পারবো।[১৩২ব]

প্রেসিডেন্টের এই মনোভাবে উৎসাহিত হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু ভাষার সমর্থকরা উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তুলতে শুরু করে। আনজুমান-ই-তরক্কিয়ে উর্দুর উদযোগে আয়োজিত পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু সমিতির চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে ভাষণ দানকালে পশ্চিম পাকিস্তানের হাইকোর্টের বিচারপতি আতাউল্লাহ সাজ্জাদ এই প্রস্তাব করেন।[১৩২ভ]

পূর্ব বাংলায় প্রতিক্রিয়া হয় তীব্র। প্রথমে প্রতিবাদ জানায় বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন। নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে বলেন:

> প্রেসিডেন্ট এক ভাষা এক তমদ্দুনের এক ধর্মের কথা বলে পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের জাতীয় সত্তার বিলোপ করিতে চাহিয়াছেন।[১৩২ম]

বিবৃতিতে স্বাক্ষর দেন ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন (দুই গ্রুপ)-এর সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

---

১৩২ফ। আজাদ, অক্টোবর ৪, ১৯৬৮
১৩২ব। ঐ, অক্টোবর ৬, ১৯৬৮
১৩২ভ। ঐ, অক্টোবর ১, ১৯৬৮
১৩২ম। ঐ, সেপটেম্বর ২৯, ১৯৬৮

Dhaka University Institutional Repository



কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি। 'আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতি ইসলাম ও এক জাতিতত্ত্বের পরিপন্থী নয়' বলে বিবৃতি দেন নূরুল আমিন ও মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ।১৩২গ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ পৃথক পৃথক বিবৃতিতে এর প্রতিবাদ করেন।১৩২ঘ দৈনিক আজাদের এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধেও এই প্রচেষ্টার নিন্দা করা হয়।১৩২ঙ মাওলানা ভাসানীও এক বিবৃতিতে প্রতিবাদ জানান এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা থেকে বিচ্যুত করার ষড়যন্ত্র বলে একে অভিহিত করেন।১৩২চ আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহক কমিটি রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নের পুনরুত্থাপনের প্রয়াস, জাতীয় ভাষা সৃষ্টির ও আঞ্চলিক সংস্কৃতি নষ্ট করার অপচেষ্টা সম্পর্কে সরকারকে সতর্ক করে দেয়।১৩২ছ ভাষা বিতর্ক জাতীয় সংহতি বিনষ্ট ও তিক্ততা সৃষ্টি করবে বলে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির /মস্কোপন্থী/ পূর্বাঞ্চল শাখা এক প্রস্তাব গ্রহণ করে।১৩২জ নারায়ণগঞ্জের মোক্তার বার সমিতি এক বৈঠকে শুধু বাংলাকেই জাতীয় ভাষা করার দাবি জানায়।১৩২ঝ পাকিস্তান তামদ্দুনিক আন্দোলনের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে দায়িত্বহীন উক্তি ও সরকারী কার্যকলাপের নিন্দা করা হয়।১৩২ঞ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি বাংলাকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গ্রহণ করে।১৩২ট

## পাঁচ

### লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখার তৎপরতা

১৯৬৮ সালের লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখার সাধারণ সম্পাদকরূপে হাসান হাফিজুর রহমান নির্বাচিত হলে এর তৎপরতা বেশ বেড়ে যায়। সে-বছর দুটি অনুষ্ঠান এদেশের সাংস্কৃতিক

---

১৩২গ। আজাদ, অক্টোবর ৩, ১৯৬৮
১৩২ঘ। ঐ, অক্টোবর, ৩, ১৯৬৮
১৩২ঙ। ঐ, অক্টোবর ৩, ১৯৬৮
১৩২চ। ঐ, অক্টোবর ৭, ১৯৬৮
১৩২ছ। ঐ, অক্টোবর ৯, ১৯৬৮
১৩২জ। ঐ, অক্টোবর ১০, ১৯৬৮
১৩২ঝ। ঐ, অক্টোবর ১০, ১৯৬৮
১৩২ঞ। ঐ, অক্টোবর ১১, ১৯৬৮
১৩২ট। ঐ, অক্টোবর ১১, ১৯৬৮

Dhaka University Institutional Repository



আন্দোলনে বিশেষ অগ্রগতি নির্দেশ করে ঃ প্রথমটি মহাকবি স্মরণোৎসব ও দ্বিতীয়টি আন্তো-এশীয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।

১ মহাকবি স্মরণোৎসব

১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে উপমহাদেশের বাংলা ও উর্দু সাহিত্যের পাঁচজন খ্যাতনামা কবির স্মরণে উৎসবটি পালিত হয় । এঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মীর্জা গালিব, আল্লামা ইকবাল, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও কাজী নজরুল ইসলাম । এক-একজন কবির জন্য এক-একদিন নির্দিষ্ট ছিল । প্রবন্ধ পাঠ, আলোচনা, কবিতা থেকে আবৃত্তি, গান-মুশায়েরা, নৃত্যনাট্য ও নাটক মঞ্চায়ন প্রভৃতির মাধ্যমে প্রতিটি অনুষ্ঠানে এক-একজন কবি সম্পর্কে সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা হয় । প্রতিদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানগুলি হত ঢাকার কারিগরী মিলনায়তনে ।

প্রথম দিন ৫ই জুলাই, ছিল রবীন্দ্র দিবস । সেদিন সভাপতিত্ব করেন ইসলামী একাডেমীর পরিচালক আবুল হাশিম ও প্রবন্ধ পাঠ করেন ডঃ আনিসুজ্জামান । আনিসুজ্জামান 'রবীন্দ্রনাথ' নামক প্রবন্ধে সুদীর্ঘ কাল-পরিক্রমায় কবির চিন্তাধারায় যে অসংগতি দেখা দিয়েছে তা আলোচনা করেন এবং বাংলা 'ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা' হিসাবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন ।[১৩৩]

আবুল হাশিম সভাপতির ভাষণে বিভিন্ন সরকারী ও সাম্প্রদায়িক বেসরকারী মহল কর্তৃক রবীন্দ্র বিরোধিতার স্বরূপ উন্মোচন করেন । সেকালের পটভূমিতে তাঁর বক্তব্য স্পষ্টবাদিতা ও সত্যভাষণের উজ্জ্বল নিদর্শনরূপে বিবেচিত হবে । তিনি বলেন, এই বিরোধিতা কোনো আদর্শবোধ বা সাহিত্যবোধ নয় বরং উৎকট সাম্প্রদায়িক মনোভাব দ্বারাই পরিচালিত ।

> যাহারা ইসলাম ও পাকিস্তানী আদর্শের নামে রবীন্দ্রসংগীত বর্জনের ওকালতি করিতেছেন, তাহারা শুধুই মূর্খ নহেন, দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত ও তাঁহারা না বোঝেন রবীন্দ্রনাথ, না বোঝেন ইসলাম । তাঁহারা একটা বিশেষ উদ্দেশ্যের

---

১৩৩। প্রতিক্রম, মহাকবি স্মরণোৎসব সংখ্যা, জুলাই-আগস্ট ১৯৬৮, পৃঃ ৭-৮

Dhaka University Institutional Repository



> অপরাধী হইয়া রবীন্দ্র বিরোধিতায় মাতিয়া উঠিয়াছেন। বস্তুতঃ রবীন্দ্র বিরোধিতা একটা বড় রকমের জুয়াচুরি। যাহারা রবীন্দ্র বর্জনের কথা বলিতেছেন, তাঁহারা নিজেরা রবীন্দ্রনাথ পড়িয়াও অন্যকে বর্জনের উপদেশ দিতেছেন।[১৩৩ক]

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়ার্ধে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠের ও গানের আসর বসে। সর্বশেষ বুলবুল ললিতকলা একাডেমী কর্তৃক মঞ্চস্থ হয় নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'।[১৩৪]

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দিন যথাক্রমে ইকবাল দিবস, গালিব দিবস ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত দিবস হিসাবে পালিত হয়। শেষদিন 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' পূর্ব বাংলায় প্রথমবারের মত মঞ্চস্থ হয়।

সর্বশেষ দিন নির্দিষ্ট ছিল 'নজরুল দিবস' হিসাবে। 'নজরুল ও আমরা' প্রবন্ধ পড়েন রফিকুল ইসলাম। তিনি তাঁর প্রবন্ধে দেশ বিভাগের পূর্বে একশ্রেণীর ধর্মান্ধ ও সাম্প্রদায়িক মুসলমান যে নজরুল ইসলামকে সহজ ও মুক্ত দৃষ্টিতে গ্রহণ করতে পারেনি এবং পূর্ব বাংলাতেও সে-ধারার অনুসরণ চলেছে, সে-সম্পর্কে আলোচনা করেন।

> আজ পূর্ব পাকিস্তানে সুচতুরভাবে নজরুলের অধিকাংশ সৃষ্টিতে বর্জনের এক গোপন প্রয়াস চলছে। তাই আমাদের প্রচার মাধ্যম সমূহে আমরা ইদানীং নজরুলের অনেক উৎকৃষ্ট কবিতা ও গান আর শুনতে পাইনা, নজরুলের নামে প্রতিষ্ঠান গড়ে আমরা নজরুলের সাহিত্য ও সঙ্গীতের অংশ বিশেষকেই নজরুলের একমাত্র পরিচয় বলে তুলে ধরছি।[১৩৫]

সেদিনের অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন কবি আবদুল কাদির। তিনি কবি নজরুলকে গণতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক সমাজের আকাঙ্ক্ষী বলে অভিহিত করেন।[১৩৬]

মহাকবি স্মরণোৎসব সেকালের সাংস্কৃতিক জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেও বিপুল জন সমাগম হয়েছিল প্রতিটি অনুষ্ঠানে। প্রবল আগ্রহ ও উদ্দীপনার

---

১৩৩ক। ঐ, পৃঃ ৫৯
১৩৪। দৈনিক পাকিস্তান, জুলাই ১১, ১৯৬৮
১৩৫। পরিক্রম, বর্ষোত্তর সংখ্যা, পৃঃ ৪৬
১৩৬। ঐ, পৃঃ ৬২

Dhaka University Institutional Repository



সঙ্গে ঢাকার সংস্কৃতিসেবী নাগরিকেরা উপভোগ করেছে এক—একটি আলোকোজ্জ্বল সন্ধ্যা। ঢাকার প্রায় প্রতিটি পত্রপত্রিকা অনুষ্ঠানকে স্বাগত জানিয়েছে। এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে দৈনিক পাকিস্তান উৎসবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে এবং উপযুক্ত হলঘর না–থাকায় দুঃখপ্রকাশ করে।[১৩৭] সংস্কৃতিমনা নাগরিকদের উৎসাহের আতিশয্যের খবর পাওয়া যায় উৎসব সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন থেকে। 'মুষলধারায় আষাঢ়ের রোদন ভরা গান' উপেক্ষা করে অনুষ্ঠান শুরুর পূর্ব থেকে দর্শক শ্রোতার আগমনের চিত্র এরূপ ঃ

> শেষে দেখা গেল বিকেল যখন পাঁচটা বাজে তখন এত বড় হলঘরে তিল ধারণের জায়গা নেই। বাইরে ঝরঝর অঝোর বৃষ্টি পড়ছে। তার মধ্যেই দেখা যাচ্ছে রং বেরংয়ের গাড়ি স্কুটার মোটর সাইকেল সাইকেল এবং রিক্সা এসে দাঁড়াচ্ছে আঙিনায়। ছেলে নামছে মেয়ে নামছে ভিজতে ভিজতে, শাড়ীর পাড়ের কুঁচি সামলাতে সামলাতে খোঁপা ঠিক করে হাসছে। যাক কপালের মত একটু জায়গাতো পেলাম আগে এসে।[১৩৮]

মহাকবি স্মরণোৎসবের সাফল্যে প্রতিক্রিয়াশীল মহল ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ইকবাল ও গালিবের মত কবিদের আলোচনা করেও উদ্যোক্তারা নিস্তার পাননি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে আলোচনা করা, তাঁকে ও নজরুলকে নাগরিকত্বদানে গ্রহণ করার দাবি এরা নির্বিবাদে গ্রহণ করতে পারেননি। বিশেষত আবুল হাশিমের বক্তব্য এদের কাছে খুব সুখকর মনে হয়নি। তাই আক্রমণের লক্ষ হল আবুল হাশিম ও লেখক সংঘ দুইই। কিন্তু আইউব খানের রাজত্বের অন্তিম পর্বে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ব্যাপক প্রাধান্যের ফলে এই আক্রমণ কোনো আলোড়নের সৃষ্টি করতে পারেনি। আক্রমণের নেতৃত্ব দিয়েছিল প্রাদেশিক গভর্নর আবদুল মোনায়েম খানের পুত্র কর্তৃক পরিচালিত 'দৈনিক পয়গাম' পত্রিকা। স্মরণোৎসবের পরদিনই 'সীমাহীন ধৃষ্টতা' শীর্ষক এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে জ্বালা উদগীরণ করা হয়, লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখা ও আবুল হাশিমের উপর। এতে প্রকারান্তরে বলা হয় 'পাকিস্তান

১৩৭। দৈনিক পাকিস্তান, জুলাই ১১, ১৯৬৬
১৩৮। 'মহাকবি স্মরণোৎসব সম্পর্কে বিবেক বিচার', দৈনিক পাকিস্তান, জুলাই ১১, ১৯৬৬

Dhaka University Institutional Repository



প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া রবীন্দ্র প্রেমের কবর না শ্মশান রচিত হইয়া গিয়েছে' এবং রবীন্দ্র দিবসের মাধ্যমে 'রবীন্দ্র অধিকার প্রতিষ্ঠার দিবস' যে-ভাবে পালিত হয়েছে তা 'তৌহিদবাদী পূর্বপাকিস্তানীদের' উপর হামলা বিশেষ এবং 'পাকিস্তানবাদী মানুষ মাত্রকেই আজ এই হামলা রুখিবার জন্য দাঁড়াইতে হইবে'।[১৩৯] কদিন পরে আবুল হাশিমের উপর ব্যক্তিগত আক্রমণ করে লেখা হয়, 'তাঁহাকে যাহারা নজরে দেখেন নাই, তাহারা যদি অনুমান করিয়া ফেলেন যে, তাঁহার মাথায় টিকি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা এবং কপালে তিলক ফোঁটা রহিয়াছে তাহা হইলে তাহাদের শাবেদ কি দোষ দেওয়া যাইবে না'।[১৪০] শুধু রবীন্দ্র প্রসঙ্গে নয়, নজরুল দিবসের অনুষ্ঠানেও এদের মনোবেদনার কারণ ঘটেছিল। নজরুলের গান ও নৃত্যনাট্যের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক চিত্র তুলে না ধরায় অনেকে ক্ষুব্ধ হয়। 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকায় চিঠি লিখে জনৈক নূরুল ইসলাম আবুল হাশিমের বক্তৃতাকে 'রাজনৈতিক কমপ্লেক্স ও হীনমন্যতার দোষে দুষ্ট' বলে অভিহিত করে এবং নজরুল দিবসের অনুষ্ঠানে 'মুসলিম ঐতিহ্য সম্বলিত কোন গান তাদের উপহার' না-দেওয়ায় আফসোস প্রকাশ করে।[১৪১]

## ২ আফ্রো-এশীয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

এশিয়া ও আফ্রিকার মুক্তিকামী সংগ্রামী জনগণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এই অনুষ্ঠানটি ১৯৬৮ সালের ২০-এ ও ২১-এ অক্টোবর ঢাকার কারিগরী মিলনায়তনে উদযাপিত হয়।

শ্বেত কপোত ও রক্তিম সূর্যের পশ্চাৎপটে সজ্জিত প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ হয়। হোচিমিনের পাঁচটি কবিতার অনুবাদ পাঠ করেন রাজিয়া খান, ঘানা কেনিয়া মোজাম্বিক ও কঙ্গোর কবিতার অনুবাদ পাঠ করেন আবদুল গনি হাজারী, কোরিয়া ও মোজাম্বিকের কবিতার অনুবাদ আবৃত্তি করেন শামসুর রাহমান এবং অনুবাদে মাও সে তুং-এর কবিতা শোনান ফজল শাহাবুদ্দিন।[১৪২]

---

১৩৯। দৈনিক পয়গাম, জুলাই ৭, ১৯৬৮
১৪০। 'মকাতুল্লার জাবিন' দৈনিক পয়গাম, জুলাই ১১, ১৯৬৮
১৪১। দৈনিক পাকিস্তান, জুলাই ১২, ১৯৬৮
১৪২। ঐ, অক্টোবর ২৮, ১৯৬৮

Dhaka University Institutional Repository



দ্বিতীয় পর্যায়ে ডঃ আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে প্রবন্ধ পাঠের সভায় অংশ নেন হাসান আজিজুল হক ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাংবাদিক সজ্জাদ জহীর। 'আফ্রিকা এশিয়ার গণমুখী সাহিত্যের ভূমিকা' প্রবন্ধে হাসান আজিজুল হক দেখান যে, এই দুই মহাদেশের লেখকদের রচনার একটি সাধারণ ঐক্যসূত্র হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসীবাদ বিরোধিতা। এই এলাকার রাষ্ট্রগুলি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ কর্তৃক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শোষণে এমনভাবে আবদ্ধ যে, শোষণমুক্তির সাধনাই লেখকদের কাছে সর্বপ্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। এবং সে জন্য, তিনি বলেন, ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ বিরোধী সংগ্রামী মানসিকতা আফ্রিকা ও এশিয়ার নতুন সাহিত্যের প্রধান সুর।[১৪৩] সজ্জাদ জহীর 'আফ্রো-এশীয় সাহিত্য আন্দোলন' প্রবন্ধে এই দুই মহাদেশের জনগণকে ইতিহাসের প্রবাহ অনুধাবন করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তাদের দেশীয় সহযোগীদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।[১৪৪]

সভাপতির ভাষণে ডঃ শরীফ বলেন, ভাষাগত ঐক্য, ধর্মীয় ঐক্য, জাতীয় ঐক্য, আঞ্চলিক ঐক্য, গোত্রীয় ঐক্য ইত্যাদি ঐক্যের কথা অতীতেও বলা হয়েছে এবং বর্তমানেও বলা হচ্ছে; এতে জনসাধারণের কোনো মঙ্গল সাধিত হয়নি, সমদর্শিতা ও সহাবস্থানের ভিত্তিতে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সম্মিলিতভাবে নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মধ্যেই সার্বিক কল্যাণ সম্ভব। তাঁর মতে — মানুষকে এই অন্তর্দৃষ্টি দান ও এই চেতনায় উদবুদ্ধ করার দায়িত্ব সাহিত্যিকদের, কারণ শিল্প কোনো কালেই শুধু নন্দনতাত্ত্বিক ছিল না।[১৪৫]

অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্যায়ে খুলনার সঙ্গীত গোষ্ঠী সন্দীপন 'অপরাজেয় ভিয়েতনাম' নামক একটি গণসঙ্গীতের আয়োজন করে। চৌদ্দটি গানের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী ও নয়া-উপনিবেশবাদী অপচেষ্টাকে বানচাল করে দেওয়ার প্রত্যয়ে সংগ্রামী ভিয়েতনামের এগিয়ে চলার সংগ্রামী ইঙ্গিত এতে ফুটিয়ে তোলা হয়।[১৪৬]

---

১৪৩। পরিক্রম, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৬৮, পৃঃ ২১৭

১৪৪। ঐ, পৃঃ ২০৯

১৪৫। ঐ, পৃঃ ২১০

১৪৬। দৈনিক পাকিস্তান, অক্টোবর ২৮, ১৯৬৮

Dhaka University Institutional Repository



দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানের প্রথম অধিবেশনে 'সাহিত্যের আসর' বসে। সভাপতি সিকানদার আবু জাফর শামসুর রাহমানের 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা' আবৃত্তি করে অনুষ্ঠান শুরু করেন।[১৪৭] আহমেদ হুমায়ুন পাঠ করেন 'আফ্রো-এশীয় সাহিত্যের ধারা : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা'। আফ্রিকা ও এশিয়ার সাহিত্য স্বাধীনতা আন্দোলন ও মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধিকার অর্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গভীরতর সার্থকতা লাভ করেছে — এই ছিল প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য।[১৪৮]

সভাপতি তাঁর বক্তৃতায় আফ্রো-এশিয়ার নিপীড়িত মানুষের মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পাকিস্তানের নির্যাতিত জনগণকেও শোষকদের তৈরী দেওয়াল ভেঙে ফেলার আহ্বান জানান। পাকিস্তান সরকারের 'উন্নয়ন দশক' উদযাপন সম্পর্কে তিনি বলেন, এই উন্নয়ন শতকরা পাঁচজন মানুষের মাত্র। তাঁর মতে একমাত্র জনগণের আন্দোলনই ভীতিকর পরিবেশকে পরিবর্তন করতে পারে এবং জনগণের তাগিদ পেলে লেখক-শিল্পীগণ জনগণের জন্য সৃষ্টি করার সাহস লাভ করবেন।[১৪৯]

দ্বিতীয়ার্ধে কবিতা পাঠের আসরে জাপানী কবিতার স্বকৃত অনুবাদ পাঠ করেন শহীদ কাদরী, আরবী কবিতার স্বকৃত অনুবাদ পড়েন আবদুস সাত্তার। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান পাঠ করেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় কৃত নাজিম হিকমতের কবিতার অনুবাদ। এর পরে গানের অনুষ্ঠানে সোভিয়েট ইউনিয়ন, তুরস্ক, আরব ও ইরানের গান গাওয়া হয়।[১৫০] সর্বশেষে লায়লা সামাদের পরিচালনায় চীনা অপেরা White - haired Girl - এর বাংলা রূপান্তর 'শ্বেত কেশিনী' মঞ্চস্থ হয়। পুরানো সামন্ত সমাজ ব্যবস্থা মানুষকে ভূত বানায় আর নতুন সমাজ-ব্যবস্থা ভূতকে মানুষে পরিণত করে — এই ছিল অপেরার মূল বক্তব্য।[১৫১]

অনুষ্ঠান-শেষে সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাংলা বর্ণমালা সংস্কার' প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।[১৫২]

---

১৪৭। দৈনিক পাকিস্তান, অক্টোবর ২৮, ১৯৬৮
১৪৮। পরিক্রম, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৬৮, পৃঃ ২৯
১৪৯। ঐ, পৃঃ ২৯–৩১
১৫০। দৈনিক পাকিস্তান, অক্টোবর ২৮, ১৯৬৮
১৫১। ঐ, ঐ
১৫২। ঐ

Dhaka University Institutional Repository



## আলোচ্য পর্বের কবিতার গতি-প্রকৃতি

একালে প্রকাশিত কবিতা সংকলনগুলির এক উল্লেখযোগ্য অংশ পাক-ভারত সংঘর্ষজাত চেতনা অবলম্বনে রচিত। যুদ্ধোদ্ভূত স্বদেশপ্রেম, জাতীয় গৌরববোধ ও সাম্প্রদায়িক বৈরীভাবকে কবিরা রচনার বিষয়বস্তু করেছেন। তাঁরা সাফল্যের সঙ্গে বীররস ও উদ্দীপনাসঞ্চার করতে পেরেছেন। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী এই চেতনা মিইয়ে গেলে এ-ধরনের কবিতা আর রচিত হয়নি। এ-ধারার উল্লেখযোগ্য সংকলনগুলি হল 'জেহাদ ময়দান', 'জেহাদের ডাক', 'এগিয়ে চল', 'জেহাদের গান কবিতা', অনন্য স্বদেশ', 'নবজীবনের গান', 'চির দুর্জয়' ও 'চির উন্নত শির'।

ইসলামী বিষয়বস্তু ও আদর্শকে নিয়ে কবিতা-রচনার যে-প্রেরণা পাকিস্তান-আন্দোলনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল তা এপর্বেও অক্ষুণ্ণ থাকে। উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলি হল আজহারুল ইসলামের 'ছায়াপথ', আবদুস সামাদ চৌধুরীর 'কও নিয়াত' ও ফররুখ আহমদের 'হাতেম তায়ী'। তাছাড়া ছিল আহমদ নওয়াজ রচিত 'ঈদ-উল আজহা', ঈদ-উল ফেতর', কায়েদে আজমের জন্মদিনে ও 'মোহররম' প্রভৃতির মত অকিঞ্চিৎকর কাব্যপ্রয়াস। এ-ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য 'হাতেম তায়ী'তে কবির আদর্শবোধ যত প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে, শিল্পবোধ ততটা নয়। তাই, মনে হয়, পাকিস্তান-আন্দোলনের সাহিত্যিক অনুপ্রেরণা এপর্বে নিষ্প্রভ ও শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। এসময়ে ইকবালের কবিতার কয়েকটি অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছিল।

উদারনৈতিক মানবতাবাদী ধারার বেশ কয়েকটি কাব্য এসময়ে প্রকাশিত হয়। সৈয়দ আলী আহসানের 'উচ্চারণ', শামসুর রাহমানের 'বিধ্বস্ত নীলিমা' ও 'নিরালোকে দিব্যরথ', মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের 'বিপন্ন বিষাদ' ও 'শঙ্কিত আলোকে', হাসান হাফিজুর রহমানের 'অন্তিম শরের মত' ও 'আর্ত শব্দাবলী', আল মাহমুদের 'কালের কলস', শহীদ কাদরীর 'উত্তরাধিকার' ও আবদুল মান্নান সৈয়দের 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ' প্রভৃতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। কাব্যগুলির নামকরণ লক্ষ্য করার মত। বিধ্বস্ত, বিপন্ন, শঙ্কিত, নিরালোক, অন্তিম শর, আর্ত, জন্মান্ধ প্রভৃতি শব্দ ইঙ্গিত করে যে, এপর্বে কবিরা দ্বন্দ্ব, সংশয় ও বিপর্যয়ের মধ্যে উত্তরণের সম্ভাবনাকে সন্ধান করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository



মার্কসবাদী আদর্শ ভিত্তিক রচিত কয়েকটি কবিতা সংকলন এসময়ে প্রকাশিত হয়। সরদার খান মাহফুজের 'রক্তের কারুকাজ', গগণ তালুর 'হাতিয়ার তুলে নাও', জুলকার নায়েমের 'মরণ বিদ্রোহ' এ-ধরনের কাব্যপ্রয়াস। তাছাড়া ছিল অনুবাদ সংকলন 'শতবর্ষ গণমুখী কবিতা' ও 'মাওসে তুং এর কবিতা ও বাণী'। শিল্পবিচারে উচ্চাঙ্গের না-হলেও কবিদের আবেগের আন্তরিকতায় কবিতাগুলি উজ্জ্বল।

এসময়ে ঢাকা ও চট্টগ্রাম ব্যতীত প্রদেশের অন্যান্য মফস্বল এলাকা থেকেও অনেক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে কবিতার ধারাকে পুষ্ট করেছে। এগুলি বিশেষ কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। এগুলিতে পাওয়া যায় অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যবিত্তের চিন্তাধারা, প্রকাশব্যাকুলতা ও কবিতার ক্ষেত্রে অগ্রগতির কথা। প্রধান-প্রধান কয়েকটি কাব্য হল আব্দুল কুদ্দুসের 'প্রজাপতি মন' /নারায়ণগঞ্জ/, অমর আশীষ 'অরণ্যে একটি লোক' /কুষ্টিয়া/, খুর্শিদ আলমের 'আলোর ছটা' /বরিশাল/, সুরেশ ত্রিপুরার 'অজানা পাহাড়ী সুর' /খাগড়াছড়ি/, সদরুল হোসেনের 'দেশের এদেশ' /গাইবান্ধা/ নেছার উদ্দীনের 'কাব্য বিতান' /খুলনা/, গোলাম মোস্তফা মজুমদারের 'গোধূলির রং', সামসুদ্দিনের 'বৃষ্টি আসি' /যশোর/, সৈয়দ মোবারক হোসেনের 'ফুল আর ধান' /দিনাজপুর/, আলমগীর জলীলের 'আগুন ছলনা নায়' /ময়মনসিংহ/, জাহান আরা বেগমের 'কাজল কথা' /পাবনা/, কাজী নূর কাদের সিদ্দিকের 'বিপ্রতীক' /বগুড়া/ প্রভৃতি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্য সম্পাদনা করে প্রকাশ করার প্রবণতা একালে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। মুহম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশার 'চর্যাগীতিকা', সৈয়দ আলী আহসানের 'পদ্মাবতী' ও আহমদ শরীফের 'সালামিদ খান গ্রন্থাবলী' ও 'চন্দ্রাবতী' এসময়ে প্রকাশিত হয়। এগুলি থেকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যসাধনার, বিশেষত মধ্যযুগের মুসলিম রচিত কাব্য সাধনার, প্রতি আগ্রহের কথা জানা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

# পঞ্চম অধ্যায়ঃ ১৯৬৯-১৯৭১

Dhaka University Institutional Repository



# রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ

## এক

### ইয়াহিয়া খানের গৃহীত ব্যবস্থা

সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর দেশে সকল প্রকার প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ২৬-এ মার্চ ইয়াহিয়া খান বেতার বক্তৃতায় তাঁর পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। তিনি জানান, শাসনতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠাই তাঁর লক্ষ্য এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা শাসনতন্ত্র প্রণীত হওয়ার পর তাদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে তিনি ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াবেন।[1] পরবর্তী কয়েকমাসে সাংবাদিক সম্মেলনে ও আরো নানা সুযোগে তিনি তাঁর এ-ইচ্ছার পুনরুক্তি করেন এবং সীমিতভাবে রাজনৈতিক তৎপরতার সুযোগ দেন। সে বছর নভেম্বর মাসের ২৮ তারিখে এক বেতার বক্তৃতায় তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেন। পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশকে ভেঙে চারটি প্রদেশে পুনর্গঠিত করা, সর্বজনীন ভোটাধিকার ও জাতীয় পরিষদে প্রদেশের জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব এর কয়েকটি প্রধান দিক। তিনি আরো বলেন, জাতীয় পরিষদের নির্বাচন হবে ১৯৭০ সালের ৫ই অকটোবর, শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে হবে ১২০ দিনের মধ্যে — অন্যথায় পরিষদ ভেঙে নতুনভাবে নির্বাচন করা হবে; প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক তৎপরতার সুযোগ দেওয়া হবে ১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে।[2] ১৯৭০ সালের ২৮-এ মার্চের অপর একটি বেতারভাষণে তিনি ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রের পাঁচটি মূলনীতি ঠিক করে দেন। ইসলামী আদর্শ মোতাবেক শাসনতন্ত্র রচিত হবে, রাষ্ট্রের নাম হবে পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র, শাসনতন্ত্রে পাকিস্তানের স্বাধীনতা, আঞ্চলিক সংহতি এবং জাতীয় ঐক্য রক্ষার নিশ্চিত ব্যবস্থা থাকতে হবে, কেন্দ্রের হাতে এমন ক্ষমতা থাকতে হবে যাতে বহির্বিষয়ক ও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এবং দেশের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক সংহতি রক্ষার উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা তার এখতিয়ারে থাকে, এবং 'জাতির পিতা কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহর স্বপ্ন অনুযায়ী একটি গতিশীল জাতিতে পরিণত হতে পারে'।[3]

---

১। 'প্রেসিডেন্টের নীতি-নির্ধারণী ভাষণসমূহের অংশবিশেষ', পূর্ব পাকিস্তানের সংকট সম্পর্কে শ্বেতপত্র, পাকিস্তান সরকার, আগস্ট ১৯৭১, পরিশিষ্ট ক, পৃঃ ১

২। ঐ, পরিশিষ্ট ক, পৃঃ ২-৬

৩। ঐ, পরিশিষ্ট ক, পৃঃ ৬-৯

Dhaka University Institutional Repository



ইয়াহিয়া খানের এই নীতিভঙ্গি অনেক রাজনৈতিক দলের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয় কিন্তু দক্ষিণপন্থী দলগুলির প্রকাশ্য সমর্থন পেয়ে ও আওয়ামী লীগের পর্যাপ্ত বিরোধিতা না-দেখে তিনি সিদ্ধান্তে অটল থাকেন এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে অগ্রসর হন। ৫-ই অকটোবর নির্বাচনের দিন ধার্য হলেও আগস্ট – সেপটেম্বর মাসে পূর্ব বাংলায় ব্যাপক বন্যার কারণে তারিখ পরিবর্তিত হয়ে ৭ই ডিসেম্বর চূড়ান্তভাবে ধার্য হয়।

দুই

রাজনৈতিক দলসমূহের তৎপরতা

ইয়াহিয়া খান নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয় এবং নির্বাচনকে সামনে রেখে নতুন-নতুন দলের জন্ম হয়, কোনো-কোনো দলে ভাঙন ধরে, আবার কোনো-কোনো দল নির্বাচনী ঐক্যজোট গঠন করে। ১৯৬৯ সালের জুন মাসের শেষ দিকে এন ডি এফ, পি ডি এম পন্থী আওয়ামী লীগ, নেজামে ইসলাম ও নবগঠিত জাস্টিস পার্টি /আহবায়ক অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল আসগর খান/ মিলিতভাবে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি /পি ডি পি/ গঠন করে এবং নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব বিলোপের কথা ঘোষণা করে।[৪] পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আট দফাকেই এই দল সামান্য অদল-বদল করে গ্রহণ করে নেয়।[৫] তাছাড়া পাকিস্তানে ইসলামী মূল্যবোধ ও গণতান্ত্রিক আদর্শ বজায় রাখা এবং পূর্ব বাংলার বিচ্ছিন্নতাবাদী ও পশ্চিম পাকিস্তানের আঞ্চলিকতাবাদী প্রবণতাকে প্রতিহত করাও এর অন্যতম লক্ষ্য বলে ঘোষণা করা হয়।[৬] নূরুল আমিন দলের আহবায়ক নির্বাচিত হন এবং এর প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয় ঢাকায়। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরেই দলে ভাঙন শুরু হয়।

---

৪। দি পাকিস্তান অবজারভার, জুন ২৪, ১৯৬৯

৫। 'P D P Draft Manifesto', Ibid, July28, 1969.

৬। 'P D P for restoration of demoratic values, ' Ibid, July 6, 1969.

Dhaka University Institutional Repository



এন ডি এফ-এর প্রবীণ নেতা আতাউর রহমান খান পি ডি পি-তে যোগ না দিয়ে নিজেই আলাদা দল গঠন করেন ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসের শেষ দিকে। 'জাতীয় প্রগতি লীগ' নামে অভিহিত এই দলের সভাপতি হন তিনি নিজে এবং সাধারণ সম্পাদক হন অলি আহাদ। দলের নীতি নির্ধারিত হয় এভাবে ঃ কেন্দ্রের অধীনে দেশরক্ষা, মুদ্রা (টেক্সী ও ছাপা) ও পররাষ্ট্র (কূটনৈতিক) রেখে অন্যান্য বিষয় আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করা, পাকিস্তানকে যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা, ফেডারেল আইন পরিষদের সদস্যগণ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হওয়া, আঞ্চলিক আইন সভার শতকরা ৬০ ভাগ আসন শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধিদের জন্য সংরক্ষিত রাখা, পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিল করা, পূর্ব পাকিস্তানের নাম বাংলাদেশ রাখা, দুই অঞ্চলের জন্য দুই পৃথক অর্থনীতি চালু করা, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা, ব্যাঙ্ক, বীমা, মূল শিল্প, সম্পদ উৎপাদন ও বিতরণের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী রাষ্ট্রগুলিকে সমর্থন দানকারী স্বাধীন নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি গড়ে তোলা।[৭]

জাতীয় প্রগতি লীগের মূলনীতিগুলি পরিপক্ক চিন্তার পরিচয়বাহী ছিল কিন্তু সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে দলের কোনো অগ্রগতি হয়নি। কিছুদিনের মধ্যে দলের অভ্যন্তরে কোন্দল সৃষ্টি হয় এবং সাধারণ সম্পাদক পাল্টা সংগঠনে যাত্রা করেন। ১৯৭০ সালের আগস্ট মাসে দলের নতুন নামকরণ হয় পাকিস্তান জাতীয় লীগ।[৮]

এই সময়ের মধ্যে সর্বাধিক রূপান্তরিত হয় পিকিংপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি জনপ্রিয় আদর্শ নিয়ে সৃষ্টি হলেও সাংগঠনিক দুর্বলতা পার্টিকে দুর্বল করে দেয় ও নানা উপদলীয় কোন্দলে এর শক্তি বিভক্ত হতে থাকে। ১৯৬৮-৬৯ সালের অভ্যুত্থানের সময় দলের আভ্যন্তরীণ বিভেদ সাময়িকভাবে চাপা থাকলেও পরবর্তীকালে তা উৎকট আকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৬৯ সালের অক্টোবরে পাবনার শাহপুরে, ১৯৭০ সালের জানুয়ারীতে সন্তোষে, এপ্রিল মাসে মহীপুরে এবং অক্টোবর মাসে ঢাকায় মাওলানা ভাসানী কৃষক সম্মেলন ও গণজমায়েতের আয়োজন করেও দলের ভাঙন রোধ করতে

৭। 'Ataur Rahman launches his new party', The Pakistan Observer, July 21, 1969

৮। আতাউর রহমানের নেতার চৌদিগ্বিজন ভাষণ', দৈনিক পাকিস্তান, নভেম্বর ৬, ১৯৬৯

Dhaka University Institutional Repository



পারেনি । ধীরে-ধীরে দলে কয়েকটি উপদল সৃষ্টি হয় । একটি ছিল আবদুল মতিন ও আলাউদ্দিনের নেতৃত্বে । এটি 'পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি' (মতিন উপদল) নামে পরিচিত ছিল এবং এর বক্তব্য ছিল, পূর্ব বাংলার গ্রামাঞ্চলে শোষণের রূপ পুঁজিবাদী এবং তাই সংগ্রামের প্রকৃতি হবে সমাজতান্ত্রিক ও সশস্ত্র বিপ্লবের । 'সাপ্তাহিক গণশক্তি'কে কেন্দ্র করে আরো একটি উপদল আত্মপ্রকাশ করে । 'পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসিস্ট লেনিনিস্ট)' নামে পরিচিত এই উপদলের প্রধান নেতা ছিলেন আবদুল হক ও মোহাম্মদ তোয়াহা । পূর্ব বাংলায় শোষণের রূপ আধা-সামন্তবাদী ও আধা-ঔপনিবেশিক, সুতরাং সংগ্রামের সুর হচ্ছে 'জাতীয় গণতান্ত্রিক' — এই ছিল এঁদের বক্তব্য । কাজী জাফর আহমদ ও রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে আরো একটি উপদল 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি' নামে দলের সক্রিয় ছিল । এঁদের বক্তব্য ছিল পূর্ব বাংলা শোষণের রূপ আধা-পুঁজিবাদী, আধা-সামন্তবাদী ও আধা-ঔপনিবেশিক, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করা এঁদের সংগ্রামের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল । ছাত্রনেতা সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বে দলের অভ্যন্তরে মাওসে তুং-এর চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ আরো একটি চরমপন্থী উপদল তৎপর ছিল । এঁরা 'পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন' নামে পরিচিত ছিল এবং প্রাথমিক গুরুত্ব দিত পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার উপর । আবার আরো একটি অংশ ছিল যার কর্মীরা সংসদীয় রাজনীতিতে আস্থা রাখত ও পার্টিকে নিয়মতান্ত্রিক দলে পরিণত করতে সচেষ্টা করত । শেষ পর্যন্ত এই অংশের সাফল্য ঘটে এবং ১৯৭০ সালের আগস্ট মাসে খুলনায় অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে সর্বাপেক্ষে পরবর্তী নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ।[৯]

মস্কোপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এই পর্বে একটি সুসংগঠিত দলে পরিণত হয় ।

---

৯। Abdul Hameed Khan, The left in East Bengal-II, The Marxist Divide, Forum (weekly), December 26, 1970, pp. 10-12; &
M. Rashiduzzaman, The National Awami Party of Pakistan : Leftist Politics in Crisis, Pacific Affairs, Fall 1970, pp. 398-400; &
Talukder Maniruzzaman, Factionalism among the Pro-Peking Leftists, Radical Politics and the Emergence of Bangladesh, (Dacca: Bangladesh Books International Ltd. October 1975), pp. 18-30.

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্বায়ত্তশাসন অর্জন ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করে এই সংগঠনটি অন্যান্য সমমতাবলম্বী দলের সঙ্গে, বিশেষত আওয়ামী লীগের সঙ্গে নির্বাচনী ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে অপমানজনকভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সে-বাসনা আপাতত পরিত্যাগ করে।[১০]

এই পর্বে আওয়ামী লীগ একটি অত্যন্ত সুসংগঠিত ও শক্তিশালী দলে পরিণত হয়, যদিও এর পাকিস্তানগত ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯৭০ সালে পূর্ব বাংলার সর্বত্র এর নির্বাচনী প্রচার সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং দলের বক্তব্য প্রদেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে যায়। নির্বাচনের পূর্বে শেখ মুজিবুর রহমান বেতার-টেলিভিশনে যে-বেতারবক্তৃতা দেন তা থেকে দেশের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান সম্পর্কে দলের দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়। তিনি ছয় দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র, শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশে সামাজিক বিপ্লব আনয়ন করা ও জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতিকে আওয়ামী লীগের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেন।[১০ক]

নির্বাচনের তারিখ যতই ঘনিয়ে আসতে থাকে, পরিবেশও তত উত্তপ্ত হয়ে উঠে। শেষ দিকে পি ডি পি, জামাতে ইসলাম, (কনভেনশন) মুসলিম লীগ প্রভৃতি দলের পূর্ব বাংলায় জনসভা করাই কঠিন হয়ে যায়। ১৯৭০ সালের ১৮ই জানুয়ারী পল্টন ময়দানে জামাতে ইসলাম দলের জনসভায় হাঙ্গামায় ১ জন নিহত ও বহু আহত হয়,[১১] পহেলা ফেব্রুয়ারী পি ডি পি-র জনসভায় বেশ কয়েকজন আহত হয়, ৮ জনকে সভাস্থল থেকে বন্দী করা হয়,[১১ক] ১০ই মার্চ কুমিল্লায় মুসলিম লীগের (কনভেনশন) সভায় বেশ কয়েকজন আহত হয় ও ২৬ জনকে

---

১০। 'তিনি বলেন, একটি দল ঐক্য ঐক্য করে মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। তিনি তাদেরকে আওয়ামী লীগে যোগদানের আহ্বান জানিয়ে বলেন আপনারা যদি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন তবে আলাদা দল করুন। ভোটের সময় বাক্স পাঠান। যদি ভোট পান ভাল কথা, না পেলে খালি হাতে বাড়ি ফিরে যাবেন'। — 'নেতার ঐক্য নয়', (পল্টনের জনসভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা), দৈনিক পাকিস্তান, জুন ৮, ১৯৭০।

১০ক। 'বেতার ও টিভিতে শেখ মুজিবের ভাষণ', দৈনিক পাকিস্তান, অক্টোবর ২৯, ১৯৭০।

১১। 'পল্টনে লাঠিধারী স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী ও জনতার মধ্যে সংঘর্ষ', ঐ, জানুয়ারী ১৯, ১৯৭০

১১ক। 'পল্টনে পিডিপির জনসভায় গোলযোগ ঃ কয়েকজন আহত', ঐ, ফেব্রুয়ারী ২, ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

গ্রেফতার করা হয়,[১১খ] ১২ই এপ্রিল পল্টনে এই দলের অন্য একটি সভায় ১৪ জন আহত হয়, ৩১ জনকে বন্দী করা হয়।[১১গ] এই পর্যায়ে কয়েকটি দল পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানের 'আদর্শ ও সংহতি বিপন্ন' মনে করে 'ইসলাম পসন্দ' নামক ঐক্যজোট গঠন করে। এই ঐক্যজোটে পিডিপি, জামাতে ইসলাম, মুসলিম লীগ (কাউন্সিল) ও নেজামে ইসলাম যোগ দেয়,[১২] কিন্তু কিছুদিন পরে প্রার্থী মনোনয়নের সময় সমঝোতা ভেঙ্গে যায়।

নির্বাচনের কিছুদিন পূর্বে, ১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর, পূর্ব বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলির উপর নেমে আসে স্মরণাতীত কালের সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস। কয়েকলক্ষ লোক এতে প্রাণ হারায় এবং ঝড়ের সময়ে যারা কোনোমতে টিকে ছিল, পরে সাহায্যের অভাবে তারাও মৃত্যুবরণ করে। এই সর্বনাশা দুর্যোগের সময় কেন্দ্রীয় সরকার নিদারুণ ঔদাসীন্যের পরিচয় দেয়। সরকারী প্রচারযন্ত্র থেকে যথাযথ খবর প্রচার না-করার চেষ্টা হয়, এমন কি মাওলানা ভাসানী দুর্গত এলাকায় যেতে চাইলে তাঁকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা হয়।[১২খ] পূর্ব বাংলার প্রতি কেন্দ্রের এই নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য দেখে জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। ন্যাপ (পিকিংপন্থী), জাতীয় লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি নির্বাচন বর্জন করার সিদ্ধান্ত নেয় ও পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করে।

৭ই ডিসেম্বর ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত এলাকাগুলি ব্যতীত অন্যত্র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং পূর্ব বাংলার দুটি আসন ব্যতীত বাকিগুলিতে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা জয়লাভ করে। ঘূর্ণিদুর্গত এলাকার আসনেও পরবর্তী কালে আওয়ামী লীগ জয়ী হয় এবং চূড়ান্ত ফলাফলের জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এভাবে পূর্ব বাংলার জনগণ আওয়ামী লীগের নীতির প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থন প্রকাশ করে।

---

১১খ। সর্বপত্রী, দৈনিক পাকিস্তান, জানুয়ারি ১, ১৯৭১
১১গ। 'পল্টনে সভাস্থলে গোলযোগ' ঐ, এপ্রিল ১৩, ১৯৭১
১২ক 'ইসলামপছন্দ চার দলের ঐক্য', ঐ, ৩০/৮/৭০
১২খ। 'ভাসানীকে জাহাজে আটকে রাখা হয়েছে!', ঐ, নভেম্বর ১৮, ১৯৭০

# তিন

## বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা

মাওলানা ভাসানী ১৯৫৬ সাল থেকেই নানা সুযোগে পূর্ব বাংলার পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা বলে আসছিলেন কিন্তু সমাজের বৃহৎ অংশে তা কোনো ব্যাপক আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। ১৯৬৮ সালের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময় থেকেই অনেক বুদ্ধি-জীবী ছাত্র ও তরুণ রাজনৈতিক কর্মী এ-সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা শুরু করে। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে কামালুদ্দিন আহমদ 'আমাদের মুক্তি সংগ্রাম' নামক একটি পুস্তকে পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তিলাভের জন্য স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ব বাংলা কায়েম করার আহবান জানান।[13] ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের সময় ছাত্রদের মিছিলে প্রায় শ্রুত একটি শ্লোগান ছিল 'সব কথার শেষ কথা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা'। জাতীয় মুক্তাহিদ সংঘ ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে সভাসমিতি ও পুস্তক প্রণয়নের দ্বারা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন 'স্বাধীন সার্বভৌম ইসলামী সাম্য-বাদী পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে থাকে।[14] ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে আতাউর রহমান খান নতুন দল গঠনের সময় পূর্ব পাকিস্তানকে 'বাংলাদেশ' নামে অভিহিত করার সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তী ৫ই ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু বার্ষিকীতে বক্তৃতায় শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানকে 'বাংলা' নামকরণের দাবি জানান।[15] তাঁর এ-দাবি বিভিন্ন স্তরের জনগণের সমর্থন লাভ করে। ছাত্রসংগঠনগুলির মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রশক্তি ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ (মুজাহিদী গ্রুপ)[16] নাম বদলে যথাক্রমে পূর্ব বাংলা ছাত্রশক্তি ও বাংলা ছাত্রলীগ রাখে। বাংলা ছাত্রলীগ কর্তৃক ১৯৬৯ সালের ২১-এ ডিসেম্বর বাংলাদেশ

---

১৩। কামালুদ্দিন আহমদ, আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, ঢাকার ইসলাম প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, প্রকাশের তারিখ নেই (আনুমানিক জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮)

১৪। স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের রূপরেখা, (প্রকাশক মোঃ খলিলুর রহমান, কাঠাল বাগান, ঢাকা, পৌষ ১৬, ১৩৭৭)

১৫। 'পূর্বাঞ্চল 'বাংলা' বলে পরিচিত হবে ঃ মুজিব' দৈনিক পাকিস্তান, ডিসেম্বর ৬, ১৯৬৯

১৬। 'বাংলা ছাত্রলীগ' নাম রাখার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, ঐ, ডিসেম্বর ২৮, ১৯৬৯

দাবির প্রতীক হিসাবে 'আসহমান বাংলা' শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন হয়।[17] ছাত্রশক্তি ১৯৭০ সালের ৭ই জানুয়ারী 'মৃত্যুহীন বাঙালী জাতিকে তার গৌরবোজ্জ্বল বাংলা' নাম ও পরিচয় পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য 'বাংলা' দিবস পালন করে এবং পরদিন 'জাগ্রত বাংলা' নামক আলোচনা সভায় মিলিত হয়।[18] পরবর্তী ২২-এ ফেব্রুয়ারী পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের /মেনন গ্রুপ/ সভাপতি মাহবুবুল্লাহ পল্টন ময়দানের এক জনসমা-বেশে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করে পূর্ব বাংলায় স্বাধীন সার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েমের ১১ দফা কর্মসূচী উপস্থিত করেন।[19] এর জন্য তিনি পরে সামরিক আদালতে দণ্ডিত হন। আগরতলা মামলার অন্যতম আসামী লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন চাকুরী থেকে অবসর নেন ৬ই মার্চ, ১৯৭০ সালে এবং তার পর থেকে 'লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি' স্থাপন করে কাজ করতে থাকেন। তিনি কেন্দ্রের হাতে দেশরক্ষার ভার ছেড়ে দেওয়ার বিরোধিতা করেন।[20] ১৯৭০ সালের ২রা অক্টোবর মাওলানা ভাসানী ঢাকার ঘোড়দৌড় ময়দানে যে গণজমা-য়েতের আয়োজন করেছিলেন সেখানে 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি'র পক্ষ থেকে 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা' কায়েমের আহ্বান জানিয়ে প্রচারপত্র বিলি করা হয়[21] এবং কিছুদিনের মধ্যে 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা'র বিস্তৃত রূপরেখাও পেশ করা হয়। এই সময় সারা দেশে পুরোদমে নির্বাচনী প্রচার চলছিল কিন্তু ১২ই নভেম্বরের মহাপ্লাবনের বর্ণনাতীত ধ্বংসলীলা ও দুর্গতদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অপরিসীম ঔদাসীন্য দেখে মাওলানা ভাসানী নির্বাচনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং ঢাকায় ফিরে পল্টন ময়দানের এক বিরাট জনসভায় 'পূর্ব পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ও পাকিস্তানের সংহতি 'স্লোগান'

---

১৭। 'আসহমান বাংলা' দৈনিক পাকিস্তান, ডিসেম্বর ২২, ১৯৬৯

১৮। পূর্ব বাংলা ছাত্রশক্তির প্রচার দফতর থেকে প্রকাশিত প্রচার পত্র

১৯। 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার ১১ দফা কর্মসূচী', পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষে মাহবুবুল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত /পুস্তিকা/, ফেব্রুয়ারী ২২, ১৯৭০

২০। 'লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণের পূর্ণ বিবরণ' — পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত, তারিখবিহীন।

২১। প্রচার পত্র, তারিখবিহীন।

Dhaka University Institutional Repository



বলে ধমকি দেন।[২২] এই সময় বারো কয়েকটি দল নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ত্রাণকার্যের জন্য পূর্ব বাংলায় বিদেশী সৈন্যের অব্যাহত অবস্থানের প্রতিবাদে ৪ঠা ডিসেম্বর পল্টন ময়দানে এক জনসভার আয়োজন করে। সভায় ন্যাপের পক্ষ থেকে মাওলানা ভাসানী, জাতীয় লীগের পক্ষ থেকে আতাউর রহমান খান ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের পক্ষ থেকে পীর মোহসেনউদ্দীন বক্তৃতা করেন। সভায় লাহোর প্রস্তাবানুযায়ী 'সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তান' গঠনের পক্ষে বক্তৃতা করা ও প্রস্তাব নেওয়া হয়।[২৩] কদিন পরে মাওলানা ভাসানী ঘূর্ণিঝড় দুর্গত এলাকা সফরে গমন করেন ও প্রত্যাবর্তনের পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে বক্তৃতা করেন। নির্বাচনে 'ছয় দফা পন্থীদের' বিজয়কে তিনি লাহোর প্রস্তাবের পক্ষে গণভোট বলে ব্যাখ্যা করেন।[২৪] ১৯৭১ সালের ৯ই জানুয়ারী তাঁর আহবানে সন্তোষে আহূত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জাতীয় সম্মেলনে আতাউর রহমান খান, পীর মোহসেনউদ্দীন ও শেখ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন অংশ গ্রহণ করেন। সভায় মাওলানা ভাসানীকে আহবায়ক করে নিম্নলিখিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়ঃ

১ লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানকে ন্যায্য মর্যাদা দেওয়া,

২ সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির নিয়ন্ত্রণমুক্ত কৃষক-শ্রমিক রাজ কায়েম করা,

৩ সকল প্রকার উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার সামাজিকীকরণ,

৪ দেশে প্রস্তুত সকল পণ্যের বিদেশী বিক্রয় বর্জন,

৫ এই সব দাবির পক্ষে গণভোট আদায়ের জন্য গণআন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়া।[২৫]

পরদিন পল্টন ময়দানে এক বৃহৎ জনসভায় এসব প্রস্তাবের পক্ষে 'রায়' নেওয়া হয়।[২৬]

এভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে ক্রমশঃ জনমত সৃষ্টি হতে থাকে এবং ১৯৭১ সালের

---

২২। 'বাঙালী জীবনে আজ মহাদুর্যোগ নেমে এসেছে ঃ মাওলানা ভাসানী' দৈনিক পাকিস্তান, নভেম্বর ২৪, ১৯৭০

২৩। 'বিদেশী সৈন্য হটাও', ঐ, ডিসেম্বর ৫, ১৯৭০

২৪। আওয়ামী লীগের সাফল্য সম্পর্কে মাওলানা ভাসানী', ঐ, ডিসেম্বর ১০, ১৯৭০

২৫। 'পূর্ব পাকিস্তানের মর্যাদা অর্জন দাবির পাঁচ দফার কর্মসূচী গৃহীত', ঐ, জানুয়ারী ১০, ১৯৭১

২৬। ৫ দফা কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন', ঐ, জানুয়ারী ১১, ১৯৭১

Dhaka University Institutional Repository

২১-এ ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবস পালন উপলক্ষে বিভিন্ন ছাত্রপ্রতিষ্ঠান 'স্বাধীন ও সার্বভৌম' বাংলা প্রতিষ্ঠার দাবি তোলে। ইয়াহিয়া খান ৩রা মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ১লা মার্চ স্থগিত ঘোষণা করলে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাধীনতার দাবি উঠতে শুরু হয় এবং পরদিন ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। সভায় পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে 'বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত' স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয়।[২৭] সেদিন 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করে। ঘোষণায় 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের' তিনটি লক্ষ্য নির্দেশিত হয়ঃ

১ স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ বাঙালী জাতি সৃষ্টি ও বাঙালীর ভাষা সাহিত্য কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা,

২ স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করে অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসন কল্পে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক শ্রমিক রাজ কায়েমের ব্যবস্থা,

৩ স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে ব্যক্তি বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র কায়েম করা।[২৭ক]

এই কর্মসূচীতে রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটিকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত এবং শেখ মুজিবর রহমানকে বাংলাদেশের 'সর্বাধিনায়ক' বলে ঘোষণা করা হয়। তাছাড়া গ্রামে-গ্রামে মহল্লায়-মহল্লায় মুক্তিবাহিনী সংগঠন করা এবং পাকিস্তানী মিলিটারীকে বিদেশী হানাদার হিসাবে গণ্য করে তাদের খতম করার আহবান জানানো হয়। ১লা মার্চ থেকে আওয়ামী লীগের নির্দেশে সারা প্রদেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ৭ই মার্চ শেখ মুজিবর রহমান ঢাকায় ঘোড়দৌড় মাঠের জনসমাবেশে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার পূর্বে চারটি

২৭। ছাত্রসমাজের পক্ষে পতাকা উত্তোলন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের তৎকালীন সহসভাপতি আ,স,ম, আবদুর রব।

২৭ক। ইশতেহার নং এক, 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচী'।

Dhaka University Institutional Repository



পূর্ণাঙ্গ আরোপ করেন এবং তাঁর সংগ্রামকে 'স্বাধীনতা' ও 'মুক্তির সংগ্রাম' বলে অভিহিত করেন। এই সময় থেকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী — শ্রমিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, সরকারী চাকুরে, অবসর প্রাপ্ত সৈনিক প্রভৃতি — ক্রমে-ক্রমে স্বাধীনতার পক্ষে সক্রিয় হতে শুরু করে। ২৩-এ মার্চ — পাকিস্তান দিবসে — পূর্ব বাংলার সর্বত্র স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমানও তাঁর বাসভবনে বাংলাদেশের পতাকা তোলেন। ২৫-এ মার্চ পাকিস্তানী সৈন্যের আক্রমণ শুরু হলে বাঙালীদের সশস্ত্র প্রতিরোধ ও স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয়।

---

Dhaka University Institutional Repository



# সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহ

## এক

### পুস্তক বাজেয়াপ্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন

১৯৬৯ সালের শেষ দিকে পর-পর কয়েকটি বইয়ের প্রকাশকদের উপর 'কেন বইগুলি বাজেয়াপ্ত করা হবেনা' তার কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হয়। বইগুলি ছিল কামরুদ্দিন আহমদের Social History of East Pakistan বদরুদ্দিন উমরের 'সংস্কৃতির সংকট' ও 'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা', ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর 'জেলে ত্রিশ বছর', সত্যেন সেনের 'পাপ সেবরী' ও আবদুল মান্নান সৈয়দের 'সত্যের মত বদমাস'। মাওলানা ভাসানীর একটি রাজনৈতিক পুস্তিকা 'ভোটের আগে ভাত চাই'-র উপরও অনুরূপ নির্দেশ আসে।

এই ঘটনাপ্রবাহ প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীদের উদ্বিগ্ন করে তোলে। তিরিশজন বুদ্ধিজীবী পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে সরকারের এই কাজকে আশংকাজনক ও মারাত্মক বলে অভিহিত করলেন এবং এই বইগুলিকে বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলে দাবি করলেন।[২৯] কয়েক জন রাজনৈতিক ও শ্রমিক নেতা ও সাংবাদিক আরো একটি বিবৃতিতে মাওলানা ভাসানীর পুস্তিকাটির উপর কারণ দর্শানোর নোটিশকে রাজনৈতিক দলের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ও গণতান্ত্রিক রীতির পরিপন্থী কাজ বলে আখ্যায়িত করলেন।[৩০] 'সাম্প্রতিক' গোষ্ঠীর লেখকরা উনুআনের রচনা নিষিদ্ধ করার মত গর্হিত ব্যবস্থা গ্রহণ না করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়।[৩১] বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গনে বেগম সুফিয়া কামালের সভাপতিত্বে একটি প্রতিবাদ সভা বসে। সভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে জনাব আবুল হাশিম বলেন, আমরা একই সঙ্গে বাঙালী, মুসলমান ও পাকিস্তানী এবং আমাদের বাঙালীত্ব স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। তিনি

---

২৯। 'পুস্তক বাজেয়াপ্তকরণ নীতি : ৩০ জন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী কর্তৃক গভীর ক্ষোভ প্রকাশ', দৈনিক পাকিস্তান, জানুয়ারী ৩, ১৯৭০

৩০। ঐ,

৩১। 'উনুআনের রচনা নিষিদ্ধ না করার আহ্বান', ঐ, জানুয়ারী ৫, ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository



আরো বলেন, মুক্ত চিন্তাকে উৎসাহিত করার মধ্যেই সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব নিহিত আছে, লেখক-দের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলে তা বিপন্ন হতে পারে।[৩২]

আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে লেখকগণ 'লেখক স্বাধিকার সংরক্ষণ কমিটি' গঠন করেন। ঢাকা শহরের প্রায় বিশটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে 'প্রস্তুতি কমিটি' গঠিত হয়। সিকানদার আবু জাফর, হাসান হাফিজুর রহমান ও সৈয়দ আতিকুল্লাহ কমিটির আহবায়ক নিযুক্ত হন।[৩৩] কমিটি ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় পর-পর কয়েকটি জনসভা করে। ক্রমে-ক্রমে সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণ কমিটির প্রতি তাদের সমর্থন জানায়। মাওলানা ভাসানী[৩৪], শেখ মুজিবুর রহমান[৩৫] পৃথক-পৃথক বিবৃতিতে লেখকদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান ও প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস অর্ডিন্যান্স বাতিলের দাবি জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতাশ জন শিক্ষক[৩৬], পূর্ব বাংলা ছাত্র শক্তির সভাপতি জিয়াউদ্দিন খান[৩৭], সাত জন চিত্র শিল্পী[৩৮] রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরানব্বই জন শিক্ষক[৩৯], তিরিশ জন চলচ্চিত্র শিল্পী[৪০], এবং গণ সাংস্কৃতিক সংঘ[৪১] বিবৃতি দিয়ে লেখকদের সংগ্রামে একাত্মতা ঘোষণা করে ও অর্ডিন্যান্সটি বাতিলের দাবি জানায়। তের জন বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক আরো একটি বিবৃতিতে খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস রচিত 'ভাসানী যখন ইউরোপে' গ্রন্থটির উপর থেকে সরকারী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি জানান।[৪২] তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি[৪৩], শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল[৪৪] এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ[৪৫] সরকারী নীতি সমালোচনা করে বিবৃতি দেয়।

---

৩২। 'পুস্তক বাজেয়াপ্তকরণ নীতির নিন্দা', দৈনিক পাকিস্তান, জানুয়ারী ৬, ১৯৭০

৩৩। 'লেখক স্বাধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন', ঐ জানুয়ারী ৯, ১৯৭০

৩৪। 'ভাসানী মুজিব ও শিল্পী সাহিত্যিকদের বিবৃতি', ঐ, জানুয়ারী ১৪, ১৯৭০

৩৫। ঐ

৩৬। ঐ

৩৭। ঐ

৩৮। ঐ

৩৯। 'পুস্তক বাজেয়াপ্তকরণ', ঐ, জানুয়ারী ১৫, ১৯৭০

৪০। ঐ

৪১। ঐ

৪২। দৈনিক পাকিস্তান, জানুয়ারী ১৪, ১৯৭০

৪৩। ঐ

৪৪। 'প্রেস অর্ডিন্যান্স বাতিল ও সাংস্কৃতিক নিবর্তন প্রত্যাহারের দাবি', দৈনিক পাকিস্তান, জানুয়ারী ১৬, ১৯৭০

৪৫। ঐ

Dhaka University Institutional Repository



কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন হয়। ছাত্রনেতৃবৃন্দ বাঙালী সংস্কৃতি, বাঙালী জাতি ও স্বাধীন চিন্তার উপর হামলা না করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। এই প্রতিবাদ সভায় অংশ গ্রহণ করে বাংলা ছাত্রলীগ, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন /দোলন গ্রুপ/ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন /উভয় গ্রুপ/[৪৬]। 'লেখক স্বাধিকার সংরক্ষণ কমিটি' ১৯৭০ সালের পনেরই জানুয়ারী বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে এক বিরাট সভা করে। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ-সভায় গৃহীত প্রস্তাবের মাধ্যমে প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স বাতিল করার, সকল পুস্তকের উপর থেকে বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রত্যাহার করার, সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবিলম্বে প্রত্যাহার করার, রেডিও টেলিভিশনকে সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার, সংবাদপত্রের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ বন্ধ করার, জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার মাধ্যমে সংস্কৃতিক্ষেত্রে গোয়েন্দাগিরি বন্ধ করার এবং লেখক সংঘ, পাকিস্তান কাউন্সিল ও পাকিস্তান আর্টস কাউন্সিলের মাধ্যমে সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের চেষ্টা না করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।[৪৭]

আন্দোলনের মুখে সরকার এক চতুর নীতি গ্রহণ করে। বাংলা একাডেমীর পরিচালক কবীর চৌধুরীকে আহ্বায়ক করে বিভিন্ন গ্রন্থ পর্যালোচনার জন্য উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে আরো ছিলেন ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ, জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার প্রধান ডঃ হাসান জামান ও বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালক ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী[৪৮]।

সরকারের চাল সফল হয়। আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। এই সময়ে কমিটি গঠনের প্রতিবাদ করে দৈনিক পাকিস্তানে আমার একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। 'একটি চিঠি' এই শিরোনামে সংবাদ আকারে এটি প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয় এই কমিটি গঠন কোনোক্রমেই সাধু-উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়, কেননা কমপক্ষে তিনজন সদস্য রবীন্দ্রবিরোধী কার্যকলাপ ও অন্যান্য ভাবে সর্বদা সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির পৃষ্ঠপোষকতা ও বাঙালী সংস্কৃতির বিরোধিতা করে এসেছে।[৪৯]

---

৪৬। 'ছাত্রসভায় প্রেস অর্ডিন্যান্স বাতিলের দাবি', দৈনিক পাকিস্তান, জানুয়ারী ১৫, ১৯৭০
৪৭। ঐ, জানুয়ারী ১৬, ১৯৭০
৪৮। 'উপদেষ্টা কমিটি গঠন', ঐ, জানুয়ারী ১৬, ১৯৭০
৪৯। 'একটি চিঠি', ঐ, ফেব্রুয়ারী ৫, ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository



দুই

## নবপর্যায়ে জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা

সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এই সময়ে জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা অত্যন্ত তৎপরতা শুরু করে ও নানারূপ প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের বিরাগের কারণ হয়ে ওঠে। সংক্ষেপে বি এন আর (BNR) নামে পরিচিত এই সংস্থাটি ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও দ্বিতীয় সামরিক শাসন জারি পর্যন্ত এর ভূমিকা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৬৯ সালের মে মাসে ডঃ হাসান জামানকে এর সার্বক্ষণিক পরিচালক নিযুক্ত করার পর এর কার্যকলাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ডঃ জামান কাজ শুরু করেন দুভাবে ঃ অল্পশিক্ষিত ও অখ্যাত লোকদের দ্বারা সাম্প্রদায়িক, রক্ষণশীল ও জাতীয়তাবিরোধী ছোট-ছোট পুস্তিকা রচনা করিয়ে তার হাজার-হাজার কপি দূরদূরান্তে গ্রামে অর্ধশিক্ষিত জনগণের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা, মোটামুটিভাবে প্রতিষ্ঠিত লেখকদের দ্বারা উচ্চমূল্যে পুস্তক রচনা করে তাদের নিরপেক্ষ করে তোলা। তিনি দুদিকে অত্যাশ্চর্যরকমভাবে সাফল্য লাভ করেন এবং পূর্ব বাংলার প্রতিষ্ঠিত লেখক শিল্পীদের এক বিরাট অংশকে সংস্থাটির গণবিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে নীরব রাখতে সমর্থ হলেন।

নিচের উদ্ধৃতি থেকে সংস্থাটির কার্যকলাপের কিছুটা খবর পাওয়া যাবে ঃ

> জাতীয় চেতনা ও সংহতি বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে সাহিত্য। এ সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা / বি এন আর/ অনন্য নজির স্থাপন করেছে। জানা যায়, ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর /আসলে মে মাস/ মাস থেকে ডঃ হাসান জামান কর্তৃক ডিরেক্টরের দায়িত্বভার গ্রহণের পর প্রায় পনেরশো বিভিন্ন ধরনের পুস্তক পুস্তিকা, কাব্য, নাটক, প্রকাশনার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত প্রায় ছশো প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামী আদর্শের বিভিন্ন দিক অর্থাৎ রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, আধ্যাত্মিক প্রভৃতিসহ পূর্ব পাকিস্তানের জনজীবন, ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্পর্কে বাংলা ও ইংরেজিতে ছোট-বড় পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে এবং এগুলো প্রদেশের দূরদূরান্তের জনসাধারণের মধ্যে বিপুলভাবে গৃহীত হয়েছে। এ ছাড়া আরও জানা

Dhaka University Institutional Repository



যায়, সংস্থার সাম্প্রতিক আকর্ষণীয় প্রকাশনা হিসেবে কতিপয় শিশুসাহিত্য এ প্রতিষ্ঠান বের করেছে। প্রকাশ, উপরোল্লেখিত পনেরশো পুস্তকের মধ্যে প্রায় আটশো খানা গণসাহিত্যমূলক, চারশো গবেষণামূলক ও তিনশো নাটক। পর্যায়ক্রমে ১৯৫৯ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত তদানীন্তন আইয়ুব সরকারের আমলে এই সংস্থা থেকে বাকি মাত্র তিনটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। এ সাহিত্যসৃষ্টি মারফত জনসাধারণের মধ্যে যেমনি একটি জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি এদেশের অবহেলিত লাঞ্ছিত লেখক সমাজও অনেকাংশে উপকৃত হলেন। এদেশের লেখক সমাজ, প্রবীণ কি নবীন, সাহিত্য সৃষ্টি করে এখান থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পারিশ্রমিক পাচ্ছেন। ফলে, যেমন প্রবীণ লেখক হতাশ হয়ে লেখনী চর্চা পরিত্যাগ করেছিলেন, তাঁরা আবার লেখনী ধরেছেন এবং বিকাশোন্মুখ তরুণ লেখকগোষ্ঠী নিজেদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের একটি যথোপযুক্ত মাধ্যম খুঁজে পেয়েছেন। আনন্দের বিষয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্ররা উল্লেখযোগ্যভাবে জাতীয় পুনর্গঠনের উদ্দেশ্য সাধনে উৎসাহের সহিত লেখনী চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন।[৫০]

১৯৭০ সালের প্রথম থেকে এই প্রতিষ্ঠানটির কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয়। বুদ্ধিজীবীদের এক বিরাট অংশ এর তৎপরতায় সন্দেহপরায়ণ হয়ে উঠেন এবং এটি পূর্ব বাংলার সংস্কৃতিক্ষেত্রে গোয়েন্দাগিরি করছে বলে মত প্রকাশ করেন। শেখ মুজিবুর রহমানও প্রকাশ্য জনসভায় এর কার্যকলাপের নিন্দা করেন। এর কাজকর্ম তবু অব্যাহত থাকে কিন্তু ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর কেন্দ্রীয় সরকার এর প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে।

তিন

'পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টি' বিরোধী আন্দোলন

উনসত্তরের অভ্যুত্থানের পর থেকে নানা পদ্ধতিতে বাঙালী তরুণ মানসে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ প্রচার ও প্রসারের চেষ্টা হয়। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মনে জাতীয়তাবোধের ভিত পাকা

---

৫০। 'দশ পর্যায়ে জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা — জনগণের অভিমত, ১৯৭০', (ঢাকা : জাতীয় পুনর্গঠনের সংস্থা, জুলাই ১৯৭০), পৃঃ ২০–২১ ।

Dhaka University Institutional Repository



করার জন্য পাঠ্যক্রমে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ আজিজুর রহমান মল্লিককে সভাপতি করে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয় এবং পরিষদের তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সিরাজুল ইসলাম 'পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টি' নামক দুই খণ্ডে একটি পুস্তক রচনা করেন।[৫১] এটি ১৯৭০-৭১ শিক্ষাবর্ষে পূর্ব বাংলার মাধ্যমিক স্কুলসমূহে নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্য হল। পুস্তকের প্রথম খণ্ডে ভারতবর্ষে মুসলিম জাতীয়তাবাদের উৎস ও বিকাশ এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তার পূর্ণ বিকাশের কথা আলোচিত হয়; দ্বিতীয় খণ্ডে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ এবং ভাষা-সাহিত্য-স্থাপত্য-চিত্র প্রভৃতির ভিতর দিয়ে যে অখণ্ড জাতীয়তার চেতনা প্রবাহিত হচ্ছে তার উপর আলোকপাত করা হয়। পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐক্য সম্পর্কে বলা হয় :

> কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, আপাতঃ এত অমিল সত্ত্বেও টেকনাফ হইতে তুরখাম পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডের প্রায় সকল অধিবাসীই এক ধর্মবিশ্বাসের সূত্রে আবদ্ধ। একে অন্যের সুখ দুঃখের ভাগীদার হিসাবে পাকিস্তানীরা একটি সুসংহত জাতি গড়িয়া তুলিয়াছে। আর সেই সঙ্গে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের নিজস্ব একটি কৃষ্টিগত বুনিয়াদ।... পাকিস্তানের নিজস্ব কৃষ্টিগত বুনিয়াদকে আমরা পাকিস্তানী কৃষ্টি আখ্যায়িত করিতে পারি। এই পাকিস্তানী কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রচ্ছদপটই দেশের জনগণের মধ্যে সংহতির একটা শক্তিশালী যোগসূত্র রক্ষা করিয়া চলিয়াছে।[৫২]

এই পুস্তকটি পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করায় ছাত্রছাত্রীরা এর প্রত্যাহারের জন্য সংগঠিত ভাবে আন্দোলন শুরু করে। দুটি সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় : একটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংসদের অপরটি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া গ্রুপ) তত্ত্বাবধানে। দুটি

---

৫১। মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম, পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টি, ২য় খণ্ড, (ঢাকা : ইস্ট পাকিস্তান স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড, মার্চ ১৯৭০), ভূমিকা।

৫২। ঐ পৃঃ ১-২

Dhaka University Institutional Repository



পরিষদই ১৯৭০ সালের আগস্ট মাসে স্কুলে-স্কুলে ধর্মঘট, প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিল করতে থাকে এবং তা পরবর্তী সপ্তাহেই সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস পর্যন্ত অব্যাহত রাখে। এই সময়ের মধ্যে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন[৫৩], বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন[৫৪] আন্দোলনে যোগদান করে এবং প্রদেশের ১৬ জন বুদ্ধিজীবী সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে বইটি প্রত্যাহারের দাবি জানায়।[৫৫]

আন্দোলনের মুখে সরকার নমনীয় নীতি গ্রহণ করে। একুশে আগস্ট এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হয়, ১৯৭১ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য বইটির প্রথম খণ্ডের কিয়দংশ ও দ্বিতীয় খণ্ড সম্পূর্ণভাবে বাদ দেওয়া হবে এবং ১৯৭২ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য বইটি একক পৃষ্ঠায় পুনর্লিখিত হবে।[৫৬] কিন্তু তবু আন্দোলন অব্যাহত থাকে কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসের পর থেকে তা স্তিমিত হয়ে আসে।

---

৫৩। 'দেশ ও কৃষ্টি বাতিলের দাবিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট' দৈনিক পাকিস্তান, সেপ্টেম্বর ২, ১৯৭০

৫৪। ঐ,

৫৫। ঐ, দৈনিক পাকিস্তান, আগস্ট ২৯, ১৯৭০

৫৬। দৈনিক পাকিস্তান, আগস্ট ২০, ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository



## আলোচ্য পর্বের কবিতার প্রতিকৃতি

ইসলামী জীবনাদর্শ বা জাতীয় আদর্শকে ভিত্তি করে এপর্বে বিশেষ কোনো কবিতা রচিত হয়নি। মফস্বল শহর থেকে প্রকাশিত চারটি কাব্যের খবর পাওয়া যাচ্ছে শুধু: এ বি এম আবদুল মান্নানের 'গোলেস্তার গুলবুলবাদ' /বরিশাল/, আব্দুল হাশেমের 'তকবির' /পাবনা/, মোহাম্মদ আবদুল বাসির 'কাব্যে কুরআন পাক' /ফরিদপুর/ ও মকবুল হোসেনের 'বিশ্বমঞ্চে মুসলিম মিশা' /ময়মনসিংহ/; কিন্তু সবাই বাহুল্য, কাব্যবিচারে এগুলি তাৎপর্যহীন।

উদার নৈতিক মানবতাবাদের ধারায় ফেলা যায় তিনটি কাব্য সংকলনকে: ফজল শাহাবুদ্দিনের 'আকাঙ্ক্ষিত অসুন্দর', সৈয়দ শামসুল হকের 'বিরতিহীন উৎসব' ও মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর 'রক্তিম হৃদয়'। প্রথম দুটিতে বিশুদ্ধ ব্যক্তিতার প্রাধান্য বেশি লক্ষ করা যায়। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর কবিতায় ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে।

এ সময়ের অনেক কবিতা সমষ্টি ভাবনায় বিশিষ্ট। নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শে বিশ্বাসী না হয়েও কবিগণ পূর্ব বাংলার সমষ্টিগত বোধ ও আবেগকে ভাষা দিয়েছেন। অবশ্য একালে প্রকাশিত সব কবিতাই এসময়ের মধ্যে কাব্যাকারে প্রকাশ পায়নি; বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আল মাহমুদের 'সোনালি কাবিন'[১] ও সিকানদার আবু জাফরের 'বাংলা ছাড়ো', মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের 'প্রতন্ন প্রত্যাশা' ও হাসান হাফিজুর রহমানের 'যখন উদ্যত সঙ্গীন'। প্রকাশিত কাব্যগুলির মধ্যে সৈয়দ শামসুল হকের 'বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা', মযহারুল ইসলামের 'বিচ্ছিন্ন প্রতিলিপি', শামসুর রাহমানের 'নিজ বাসভূমে', আবদুর রশীদ খানের 'বন্দিত্ব স্বদেশ' ও নির্মলেন্দু গুণের 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই'-র মধ্যে এচেতনার পরিচয় লক্ষণীয়। 'বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা' আত্মকেন্দ্রিক হলেও এর পটভূমিতে বিরাজিত বিপর্যস্ত পূর্ব বাংলা স্পষ্ট ভাবেই প্রত্যক্ষগোচর। এগুলিতে এদেশের জনজীবনের দুর্দশা, জাতীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা

১। সোনালি কাবিন পুস্তকাকারে প্রথম বেরোয় ১৯৭০ সালে (ঢাকা: সব্যসাচী প্রকাশনী), কিন্তু ঐ সংস্করণে ঐ [illegible] হয়নি। ১৯৭৩ সালে একটি বর্ধিত সংস্করণ বেরোয় ঢাকার প্রাচ্য প্রকাশনী থেকে। এই সংস্করণে প্রথম সংস্করণের [illegible] উল্লেখ দিলেন, ১৯৭০ এর এইটি [illegible] অনেক আগে, [illegible] পুস্তকাকারে [illegible]।

Dhaka University Institutional Repository



ব্যক্তিগত নির্যাতন ও নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—কখনো মৃদু, কখনো সরোষে, —বিষয়বস্তু হয়েছে। এদেশের অনেক কবির রচনায় বিষয়বস্তু ব্যক্তিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার যে-প্রবণতা পূর্বে প্রকট ছিল তা এসময়ে কাটতে শুরু করেছে এবং ধারণা করা যেতে পারে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানই এর কারণ। কবিরা ক্রমশঃ জনজীবনবিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে জনজীবনসম্পৃক্ত হয়েছেন। এভাবে কবিতায় বাঙালী জাতীয়তাবাদের যে-স্ফুরণ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে, তা বাড়তি শক্তি পেয়েছে নবোদ্যমে রবীন্দ্র-নজরুল-জীবনানন্দের কবিতার চর্চার মধ্য দিয়ে।[৫৭] এসময়ে এঁদের কবিতার নতুন-নতুন সংস্করণ এদেশে প্রকাশিত হয়েছে।

জাতীয় মুক্তি ও মার্কসবাদী আদর্শকে অবলম্বন করে রচিত কবিতার সংখ্যা এপর্বে আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। মৌলিক ও অনূদিত সংকলনগুলি হচ্ছে : ইনু সাহার 'ঝড় আসছে', গগণ তানুর 'মিছিলের আর্তনাদ', (অনুবাদ ও [illegible]) লেখক সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত 'আফ্রো-এশীয় কবিতাগুচ্ছ', রণেশ দাশগুপ্ত অনূদিত ও সম্পাদিত 'ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতা'। সুকান্ত-র কবিতাও এসময়ে কিছু-কিছু সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হতে শুরু করে।

ঢাকা ও চট্টগ্রামের বাইরে মফস্বল শহর থেকে প্রকাশিত কবিতা-সংকলনের সংখ্যাও আগের তুলনায় বৃদ্ধি হয়েছে।

---

৫৭। স্বাধীনতা যুদ্ধের ও পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের তরুণদের মুখে-মুখে যে-গানটি ফিরত, তার একটি চরণ হচ্ছে :

রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা
নজরুলের বাংলাদেশ
জীবনানন্দের রূপসী বাংলা
রূপের যে তার নেইকো শেষ।
আমার বাংলাদেশ ॥

Dhaka University Institutional Repository



# ষষ্ঠ অধ্যায়

## পাকিস্তান ও ইসলাম -বিষয়ক কবিতা

Dhaka University Institutional Repository



আধুনিক যুগে মুসলমান-রচিত বাংলা সাহিত্যের এক বিরাট অংশ ইসলাম ও মুসলমানদের জীবনভাবনার সঙ্গে সম্পর্কিত। বিশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতবর্ষের তথা বঙ্গদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেও এর সরাসরি প্রভাব পড়ে। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবি গ্রহণ করলে মুসলিম বাংলা সাহিত্যও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। মুসলমান সাহিত্যিকদের অনেকে এই ঘটনায় আলোড়িত হন এবং কাব্যে, উপন্যাসে, নাটকে ও প্রবন্ধে নানাভাবে সাম্প্রদায়িক ভাবধারা আনয়ন করতে ও চাপিয়ে দিতে প্রয়াসী হন।* কিন্তু পাকিস্তান প্রস্তাবের পশ্চাতে কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ না-থাকায়, সাহিত্যে, বিশেষত কবিতায়, পাকিস্তানী ভাবধারা কোনো সুষ্ঠু পরিণতি লাভ করেনি। কারো রচনায় পাকিস্তান একটি আদর্শ ধর্মরাজ্য রূপে বিবেচিত হল, কারো রচনায় পাকিস্তান একটি ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ রাষ্ট্র রূপে দেখা দিল। কেউ স্বপ্ন দেখলেন পাকিস্তানে পূর্ণ মানবতা ও পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটবে, আবার কেউ একটি স্বতন্ত্র সাহিত্য-আন্দোলন সৃষ্টির সুযোগ হিসাবে পাকিস্তানকে গ্রহণ করতে চাইলেন। তবে সমস্ত কবিতায় নিঃসন্দিগ্ধভাবে লক্ষ্য করা গেল স্বপ্ন, আবেগ ও উল্লাসের প্রবল প্রবাহ।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক বছরের মধ্যেই সে আগ্রহ ও আবেগ লোপ পেয়ে যায়। নানা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের ফলে পূর্বযুগের স্বপ্ন মরীচিকা রূপে প্রতীয়মান হয়। কবিতায়ও এর ছায়াপাত ঘটে। কেউ-কেউ এই

---

* "পাকিস্তান প্রস্তাব রাজনীতির ক্ষেত্রে মুসলমানকে যেমন একটি স্বতন্ত্রপথে পরিচালিত করে, তেমনি সাহিত্য ক্ষেত্রেও হীনমন্যতাবোধ দূর করে ও হিন্দু লেখকদের প্রভাবমুক্ত করে সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যের পথে চলতে অনুপ্রাণিত করে। এইভাবে দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রভাব সাহিত্য সংস্কৃতির অঙ্গনেও পড়ে।"
অমলেন্দু দে, বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃঃ ৩৮ – ১১।

Dhaka University Institutional Repository



সাহিত্যাদর্শ ত্যাগ করলেন, আবার কেউ-কেউ গান কবিতা লিখে সমাজকে শোধরাবার চেষ্টায় মনোনিবেশ করলেন। অন্য যাঁরা অকৃত্রিমভাবে এই ধারায় কবিতা রচনা করে চল ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকের অকৃত্রিমতা সত্ত্বেও শিল্পগুণ উৎকর্ষের আগ্রহ লক্ষিত হয়নি। ভাবমূলকভাবে অধিকতর প্রতিভাশালী কবি ফররুখ আহমদ ' হাতেম তায়ী ' পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন।

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত সংঘর্ষের সময় কৃত্রিমভাবে জাতীয়জীবনে ইসলামী জোশ ও পাকিস্তানী-বোধ জাগ্রত করার চেষ্টা হলে সাহিত্যেও এর অস্থায়ী প্রভাব পড়ে। সে-সময়ে অনেকে স্বদেশপ্রেম-মূলক কবিতা রচনার চেষ্টা করেন। তবে স্বাভাবিকভাবে লক্ষ্য করা গেল যে, তাঁদের অনেকের রচনায় পূর্ববাংলার ঐশ্বর্য, ঐতিহ্য ও মর্মবেদনাই বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এই ধারার আটজন প্রধান কবির কবিতা আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে এসেছে আরো কয়েকজন কবির বিচ্ছিন্ন কয়েকটি কাব্য। এই প্রধান কবিগণ হলেন গোলাম মোস্তফা /১৮৯৫ - ১৯৬৪/, সুফী জুলফিকার হায়দার /জন্ম ১৮৯৯/, ছদরুদ্দীন /জন্ম ১৯১০/, রওশন ইজদানী /১৯১৭ - ৬৭/, ফররুখ আহমদ /১৯১৮-৭৪/, তালিম হোসেন /জন্ম ১৯১৮/, মুফাখ্খারুল ইসলাম /জন্ম ১৯২১/ এবং সৈয়দ আলী আহসান /জন্ম ১৯২২/।

Dhaka University Institutional Repository



## গোলাম মোস্তফা

১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে[১] যশোর জেলার কুমার নদীর তীরবর্তী মনোহরপুর গ্রামে গোলাম মোস্তফা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ গোলাম সরওয়ার নীল বিদ্রোহের সময় জাতীয় উদ্দীপনামূলক কবিতা রচনা করে জনপ্রিয় হয়েছিলেন এবং পিতা কাজী গোলাম রব্বানী প্রসিদ্ধ ছিলেন গ্রাম্য কবি হিসাবে।[২]

গ্রামের বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। ১৯১৮ সালে রিপন কলেজ থেকে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর 'সাংসারিক প্রতিকূলতার দরুণ' তাঁর লেখাপড়ার পর্ব সমাপ্ত হয়। ১৯২০ সালে ব্যারাকপুর সরকারী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকরূপে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন এবং ১৯৫০ সালে ফরিদপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে 'নির্দিষ্ট সময়ের বহুপূর্বে ব্যক্তিগত কারণে' অবসর নিয়ে কর্মজীবনে ইতি টানেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৬৪ সালের ১৩ই অকটোবর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে — সেরিব্রাল থ্রম্বসিস রোগে।[৩]

তিনি বাংলা একাডেমীর ফেলো ও আজীবন সদস্য, টেকস্ট বুক বোর্ড, করাচীর নজরুল একাডেমী, কেন্দ্রীয় বর্ণমালা সম্প্রসারণ বোর্ড, পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি/১৯৪৯/, পাকিস্তান জাতীয় গ্রন্থাগারের গভর্নিং বডি ও পাকিস্তান লেখক সংঘের সদস্য ছিলেন। ১৯৬০ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ইন্দো-পাক সাংস্কৃতিক সম্মেলন এবং ১৯৬১ সালে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর অধিবেশনে তিনি পাকিস্তানী লেখকবৃন্দের প্রতিনিধিত্ব করেন।[৪]

বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য যশোর সাহিত্যসংঘ ১৯৫২ সালে তাঁকে 'কাব্য সুধাকর' উপাধি দান করে। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হওয়ার অব্যবহিত পরে

---

১। সার্টিফিকেটে উল্লিখিত আছে ১৮৯৭, গোলাম মোস্তফা, অভিভাষণ, মওলাহার, বৈশাখ ১৩৫৯, পৃঃ ২৮৯

২। ঐ, পৃঃ ২৮৯ – ৯০

৩। এম ইয়াসীন, কবি গোলাম মোস্তফা : জীবনী, কবি গোলাম মোস্তফা, ফিরোজা খাতুন /সংগ্রহ ও সম্পাদনা/, ঢাকা ১৯৬৭, পৃঃ ১৯

৪। ঐ, পৃঃ ১৩৬ – ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository


তিনি প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে পাঁচহাজার টাকা পুরস্কার, ১৯৬০ সালে সিতারা-ই-ইমতিয়াজ খেতাব, President's Medal for Pride of Performance in Bengali ও আরো পাঁচ হাজার টাকা লাভ করেন।[৫]

দুই

গোলাম মোস্তফার রচিত প্রথম কবিতা 'আদ্রিয়ানোপল উদ্ধার' ১৯১৩ সালে সাপ্তাহিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত হয়।[৬] পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে তিনি মোট সাতটি মৌলিক কাব্য, চারটি কাব্যানুবাদ এবং একটি কবিতা-সংকলন রচনা করেন। এগুলির মধ্যে পাকিস্তান-পূর্ব যুগে প্রকাশিত হয় রক্তরাগ /১৯২২/, হাস্নাহেনা /১৯২৭/, খোশরোজ /১৯২৯/, সাহারা /১৯৩৬/, কাব্যকাহিনী /১৯৩৮/ এবং অনুবাদ-গ্রন্থ মুসাদ্দাস-ই-হালী /১৯৪১/। পাকিস্তান-আমলে প্রকাশিত হয় মৌলিক রচনা তারানা-ই-পাকিস্তান /১৯৪৮/ ও বনি আদম/১ম খণ্ড, ১৯৫৮/; অনুবাদ-কাব্য আল-কুরআন /১৯৫৭/, কালামে ইকবাল /১৯৫৭/ ও শিকওয়া ও জবাব-ই-শিকওয়া /১৯৬০/ এবং কবিতা-সংকলন বুলবুলিস্তান /১৯৪৯/।

গোলাম মোস্তফার কবিতার দুটি প্রধান অবলম্বন প্রেম ও ইসলাম। দুটিতেই তিনি সরল আবেগের প্রশ্রয় দিয়েছেন। মুসলমানদের ঐতিহ্য নিয়ে বাংলা সাহিত্যে একটি ইসলামী-ধারা সৃষ্টি হোক, এটা তিনি আন্তরিকভাবেই কামনা করতেন। ''আমি তাই ছোট বেলা থেকেই চেয়েছিলাম মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্য রচনা করতে। রবীন্দ্রনাথ বা সত্যেন্দ্রনাথের অনুরাগী হলেও আমার মনে জেগেছিল আমাদের নিজস্ব সাহিত্য-সৃষ্টির একটা দুর্জয় আকাঙ্ক্ষা। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির তাকিদে নয় – সহজভাবেই আমি বাংলা সাহিত্যে চেয়েছিলাম ইসলামী কৃষ্টির রূপায়ণ।''[৭] মুসলমানদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি তাদের পতিত অবস্থার জন্য দুঃখ করেছেন কিন্তু কোনো গভীর জিজ্ঞাসা দ্বারা আলোড়িত হননি। একজন ধর্মভীরু মুসলমান হিসেবে তিনি মুসলমানদের পুনর্জাগরণ কামনা করেছেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন সংকটের উত্তরণের জন্য ইসলামকেই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে বিশ্বাস করেছেন। তিনি পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানকে একই জাতি রূপে মেনে নিয়েছেন এবং পৃথিবীর যে-কোনো অঞ্চলে মুসলমানদের সৌভাগ্যে আনন্দিত হয়েছেন। তাঁর এই প্যান-ইসলামীজম অবশ্য প্যান-এ্যারাবিজমের সমার্থক ছিল। তিনি কখনো সাম্প্রদায়িকতাকে লালন করেননি, ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানের মিলন-কামনায় রচিত অনেক কবিতাও তাঁর রয়েছে।

---

৫। ঐ, পৃ ১০৭     ৬। পূর্বোক্ত অভিভাষণ, পৃ ২৯০

৭। ঐ, পৃ ২৯১-৯২

Dhaka University Institutional Repository



ইসলাম ও মুসলমান-সম্পর্কিত তাঁর কবিতাগুলিকে কয়েকভাগে বিন্যাস করা যায়। এক শ্রেণীর কবিতায় তিনি বিভিন্ন পর্বকে /ঈদ, কোরবানী, শবেবরাত, ফাতেহা ইয়াজ দহম/ অবলম্বন করেছেন, অপর এক শ্রেণীতে প্রকাশ করেছেন আধুনিক পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের জাগরণে উল্লাস ও আনন্দ /মোস্তফা কামাল, মিসর, লীগ বিজয় — কলকাতার মোহামেডান স্পোর্টিং দলের লীগ বিজয়/, আরো এক শ্রেণীতে রয়েছে ইসলামের ইতিহাসের মহত্ত্ব, উদারতা, সাম্য ও বীরত্ব-ব্যঞ্জক বিভিন্ন ঘটনা ও কাহিনীর বর্ণনা এবং সর্বশেষ শ্রেণীতে পড়ে ইসলামের বিভিন্ন উপকথাকে ভিত্তি করে রচিত কবিতাগুলি।

'রক্তরাগ'[৮] কাব্যের কবিতাগুলি প্রধানত ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে। ভূমিকা হিসাবে রচিত 'পরিচয়' কবিতায় কবির মনোভাব পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে। ১৯১৬ সালে 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রকাশিত এই কবিতায় তিনি লিখেছেন —

> যে জাতি একদা উষর-ধূসর ভীষণ আরব দেশে
> বিরাজ করিত অতীব তুচ্ছ, অতীব ঘৃণ্য বেশে,
> জীবন-মরণ, সমাজ-ধরম ভুলিয়া যাহারা হায়
> পশুর অধিক পড়িয়া রহিল সুনিবিড় তমসায়!
> সহসা আবার নবীন মন্ত্রে লভিল যাহারা প্রাণ
> তাদেরই আজি সে শিশু-সন্তান — আমরা মুসলমান।[৮ক]

এখানে কবি চমৎকারভাবে বলেছেন যে, মুসলমানদের দেশ-কাল ও গোত্রভেদ নেই।

এই কবিতার শেষাংশে তিনি মুসলমানদের উদ্বোধন কামনা করেছেন নিম্নলিখিত ভাবে —

> জগতের মাঝে আমরা সবাই বিপুল একটি জাতি,
> লুকায়ে রয়েছে আমাদের মাঝে অসীম বীর্য-ভাতি,
> আমরা জগতে মরিব না কভু, চিরকাল বেঁচে রবো
> যুগে যুগে লভি নূতন শক্তি, বিশ্ব-বিজয়ী হবো।
> এক জাতির সনে বেঁধে দিব প্রাণ— এক সুরে গাবো গান,
> মহা-মানবতা গড়িয়া তুলিব — আমরা মুসলমান।[৮খ]

একটি কবিতায় কবি হিন্দু-মুসলমানের মিলন-কামনা করেছেন। রশিদ তার বন্ধু নরেনকে মুসলমানদের অতীত-গৌরবের বিবরণ দান করায় নরেন মুগ্ধ হয়েছে এবং এই মহান জাতির সঙ্গে মিলিত হয়ে 'ভারত-জননী'র সেবা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

---

৮ক। পৃঃ ৫, কাব্যগ্রন্থাবলী, ১মখণ্ড, (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৭)
৮খ। পৃঃ ৬, ঐ

Dhaka University Institutional Repository


শিখুর আশিস্ মম ; যে মহা-জাতির
অতীত কীর্তি আছে সারা বিশ্ব জুড়ি
সেই জাতি অন্ধকারে আছে আজ পড়ি ;
সেই জাতি উপেক্ষিত — ঘৃণা-হতাদর ;
এসো ভাই, এসো সবে, দাও আলিঙ্গন,
তুমি কভু ঘৃণ্য নহ, নহ হীনজন,
নহ তুচ্ছ, নহ পর, — তুমি মোর ভাই !
এসো ভাই দাঁড়াইয়া আকুলে আজি
লই দীক্ষা, করি পণ, — জীবনে মরণে
এক হয়ে রবো মোরা, সমবেতভাবে
সাধিব মায়ের কাজ, ভারত-জননী
উভয়ের মুখপানে উঠিবে হাসিয়া,
ঘুচে যাবে দুঃখ-ক্লেশ, ঘুচিবে বিরোধ,
ঘরে ঘরে কল্যাণের হবে অভ্যুদয়
ধন্য হবো মোরা সবে । জুড়াবে প্রাণ
হেরিয়া যুগল-মূর্তি হিন্দু-মুসলমান ।[৯]

'খোশরোজ'[১০] কাব্যগ্রন্থের প্রায়-সমস্ত কবিতাই মুসলমানদের সম্পর্কে । এক কালে মুসলমানরা জ্ঞানে-গুণে-শৌর্যে-বীর্যে পৃথিবীর সেরা জাতি হিসাবে বিবেচিত হত কিন্তু আধুনিক কালে কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার বেড়াজালে সে দুর্বল হয়ে এক পতিত জাতিতে পরিণত হয়েছে । সে-জাতিকে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে পুনরায় পৃথিবীর বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে তিনি আহ্বান জানাচ্ছেন ।

দৃপ্ত গর্বে বেগে ওঠ্ তবে শাখা-বন্ধন দুপায়ে দলি
আঘাত সহিয়া বাঁধন কাটিয়া চলারেই মোরা জীবন বলি ।
বল বল তুই ছোটো নস— তুই হীন নস — তোর বিরাট খ্যাতি,
মুসলিম তুই — বিশ্বাস কর — জগতের মাঝে শ্রেষ্ঠ জাতি ।[১১]

---

৯। হিন্দু মুসলমান, রক্তরাগ, পৃঃ ৪১, কাব্যগ্রন্থাবলী

১০।

১১। মুসলিম, ঐ, পৃঃ ৮৪, কাব্যগ্রন্থাবলী,

Dhaka University Institutional Repository



কবি স্বপ্নেও দেখেছেন এক জাগ্রত মুসলিম জাতিকে যাঁরা সমগ্র পৃথিবী জুড়ে স্থাপন করেছে ইসলামের এক শান্তি-রাজ্য ঃ

পূরব-পশ্চিম মিশিল আজ
মহা-মানবের মিলন-তীর্থে
রচিল শিশু জগৎ-মাঝ !
ধলা-কালা-পীত সকল মিলে
মধুর এ নব মিলন দৃশ্য !
ইসলামী শাহী পতাকার তলে
পূজা হলো আজি সকল সাজ !
চরণে লীনত বিদ্রোহী যতো
শান্তি-রাজ্য করে বিরাজ ।[12]

কবির ভাবনায় এই কাব্যে 'বাংলা' দেশ স্থান পেয়েছে। তিনি মরুভূমির 'তপ্ত বালুকা-সার' বাংলার সরস জমিতে ছড়িয়ে এর চির-শ্যামলতা ও চির-সরসতা দূর করে, [illegible]পান, দৃপ্তপ্রাণ জাতি গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন 'বেদুঈন' কবিতায়, বাংলার মুসলমানদের জাগতে আহ্বান করেছেন 'তীর-শরীক' কবিতায়; বাংলা দেশের 'খাঁটি স্বদেশ নেতা', 'নতুন সুফী পীর' 'সৈয়দ আহমদ খান' হতে চেয়েছেন 'খেয়াল' কবিতায় এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-এর মৃত্যুতে 'নবনীর আশুতোষ' দিয়ে তাঁকে বন্দনা করেছেন বাংলার জাতীয় গৌরব বলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কথা ও কাহিনী'র অনুসরণে 'কাব্য-কাহিনী',[13] রচিত হয়। এতে ইসলামের ইতিবৃত্ত ও উপকথার কয়েকটি ঘটনা ও কাহিনীর কাব্যরূপ দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ কবিতায় মুসলমানদের শৌর্য-বীর্য, উদারতা, ত্যাগ ও মহত্বের পরিচয় আছে, তিনটি কবিতায় /রাখী-ভাই, গোপাল-গৃহিণী, প্রতিশোধ/ রয়েছে হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও মৈত্রীর চিত্র এবং শেষের দুটি কবিতায় /শিবাজী ও আফজল খাঁ, ঐ হিকমত/ রয়েছে মুসলমানের সঙ্গে হিন্দু-মারাঠা ও শিখের বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী।

---

১২। [illegible], মহাশ্মশান, পৃঃ ১২১, কাব্যগ্রন্থাবলী
১৩। কাব্য-কাহিনী, ১ম সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৩৬ ।

Dhaka University Institutional Repository



## তিন

পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠা গোলাম মোস্তফার কাব্য-সাধনায় গভীর প্রভাব বিস্তারকারী ঘটনা। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট মধ্যরাত্রিতে ঢাকা রেডিও থেকে কোরান তেলাওয়াতের পর গীত হয় তাঁর রচিত 'সকল দেশের চেয়ে পিয়ারা / দুনিয়াতে ভাই সে কোন স্থান / পাকিস্তান সে পাকিস্তান'।[14] দু-এক বছরের মধ্যে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠলে পূর্ব পাকিস্তানীদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখা ও বৃদ্ধি করার জন্য সীমান্ত-সংলগ্ন শহরে-শহরে গাওয়া হত কবি রচিত 'ওরে ও মোমিন ভাই, তুই করিস কেন ভয় / পাকিস্তানের দুর্দিন যাবে হবে হবে জয়' এবং 'আল্লা আল্লা বলরে ভাই যত মোমিন-গণ / পাকিস্তানের ময়দান কর্ রোশন দিয়া মন'।[15] কবি নিজেও উদ্যোগী হয়ে পাকিস্তানের আদর্শ প্রচারে ব্রতী হলেন। তাঁর পরিচালনায় এবং তাঁর স্ত্রী মাহফুজা খানমের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'নওবাহার' / ভাদ্র ১৩৫৬। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক আদর্শ প্রচার করা, কমিউনিজমের বিস্তার রোধ করা এবং বিশ্ব মুসলিম জাহানের তামদ্দুনিক-সংযোগ নিশ্চিত করা।[16] এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি নজরুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাদর্শের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান শুরু করেন। হিন্দু ধর্ম ও ঐতিহ্য সম্পর্কিত এবং ইসলাম-বিরোধী অংশগুলি বর্জন করে নজরুল রচনাবলীর পাকিস্তানী সংস্করণ প্রকাশ করার জন্য তিনি প্রস্তাব দেন[17] এবং 'নজরুল কাব্যের অনাকাঙ্ক্ষিত অংশ' নামক প্রবন্ধে বর্জনীয় অংশগুলির তালিকাও প্রণয়ন করেন।[18] ১৯২২ সালের রচনায় রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতার ভাব ও আদর্শের সঙ্গে তিনি ইসলামী আদর্শের 'চমৎকার সাদৃশ্য' আবিষ্কার করেছিলেন এবং এমনভাবে 'মুসলমানদের প্রাণের কথা জগতের কোনো মুসলমান কবির হাত দিয়া' রচিত হয় নাই বলে দাবি করেছিলেন।[19] ১৯৪৩ সালেও তাঁর সে মনোভাব অক্ষুণ্ণ ছিল।[20] কিন্তু ১৯৬০ সালের রচনায় রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে মধ্যযুগীয় ও প্রগতিশীল বিশ্বমানবের কাছে অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করে তিনি ইকবালকে সেই গৌরব দান করলেন।[21]

---

১৪। আব্বাসউদ্দীন আহমদ, আমার শিল্পীজীবনের কথা, ২য় সংস্করণ, ঢাকা জুলাই ১৯৬৫, পৃ ১২৭। ১৫। ঐ, পৃ ১২৮ – ২৯।

১৬। মত ও পথ, নওবাহার, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫৬।

১৭। সম্পাদকীয়, নওবাহার, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৫৭, পৃ ৭৩৭ – ৩৮।

১৮। মাহফুজা খানম (সম্পাদনা), গোলাম মোস্তফা প্রবন্ধ সংকলন, ঢাকা, জুন ১৯৬৮, প্র, সং, পৃ ১৯১–২১৫।

১৯। গোলাম মোস্তফা, ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ, আমার চিন্তাধারা, ঢাকা, ২য় সং, '৬৮, পৃ ২৫

২০। রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয়বাদ, ঐ, পৃ ১৩০।

২১। ইকবাল ও রবীন্দ্রনাথ, ঐ, পৃ ২৩২–৩৩।

Dhaka University Institutional Repository



১৯৫২ সালে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের স্তুতিমূলক 'মুসলিম লীগ' কবিতায় রাষ্ট্রভাষার বিরোধ ভুলে 'মুহাম্মদের রাষ্ট্র 'ভাষায়' কথা বলার জন্য তিনি বাঙালীদের প্রতি আহবান জানালেন —

আমারও তোমার ভাষার দুখ, ভুলোনা ও-কথা, দিওনা দাগ
মুহাম্মদের রাষ্ট্রভাষায় দিলে-দিলে কথা কহিব আজ।
অন্তরে আজ জেগেছে সুখ
আজ নাই কোন ভাষার দুখ
ভাষার সীমানা পেরিয়ে আমরা পৌঁছেছি আজ সুরলোকে
মহামিলনের স্বপ্ন জেগেছে চোখে চোখে।[22]

বাংলা ভাষার হরফ বদল করে 'পাক-বাংলা' সৃষ্টির জন্য তিনি পরামর্শ দিলেন[23] এবং বললেন 'পূর্ব পাকিস্তানকে আরবী হরফ গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকিবেনা'।[24] বাঙালী জাতি সেমিটিক জাতি থেকে উদ্ভূত এবং বাংলা ভাষা সেমিটিক গোষ্ঠীর ভাষা এই মতবাদও তিনি প্রচার করতে শুরু করলেন[25] এবং নবীন সাহিত্যিকদের উপদেশ দিলেন সাহিত্যে 'পাকিস্তানবাদ' প্রয়োগ করতে।[26]

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হলে তিনি যারপরনাই আনন্দিত হলেন। আইউব খানের প্রশস্তিমূলক তাঁর দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হল। সামরিক শাসনকে তিনি ইসলাম সম্মত বলে জানালেন এবং আইউব খানকে আহবান করলেন 'আমীরুল মুসলিমীন' হতে।

খুশ-আমদিদ! পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়ক আইউব খান,
মরণ-আহত জাতির জীবনে যথা মসিহা মূর্তিমান।
... ... ...
আইউব, তোমার হাতে তলোয়ার, পরে ঋষী দীনের বেশ;
ক্ষতি কি তাহাতে; ঋষী জেনেছে শাসন করা কি চলেনা দেশ;
মিথ্যা ধারণা! ইসলাম কভু বলেনা একথা। শাসন তার
শাশ্বত এক নীতির উপরে চলে চিরদিন চমৎকার।[27]

---

২২। নওবাহার, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৃঃ ৫–৬
২৩। সম্পাদকীয়, নওবাহার, পৌষ ১৩৫৯, পৃঃ ৮৮ – ৮৯
২৪। গোলাম মোস্তফা, আরবী হরফের ইতিহাস, নওবাহার, শ্রাবণ ১৩৫৯, পৃঃ ১৭৫
২৫। আর্য-সভ্যতা, পূর্বোক্ত আমার চিন্তাধারা, পৃঃ ২৪৭–৬৪
২৬। পাক-বাংলার ভাষা-সাহিত্য, ঐ, পৃঃ ১৯২ ১৯৫৭
২৭। খুশ-আমদিদ, মাসিক মাহে নও, ফেব্রুয়ারী, পৃঃ ১ – ৩

Dhaka University Institutional Repository



এই কবিতায় তিনি গণতন্ত্রেরও নিন্দা করলেন —

এখন দুনিয়া চলিতেছে আজ মানবনীতি ও মানব মত,
যাহার গুণকীর্তি গণতন্ত্রের মায়ায় মুগ্ধ সারা জগৎ ।
কী ফল পেয়েছে মানুষেরা এই 'গণদেবতার' অর্চনা করি ;
যত দুর্নীতি অনাচার আর ব্যভিচারে গেছে জগৎ ভরি ।[28]

অব্যবহিত পরে তিনি মৌলিক গণতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহিত্যরচনা করতে লেখক সমাজের প্রতি আহ্বান জানালেন ।[29] তাঁর এই ধরনের কার্যকলাপে সরকার খুশি হয়ে তাঁকে নানাভাবে পুরস্কৃত করে ।

গোলাম মোস্তফার এই চিন্তাধারা সর্বাংশে সাহিত্যিক বা আদর্শিক ছিল বলে স্বীকার করা কষ্টকর । নজরুল ইসলাম আত্মীয়তার সম্পর্কে তাঁর নানা শ্বশুর[30] হলেও তাঁর জনপ্রিয়তায় তিনি খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন না । নজরুলের কবিতায় ইসলাম-বিরোধী ভাব খুঁজে বের করার আড়ালে নজরুলের পরিবর্তে পাকিস্তানের জাতীয় কবি হিসাবে তাঁর নিজের স্বীকৃতি পাওয়ার উদগ্র কামনা যুক্ত ছিল, এমন অনুমান অসংগত নয় । তিনি নিজেকে মনে করতেন পাকিস্তানের বুলবুল কবি ।[31] যাহোক তাঁর এই মনোবৃত্তি তরুণ সমাজের কাছে প্রশংসিত হয়নি এবং তাঁরা তাঁকে ব্যঙ্গ করতেন 'গোলমাল ফতুয়া' বলে ।[32]

চার

পাকিস্তান আমলে তাঁর প্রকাশিত প্রথম কাব্য 'তারানা-ই-পাকিস্তান'।[33] এতে ইসলামী গজল, পাকিস্তানী গান ও বিবিধ — এই তিন ধরনের গান সংকলিত হয়েছে । প্রথম খণ্ডে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম / সকল কাজের শুরুতে বল / ওরে ও মুমিন মুসলমান,

---

২৮। ঐ
২৯। পাক-গণতন্ত্র ও লেখক সমাজ, পূর্বোক্ত আমার চিন্তাধারা, পৃঃ ২৪৫
৩০। সৈয়দ আলী মিয়া, কবি গোলাম মোস্তফা, ঢাকা, ১ম সং, এপ্রিল ১৯৬৫, পৃঃ ৩২
৩১। সরলানন্দ সেন, ঢাকার চিঠি, ১ম খণ্ড, মুক্তধারা, ১৯৭১ ডিসেম্বর, মুজিবনগর, বাংলাদেশ, পৃঃ ৭৩ ।
৩২। ঐ
৩৩। ২য় মুদ্রণ, (ঢাকা : মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী, ১৩৫৬)

Dhaka University Institutional Repository



সব গুণগান তোমারি / হে রাব্বিল আলামিন, অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি / বিচার দিনের স্বামী, নিখিলের চির সুন্দর সৃষ্টি / আমার মুহাম্মদ রসুল, নাজাতের এই পাঁচ পিয়ালা, পলাশী প্রান্তর — এই ধরনের সতেরটি গান রয়েছে। এই গানগুলি বাঙালী মুসলমান সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল এবং এখনো ধর্মীয় সভা-সমিতিতে গীত হয়ে থাকে। দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে পনেরটি গান। পাকিস্তান-সৃষ্টিতে কবির মনে যে অপরিসীম আনন্দ-উদ্দীপনা জেগেছে তার প্রচুর নিদর্শন রয়েছে এ গুলিতে। পৃথিবীতে পাকিস্তান এক আদর্শ রাষ্ট্র হবে সেকথা তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

দুনিয়াতে আজ জুলমাত ভারী, নাইকো ইনসাফ, নাই ঈমান
কে শুনাবে প্রেমের বাণী, করবে কে মুশকিল আসান
কে মিলাবে আরব-আজম পূর্ব-পশ্চিম সারা জাহান
এক কথায় তার সাফ জবাব দাও —
— পাকিস্তান সে পাকিস্তান।[৩৪]

পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা কবির কাছে নব সাম্যবাদের ও অগণিত গণমানবের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক বলে মনে হয়েছে —

তারা সে ইশারা নব সাম্যবাদের
প্রতীক সে অগণিত গণমানবের
চাঁদ সাথে দেয় মিলন মহান
আমাদের কওমী নিশান।[৩৫]

৩নং গানে কৃষকদের এবং ৫নং গানে নারী জাতিকে নতুন পাকিস্তানে নবতালে জেগে উঠতে তিনি আহ্বান করেছেন; ৯নং গানে চোরাকারবারী, ঘুষখোর, মজুদদার ও কালোবাজারীদের হুঁশিয়ারী দিয়েছেন; ৮নং গানে শূন্য অবস্থা থেকে পাকিস্তানকে গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন এবং ১২নং গানে বলেছেন পাকিস্তানে কোনো কিছুর অভাব নেই। নিজে কিভাবে 'কওমী ফৌজ' সেজে দুর্নীতিবাজদের শায়েস্তা করবেন তার সরস বর্ণনা দিয়েছেন ৯ নং গানে।

টিকিট না কিনে রেলগাড়ী চড়ে দেখি কারা আজ যায়
জাহান্নামের ইস্টিশনেই নামাইয়া দিব তায়!
অফিসে বসানো গুপ্তচর,
পাখির সবাই কর্তা নফর
ঘুষ খাবে যারা, ঘুষি খাবে তারা, চাবুক মারিব — খবরদার।

---

৩৪। ১নং গান, ঐ।  ৩৫। ৩নং গান, ঐ।

Dhaka University Institutional Repository



তিন খণ্ডে সমাপ্ত করার বাসনা নিয়ে 'নবি আদম'[৩৬] মহাকাব্য তিনি রচনা শুরু করেন ১৯৫১ সালে এবং প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হয় ১৯৫৮ সালে।[৩৭] কাব্য-কাহিনী'র অনুবর্তী 'মানুষ' কবিতার ভাবই বিস্তৃততর হয়ে এখানে মহাকাব্যের আকার ধারণ করেছে; যদিও কাব্যোৎকর্ষে 'মানুষ' শ্রেষ্ঠতর।[৩৮] 'সত্য, ন্যায় ও সুন্দরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য শয়তানের সঙ্গে অনন্ত সংগ্রাম এবং পরিণামে মানবের জয় ঘোষণা — ইহা নবি আদম কাব্যের মূলসুর।'[৩৯] এই কাহিনী মুসলমান ও খ্রীস্টানদের নিকট সুপরিচিত এবং মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট' এই কাহিনী অবলম্বনে রচিত। প্রথম খণ্ডে আল্লাহ কর্তৃক আদম ও হাওয়ার সৃষ্টি, আদমকে সেজদা করতে শয়তানের অস্বীকৃতি, শয়তানের প্ররোচনায় আদম-হাওয়ার গন্ধম ভক্ষণ এবং পরিণতিতে পৃথিবীতে আগমন অবলম্বিত হয়েছে। শয়তানের চরিত্র-সৃষ্টিতে তিনি মিলটন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন —

> শয়তান যে মানুষের পক্ষে চির-অমঙ্গল, তাহাও নহে। যে সমস্ত শক্তি ও উপাদান দ্বারা বিশ্বজগৎ চালিত হইতেছে, শয়তান তাহাদের অন্যতম। সৃষ্টির সংরক্ষণ, প্রসারণ ও প্রগতির জন্য বিরুদ্ধ শক্তির প্রয়োজন রহিয়াছে। সেই বিরুদ্ধশক্তিই শয়তান। ... শয়তান তাই এক হিসাবে মানুষের শত্রু এবং সৃষ্টির সহায়ক। মানুষকে খাঁটি মানুষ হইবার সে সুযোগ দেয়; সমুদয় অপূর্ণকে সে পূর্ণ করিতে সাহায্য করে।[৪০]

আল্লাহ ও শয়তানের সম্পর্কে কবি আশেক ও মাশুকের সম্পর্ক কল্পনা করেছেন। সূফীতত্ত্ব ও বৈষ্ণবদের প্রেমতত্ত্ব দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন নিশ্চিতভাবে। আদমকে সেজদা করতে অস্বীকার করে শয়তান আল্লার কাছে অনুযোগ করছে —

> 'এ নহে বিদ্রোহ।' কহে ইবলিস্,
> 'এ আমার অভিমান। সমর্পিতা প্রীতের
> বঞ্চনার বেদনা এ। এর মাঝে তুমি
> দেখেছো কি শুধুই বিদ্রোহ, দেখনি কি

---

৩৬। নবি আদম, ১ম খণ্ড, ১ম সং, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৫৮
৩৭। ঐ, পেশকালাম, পৃঃ ৵
৩৮। হাসান হাফিজুর রহমান, আধুনিক কবি ও কবিতা, ১ম সং, ঢাকা নভেম্বর ১৯৬৫, পৃঃ ১৩৭ — ৩৮।
৩৯। পেশ কালাম, নবি আদম, পৃঃ ।০
৪০। ঐ, পৃঃ ৸০

Dhaka University Institutional Repository



আমার প্রেম ; আমার বিরহ ; আমার
অশ্রু ; হায় ! কাঁদি আমি কোন বেদনায়
তাও কি দেখোনি তুমি ; যুগ যুগ ধরি
যারে এত ভজিলাম, তাহার বিদ্বেষী
যার পায়ে লুটাইলাম, সেই বিনা আর
আমার আঙিনা দিয়া পরদেশে যায়
প্রেম করে অন্য সনে ! সহি তা কেমনে ![৪১]

মহাকাব্যিক মহিমা, গঠন কল্পনা ও বিস্তৃতি থাকলেও নবি আদমে উপযুক্ত ভাষা নেই। স্বর্গ, মর্ত্য, অন্তরীক্ষে বিস্তৃত যে-কাহিনী, অর্থ অক্ষম ও অশোভন শব্দ ব্যবহার করার ফলে এতে গাম্ভীর্য ও গাঢ়বদ্ধতা আসেনি ।

আল্লাহ কহিলেন : আমার কথা মন্দ নয় !
আদমের নাম করে আমারেই তুমি
দিতেছো আশ্বাস ! আমারি বিধান তুমি
ফিরে চাও খণ্ড করি ! সন্দ-পূজারী
তোমার এ আশা ! বেশ বেশ ! ভালো কথা !
কতোদিন এ সংগ্রাম জারী রবে, বলো ;
আগে চাই সময়ের সীমা-নির্ধারণ !
নির্দিষ্ট সময়-রেখা দাও ।[৪২]

তবে কাব্যের শুরুতে উপযুক্ত গাম্ভীর্য, ছন্দের প্রবহমানতা ও ভাবের গাঢ়বদ্ধতা সৃষ্টির বেশ কাছাকাছি তিনি পৌঁছুতে পেরেছিলেন —

নিস্তব্ধ নির্জন রাত্রি ! মহাশূন্য মাঝে
কোটি কোটি জ্যোতিষ্ক গ্রহতারাদল
মেলে আছে স্তব্ধ নয়নে ! মনে হয়
সুদূর নীলিমার এক সমুদ্র-প্রাঙ্গন
ভুলাইয়া অন্তরীক্ষ — বিশ্ব চরাচর
অনন্তকালের বুকে পাতিয়াছে তার
চিরন্তন অধিকার ।[৪৩]

---

৪১। নবি আদম, মনজিল : ২, পৃঃ ১৯-২০
৪২। ঐ, মনজিল : ৩, পৃঃ ৪৩-৪৪
৪৩। ঐ, মনজিল : ১, পৃঃ ১-২

Dhaka University Institutional Repository



কবি গোলাম মোস্তফা কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতার ভাবকে গ্রহণ না করলেও এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই কারণে শয়তান আল্লার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে গিয়ে যে বাকভঙ্গি ব্যবহার করেছে তা 'বিদ্রোহী'র অনুকরণ মাত্র। শয়তানের সংলাপে বিদ্রোহীর ছন্দ-ব্যবহার উদ্দেশ্যমূলক কিনা — এ সন্দেহ অমূলক নয়।

আমি রাহু হয়ে কভু বাড়াইব বাহু
চন্দ্র সূর্য করিব গ্রাস,
টপাটপ করে গিলে খাবো ধরে
সৃষ্টি জুড়িয়া আনিব ত্রাস।
কভু ধূমকেতু হবো উল্কা ছুটিয়া পালাবে আমার ভয়ে
নিবিড় অন্ধকারে !
মূর্ছিত হয়ে পড়িবে সৃষ্টি আমার হুহুঙ্কারে !
আমি বুদ্ধের প্রাণ — ভুলাইয়া দিব শিশু
আমি সাহারা গোবীর হাহাকার
ওই শ্যামকুন্তলা ধরণীরে আমি করিব চির নিঃস্ব,
আমি আনিব বন্যা তুফান ঝঞ্ঝা
করিব যখন চাহে এ মন যা
লণ্ডভণ্ড করে দিব আমি সৃষ্টির যতো শোভা
আমি রাখিব না কিছু সুন্দর মনোলোভা।[৪৪]

গোলাম মোস্তফা কবিতা-রচনা করেছেন প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে। এই দীর্ঘ সময়ে তাঁর কাব্যভাবনায় তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাঁর প্রথম দিকের রচনা দৃষ্টির

---

৪৪। বনি আদম, মনজিল ঃ ৬, পৃঃ ৫৯

Dhaka University Institutional Repository



সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন নয়। ইসলামিক বিষয়কে তিনি অবলম্বন করেছেন সম্প্রদায়নিষ্ঠ সাহিত্যিক হিসাবে। মুসলমানদের জীবন ও ঐতিহ্য সাহিত্যে স্থান লাভ করুক, বাংলা সাহিত্যে একটি ইসলামমুখী ধারা গড়ে উঠুক, এটা তিনি আন্তরিকভাবে কামনা করতেন। সে-জন্য ধর্ম-প্রভাবিত মানসিক প্রসঙ্গ তাঁর কবিতায় স্থান লাভ করেছিল। পাকিস্তানকালে তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানী রাষ্ট্রাদর্শের সঙ্গে সাহিত্যাদর্শকে মেলানো। সেজন্য তিনি ইকবালের কবিতা অবলম্বনে তরজমা করেছেন, নজরুলের কবিতার পাকিস্তানী সংস্করণ বের করার সুপারিশ করেছেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে বর্জনীয় ও পৌত্তলিক মানস-মনের কাছে দুর্বোধ্য বলে বাতিল করেছেন, বাংলা ভাষার উৎস অনুসন্ধান করেছেন সেমিটিক গোত্রের ভাষার মধ্যে। তাঁর এই মনোভাব খাঁটি সাহিত্যিকের ছিল না। অনিবার্যভাবে একালের রচনা হয়েছে শিল্পমূল্য বিযুক্ত। তবে দীর্ঘকাল ধরে কাব্যচর্চা করার ফলে কবিতা-রচনায় তাঁর যে একটি অনায়াসদক্ষতা অর্জিত হয়েছিল সেজন্য তিনি অনেকটা উৎরে গেছেন।

Dhaka University Institutional Repository



# সূফী জুলফিকার হায়দার

কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার ভাতুরিয়া গ্রামে ১৩০৬ সালের ১৪ই অগ্রহায়ণ (ডিসেম্বর ১৮৯৯) জুলফিকার হায়দার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃকুল ও মাতৃকুল কয়েক পুরুষ পূর্বে পারস্য থেকে হিজরত করে এই অঞ্চলে এসে বসবাস করতে শুরু করে এবং অচিরেই 'মানবীয়তা, ধার্মিকতা, সাহিত্য-প্রীতি ও পদমর্যাদার' জন্য খ্যাতি লাভ করে। কবির পিতা মওলবী মাহমুদ আখতার মোমিনে সেটেলমেন্ট বিভাগে চাকুরী করতেন এবং পরে শিবপুরের জমিদারের অধীনে সদর নায়েব পদে নিযুক্ত হন।[৪৫]

স্থানীয় বিদ্যায়তনে কবির বিদ্যার্জন শুরু হয় কিন্তু ম্যাট্রিক পরীক্ষার পূর্বে ১৯১৭ সালে তিনি পালিয়ে কলকাতা গমন করে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। এখানে তিনি প্রথম মহাযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। যুদ্ধান্তে তাঁকে জেলা জজকোর্ট বিভাগের সুপারভাইজার পদে নিযুক্ত করা হয়। কিছুদিনের মধ্যে তিনি সে চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতার ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোম্পানীতে প্রাথমিক সুপারভাইজার হিসাবে যোগ দেন এবং ১৯৪২ সাল পর্যন্ত সে পদে কাজ করেন।[৪৬]

১৯৪৬ সালে কলকাতায় এক সূফী দরবেশের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাঁর জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়ে যায়। তিনি দরবেশের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর নির্দেশে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করে কামেলদরবেশদের সংস্পর্শে আসেন। পরবর্তীকালে চট্টগ্রামের হযরত শাহ সূফী আলহাজ্ব মাওলানা আল মাহমুদ নিজামপুরী পীর সাহেব তাঁকে 'সূফী' পদবী প্রদান করলে তিনি তা নামের সঙ্গে ব্যবহার করতে শুরু করেন।[৪৭]

তিনি ভ্রমণাসক্ত ছিলেন এবং কার্যোপলক্ষে ও তীর্থদর্শনের জন্য বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে সফরে গমন করেন।[৪৮]

কবি জীবনে বিভিন্ন সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ

---

৪৫। দেওয়ান আব্দুল হামিদ, কবি জুলফিকার হায়দার (জীবন ও সাহিত্য), ১ম সংস্করণ, মার্চ ১৯৬২, ঢাকা, পৃঃ ৩

৪৬। ঐ, পৃঃ ৪-৬

৪৭। ঐ, পৃঃ ১৭

৪৮। সূফী জুলফিকার হায়দার, বিপ্লব বিপ্লব দ্বিতীয় বিপ্লব, ১ম সংস্করণ, মে ১৯৭৫ ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository



যোগাযোগ ছিল। তিনি ছিলেন কলকাতার 'নবীর পরিশীলন সমিতি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ময়মনসিংহের 'হায়দারিয়া খাদেমুল ইনছান' (১৯৫৫) সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। বিভাগ-পূর্ব কালের অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয় ছিল এবং কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে সাথে এই পরিচয় নিবিড় হৃদ্যতায় পরিণত হয়। রোগাক্রান্ত নজরুলের চিকিৎসার জন্য প্রথম যে বেসরকারী 'নজরুল সাহায্য কমিটি' গঠিত হয় তিনি ছিলেন তার যুগ্ম সম্পাদক।[৪৯]

গদ্য ও পদ্য উভয় রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর রচিত কাব্যের মধ্যে রয়েছে 'ভাঙা তলোয়ার',[৫০] 'ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম',[৫১] 'খুন যার খানলো যে গজল যারা',[৫২] 'সিপুর সিপুর দ্বিতীয় সিপুর'[৫৩], 'দোলন চাঁপা বই পাকানো'[৫৪] ও 'বাংলা কবিতায় মিলাদ শরীফ'[৫৫]। গদ্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়'[৫৬], 'বিদ্রোহী নজরুল নীরব থাকি'[৫৭] ও 'নজরুল প্রতিভা পরিচয়'।[৫৮]

বিভিন্নমুখী সাহিত্য রচনা করলেও যে-সুরটি তাঁর সকল সাহিত্যকর্মের মধ্যে ঐক্য রক্ষা করেছে তা হচ্ছে —

মুসলিম হলে সাচ্চা মুসলমান
বিভিন্ন দিশে থাকতে পারে সে শান্তির জবান।
বন্দুকের বুকে সহাতে পারে সে কত্তর নির্ভর,
তৌহিদ বাণী মুখর হলেই বিশ্বের প্রতিষ্ঠর।
যাঁর বাণী শুনলে আকাশে চাঁদ খণ্ডিত হয়
তাঁরি সাচ্চা উম্মতই শুধু মুসলিম নিশ্চয়।[৫৯]

---

৪৯। কবি মুনাফিকার হায়দার (জীবন ও সাহিত্য), পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬-৮
৫০। ১ম সং, ১৯৪৫, কলকাতা; ২য় সং, ১৯৫৯, ঢাকা।
৫১। ১ম সং, ১৩৬৮ হিজরী, ঢাকা; ২য় সংস্করণে (১৯৫৯ ঢাকা) নতুন নামকরণ হয় 'চেন সবাই মুসলমান'।
৫২। ১ম সং, ১৯৫৯, ঢাকা। ৫৩। ১ম সং, মে ১৯৭৫, ঢাকা।
৫৪। অপ্রকাশিত, সিপুর সিপুর দ্বিতীয় সিপুরের পরিশিষ্টের গ্রন্থতালিকা।
৫৫। অপ্রকাশিত ঐ।
৫৬। ১ম সং, সেপ্টেম্বর ১৯৬৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৫৭। 'নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ, ১ম সং, মে ১৯৬৬, ঢাকা।
৫৮। অপ্রকাশিত গ্রন্থতালিকা, সিপুর সিপুর দ্বিতীয় সিপুরের পরিশিষ্ট।
৫৯। পূর্বোক্ত কবি মুনাফিকার হায়দার, পৃঃ ১৯।

Dhaka University Institutional Repository


দুই

'ভাঙা তলোয়ার'[৬০] ১৯৪৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এর দ্বিতীয় সংস্করণে পাকিস্তান-আমলে প্রকাশিত চারটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রথম সংস্করণের কবিতাগুলি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত। যুদ্ধের অবর্ণনীয় ধ্বংস ও মৃত্যু এবং যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ, সামাজিক বৈষম্য ও কদাচার কবিকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। পৃথিবীব্যাপী কবি নিখিল মানবাত্মার আর্ত হাহাকার শুনতে পান শুধু ঃ

আমি যে দেখেছি ধরিত্রীর
রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ফাটল ধরেছে আজ,
দীর্ণ পৃথিবী আর জীর্ণ মানব-সমাজ
ধ্বংসের পথে ছুটে চলেছে হবে বুঝি ছারখার
নিখিল মানবাত্মার আর্ত-হাহাকার
সর্ব কাজের মাঝে মোর কানে বাজে
দিবা-রাত্রি লক্ষ হাজার বার।[৬১]

ইসলাম ধর্মে শরণ নেওয়াকেই এই সামাজিক দুর্গতি ও বৈষম্যের হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় বলে কবি গণ্য করেন ঃ

আজ প্রয়োজন কি, কত প্রয়োজন;
আপন বাঁচার প্রয়োজনে আজ প্রয়োজন
বাঁচাতে অসংখ্য মানব জীবন
আজ প্রয়োজন, সামান্য দুটি অন্ন নয়কি;
ইসলাম সাম্যবাদী ধর্ম,
ইসলাম প্রচারক আদি সাম্যবাদী
ইসলাম ধর্মের নির্দেশ ঃ
রাখিবে না প্রাণে হিংসা ও বিদ্বেষ
সকলের তরে সকলে আমরা, মোরা সবে যেন ভাই ভাই
অনাহারে মরিবে কেহ — ইসলাম ধর্মে তার ক্ষমা নাই।[৬২]

---

৬০। ২য় সং, ইসলামিক একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৫৯।
৬১। ভাঙা তলোয়ার, ভাঙা তলোয়ার, পৃঃ ২৫
৬২। ইসলাম, ঐ, পৃঃ ৩০

Dhaka University Institutional Repository



এবং এজন্যই ইসলামী সমাজ কায়েমের ওয়াদা নিয়ে ১৯৪০ সালে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' গৃহীত হলে কবি যারপরনাই আনন্দিত হলেন। ন্যায়নীতি ও উদার সাম্যবাদের ভিত্তিতে পাকিস্তানে নতুন সমাজ গড়ে উঠবে বলে কবি গভীর আশা পোষণ করলেন —

ফিরমানখানা খুলেছে আজিকে সবীরা দলে দলে
পাকিস্তানের নয়া রাহা ধরে, মুক্তির পথে চলে।
যেথা মজলুম নির্ভয় — আর
হক বিচারের হবে দাবীদার
যেথা বিত্তের দলাদলি নেই, যত আমীর কৃষাণ,
হাতে হাত রেখে গাহিবে যেথায় জীবনের জয়গান।

সপ্তদশ অশ্বারোহী বীর যে দেশেতে
উড়াইল বিজয় নিশান
তাদেরি আত্তি বীরের জাতি দশ কোটী মুসলমান
মহা হেলায় করিবে কায়েম এ দেশেতে
আজাদ পাকিস্তান
বিফল হবে শত্রুকায় জাতি ও হিন্দুজাতির বাধাদান।[৬৩]

এক সভায় কবিকণ্ঠে এর আবৃত্তি শুনে সভায় উপস্থিত খাজা নাজিমুদ্দিন ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কবিকে আলিঙ্গন করেন ও কবিতাটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।[৬৪]

মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে সারা ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা যখন অনিবার্য হয়ে উঠেছে, তখন তিনি রচনা করেন 'হুঁশিয়ার হও সাবধান' কবিতাটি।[৬৫] তিনি বলেন, মহাযুদ্ধের এই বিপুল ধ্বংসের পরেও 'মহা-বিদ্বেষ বহ্নি' কমেনি বরং হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের রক্তপাতের জন্য মুখোমুখি হয়ে আছে —

এত রক্তস্রোত, এত লোকক্ষয় জগত জোড়া মহা-প্রলয়,
হেন বিধ্বংসী খেলা জগতে আর কভু ঘটেনি নিশ্চয়।
তবু মিটে নাই, হায়, তবু মিটে নাই যেদিকে তাকাই,
অশ্রু-বাদল দুচোখ মোর আজো আমি দেখিবারে পাই,

---

৬৩। তকবীর, ঐ, পৃঃ৩৫-৩৬, রচনাকাল ১৯৪৩, কবি জুলফিকার হায়দার, পৃঃ ৫৯
৬৪। কবি জুলফিকার হায়দার, পৃঃ ৫৯।
৬৫। মাসিক মোহাম্মদী, বৈশাখ ১৩৫৩, পৃঃ ৫৩২-৩৩।

Dhaka University Institutional Repository



দিকে দিকে জ্বলিছে আজো মহা-বিদ্বেষ বহ্নি লেলিহান
অজ্ঞান মানস গাহিছে আজো দানবী শক্তির জয়গান।

... ... ...

গোটা ভারতের ঘরে ঘরে
আজ এমনি গর্জিয়া ফেরে –
হিন্দুর ঘরে রামেশ্বর — মুসলমানের ঘরে রহমান।

এই সমস্যার সমাধান ভারত-বিভাগের মধ্যেই নিহিত বলে তাঁর ধারণা হয়েছে। হিন্দু ও মুসলমানের মৈত্রী যখন নষ্ট হয়ে গেছে তখন মিথ্যাই ছলনা করা কিংবা কাসুন্দি শান দেওয়া —

বহুদিন ধরে হিন্দু ও মুসলমান এ-দুই মহাজাতে,
একে অন্যের প্রতি দিনের পর দিন, বহু নির্মম আঘাতে আঘাতে,
ভেঙেই গেছে যখন হৃদয়ে হৃদয়ে তাদের মন্দির মসজিদ,
তবে কেন আর মিথ্যা ছলনা অথবা কাসুন্দি শান দেওয়া।

দেশ-বিভাগের কয়েকমাস পরে লিখিত 'নয়া সড়ক'[৬৬] কবিতায় তিনি পাকিস্তানী মুসলমানদের চৌদ্দশ বছরের পূর্বেকার ইসলামে প্রত্যাবর্তন করার তাগিদ দিয়েছেন। সে পথ পরিত্যাগ করেছে বলেই মুসলমানদের সীমাহীন দুর্গতি বলে কবির বিশ্বাস।

ঈমানের উৎস-মূলে লেগেছে মড়ক,
তাই এ সুন্দর ধরা আজকে নরক।
বেঈমান বানরেরে পথে আনো, হে নয়া সড়ক।
যারা শত-শত্রুর হুকুম মেনে চলে, আর
খোদার হুকুম করে হামেশা তরক
দেখাও তাদের পথ, হে নয়া সড়ক।
পারবে কি দেখাতে সে-পথ
চৌদ্দশ বছর আগে সত্যসেবী মোর হজরত
দেখিয়ে গেছেন যেই পথ
সেই পথ, হে নয়া সড়ক।
সে পথের নাম —
শরিয়তুল ইসলাম
হে নয়া সড়ক।

---

৬৬। ভাঙা তলোয়ার, পৃঃ ৪৮–৪৯, রচনাকাল ২৭-১১-৪৭, কবি জুলফিকার হায়দার পৃঃ ৬৪

Dhaka University Institutional Repository



পরবর্তীকালে রচিত আরো একটি কবিতায় (রচনাকাল ১০ই এপ্রিল, ১৯৫৪) কবি পাকিস্তানে ইসলামী জীবনচর্যার ক্রমবিলোপে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন দেশের তাহজীব তমদ্দুন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বেদায়তী কার্যকলাপ বেড়ে যাচ্ছে এবং নৃত্যগীত, মদ, জুয়া ও ঘুষ ক্রমশঃ বর্ধিষ্ণু হয়ে পাকিস্তানের মূলকেই ধ্বংস করে দিচ্ছে। তাই সবাইকে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে কবি আহবান জানাচ্ছেন —

ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন লোকের চিন্তাধারা
সব কিছু আজ কেমন পাগল-পারা
বদলে যেন সব কিছু আজ এই আজাদীর পর।
খোঁজ রাখেনা, কেমন করে সর্প-ঢোরা
শত্রু নাফরমান
দিচ্ছে তোমার তমদ্দুন আর তাহজীবকে আজ
কেবলি কোরবান।

... ... ...

নৃত্যগীত আর মদের আসর
জুয়া খেলা, ঘুষের বাসর
ভাসিয়ে দিল আজকে বুঝি সাধের পাকিস্তান।
চোখ খুল আজ, রুখে দাঁড়াও পাকিস্তানী
বন্ধু মুসলমান।[৬৭]

তাঁর দ্বিতীয় কাব্য 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম' দেশবিভাগের কিছু আগে রচিত হয়ে দেশবিভাগের পরে প্রকাশিত হয়। 'কেন্দ্র বানাও মুসলমান' নামে এর দ্বিতীয় সংস্করণ বের করে ঢাকার ইসলামী একাডেমী। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় কবি লিখেছিলেন —

> বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সম্পর্কে অনেক কবিতাই লেখা হয়েছে। যাদের সেই মহাজীবন প্রতি দরদ আছে, তাদের রচনাই হয়েছে অন্তর নিঃসৃত – মর্মস্পর্শী। আমার নবীপ্রেম কতটুকু আছে জানিনা তবে তিনিই হচ্ছেন এই কবিতার প্রেরণা এবং উৎসমূল। বর্তমানের বিপর্যস্ত সমাজের কাছে এই কবিতাটি কতটুকু হৃদয়গ্রাহী হবে জানিনা, তবে সর্বযুগের আদর্শ এই নবীর জীবনী আলোচনার মধ্যে বর্তমানের দুঃখ-দগ্ধ মানবসমাজ নিশ্চয়ই পাবে সান্ত্বনা ও মুক্তিপথের সন্ধান।[৬৮]

---

৬৭। রুখে দাঁড়াও, তালিম তলোয়ার, পৃঃ ৪৩-৪৪।
৬৮। কেন্দ্র বানাও মুসলমান, ১ম সংস্করণের ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository



দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা ইসলামী একাডেমীর পরিচালক লিখেছেন —

/ আজকের নিপ্রানু মুসলমানদের জীবনে মহানবীর এ শাশ্বত জীবনাদর্শের পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠাই কবি কামনা করেছেন। তাই আল্লাহর কাছে এ প্রার্থনার সুরটিই তাঁর কন্ঠে বার বার মনজুরিত হয়েছে : তাদের 'ফের বানাও মুসলমান'। সমগ্র কাব্য গ্রন্থটির মূলসুরটিও এই। এ দিকটির প্রতি লক্ষ্য রেখেই বইটির অনুরূপ নামকরণ করা হয়েছে।

পাকিস্তানোত্তর যুগে আমাদের আদর্শের নবজন্মের মহত্তর প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে একাব্য গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে একটি যুগোপযোগী এবং অমূল্য গ্রন্থ।[৬৯]

পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করতে কবি আগ্রহী। হযরত মোহাম্মদ /দঃ/— এর জীবনী অবলম্বনে রচিত এই কাব্যটিতে স্বাভাবিকভাবে পাকিস্তানের কথা এসেছে এবং যারা ন্যায়ের পথে চলেনা, অন্যায় —অপকর্মে যাদের আসক্তি অত্যধিক, পাকিস্তান তাদের জন্য নয় বলে কবি পরিস্কারভাবে জানিয়েছেন। তাদেরকে এবং যারা 'গডলেস ইজমের' মোহে পড়েছে তাদেরকেও পুনরায় মুসলমান বানাতে কবি প্রার্থনা করেছেন —

তুচ্ছ দলীয় স্বার্থ অথবা আপন স্বার্থের
খাতিরে যে সদাদিল
সৃষ্টি করিয়া চলে জাতির সংকট
বিপদ মুসকিল
নাহি যার হুশজ্ঞান
জলাই করে যে জাতির স্বার্থ
মওমের গর্দান
তাকে ফের বানাও মুসলমান।

... ... ...

পাকিস্তান নয় তার তরে
আছে যার পাক প্রাণ।

... ... ...

কোরানের আলো আর হাদিসের আলো
সহিতে পারেনা যে হত ভাগ্যের দল
'গডলেস ইজমের' বাঁধা বুলি যাহাদের ঘটে,

... ... ...

তাকে ফের বানাও মুসলমান।[৭০]

---

৬৯। ঐ. আমাদের কথা। ৭০। ঐ, পৃঃ ১২ – ১৫

Dhaka University Institutional Repository



তাঁর তৃতীয় কাব্য 'স্বপ্ন যারা আনলো যে গড়লো যারা' ।[৭১] 'ইকবাল তুমি লহ অর্ঘ্যদান' 'কায়েদে আজম', 'শহীদ লিয়াকত স্মরণে', 'শের-ই-সেরহদ' এবং 'আইয়ুব খান' নামক পাঁচটি কবিতা এতে রয়েছে । কবির মতে, ইকবাল পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছেন, জিন্নাহ একে বাস্তবায়িত করেছেন আর লিয়াকত – আইয়ুব একে গড়ে তুলেছেন ।

আইউব খানের ক্ষমতা দখলকে কবি উচ্ছ্বসিত ভাষায় বর্ণনা করেছেন । সে বিষয়ে তার দুটি কবিতা রয়েছে । একটি কবিতায় বলা হয়েছে যে, প্রাক্-আইউব আমলে অন্যায় অবিচার দুর্নীতি জুলুম ষড়যন্ত্র প্রভৃতিতে পাকিস্তান পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল; অপর কবিতায় বলা হয়েছে, এই পরিস্থিতিতে আইউব খানের ক্ষমতা দখলে সবাই সুস্থির নিঃশ্বাস ফেলেছে এবং প্রাণভরে তার দীর্ঘায়ু কামনা করে আল্লার কাছে মোনাজাত করছে —

ক. ভণ্ড, লুঠেরা, চোরাকারবারী গড়েছে শ্মশানে বিপুল প্রাসাদ
যত বানছিন্ন ফেলেছে দীর্ঘশ্বাস ।
নেতা, উপনেতা হল নেতা আর স্বার্থবাদীর কাছে
এদেশ তো ছিল খালে গনীমত
আর তো কিছুই নয় ।
চির মজলুম পায় নাই আশ্বাস ।[৭২]

খ. হে বীর সেনানী, লৌহ-মানব এদেশবাসীর নেতা
হাজার শুকুর, তুমিই এবার রক্ষা করিলে পতিত পাকিস্তান ।
নিমিষে থামিয়ে দিয়েছ হেথায় যত হীন কলরব,
অসুরের মত গলাবাজি আর বিদেশী-দালাল-সুর ।

তব দৌলতে পুনঃ পাকভূমে হাসিছে সবুজ নুর
তাই তো হেথায় এ পাকভূমির আজ সব ঘরে ঘরে
নরনারী শিশু আইয়ুবের আয়ু দুহাতে কামনা করে,
আইয়ুব নামের তাজিম করিছে, ইজ্জত সম্মান ।
তুমিই ধন্য, ধন্য যে তুমি, ওগো শের-ই-সেরহদ আইয়ুব খান ।।[৭৩]

---

৭১। ১ম সং, ইসলামী একাডেমী, ঢাকা, আগস্ট ১৯৫৯ ।
৭২। আইয়ুব খান, পৃঃ ৩৫ ।
৭৩। শের-ই-সেরহদ, পৃঃ ২৯ ।

Dhaka University Institutional Repository



## তিন

সুফী জুলফিকার হায়দারের কাব্য-কর্ম সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হবার কিছু নেই। এটুকু বলা যেতে পারে যে, তিনি অবলীলাক্রমে কবিতা রচনা করতে পারতেন, তাঁর মধ্যে সহজ আবেগের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় এবং বৃহত্তর মানব-সমাজের মঙ্গল-কামনা তাঁর চিন্তায় ছিল। নজরুলের প্রভাব তাঁর রচনায় অভ্রান্তভাবে লক্ষ্য করার মত, যদিও উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রয়োজনীয় পরিশীলনের অভাবে সে-প্রভাবকে তিনি সার্থকভাবে আত্মস্থ করতে পারেননি। শিক্ষার এই সীমাবদ্ধতার কারণেই সমকালীন ঘটনার দ্বারা বিশেষভাবে আলোড়িত হলেও সেগুলির প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। পাকিস্তান আন্দোলন তাঁর কাছে যেমন বিরাট প্রাগ্রসর ঘটনা বলে মনে হয়েছিল, তেমনি মনে হয়েছিল ১৯৫৮ সালের তথাকথিত অক্টোবর বিপ্লবকেও; এমনকি ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিক্রিয়াশীল পদক্ষেপ 'দ্বিতীয় বিপ্লব' ও তাঁর কাছে পরম সম্ভাবনাময় বলে মনে হয়েছিল।[৭৪]

---

৭৪। শেখ মুজিবুর রহমানের দ্বিতীয় বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'আকস্মিক প্রেরণালব্ধ এক inspired গোলাপ-গুচ্ছে' তিনি 'বিপ্লব বিপ্লব দ্বিতীয় বিপ্লব' নামক একটি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করে তাঁকে অভিনন্দিত করেন। আমাদের আলোচনার সময়সীমা বহির্ভূত হওয়ায় সেকাব্যের আলোচনা এখানে করা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository



## হমরুদ্দীন

রংপুর জেলার গাইবান্ধা মহকুমার বেলকা গ্রামে ১৯১০ সালে [illegible] জন্ম গ্রহণ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান দখল করে ইংরেজিতে অনার্সসহ তিনি বি-এ পাশ করেন ১৯৩২ সালে। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল এম-এ পড়েছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে তা বেশিদিন চালানো সম্ভব হয়নি। কর্মজীবন শুরু হয় স্থানীয় বেলকা স্কুলে সহকারী শিক্ষক রূপে; এর পরে ক্রমান্বয়ে ১৯৩৫ সালে রাজশাহী মাদ্রাসার ইংরেজির শিক্ষক, ১৯৪৪ সালে রংপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক, দেশবিভাগের পর ঢাকার শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের অধ্যাপক, যশোর জেলার স্কুল সমূহের পরিদর্শক, নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তান টেক্সট বুক বোর্ডের সচিব, জনশিক্ষা বিভাগের উপপরিচালক প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করে অবসর গ্রহণ করেন ১৯৬৯ সালে।[৭৫]

কিশোর বয়সে তিনি সাহিত্যিক পরিবেশে বর্ধিত হন। বেলকা কাছারীর তহশিলদার ক্ষেমদাকুমার সেন রায় সাহিত্য-ভক্ত ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারটি ছিল দেশি-বিদেশী সাহিত্য-পুস্তক বাসা ভর্তি। তাঁর স্ত্রী মাধবমালা দেবী ছিলেন দীনেশ চন্দ্র সেনের প্রথমা কন্যা। এই পরিবারের অনুরূপ সাহচর্যে এসে ছমরুদ্দীন সাহিত্যের অনুরাগী হয়ে ওঠেন। তিনি নিয়মিতভাবে সাহিত্য পত্রিকা পাঠ করতে শুরু করেন এবং সময়ে-অসময়ে কবিতা রচনা করে পরিচয় লাভ করেন কবি হিসাবে।[৭৬]

ছমরুদ্দীনের তরুণ যৌবনে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য চেতনা প্রাধান্য লাভ করে। রংপুরের সদর পল্লীতেও এর প্রভাব অনুভূত হয়। 'আমার ছোট বেলায় রংপুরের পল্লীতে পল্লীতে ওহাবী জিহাদী আন্দোলন, ফারাজি আন্দোলন ও মৌলানা কেরামত আলীর দ্বীনি আন্দোলনের ধ্বনি প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছিলো।'[৭৭] এই পরিবেশে তাঁর তরুণ মন গঠিত হয় এবং তিনি ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের সম্ভাবনায় শিহরিত হয়ে ওঠেন। 'যে কোন ইজমের চেয়ে মহত্তর' সত্যিকার ইসলামের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে তা মানুষের কল্যাণে খোদাবিহীন 'আমেরিকান বুর্জোয়া গণতন্ত্র' ও 'রাশিয়ার অর্থনৈতিক সাধারণতন্ত্রে'র চেয়ে বেশি উপযোগী ও কার্যকর হবে বলে তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করেন।[৭৮]

---

৭৫। তথ্যগুলি সংগৃহীত হয়েছে তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা 'দেশ-কাল-পাত্র' থেকে ও ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে।

৭৬। দেশ-কাল-পাত্র, ঢাকা, ১ম সং, অক্টোবর ১৯৬৬, পৃঃ ২৮ – ৩১

৭৭। ঐ, পৃঃ ৪০ ৭৮। ঐ, পৃঃ ৮৯ – ৯১

Dhaka University Institutional Repository



মাতৃভাষার মাধ্যমে নিজের 'কালচার'কে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার ব্যাপারে এ-সময়ে তাঁর আগ্রহ প্রকাশিত হয়। কালচারের প্রধান ভিত্তি ধর্ম, কাজেই সাহিত্যে ধর্মের প্রভাব পড়া অস্বাভাবিক কিছু নয়, এ ছিল তাঁর বিশ্বাস[৭৯] এবং তাঁর কবিতায় এর প্রতিফলন হয়েছে অনিবার্য ও প্রগাঢ়।

ছদরুদ্দীনের রচনার সংখ্যা বেশ কয়েক। তবে সবগুলি প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশিত কাব্যের মধ্যে রয়েছে মানুষ, /১৩৪৬/, পদ্মগাম /১৩৫৮/, সংগ্রাম /১৯৫৮/, এক ফালি চাঁদ/১৩৫৭/ ও কবিতা-চয়নিকা অলস ভাবনা /১৯৬৬/।[৮০] শেষোক্ত বইয়ে সংকলিত হয়েছে তাঁর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সমস্ত কাব্যের বাছাই করা কবিতা। তাঁর অপ্রকাশিত কাব্যগুলি হচ্ছে পল্লী পথে /রচনা ১৩৩৩ - ৪০/, বিভূতা /১৩৩৬ - ৩৭/, নকশ মেহেদীত /আষাঢ় ১৩৫৮/, চাঁদের দেশে খোকাবুড় /১৯৫২/, বুলবুলী /১৯৫৪ - ৫৫/ এবং তেজোনুজ /১৯৬৫ - ৬৭/। এতদ্ব্যতীত তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা 'দেশ-কাল-পাত্র' ও উল্লেখযোগ্য।

দুই

'পল্লী পথে' ও 'বিভূতা'র কাব্যমূল্য উঁচুদরের নয়। গ্রাম্য জীবনের কিছু-কিছু রোমান্টিক চিত্রচিত্র তিনি এখানে আঁকতে প্রয়াসী হয়েছেন। প্রথম প্রকাশিত কাব্য 'মানুষ' কবির কবি-জীবনের পাদাবদানের সূচনা করে। ১৩৪৫ সালে এর অধিকাংশ কবিতা রচিত হয় এবং ১৩৪৬ সালে ডাকবিভাগের মাধ্যমে কলকাতার সংগে যোগাযোগ করে তিনি তা প্রকাশ করেন। এই সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ায় অধিকাংশ বই কলকাতায় নষ্ট হয়ে যায়; মাত্র কয়েকটি কপি কবি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন।[৮১]

'মানুষ' কাব্যের বিষয়বস্তু হল আদম ও হাওয়ার স্বর্গচ্যুতি ও বিরহ, মিলন ও প্রেম এবং আত্মপরিচয়। পৌরাণিক আদম-হাওয়ার মাধ্যমে আধুনিক কালের নরনারীর কামনা-বাসনার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে এখানে। বিরহের মাধ্যমে আদম দগ্ধ হচ্ছে

---

৭৯। ঐ, পৃঃ ৯২ - ৯৩

৮০। অলস ভাবনা, ঢাকা, ১ম সং, ১৯৬৬

৮১। দেশ-কাল-পাত্র, পৃঃ ৭০ - ৭১ ।

আপনের এবং আল্লার মহৎ-বিধানে সমর্পণাপন্ন হয়ে উঠলেন ঃ

শুধু সত্য দুঃখ
আর সত্য জীবনের অস্ফুট উন্মুখ
অনন্ত বাসনারাশি, অনন্ত কামনা
বিরাট বেদনামাখা নিষ্ফল সাধনা।[৮২]

এর পরে হাওয়ার সঙ্গে তাঁর দেখা হল এবং এই মিলনের ফলে মিত্রের আধুনিকাদে হাওয়ার প্রয়োজনীয়তা আদম উপলব্ধি করলেন।

তোমার আকাশে আছে যে নারীর নিতি নব পরিচয় —
নারী নহে নয়নের সুধা, দেহের সুধা সে নয়।
মনুর তলে যে সুধা নিয়ত দুলিছে মানস বনে,
বুঝিয়াছি আজ তাহার খোরাক আছে শুধু নারী মনে।
নারী দেবী, তার মায়া অমর অমিয়ের ভাণ্ডার
নর — প্রাণ মাগিছে সেথায় অমৃতা ধারণার।[৮৩]

রূপের ও ইন্দ্রিয়ের প্রেম ধীরে ধীরে উন্নীত হল অরূপ ও অতীন্দ্রিয় প্রেমে। এই প্রেমের মাধ্যমে পরিচয় হল বিশ্বের সাথে, বিশ্বের সত্যের ও আল্লার সত্যের। কল্পনার সেতুও আমাদের কাছে সত্য হয়ে ধরা দিল।

কোটি ভূলোক হেথায় আসি করিতেছে গড়াগড়ি,
তাহাদেরি ছায়া আকাশের কায়া করিতেছে জড়াজড়ি।
কে আছে সে কোন্ ধ্যানে
আসন মেলিয়া বক্ষতলে চায়,
পাখির পাখা বনহেলি বায়
বীথিকা সন্ধানে।[৮৪]

অনুপাত[৮৫] কাব্যের অধিকাংশ কবিতা ১৯৩৮ সালের প্রথম দিকে রচিত। কবি তখন ধীরে ধীরে ইসলামী জীবনাদর্শের দিকে ঝুঁকছিলেন, একাব্য রচনার সময় তা আরো দৃঢ় হয়। এসময় তিনি মাওলানা আকরাম খাঁর কোরআন শরীফের তর্জমা পড়ে

৮২। ঐ, পৃঃ ৭১
৮৩। ঐ, পৃঃ ৭১
৮৪। ঐ, পৃঃ ৭১
৮৫। লেখকা, তুলতুল, ১ম সং, বৈশাখ, ১৩৩৮

Dhaka University Institutional Repository



বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন। 'পয়গাম' এরি ফল। ভূমিকা স্বরূপ উদ্ধৃত কবিতাটিতে এর ইঙ্গিত আছে।

নীল কোরআন
অসীম সাগর
অমূল্য রত্নখনি।
সেই সাগরের দুটি কণা নিয়ে
সেই খনি হতে মণিকা কুড়িয়ে
লশিক সেজেছি আমি।[86]

সে-সময় পূর্ব বাংলার সরকার বাংলা ভাষা সংস্কারের জন্য উদ্যোগী হয়েছিল। কবি ছদরুদ্দীন ছিলেন এর উৎসাহী সমর্থক। নিজের নামের বানানে ও কবিতায় তিনি নতুন বানান পদ্ধতি ব্যবহার শুরু করলেন। পূর্বে তিনি নিজের নাম লিখতেন 'সদরুদ্দীন', কিন্তু বাংলা 'স' হরফের পরিবর্তে 'ছ' হরফ ব্যবহার করলে আরবী-ফারসী 'ص' ধ্বনির বিশুদ্ধ উচ্চারণ আসে এবং বাংলা 'বর্ণমালা থেকে ণত্ব ও ষত্ব তুলে দিয়ে একত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারলে সত্যিকার পাকিস্তানী বাংলার গোড়া পত্তন হবে' এই বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে তিনি নিজের নামের রূপান্তর করলেন 'ছদরুদ্দীন'[87] এবং নতুন বানান-পদ্ধতি কবিতা লেখায় প্রয়োগ করতে শুরু করলেন।

পয়গামে কবিতা-সংখ্যা এগার। কবিতাগুলি ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে। হজরত মোহাম্মদের নবুয়ত লাভ ও গৃহে প্রত্যাবর্তন করে বিবি খাদিজার কাছে ভাবাবিহ্বলতার কাহিনীর বর্ণনা করার ঘটনা নিয়ে 'বাজিবা পড়িল মহা পয়গাম' ও 'ঢেকে দাও' রচিত হয়েছে। প্রথম বাণী লাভ করে মোহাম্মদ বুঝতে পারলেন পৃথিবীতে প্রেমের বিভিন্ন প্রকাশ রয়েছে।

প্রেমে ওঠে রবি প্রেমে ভোরে
প্রেমে সাগরের বুক ফুলে যায়
চাঁদ দোলে।
প্রেমে ফোটে ফুল ফলে সো ধান,

---

৮৬। সমুদ্দেশ, পয়গাম।
৮৭। দেশ-কাল-পাত্র, পৃঃ ১১৪-১১৫

Dhaka University Institutional Repository



প্রেমে লুটে পড়ে পাপড়ির দল,
প্রেমের একটু মৃদুল পরশে
কালো মেঘখানি লুটায় হরষে
মরুভূমে
নিঝুর ঝিরি প্রেমে চুমে।[৮৮]

'মুছলিম সেই জন' কবিতায় একজন সাচ্চা মুসলমানের ছিফাত বর্ণনা করা হয়েছে ঃ তিনি সর্বদা আল্লাহতে নিবিষ্ট চিত্ত, শুদ্ধ আত্মা ও নির্মল চিত্ত।

যার
উঠিতে আল্লাহ
বসিতে আল্লাহ্
শয়নে আল্লাহ্
স্বপনে আল্লাহ্
যার
জীবন মৃত্যু
চিন্ত
শিক্ষ
ধ্যান আরাধনা
সাধন ভজন
সবি আল্লার তরে
আল্লার রাহে — করিয়াছে যেই
পূর্ণ
সম্পূর্ণ
আত্মদান, আত্ম-সমর্পণ
মুছলিম সেই জন
সেইত ধর্মপ্রাণ
ছাহ্চা মুছলমান।[৮৯]

---

৮৮। ঢেকে দাও, পৃঃ ১৫

৮৯। মুছলিম সেই জন, পৃঃ ৫৯ – ৬০

শেষ কবিতা 'কই সে মুসলমান'– এ তিনি আক্ষেপ করেছেন পৃথিবীতে প্রকৃত মুসলমানের অভাব ও অত্যাচারিত পৃথিবীর মুক্তির জন্য, তবে ভরসা আছে এই যে, সাচ্চা মুসলমানের আবির্ভাবের সুস্পষ্ট পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

শোন
ঐ শোন ...
ক্ষীণ
অতি ক্ষীণ
দূর অনাগত পদ-ধ্বনি যে তার
সুস্পষ্ট হইতে
হতেছে সুস্পষ্টতর,
হতেছে দ্রুততর
হতেছে বৃহত্তর
আকাশে বাতাসে ধ্বনি
ঐ ধ্বনি
ধ্রুব – ধ্বনি যে তার ...।[১০]

'সংগ্রাম'[১১]-এর কবিতাগুলি ১৯৪৭ সালের আগস্ট থেকে ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে রচিত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে কবির মনে যে আবেগ-স্পন্দন ও নতুন আদর্শবোধের জন্ম হয়েছিল এই কবিতাগুলি সে-পরিচয় বহন করছে। 'সংগ্রামের' পূর্বকথায় কবি নিজেই ঘোষণা করেছেন —

ভিক্ষা করে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও রাখা যায় না। এর জন্য চাই সাধনা ও ত্যাগ। মুসলমানকে হতে হবে আত্মপ্রতিষ্ঠিত। নিজের ঘরে আনতে হবে শৃঙ্খলা। তবেই সে গ্রহণ করতে পারবে বিশ্বশান্তি স্থাপনের গৌরবময় ভূমিকা। আত্মচেতনা ছাড়া কি নিজের কি পরের কোন উপকার করা যায় না। ঘুমন্ত যে, সে অপরের প্রাসাদে কি করে; মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া তক সমস্ত মুসলমানকে হতে হবে আত্ম-সচেতন। করতে হবে নিজের ও রাষ্ট্রের সংস্কার সাম্য ইসলামিক আদর্শে। হতে হবে সংঘবদ্ধ। তবেই করা যেতে পারে বিশ্বশান্তির গোড়া পত্তন। এর জন্য চাই অবিরত সংগ্রাম।[১২]

১০। কই সে মুসলমান, পৃঃ ১৩
১১। [illegible], সংগ্রাম, ১ম সং, আগস্ট, ১৯৫১
১২। দেশ – কাল – পাত্র, পৃঃ ৮২

Dhaka University Institutional Repository



'সংগ্রামে' স্বাধীনতা দান নয়, স্বাধীনতা চায়, একোরে পাকিস্তান, ইদের আরজা, বিদ্রোহী, ১৪ই আগস্ট, ১১ই সেপ্টেম্বর, আল্লো আছে যে ইসলাম শীর্ষক আটটি কবিতা আছে।

'বিদ্রোহী' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামকে লক্ষ করে রচিত। কবির বিদ্রোহের বাণী আজ নতুন সুরে জগত পাকিস্তান সাগরে রূপ লাভ করেছে কিন্তু এখনো অন্যায় অবিচার শাসন শোষণ লোপ পায়নি —

সর্বহারা আজো কাঁদে
জালেমের অত্যাচারে মজলুম করে আহাজারি,
মন্দিরে মছজিদে হেন মুখবার আজো আলা-পাগা,
আজিও দুর্ভাগা
মানুষের অধিকার লুটিতেছে স্বার্থ-কারবারি।[১৩]

সুতরাং বিদ্রোহ ও বিপ্লবের বাণী নিয়ে কবিকে এখনো সমাজে আহ্বান জানাতে হবে।

'১৪ই আগস্ট' দীর্ঘ কবিতা। এর পরিধিও বড় বিস্তৃত। আরবদেশে ইসলামের অভ্যুদয়, পৃথিবীব্যাপী মুসলমানদের বিজয়াভিযান, মুসলমানদের ভারতে বিজয়ী বেশে প্রবেশ, পলাশীর মাঠে ইংরেজের হাতে পরাজয়, সিপাহী বিপ্লবে 'কবিকের জাগরণ' এবং সর্বশেষে 'এশিয়ার শ্রেষ্ঠতম নর' এর নেতৃত্বে মুসলমানদের পুনর্জাগরণের কথা কবি প্রানজরভাষায় বিবৃত করেছেন। শেষে তিনি আবেগভরে বলেছেন —

পুনর্বার
যাত্রা হলো শুরু কাফেলার
অনন্তের অসীম আহ্বানে।
মনজিল হতে মনজিল পানে
অগ্রদূত পদে
অশ্বখুরে উড়াইয়া ধূলি,
নয়া জীবনের রথে
বাজাইয়া পথ আর প্রাণভরা বুলি
দলে দলে চলে ফৌজ
চলে কারাভান
দিকে দিকে জানাইয়া মুক্তির আহ্বান ....।[১৪]

---

১৩। বিদ্রোহী, পৃঃ ১৩ - ১৪
১৪। ১৪ই আগস্ট, পৃঃ ২৪

Dhaka University Institutional Repository



'১১ই সেপ্টেম্বর' জিন্নাহর মৃত্যু উপলক্ষে রচিত। প্রসঙ্গক্রমে কবি ধর্মরাষ্ট্রের পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। পাকিস্তান ধর্মরাষ্ট্র হওয়ায় অনেকে খুশি হননি কিন্তু কবি মনে করেন 'ধর্ম কভু অবহেলা মানেনি ধরায়' এবং 'ধর্মহীন শিক্ষা / এটম বোমায় করে দীক্ষা।'

পরবর্তী কবিতা 'আজো আছে সে ইসলাম'। এতে সমস্যাজীর্ণ, যুদ্ধজর্জর, সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও ষড়যন্ত্রে জর্জরিত পৃথিবীকে মুক্ত করার জন্য পৃথিবীজোড়া 'মুসলিম ভ্রাতৃত্ব' গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

এই শুধু পারিবে গড়িতে
প্রীতি সাম্যে সুধাময় সুন্দর পৃথিবী।
মানব ও দানবের
অন্তর্জন্ম যোঝাযুঝি এই ভাবে হতে পারে ইতি[৯৫]।

'এক ফালি চাঁদ'[৯৬]— এ কবি বিশেষভাবে সমাজের দুঃখদারিদ্র্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছেন। ঈদের দিন এসেছে। আকাশে দেখা দিয়েছে এক ফাঁলি চাঁদ। চারদিকে আনন্দ, উচ্ছ্বাস, উল্লাস ও কোলাহল; কিন্তু এর মধ্যেও রয়েছে অন্নহীন অভাব বেদনা হাহাকার ও নৈরাশ্য। এই বৈপরীত্যের ছবি ফুটাতে চেয়েছেন কবি এই কাব্যে। খণ্ড খণ্ড চিত্র, চরিত্র ও কাহিনীর মধ্যে এই হল ঐক্যসূত্র। মঞ্জুকে উদ্দেশ্য করে তিনি প্রথমে লিখেছেন —

এ পিঠেতে আলোরাশি
ও পিঠেতে কালোমসী
মন বাঁধিয়ার
এ পিঠেতে হাসিগান
ও পিঠেতে আহ্বান
অনাবৃত ক্ষিধার।[৯৭]

কাব্যের মহলান্তরে রয়েছে গ্রামের পরিবেশ। শহর-প্রবাসী স্বামীকে ঈদের ছুটিতে বাড়ি আসতে কৃষাণ কন্যার লেখা 'খত', গ্রাম্য স্কুল মাস্টারের কাহিনী, স্বর্ণসূত্র পাট নিয়ে কৃষাণ-কৃষাণীর আশা ও শেষে হতাশা, প্রভৃতির সঙ্গে রয়েছে উচ্চশিক্ষিত বেকারের মনোবেদনার, শহরের প্রশস্ত রাজপথে আধুনিক সভ্যতার উগ্র বিলাসের বিবরণ।

---

৯৫। আজো আছে সে ইসলাম, পৃঃ ৪০
৯৬। দেলকা, রংপুর, ১ম সং, কার্তিক ১৩৫৭
৯৭। মধুর প্রীতি, এক ফালি চাঁদ।

Dhaka University Institutional Repository



'শকুন' কবিতা শুরু হয়েছে ঈদের বাজারের বর্ণনা দিয়ে —

বাজার গরম —
আগুন !
সব জিনিসের দাম
বাড়িয়াছে চার পাঁচ গুণ ।[৯৮]

সওদা করতে এসেছেন এক মিয়া । ছেলের জামা, মেয়ের ফ্রক, বিবির শাড়ি-ব্লাউজ সব কিনতে হবে । ঘরে আরো আছে 'বিধবা ভাবি' ও তার এতিম সন্তান । সুতরাং মিয়া নিজের পিরহান কেনা বাদ দিলেন । অন্যদিকে আছে বিপরীত চিত্র —

ও ধারে গদির পরে সাধুভাবে বসে ঃ
কয়গুণ মুনাফায় কোন মাল দিলে এসে ছাড়ি
কয় জমা ওঠে তার বাড়ি
কয় খানা হয় নয়া বাড়ি ... ।[৯৯]

এমনি সময়ে আকাশের বক্ষে ঊর্ধ্বে উড়ছিল একটি শকুন— দৃষ্টি ছিল নিম্নে, ভাগাড়ের দিকে ।

'শাড়ি' কবিতায় এক স্কুল শিক্ষকের কাহিনী অবলম্বনে রচিত । বেতনের অর্ধেক দিয়ে তিনি ঈদের বাজার থেকে স্ত্রীর জন্য শাড়ি কিনেছেন; স্ত্রী সেটা অবজ্ঞায় ঠেলে দিয়েছে চট বলে । মনের দুঃখে মাস্টার সাহেব দহলিজে বসে ভাবছেন —

মাস্টারি পদ —
পদ নয় ঠ্যাং
ভাঙা ল্যাং ল্যাং
হাঁটি বাত, দেই হামাগুড়ি ।[১০০]

ঠিক সে-সময়ে আকাশে হাসছিল ঈদের চাঁদ । সেদিকে তাকাতে তাকাতে শিক্ষকের মনে হল —

চাঁদ বুঝি চুপি চুপি কয় ঃ
ওরে মূঢ়,
অর্থ চাই, বিদ্যা বুদ্ধি নয় ।[১০১]

---

৯৮। শকুন, পৃঃ ২৮ ৯৯। ঐ
১০০। শাড়ি, পৃঃ ৩১
১০১। ঐ

Dhaka University Institutional Repository



পরবর্তী কাব্য 'মরুর সেতেহ্যৎ' সুতরাং কালক্রমে প্রকাশিত হয়নি, কয়েকটি প্রতিনিধিত্বশীল কবিতা 'অলস ভাবনায়' সংকলিত আছে। ১৩৫৮ সালের আষাঢ় মাসে এগুলি রচিত হয়। তখন ছিল রমজান মাস। শেষরাতে কবি সেহরীর সংকেত শুনতেন। সাইরেনের আওয়াজ শুনে কবির মনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের স্মৃতি ভেসে ওঠে। 'সেহরীর সাইরেন মোচড় দিল হৃদয়-তন্ত্রীতে। দিল খুলে গেল। শুনতে পেলাম স্তব্ধ মুমূর্ষের বিলাপ-ধ্বনি। দেখতে পেলেম অগণিত নর-কংকাল। ভুখ মিছিল। কালোবাজার।' এই পটভূমিতে রচিত হয়েছে 'মরুর সেতেহ্যতে'র কবিতাগুলি।[১০২]

১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের স্মৃতিতে কবি রচনা করেছেন 'তেরশো পঞ্চাশ' কবিতাটি। পথে-পথে কঙ্কালসার মানুষের ভীড়, সামান্য আহার্যের জন্য মানুষ-কুকুরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিরান গ্রাম, এগুলিই কবির স্মৃতিতে জুড়ে আছে।

গ্রামের শ্মশান – ভস্ম
শহরের ফুটপাথে
কংকালের ছায়ামূর্তি জীবন-মৃত্যুর সন্ধি-ক্ষণে
অস্ফুট ক্রন্দনে
আকুলিয়া তোলে দশদিশি
তারে ঘেরি শুধু দিবানিশি
বায়স ও শৃগাল শকুন
কুকুরের পালে
ভোজের নেশায় মাতি অট্টহাসি হাসে
নাগ ও নাগিনী ফেলে সুখের নিশ্বাস
তেরশো পঞ্চাশ।[১০৩]

---

১০২। দেশ – কাল – পাত্র, পৃঃ ১১১

১০৩। তেরশো পঞ্চাশ, অলস ভাবনা, পৃঃ ৯৫

Dhaka University Institutional Repository



অন্যান্য কবিতার মধ্যে শুধু মিছিল, ভাঙ্গা কবর, সোনা গাছ, ইঁদুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের এই বেদনাদায়ক স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত হয়ে কবির কাছে মনে হয়েছে আমাদের এই গোটা সভ্যতা কৃত্রিমতায় ভরা, বাইরের খোলস তার ভেতরের দৈন্য ও অসঙ্গতিকে ঢাকতে পারছেনা। এটা সকল দেশেরই সমস্যা।

ছদরুদ্দীনের অবশিষ্ট কাব্যগুলি শিশু ও কিশোরদের উপযোগী।

তিন

ছদরুদ্দীনের কবিতার কাব্য-মূল্য অকিঞ্চিৎকর। উপাদানকে ছাড়িয়ে তা শিল্পকলার স্তরে উন্নীত হতে পারেনি। কবিতার আঙ্গিক ও নতুন বানান-রীতি এক্ষেত্রে প্রবল প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তথাপি, দেশের এক যুগে রাষ্ট্রাদর্শের ভিত্তিতে যে-নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করতে তিনি ঐকান্তিকভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তার জন্য তিনি একালের অনেকের কৌতূহল-দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন — এ কথা বোধ হয় বলা যায়।

Dhaka University Institutional Repository



## রওশন ইজদানী

১৯১৭ সালে মোমেনশাহী জেলার কেন্দুয়া থানার অন্তর্গত সিদলাসলুত গ্রামে রওশন ইজদানী জন্ম গ্রহণ করেন । উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের মধ্যেই তাঁর শিক্ষাজীবন সীমাবদ্ধ ছিল । কর্ম-জীবনে তিনি কিছুকাল সংবাদপত্র অফিসে এবং গ্রাম্য ডাকঘরে কাজ করেন । ক্যান্সার রোগে দীর্ঘকাল অসুস্থ থাকার পর ১৯৬৭ সালের ২০-এ জুন তারিখে তিনি তাঁর গ্রামের বাসভবনে এন্তেকাল করেন ।[১০৪]

কবির পূর্বপুরুষগণ ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ও ইসলামের প্রতি গভীর অনুরাগী ছিলেন । সে পরিবারে পুঁথি ও লোকসাহিত্যের চর্চা ছিল । কবির কাব্যসাধনায় এই প্রবণতা বিশেষভাবে কার্যকর হয় ।[১০৫] হজরত মোহাম্মদের কাব্যজীবনী 'খাতামুন-নবীঈন' রচনা করে ১৯৬০ সালে তিনি আদমজী পুরস্কার লাভ করেন এবং পূর্ব বাংলার লোকসাহিত্য সম্পর্কে আলোচনার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'এশীয় লোকসাহিত্য সম্মেলনে' আমন্ত্রিত হন ।[১০৬] ইসলামের প্রতি গভীর অনুরাগের কারণে তিনি শেষপর্যন্ত 'পাকিস্তানবাদী' কবি হিসাবেই পরিচিত হন । পাকিস্তান সম্পর্কে তিনি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গান ও কবিতা রচনা করেছেন, এমন কি ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর যুদ্ধের কাহিনীকে অবলম্বন করে 'পাকিস্তানের জংনামা' নামক একটি পুঁথিও তিনি রচনা করেছেন । এখানে, যদিও প্রথম দিকে ভিন্ন আদর্শে তিনি কাব্যসাধনা আরম্ভ করেছিলেন, তবু শেষপর্যন্ত, পাকিস্তান, ইসলাম, পুঁথি সাহিত্য ও লোকসাহিত্য — এই চারকোনা গণ্ডীতে তাঁর সাহিত্যজগত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে ।

রওশন ইজদানীর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা অপ্রচুর নয় । এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অনুরাগী[১০৭], রাহবীর[১০৮], চিনুবিবি[১০৯], সপ্তিলা মহু[১১০], খাতামুন-নবীঈন[১১১], পাকিস্তানের জংনামা[১১২] ও মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য ।[১১৩] তাছাড়া অনুরাগী 'তে

---

১০৪। দেওয়ান আবদুল হামিদ, 'পল্লীকবি রওশন ইজদানী' মাহে নও, পৌষ ১৩৭৪, পৃঃ ১১২-১৪
১০৫। ঐ, পৃঃ ১১২   ১০৬। ঐ, পৃঃ ১১৪   ১০৭। ঢাকা, ১মসং, ১৯৪৭
১০৮। ঢাকা, ১ম সং, ১৩৫৫   ১০৯। ঢাকা, ১ম সং, ১৯৫১
১১০। /গানের সমষ্টি/, ঢাকা, ১ম সং, ১৯৫১   ১১১। ঢাকা, ১ম সং, ১৯৬০
১১২। ঢাকা, ১ম সং, ১৯৬৫
১১৩। /প্রবন্ধ/, ঢাকা ১ম সং, ১৯৬৪ ।

Dhaka University Institutional Repository



তিনটি পুস্তকের বিজ্ঞাপন দেখা যায়। সেগুলি হচ্ছে বীন বাদিয়া /একটি সম্পূর্ণ নূতন ধরনের কবিতার বই/, সন্ধ্যে বাঁশী /কতগুলি ভাটিয়ালী সন্ধ্যাহারা গানের সমষ্টি/ এবং তারানা-এ-ইসলামী /সুফী ও ইসলামী গজল গানের সমষ্টি/।

দুই.

তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য কাব্য 'অগ্নিবাণী' দেশবিভাগের কয়েকমাস পূর্বে প্রকাশিত হয়। 'এর প্রায় প্রত্যেকটি কবিতাই ছাত্রীদের বিদ্রোহে মজলুমের মুক্ত প্রতিবাদ। যৌবনোদ্দীপ্ত প্রাণের যে উদ্দাম-গতি-প্রবাহে মানুষ কোনো বাধা-নিষেধের ধার ধারেনা, সেই মর্মবাণীর সুরই এর মূলছন্দ[114]- এভাবে কবি তাঁর কাব্যের পরিচিতি দিয়েছেন। এই পরিচিতি যতটা খাঁটি এবং এ-ও সত্য যে, সাম্প্রদায়িকতার সামান্য নিদর্শনও এতে নেই। হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত মহাভারতের জাগরণ তিনি কামনা করেছেন আবেগমথিত ও উচ্ছ্বাস-প্রবণ ভাষায়।

জাগিবে আবার সে-জানকী-নাথ
জাগিবে যুধিষ্ঠির
বিশ্বামিত্র, মহাকবি-ব্যাস
অর্জুন ভীমবীর,
জাগিবে সে-বের মুর্জা আলী
হায়দরী মহাহাঁক
মূর্খা আহাদ্‌র অগ্নিমেঘ বেশ
শনিবে বৃদ্ধি-ডাক,
... ... ...
নয় নয় নয়, আর বেশী নয় —
বহেছে সেদিন দূরে,
জাগিবে আবার এ মহাভারত
মুর্দার কাল-গোরে ॥[115]

১৯৪৬ সালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার যে উন্মত্ততা দেখা দিয়েছিল তাতে বিচলিত হয়ে তিনি রচনা করেন 'দাঙ্গা' কবিতাটি। তিনি লিখেছেন, এখানে স্বাধীনতা

---

১১৪। উৎসর্গপত্র

১১৫। জাগিবে আবার এ মহাভারত, পৃঃ ৪৭ - ৪৮

Dhaka University Institutional Repository



আসবেনা, বরং ব্যক্তির জীবনীশক্তি নষ্ট হলে দেশজোড়া নায়কেরা লাঞ্ছনা হবে শুধু —

পরস্পরে তুমি ছড়াইছো দ্বেষ ।
এক দেহে হলো দাস — ভিন্ন তব প্রাণ —
গড়িয়া তুলিছো যারে দীর্ঘ ব্যবধান ।
ছিলোতে রক্ত দিলেনা মুক্তি — শোণিতে মিলেনা মধু,
আজাদীর নামে শুধু দিনে দিনে দিনে
ব্যক্তির জীবনী — শক্তি করিতেছো ক্ষয় ।[116]

সিরাজদ্দৌলার মৃত্যুবার্ষিকীতে লিখেছেন 'তেসরা জুলাই'। সিরাজের সাধের বাংলায় আজ অন্যায় শোষণ হাহাকার মৃত্যু ও অবজ্ঞার তাণ্ডবলীলা। দেশের অসম্মানের জন্য তাঁর পুনরাবির্ভাব অত্যন্ত প্রয়োজনীয় — একথা কবি মনে করেন।

সিরাজ সিরাজ, জাগো তুমি জাগো —
খোলো আর বার তব ক্লান্ত নয়ান,
তোমার সাধের বাংলায় দেখো আজ
করিয়াছে জালিমেরা জিন্দা — গোরস্থান ।
শহরে নগরে পথের কিনারে ক্ষুধিত নরের হাড়,
গড়িয়া তুলিছে জালিমের সাজানো
মানুষের লাশের পাহাড় ।[117]

তাঁর দ্বিতীয় কাব্য 'রাহ্‌বীর'। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকে ইসলামের পুনর্জাগরণ হিসাবে বিবেচনা করে তিনি এ-কাব্য রচনা করেছেন। সমগ্র পৃথিবীতে যখন ঘোর অমা, তখন আরবদেশে ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয় হয় এবং এই ধর্মে দীক্ষিত হয়ে আরবগণ পৃথিবীর বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে নতুন সভ্যতার পত্তন করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাদের পতন হয় এবং অজ্ঞানতা ও অন্ধকার মুসলমানদের গ্রাস করে। পুনর্বার আবর্তনের পথে জ্বলেছে ইসলামের আলো এবং ইসলামী সভ্যতার স্বর্ণদিনের মতন সাম্য-মৈত্রী-শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে নতুন পাকিস্তানে। মুসলমানদের এই দীর্ঘদিনের ইতিহাস তিনি বর্ণনা করেছেন বিভিন্ন পর্যায়ে

---

১১৬। দাদা, পৃঃ ৩৬

১১৭। তেসরা জুলাই, পৃঃ ১৯

Dhaka University Institutional Repository



বিভক্ত করে। পর্যায়গুলি হচ্ছে ঃ পরিচয় (তিমির যুগ), কাফেলার নব যাত্রা (প্রথম অরুণ কিরণে), দিক্ বিজয় পর্ব (মধ্যাহ্নে), অবসাদ-মুহূর্তে (দিবসের শেষ যামে), ভুলের স্বীকৃতি (বেলা শেষে), নিশি অবসানে (খোশরোজ) ও নতুন পথে (নবযাত্রার শপথ)। কাব্যের প্রথমে পরিচয়-জ্ঞাপক নিম্নরূপ বক্তব্য তিনি দিয়েছেন —

> ত্রিকালের এ যাত্রীর, যাত্রা তার সার্থকের লোভে সর্ব পূর্বেই শুরু হয়েছে।
> অতীত তার প্রোজ্জ্বল, সে-পথে তার সাফল্য অপূর্ব। বর্তমান তত অন্ধকারে
> কেটেছে, কিন্তু ভবিষ্যৎ যাত্রাপথে তার এক নব জ্যোতির বিকিরণ দৃষ্ট হচ্ছে।
> এ যাত্রা সাফল্যমণ্ডিত হলেই সে তার প্রোজ্জ্বল অতীতের মর্যাদা ফিরে পাবে।

মুসলমানদের আভিজাত্য-গৌরব তথা অতীত-প্রীতিকে কবি তীব্রভাবে ধিক্কার দিয়েছেন। বাংলার মুসলমানরা জমিদার-মহাজনের অত্যাচারে ও শোষণে বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করে দেশান্তরী হয় কিন্তু তবু নিজেদেরকে 'শাহী জাত' বলে পরিচয় দিতে কসুর করেনা এ কথা-তিনি বার-বার বলেছেন। যথা

> রৌদ্রেতে পুড়ি বৃষ্টিতে ভিজি ঘরে তোলে নিজধন
> জমিদারে নেয় খাজনা উসুল বাকী তবু রয় সব,
> মালিকের লোক জমি করে ক্রোক, মহাজন হয় দাবী
> সুদের দেনায় শোধ দিতে হায় সব যায় তাড়াতাড়ি,
> কাঁধে নিয়ে ঝুলি আসামের পথে কাজ খুঁজিতে চলে
> 'মোরা মুসলিম সেই শাহী জাত' — গৌরব করি বলে।[১১৮]

কিন্তু মুসলমানদের দুঃখের দিন গত হয়েছে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় নতুন সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সাধনা সৃষ্টির সুযোগ এসেছে। কবি আবেগ-ভরে বলেছেন পাকিস্তানে সাম্য-মৈত্রী-সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

> আমরা ফুটাব ধুলার ধরায় ভেস্তের সুধাহাসি
> গড়িব মহান অমর জীবন কলুষ-কালিমা নাশি'
> দূর করে দিব অতীতের যত বাধা-অপমান-গ্লানি,
> দানিব বিশ্বে পুরাতন প্রাণে নতুন জীবন-বাণী,
> উড়াব সকল ব্যথার নিবৃত্ত — জুলুমের নিশান
> পুণ্য জাহানে আনিব আজাদী ঈমান-ভেজা-ময়দান,

---

১১৮। পৃঃ ১৭

Dhaka University Institutional Repository



বিলাস ধূলায় আজাদী ' খানা, কারুণের দৌলত
ধূলির আকারে গড়িও মহান সত্যের ইমারত ।
খেজুর তলায় দরবারে শাহী, ফকিরী এন্তেজাম,
ধূলার ধরায় নামাইল রাণী-শাহীর পয়গাম ।
সবুরে গড়িল মোরাই মিলন-মৈত্রী সাম্যের হুকুমত
আমরা নিয়েছি আজাদী-স্বাধর, নয়া চলার শপথ ।[119]

'রঙিলা বন্ধু' পল্লীগীতির সমষ্টি । কয়েকটি গানে পল্লীর জনগণের দুঃখের চিত্র আছে, বাকি অধিকাংশ গানই আধ্যাত্মিক ও পরমার্থিক । একটি গান রচিত হয়েছে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর এন্তেকাল উপলক্ষে । তাঁর মৃত্যুতে 'সোনার পাকিস্তানের' শোকাভিভূত অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন নিম্নরূপভাবে —

বাপু হতে এতিম হইলো — সোনার পাকিস্তানে' ।।
সবাই বলে 'হায় হায়' ছাতি পিটে লইয়া —
'কোথায় গেল কায়েদে-আজম বাপু মোদের থুইয়া' — রে
পল্লায় কান্দে, নগরায় কান্দে — কান্দে কোলের ছাও,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে ছাওয়াল কোলে মাও — রে ।।
আশিম কান্দে, পশিম কান্দে, কান্দে পুলাপান —
সোনার পল্লী আন্ধ্যারা কইর্যা, চইল্যা গেলো চাঁন — রে ।।[120]

'চিনুবিবি' পালাগানের ঢংয়ে রচিত । কাহিনী কবির নিজস্ব । গাজন মিয়া নামক 'সৈয়দ-পাঠান' জাত এক খানদানী পরিবারের গেরস্তের তিন বিবি ছিল । তিন বিবিই সন্তানহীনা । বড় বিবি এক 'জাতি পাঠান' সোনাধরের ছেলেকে পালক-পুত্র হিসাবে গ্রহণ করে — নাম তার দুলু । ছ'সাত বছর পর ছোট বিবি এক কন্যাসন্তানের মা হয় — তার নাম রাখা হয় চিনু । বড় বিবির মৃত্যু হলে দুলু ছোটমায়ের কাছে লালিত-পালিত হতে থাকে এবং দুলু-চিনুর মধ্যে প্রণয়-সঞ্চার হয় । পিতামাতা একে প্রশ্রয় দেয় এবং এদের বিয়ের আয়োজন করে । কিন্তু অকস্মাৎ ছোট বিবির মৃত্যু হলে এরা মেজ বিবির খপ্পরে পড়ে এবং সে এই বিয়ে ভেঙে দেয় । দুলু দেশান্তরি হয় এবং চিনুর বিয়ের ব্যবস্থা হয় এক খানদানী পরিবারের ছেলের সঙ্গে । বিয়ের দিন চিনু আত্মহত্যা করে । চিনুকে উদ্ধার করতে এসে সে-খবর শুনে দুলুও আত্মহত্যা করে ।

১১৯। পৃঃ ৩১ – ৩২
১২০। 'কায়েদে-আজম স্মৃতি', পৃঃ ১৭

Dhaka University Institutional Repository



মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের একাংশের এক বিচিত্র মানসিকতার খবর এ-কাব্য থেকে পাওয়া যেতে পারে। মুসলিম জাতীয়তাবাদের উন্মেষ-যুগে এদেশীয় একশ্রেণীর মুসলমান পারিবারিক ঐতিহ্যের উৎস সন্ধানে মধ্যপ্রাচ্যে যাত্রা করেছিল এবং সে-সুবাদে এদেশীয় সমাজে আভিজাত্য দাবি করেছিল। গাজন মিয়া ও সোনাবরের 'সৈয়দ-পাঠান' বংশোদ্ভূত হওয়ার মধ্যে সে-মানসিকতার প্রমাণ মিলে।

এর পরে কবি আরো বিশেষভাবে ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ /দঃ/-এর জীবনকথা কবিতাকারে লিখতে মনস্থ করেন। ১৯৫২ – ৫৩ সালে এটি ধারাবাহিক ভাবে 'মাসিক মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত হয় এবং 'খাতামুন-নবীঈন' নামে পুস্তকাকারে বের হয় ১৯৬০ সালে। 'যে আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে' ফররুখ আহমদের সঙ্গে তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন, 'সেই সংগ্রাম ও সাধনার সামান্যতম ফলশ্রুতি' এই গ্রন্থ তিনি উৎসর্গ করেন ফররুখ আহমদকেই।[121]

এই কাব্য বিদগ্ধ পাঠকের জন্য রচিত হয়নি। সমাজের অশিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত লোক — যাঁরা ভিড় করে এখনো শহীদে কারবালা ও জঙ্গে নামা শুনে — তাঁদের জন্য তাঁদের ভাষায় তিনি হজরতের জীবনী ছন্দোবদ্ধ ভাষায় রচনা করেছেন।[122] নয় মনজিলে /পরিচ্ছেদ/ সমাপ্ত এ কাব্যে হজরতের পয়দায়েশ থেকে পরলোকে গমন পর্যন্ত জীবনলীলা বর্ণিত হয়েছে এবং প্রাধান্য পেয়েছে লোকসাহিত্যের রুচি, ভাষা, ভঙ্গী ও জীবনবোধ। আরবদেশের কাহিনীকে কবি পূর্ব বাংলার প্রাচীন পরিবেশে স্থাপন করে জনচিত্ত জয় করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাই আরবদেশের বর্ণনা হয় নিম্নরূপ —

নিশাতে নাই চান-জেতারা-দিনে আমাইশ রাত,
বাগ-বাগিচায় নাই সে ফুল, গায়না ভোমর প্রাত,
বন-বিনালে পাখ-পাখালীর নাই সে মধুর রাও
দুলায় না সে কলার পাতায় পাখা ভোরের বাও।
ময়না গাছে পাখির.তোতা-কাঁটে নাই বন.
কপাল-জোড়া দুঃখের বল, চেকে-ঝোড়া দর।[123]

---

১২১। উৎসর্গপত্র, খাতামুন-নবীঈন
১২২। আরজ, ঐ, পৃঃ ৵. – ৶.
১২৩। প্রথম মনজিল, পৃঃ ৬

Dhaka University Institutional Repository



অন্যান্য গভীর ভাব সৃষ্টিতে কবি কোন-কোন স্থলে বেশ সমর্থ হয়েছেন। দ্বীনের সমস্ত গুরুদায়িত্ব সমাপ্ত করে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যখন পরপারে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হতে প্রস্তুত হয়েছেন, তাঁর সে-সময়ের মনোভাব ধরা পড়েছে নীচের অনবদ্য চরণগুলিতে। ছন্দের শিথিলতা ও মধ্যবর্তী ছেদের উদাসীনতার প্রয়াস কাব্যাংশটির রসহানি করেছে কোন-কোন ক্ষেত্রে

রঙ্গ করিয়া আসতে ঘরে দীনের নবীবর
হইয়া গেল কেমন যেনো ঘোর ব্যাকুল অন্তর,
যেইখানে যান সদায় শুনেন পায়ের বাঁশির সুর,
ডাকছে তারে নাম ধরিয়া অনেক দূর দূর;
ডাকছে যেন দরদভরে অনেক দরদীজন
সেই ডাকেতেই আজকে যেনো ঘর না লহে মন।
সেই ডাকেতে প্রাণ পঙ্খী উড়ুম উড়ুম করে।
পিঞ্জিরাতে পঙ্খী কেমন ছটফটায়া মরে।[১২৪]

'১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ভারত কর্তৃক পাকিস্তানের উপর অতর্কিত হামলার বিরুদ্ধে পাকিস্তানীদের জেহাদের বিবরণ' অবলম্বনে রচিত হয়েছে 'পাকিস্তানের জঙ্গনামা'। পাকিস্তান ও ভারতের যুদ্ধের কারণ, যুদ্ধে পাকিস্তানীদের কৃতিত্ব, শহীদদের কীর্তি-গাথা, জনগণের সুদৃঢ় মনোবল, কাশ্মীর-বিরোধ ও জেহাদের শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় পুঁথির আলোচ্য বিষয় হয়েছে। কবি মনে করেছেন, বদর যুদ্ধের সঙ্গে পাক-ভারত সংঘর্ষ তুলনীয় হতে পারে। বদর যুদ্ধের সাফল্যের উপর যেমন ইসলামের অস্তিত্ব নির্ভরশীল ছিল, সেপ্টেম্বর যুদ্ধও তেমনি ছিল পাকিস্তানের কাছে। যুদ্ধে জয়ী হয়ে পাকিস্তানীরা বুঝতে পেরেছে যে, তাঁদের সমস্ত শক্তির উৎস আল্লাহ।

পাকিস্তানের পক্ষে ছিল এ-রণে বদর ।।
পাকিস্তানের ভাগ্য ছিল নির্ভর এর উপর,
হৈত যদি এই রণেতে তাহার পরাজয় ।।
এই দুনিয়ায় হৈত তাহার নাম নিশানা লয়
মানলো আমার মুসলমানে মনে প্রাণে ঠিক ।।
আল্লাই তার শক্তি পরম সমস্তের মালিক
মানলো আমার বতন করে সকল মুসলমান ।।
শক্তি তাহার সংখ্যাতে নয় শক্তি তার ঈমান।[১২৫]

---

১২৪। [illegible], পৃঃ ৩৮২
১২৫। উপক্রমণিকা, পৃঃ ৩

Dhaka University Institutional Repository



যুদ্ধের ফলে পাকিস্তানীদের আরো একটি বড় লাভ হয়েছে। তাদের ঐক্য, ঈমান, শৃংখলা মজবুত হয়েছে। এর মাধ্যমেই প্রমাণিত হল, পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যতই বিবাদ-বিসম্বাদ থাকুক না কেন, প্রয়োজনে তারা এক কাতারে দাঁড়িয়ে যেতে পারে।

ফেরকা থাকুক শত শত ফেসাদ থাকুক জোর।।
আপদকালে সবাই ধরে কইন্যা একের ডোর*
থাকুক শত দ্বন্দ্ব বিবাদ পরস্পরে আন।।
বাদশা ফকির এক হয়্যা যায় শুনলে পাক আজান*
পূর্ব পশ্চিম এক হয়্যা যায় শুনলে পাক তকবির।।
সবাই দাঁড়ায় এক কাতারে উচচ করে শির।
পাক কলেমার একিন তাদের পরশমনি ধন।।
এর পরশেই করে তারা লোহারে কাঞ্চন*[১২৬]

তিন

এক বিবেচনায় রওশন ইজদানীকে 'পাকিস্তানবাদী' কবিদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। দেশবিভাগকে যাঁরা 'পাক-বাংলা' সাহিত্য সৃষ্টির সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এই শ্রেণীর কবিদের লক্ষ্য ছিল পুঁথি সাহিত্য, লোকসাহিত্য, পূর্ব বাংলার প্রবহমান জীবনধারা ও ইসলামকে ভিত্তি করে নতুন সাহিত্য-ঐতিহ্য নির্মাণ করা। [illegible] ইজদানী তাঁর কবিতায় এর সবগুলিকে জড়ো করেছিলেন। তিনি যে উপযুক্ত শিক্ষা, পরিশীলন ও সাহিত্যবোধের অভাবে এ-বিষয়ে শিল্প-সার্থকতা অর্জন করতে পারেননি, সেটা স্বীকার্য এবং ভিন্ন মানদণ্ডে বিচার্য। কিন্তু তিনি চেষ্টা করেছিলেন কবিতাকে অল্পশিক্ষিত জনরুচির উপযোগী করে এর পাঠক-পরিধি বৃদ্ধি করতে। তাঁর এ-মনোভাব অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য।

---

১২৬। জেহাদের শিক্ষা, পৃঃ ৪০ ।

Dhaka University Institutional Repository



## ফররুখ আহমদ

আলোচ্য ধারার কবিদের মধ্যে ফররুখ আহমদ (১৯১৮ – ৭৪) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। আদর্শানুরক্তি, মার্জিতবোধ ও প্রকাশের অনবদ্য ভঙ্গি মিলে তাঁর কবিতাকে ক্লাসিকাল সমুন্নতি দান করেছে এবং পাকিস্তান আমলের শ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী কবি হিসাবে তিনি বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছিলেন।[১২৭] কেউ কেউ তাঁকে 'প্রকৃত প্রস্তাবে পাকিস্তান আন্দোলনের সৃষ্টি' বলেও মত প্রকাশ করেছেন।[১২৮] জীবনের শেষ দিকে স্বীয় আদর্শের জন্য তিনি নানাভাবে লাঞ্ছিত হলেও মৃত্যুর পর তাঁর কবিতার যথার্থ কদর পুনর্বার শুরু হয়েছে।

যশোর জেলার মাঝআইল গ্রামে এক সৈয়দ পরিবারে তাঁর জন্ম। কবির পুরো নাম ছিল সৈয়দ ফররুখ আহমদ কিন্তু সৈয়দ বংশজাত বিভিন্ন লোকের চরিত্রের সর্বজনীন অসঙ্গতি দেখে বিরক্ত হয়ে তিনি পরবর্তীকালে নিজ নামে সৈয়দ ব্যবহার করা থেকে বিরত হন।[১২৯] তাঁর পিতা সৈয়দ হাতেম আলী একজন পুলিশ ইনসপেকটর ছিলেন এবং স্বীয় কর্মদক্ষতার গুণে খান সাহেব উপাধি অর্জন করেন।[১৩০] দেড় বছর বয়সে মাতৃহারা হয়ে ফররুখ আহমদ তাঁর দাদীর নিকট প্রতিপালিত হন। এই দাদী ইসলামী পৌরাণিক কাহিনীর ভাণ্ডার তাজকেরাতুল আউলিয়া ও কাসাসুল আম্বিয়া থেকে নানা কেচ্ছা শিশু ফররুখকে শুনাতেন। এই সময়ে তিনি কারী-আমা এক মহিলার নিকট ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতেন।[১৩১]

---

১২৭। ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে দলমত নির্বিশেষে ঢাকার সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীরা সাহিত্যসেবার জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করায় তাঁকে সম্বর্ধনা প্রদান করেন। অধ্যাপক আবদুল হাইয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ-সভায় কবিকে প্রদত্ত মানপত্রে তাঁর সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যকে 'সকল সাহিত্যসেবীর পক্ষে প্রণিধানযোগ্য' বলে মত প্রকাশ করা হয়। (মাসিক পূবালী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮, ১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা, পৃঃ ৭০ – ৭৮)।

১২৮। সৈয়দ আলী আহসান, পূর্ব পাকিস্তানের কাব্য সাহিত্যের ধারা, মাহে নও, আগস্ট ১৯৫১, পৃ ৫৩

১২৯। 'ফররুখ ভাই-এর তাপাতেই বলি, তিনি উত্তর দিলেন – 'অনেক ভেবে দেখলাম ও শালার সৈয়দের গুষ্ঠির মধ্যে থাকলে সত্যিকারের মানুষের গুষ্ঠির বাইরেই থাকতে হবে আমাকে তোরা কি বলে করিস ; ও শালার লালত ল্যাজটা কেটে বাদ দিয়ে দিলাম।' কামরুল হাসান, ফররুখ ভাই, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১লা নভেম্বর ১৯৭৪, পৃঃ ৩৩।

১৩০। ঐ

১৩১। সাইয়েদা ইয়াসমীন বানু, আব্বাকে যেমন দেখেছি, ঢাকা ডাইজেস্ট, নভেম্বর ১৯৭৪, পৃঃ ৮৯৯ – ৯০০।

Dhaka University Institutional Repository



ভাল ছাত্র হলেও তাঁর লেখাপড়া বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। ১৯৩৯ সালে রিপন কলেজ থেকে আই-এ পাশ করে কিছুকাল স্কটিশ চার্চ কলেজ ও সেন্ট পল কলেজে পড়াশোনা করেন। প্রথমে দর্শনে ও পরে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্সে ভর্তি হলেও শেষ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেননি।[১৩২]

তরুণ বয়সে তিনি দুরন্ত প্রাণচাঞ্চল্যের অধিকারী ছিলেন এবং নানাবিধ সংগঠন নিয়ে সর্বদা ব্যাপৃত থাকতেন। এই সময়ে বিখ্যাত মানবতাবাদী নেতা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রভাবে তিনি সেদিকে ঝুঁকে পড়েন কিন্তু কিছুকাল পরে কুমিল্লার ধর্মীয় নেতা মাওলানা আবদুল খালেকের সংস্পর্শে এসে তাঁর মতামত বদলে যায় এবং তিনি ইসলাম ধর্মের একনিষ্ঠ অনুরাগী হয়ে পড়েন।[১৩৩]

ফররুখ আহমদ গদ্যে বিশেষ কিছু লেখেননি।[১৩৪] তিনি প্রচুর কবিতা রচনা করেছেন কিন্তু অধিকাংশই অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। প্রকাশিত যা হয়েছে তা-ও আবার পুস্তকাকারে গ্রথিত হয়নি। পুস্তকাকারে প্রকাশিত কাব্যগুলি হচ্ছে: সাত সাগরের মাঝি /১৯৪৪/, আজাদ করো পাকিস্তান /১৯৪৬/, সিরাজাম মুনীরা /১৯৫২/, মুহূর্তের কবিতা /সনেট সংকলন, ১৯৬৩/ ও হাতেম তায়ী /১৯৬৬/। নৌফেল ও হাতেম নামক তাঁর একটি কাব্যনাট্য প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে। সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ১৯৫৯ – ৬০ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ১৯৬১ সালে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার Pride of Performance ও ১৯৬৬ সালে আদমজী পুরস্কার লাভ করেন।[১৩৫]

---

১৩২। কবি ফররুখ আহমদ স্মরণে বিশেষ ক্রোড়পত্র, দৈনিক বাংলা, ১৯–১০–৭৫।

১৩৩। সাইয়েদা ইয়াসমীন বানু, পূর্বোক্ত।

১৩৪। তাঁর একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রবন্ধ হচ্ছে 'পাকিস্তান: রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য' /সওগাত, আশ্বিন, ১৩৫৪/। এতে তিনি লিখেছেন, 'এটা দৃঢ়তার সাথেই আশা করা যায় যে, পাকিস্তানের জনগণের বৃহৎ অংশের মতানুযায়ী ... বাংলা ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে।' এবং 'পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ শত্রু বলে সর্বপ্রথম গণ্য হতে পারে কম্যুনিজম ও ক্যাপিটালিজম'। সওগাতের ১৩৮১ সালের আশ্বিন–কার্তিক সংখ্যার ৬০০ – ৬০১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১৩৫। Literary Prizes in Pakistan, National Book Centre of Pakistan, 2nd edition, 1969, Karachi, পৃঃ যথাক্রমে ৪৬, ১০ ও ১৫।

Dhaka University Institutional Repository



দুই

ফররুখ আহমদ বিশ বৎসর বয়সের সময় থেকে রীতিমত কবিতা লিখতে শুরু করেন। বয়োধর্ম অনুসারে অথবা বাংলা কাব্যের প্রবহমান ঐতিহ্যের প্রধান ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রোমান্টিক প্রেম, বিরহ ও বেদনা সম্পর্কেই সে-সময় তিনি কবিতা রচনা করেন। আঁধারের স্বপ্ন,[১৩৬] চৈত্র প্রভাতের সুর,[১৩৭] নাটকীয়,[১৩৮] চৈত্র সন্ধ্যায় সুর,[১৩৯] কর্দম,[১৪০] নাটক,[১৪১] কাচড়াপাড়ায় রাত্রি,[১৪২] উপহার[১৪৩] প্রভৃতি কবিতার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। উপহার কবিতার বাণীভঙ্গির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নির্ভয়' কবিতার মিল লক্ষ্য করার মত —

যেথা তুমি থাকো, যেথা আমি থাকি
যেথা আছে ভালবাসা —
যেখানে নিত্য প্রেমের শিখায় জাগে দীপ্ত আশা,
সেথা এসে মোরা দাঁড়াব দুজনে
হাতে হাত রেখে মন রেখে মনে;
জাগাবো সেখানে প্রাণ-উৎসব বিচিত্র সুন্দর
আমরা দুজনে ধরার ধূলায় বাঁধব বাসর-ঘর।

আর রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে —

দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ
দোঁহারে দেখেছি দোঁহে
মরু পথ তাপ দুজনে নিয়েছি সহে।
...          ...          ...
এই গৌরবে চলিব এ ভবে
যতদিন দোঁহে বাঁচি।
এ-বাণী প্রেয়সী হোক মহীয়সী
তুমি আছ, আমি আছি।[১৪৪]

---

১৩৬। প্রথম প্রকাশ সওগাত, পৌষ ১৩৪৫, ১৩৮১ সালের সওগাতের আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যার ৫৩৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।
১৩৭। প্রথম প্রকাশ, ঐ, ফালগুন ১৩৪৫, ঐ, পৃঃ ৫৩৮
১৩৮। প্র প্র, ঐ, চৈত্র ১৩৪৫, ঐ পৃঃ ৫৩৯
১৩৯। প্র প্র ঐ, বৈশাখ ১৩৪৬, ঐ, পৃঃ ৫৪০
১৪০। প্র,প্র,ঐ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬, ঐ, পৃঃ ৫৪০
১৪১। প্র.প্র., ঐ, আষাঢ় ১৩৪৬, ঐ, পৃঃ ৫৪১
১৪২। প্র.প্র., ঐ, পৌষ ১৩৪৭, ঐ, পৃঃ ৫৪১
১৪৩। প্র.প্র., ঐ, অগ্রহায়ণ ১৩৪৯, ঐ, পৃঃ ৫৪৭
১৪৪। নির্ভয়, মহুয়া, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী, পৃঃ ৩৬

Dhaka University Institutional Repository



এই মনোভাব তাঁর কবিতার প্রধান অবলম্বন হয়ে নিরূপিত হতে পারেনি। সে-সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছিল। ভারতবর্ষও এতে জড়িয়ে পড়ে এবং বাংলাদেশেই মহাযুদ্ধ তার বিভীষিকার পূর্ণ রূপ — বোমা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দাঙ্গা — নিয়ে প্রকাশিত হয়। এই পরিবেশ কবিকে বিশেষভাবে বিচলিত করে এবং তাঁর কাব্যরচনাকেও প্রভাবিত করে। এ-বিষয়ে তিনি কয়েকটি কবিতা রচনা করেছেন, কিন্তু শুধু দুটি কবিতা — লাশ, আর্তনাদ — সাত সাগরের মাঝি কাব্যে সংকলিত হয়েছে। ব্ল্যাক আউট,[145] প্রেক্ষা,[146] শকুনেরা,[147] এই তিনটি অগ্রন্থিত কবিতার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। শকুনেরা কবিতাটি মন্বন্তর সময়ের চোরা-কারবারী, কালোবাজারী প্রভৃতি সমাজবিরোধী লোকদের কথা তাদের লালনক্ষেত্র [illegible] সত্যভাবে অবলম্বন করে লেখা।

হে জঘন্য শকুনেরা! আজ মানুষের এই
অবশিষ্ট পচা লাশ উপহার নাও,
খাও তারে কুরে কুরে খাও।
আর নাও বিশীর্ণ ক্ষুধিত জনের
জীর্ণ শুষ্ক শব
আর নাও তিলে তিলে মৃত এই শিশুর, বৃদ্ধের
ক্ষুধাতুর শব
জঘন্য পাশব
প্রাণহীনতার
পূর্ণ করো স্বরূপ তোমার।

এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ কবিতা 'লাশ'। পথের পাশে পড়ে থাকা একটি মৃতদেহকে উপলক্ষ করে তিনি এর জন্য দায়ী মুনাফাখোর শোষক, মানবতাবিরোধী মৃত জড় সভ্যতাকে তীব্রকণ্ঠে ধিক্কার জানিয়েছেন এবং এর বিনাশ কামনা করেছেন।

---

১৪৫। প্র.প্র. সওগাত, শ্রাবণ, ১৩৪৯, পূর্বোক্ত সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৫৪৪

১৪৬। প্র.প্র. ঐ, বৈশাখ, ১৩৫০, ঐ, পৃষ্ঠা ৫৫২

১৪৭। প্র.প্র. ঐ, কার্তিক, ১৩৫০, ঐ, পৃষ্ঠা ৫৫৭

Dhaka University Institutional Repository



অনাহারে মৃত একটি লাশের মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এই জরাজীর্ণ, মৃত ও ঘৃণ্য সভ্যতার 'অন্তিম স্বর'।

জানি মানুষের লাশ মুখ গুঁজে পড়ে আছে ধরণীর 'পর,
ক্ষুধিত অসাড় তনু বত্রিশ নাড়ীর তাপে পড়ে আছে
নিসাড় নিথর,
... ...
পৃথিবী চলিছে তবু শোষণ শাসনে
সাক্ষী তার রাজপথে মনিবের গাড়ি
সাথে জিনহাত হাড় গুঁড়িতেছে মানুষের অন্তিম স্বর।
পড়ে আছে মৃত মানবতা
তারি সাথে পথে মুখ গুঁজে।
... ... ...
হে জড় সভ্যতা
মৃত সভ্যতার দাস স্ফীতমেদ শোষক সমাজ
ধ্বংস হও
ধ্বংস হও।[১৪৮]

এই জড় সভ্যতার অবসান করে নতুন মানবতাবাদী সভ্যতার নির্মাণের আকাঙ্ক্ষায় তিনি ইসলামের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। এই পরিবর্তনের পশ্চাতে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মাওলানা আবদুল খালেকের প্রভাব এবং সাহিত্য-ক্ষেত্রে কলকাতার 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' ও ঢাকার 'পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ'-এর প্রভাব কার্যকর ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে পুঁথি সাহিত্যের উত্তরাধিকারকে অবলম্বন করে ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম ঐতিহ্যমণ্ডিত স্বতন্ত্র কাব্যধারা নির্মাণে তিনি ব্রতী হলেন। প্রথম যুগের মুসলমানেরা ইসলামের শান্তিতে একতাবদ্ধ হয়ে অর্ধপৃথিবী জুড়ে মানব ঐশ্বর্য মনুষ্যত্ব ও মহিমার যে বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল ও নতুন সমাজসৃষ্টিতে ব্রতী হয়েছিল বর্তমানের মুসলমানদের জন্যও কবি সেই সমাজ কামনা করেছেন।

---

১৪৮। সাত সাগরের মাঝি, পৃঃ ৫৬-৫৭

Dhaka University Institutional Repository



সাত সাগরের মাঝি[১৪৯] কাব্যের অধিকাংশ কবিতায় সেই সুদূর যুগে প্রত্যাবর্তনের ও তার উদ্বোধনের আহবান রয়েছে এবং সুনিপুণ ভাষায় কবি সেই অতীত যুগের প্রাণোচ্ছলতা, ঐশ্বর্য, বিলাস, দুঃসাহসিকতা, শক্তি ও সমৃদ্ধির কথা বিবৃত করেছেন। সিন্দাবাদ, বার দরিয়ায়, দরিয়ায় শেষ রাত্রি, আকাশ-নাবিক, পাঞ্জেরী, নিশান, সাত-সাগরের মাঝি প্রভৃতি কবিতায় এই মনোভাব বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

ক. কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ,
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ,
পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ বয়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক,
নতুন পানিতে সফর এবার, হে মাঝি সিন্দাবাদ![১৫০]

খ. তুমি দেখেছো আলো, আলো দেখো আজো জিন্দেগীর জয়ারী;
আলো চাঁদ আলো রবি তোমার হে আল-হেলালধারী।
তোমার তনুর শিরাতে শিরাতে সেই প্রভাত নূর,
আগুন বানমাত্রা হেরিছে সমুদ্র অন্দুর।[১৫১]

হেরার রাজতোরণে পৌঁছুতে পারলেই সকল সমস্যার সমাধান হবে এই দৃঢ়চিত্ত বিশ্বাসে কবি সেদিকে যাত্রা করার উদাত্ত আহবান জানিয়ে কাব্য শেষ করেছেন —

তবে পাল খোলো, তবে নোঙর তোলো,
এবার অনেক পথশেষে সন্ধানী!
হেরার তোরণ মিলবে সমুখে জানি।
তবে নোঙর তোলো,
তবে তুমি পাল খোলো,
তবে তুমি পাল খোলো।[১৫২]

---

১৪৯। প্রথম সংস্করণ, সেপটেম্বর ১৯৫২, ঢাকা। প্রথম প্রকাশিত হয় কলকাতায়, ডিসেম্বর ১৯৪৪।
১৫০। সিন্দাবাদ, পৃঃ ৯
১৫১। হে নিশান-বাহী, পৃঃ ৬২
১৫২। সাত সাগরের মাঝি, পৃঃ ৮৩

Dhaka University Institutional Repository



সাত সাগরের মাঝি ফররুখ আহমদকে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। সচেতন আদর্শবাদ দ্বারা পরিচালিত হলেও কাব্য বিচারেও যে এটি উৎকৃষ্ট হয়েছে — এ বিষয়ে সব সমালোচকই একমত।[৫৩]

---

৫৩। কয়েকজন বিশিষ্ট সমালোচকের মত এখানে উদ্ধৃত করা হল —

ক. তাঁর 'সাত সাগরের মাঝি' ছন্দের অনবদ্য কারুকার্যে, তৎসম শব্দের সঙ্গে আরবী-ফারসী শব্দের নিখুঁত ধ্বনি-সাম্য নির্মাণে এবং সর্বোপরি বর্তমান যুগের ক্ষয় ও অসহিষ্ণুতার মধ্যে সমুজ্জ্বল ইতিহাস নির্ভরতায় পূর্ব-পাকিস্তানের কাব্য ধারায় একটি প্রধান স্থান অধিকার করেছে।— সৈয়দ আলী আহসান, পূর্ব পাকিস্তানের কাব্য, মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ), ২য় সংস্করণ, চট্টগ্রাম ১৯৬৬, পৃঃ ৫২২।

খ. 'সাত সাগরের মাঝি' ... আমাদের কাব্য সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, রীতিমত বিস্ময়কর ঘটনাও বলা চলে। আরও বিশদভাবে বলতে গেলে যে অর্থে বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা', অথবা বিষ্ণু দে-র 'চোরাবালি', অথবা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' এক একটি বিস্ময়কর ঘটনা, সেই অর্থেই একটি বিস্ময়কর ঘটনা। রূপে-রসে একান্ত সমকালীন কাব্যধারায় সত্যিই একটি ব্যতিক্রম ছিল।— সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, কবি ফররুখ আহমদ, ১ম সং, ঢাকা ১৯৬৯, পৃঃ ৬৮।

গ. সুস্পষ্ট মুসলিম কাব্যাদর্শের ও ঐতিহ্যের রূপায়ণে তাঁর যে শিল্প-সার্থকতা তা-ই তাঁকে অন্যান্য কবি কর্মী থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী করেছে। 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থে ফররুখ আহমদের এই বৈশিষ্ট্যই বিশদ মহিমায় উজ্জ্বল।— মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা ১৯৬৯, পৃঃ ১১৯।

ঘ. ফররুখ আহমদের সর্বপ্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' সত্যিকারের সাড়া তুলেছিলো। — শামসুর রাহমান, পূর্ব বাংলার সাম্প্রতিক কবিতা, সাহিত্যমেলা, কলকাতা, ১ম সং, ১৮৭৯ শকাব্দ, পৃঃ ১১৭

ঙ. অথচ বিষয় আদর্শ যে ভাষায় কাব্য হয়, যে ছবিতে চিত্ররূপ হয়, যে মূর্ছনায় লিরিক হয়, যে ধ্যানে আত্মগত হয়, যে কল্পনায় সাবলীলতা ও ঘটমানতা Crudeness ছাড়িয়ে ওঠে এবং যার ভাষা বিশেষ করুণের পুনঃ-সাপেক্ষতার উর্ধ্বে শৈল্পিকতায় স্বাচ্ছন্দ্য থাকতে পারে, তা ফররুখের অনায়ত্ত ছিল না। সাত সাগরের মাঝি এর প্রমাণ। — হাসান হাফিজুর রহমান, আধুনিক কবি ও কবিতা, ১ম সং, ঢাকা ১৯৬৫, পৃঃ ১০৬।

Dhaka University Institutional Repository



বর্তমানের হতাশা থেকে মুক্তিলাভের জন্য মুসলমানদিগকে শুধু ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানিয়েই কবি সন্তুষ্ট থাকেননি, একটি নির্দিষ্ট আদর্শ অনুসরণের দ্বারা ও একটি বিশেষ ভূখণ্ডের ভিত্তিতে কিভাবে নতুন জাতির বিকাশ হতে পারে সে-সম্পর্কেও তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ও তাঁর চার খলীফার জীবনের সমুন্নত আদর্শের মধ্যেই কবি তাঁর ঈপ্সিত আদর্শ খুঁজে পেয়েছিলেন এবং 'পাকিস্তান' রাষ্ট্র বাস্তবায়নের মাধ্যমে দ্বিতীয় আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন সম্ভব হবে ভেবেছিলেন। সিরাজাম মুনীরা ও আজাদ করো পাকিস্তান কাব্যদ্বয়ে এই দুই বাসনার প্রতিফলন ঘটেছে। প্রথম কাব্যটি পাকিস্তানোত্তর যুগে প্রকাশিত হলেও এর অধিকাংশ কবিতা রচিত হয়েছিল প্রাক-পাকিস্তান যুগে।

সিরাজাম মুনীরা-র[১৪৪] মূল ভাব-ভিত্তিক কবিতাগুলি হচ্ছে সিরাজাম মুনীরা, আবুবকর সিদ্দিক, উমর দারাজ-দিল, ওসমান গনী, আলী হায়দার, শহীদে কারবালা, গাউসুল আজম, খাজা নকশবন্দ, সুলতানুল হিন্দ, মুজাদ্দিদ আলফেসানী প্রভৃতি। কাব্যটি উৎসর্গ করা হয়েছে 'তৌহিদী মশাল বহি চলে গেছে' যাঁরা, সেই কাফেলার নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী', কবির দীক্ষাগুরু 'আলহাজ্জ মৌলানা আবদুল খালেক' সাহেবকে।[১৪৫] বিভিন্ন কবিতায় কবি হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ও তাঁর অনুগামীদের সত্যসন্ধানী, মানবমুখী, সংগ্রামী ও ত্যাগী জীবনের পুণ্য কাহিনী বর্ণনা করেছেন। নাম কবিতাটিতে উল্লেখ করা হয়েছে রাসূলুল্লাহর আদর্শানুসারীদের কথা এবং তাঁদের নেতৃত্বে পৃথিবীতে নতুন জামানার অভ্যুদয়ের কথা —

গলেছে পাহাড়, খুলেছে আকাশ, মেলেছে মানুষ তোমার সাথে,
তোমার পথের যাত্রীরা তবু থামেনি চরম ব্যর্থতাতে, তা
তাই সিদ্দিক পেয়েছে সবে অমর সত্য সিন্ধু-দোল,
তাই উমরের পাতার ভেলায় নিখিল মনের ও-কল্লোল,
তাই ওসমান খুলে দিল তার নতুন দিন মণিকোঠায়,
তাইতো আলীর হাতে চমকায় বাঁকা বিদ্যুৎ জুলফিকার,
খালেদ, তারেক ঝাণ্ডা ওড়ায় মাশুকের বুকে প্রেমের টান,
মহাচীন মুখে ফেলায়ে কাফেলা আর যাত্রীরা করে প্রয়াণ।
পাল তুলে দিয়ে কিস্তি ছুটেছে জোয়ার ভাটার বাঁকে অটল,
নতুন জাহানে কোটী মরাগাঙ অবনীতে পেল নতুন জল,
তারা খুঁজে ফেরে সিন্ধু ঠিকানা প্রবল [illegible] ধুলার মাটি অতল,
মৌসুমী ঝড় জাগায় দুধারে সব দেশের তোলে ফসল।[১৪৬]

---

১৪৪। প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, ঢাকা, পূর্ব পাকিস্তান, ১৯৫২
১৪৫। উৎসর্গ পত্র
১৪৬। সিরাজাম মুনীরা, পৃঃ ২০ – ২১।

Dhaka University Institutional Repository



কাব্যগ্রন্থের সিরাজাম মুনীরা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। কবি এখানে প্রচারক হয়ে উঠেছেন। প্রথম কাব্যের তুলনায় এটি নিকৃষ্ট।[১৫৭]

মানুষের মধ্যে রয়েছে সুন্দর-অসুন্দর, শুভ-অশুভ, দাম্ভিকতা-উদারতা এবং পশুত্ব-মনুষ্যত্বের পাশাপাশি অবস্থান। পূর্ণ মানুষ হতে হলে জয় করতে হবে মনের সকল হীনতা, ক্ষুদ্রতা ও পশুপ্রবৃত্তিকে। তাই প্রয়োজন নিজের প্রবৃত্তির সঙ্গে জেহাদের। 'আত্ম সংগ্রাম' ও 'এই সংগ্রাম' কবিতাদ্বয়ে এই সংগ্রামের আহবান আছে —

এবার আমরা ফিরেছি জেহাদে সফর –
এবার তোমার সকল শৌর্য প্রকাশ করো
সিপা-সালার।
... ... ...
আত্ম সংগ্রাম নিজেকে চেনার
মানবতা নিয়ে বেচা ও কেনার
হাটের ভীড়ে,
সময় এসেছে সকল দেনার
সকল হিসাব মেটাতে ফিরে।[১৫৮]

আজাদ করো পাকিস্তান[১৫৯] পাকিস্তান-পূর্ব যুগে প্রকাশিত একটি ক্ষুদ্রকাব্য। মুসলিম লীগ 'পাকিস্তান প্রস্তাব' গ্রহণ করলে ফররুখ আহমদ দারুণভাবে আলোড়িত হন এবং এই কাব্য রচনা

---

১৫৭। ক. সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫২২
খ. হাসান হাফিজুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৬
গ. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৮

১৫৮। আত্ম সংগ্রাম, সিরাজাম মুনীরা, পৃঃ ৬৬ – ৬৭

১৫৯। মৃত্তিকা প্রকাশনি বিভাগ, ১৭-বি, তারকদত্ত রোড, বালিগঞ্জ, কলকাতা। প্রথম সংস্করণের যে-কপিটি আমি কবির বাসায় দেখেছি, তাতে প্রকাশের তারিখ নাই। কাব্যটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক এর প্রকাশকাল বলেছেন পাকিস্তান-পূর্ব যুগ। /মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ২য় মুদ্রণ, ঢাকা ১৯৬৫, পৃঃ ৩৪৪/। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ একটি প্রবন্ধে /বাংলা কাব্যে পাকিস্তান, মাসিক পূবালী, ভাদ্র ১৩৭১, পৃঃ ১০৭৫ – ৭৮/ এই কাব্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আব্দুল মান্নান সৈয়দ /মোঃ মাহফুজউল্লাহর সহযোগিতায়/ সম্পাদিত 'ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতায়' /ফররুখ স্মৃতি অর্চনা, ১ম সং, ১০ই জুন ১৯৭৫/ কবির প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনার পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরীর প্রয়াস আছে কিন্তু সেখানে এই কাব্যের উল্লেখ না-থাকা রীতিমতো বিস্ময়কর ও সন্দেহজনক।

Dhaka University Institutional Repository



স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তান বলতে একটি ভৌগোলিক এলাকাকে কবি বোঝাননি, একটি সুষ্ঠু আদর্শের লালনাগার হিসাবে একে কবি অঙ্কন করেছেন। কাব্যটি তিনি উৎসর্গ করেছেন 'ইসলামের জন্য যাঁরা রক্ত দিয়েছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে'। বিশ পৃষ্ঠার এই কাব্যে দশটি কবিতা রয়েছে। সেগুলি হচ্ছে : কৌমের গান, আজাদ করো পাকিস্তান, জাগাও তারা, কায়েদে-আজম জিন্দাবাদ, নতুন মোহাররম, পথ, পাকিস্তানের কবি, শান্তির অগাধ তলে, কারিগর, আজিম ও মজলুম। কাব্যের পরিচিতি হিসাবে যে-বক্তব্য তিনি রেখেছেন তা-ও উল্লেখযোগ্য :

> স্বাধীন হয়ে বাঁচবার অধিকার মানুষ মাত্রেরই। নিজের চলার মাঠে নিজের সম্পূর্ণ অধিকার দাবী অযৌক্তিক নয়। এ-দিক থেকে পাকিস্তান দাবী আদ্যাবাদের মতো বিবেচিত হলেও তা গ্রহণযোগ্য : আদ্যাবাদের বিচার জীবনশ্রেষ্ঠ মানুষের, পশুর নয়। এবং, মানুষ যখন বাঁচে স্বাধীন হয়েই বাঁচে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে অত্যাচারী ও শোষকের পতন হবে এবং নিরন্ন লাঞ্ছিত মজলুমেরা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে — এটা কবি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন।

কৃষ্ণা যামিনীর পাণ্ডু ম্রিয়মান চাঁদ
আসন্ন ঊষার প্রান্তে এল শেষ হয়ে,
দিগন্তে স্বর্ণাভা : দূরে আলোর ইঙ্গিত।
শোনাও মৃত্যুর সুর শোন জীবনের
অনুধ্বনি : মেঠো পথ, পায়ে-চলা পথ
কাঁকর বিছানো পথ : মজুরের আর
নিঃস্ব জনতার পথ টানিছে আমাকে।
রাজসিক অভ্যুদয়ে চলেছে যে-পথ
এখনো পান্থ-পর্বে — সে-পথের আয়ু
এল শেষ হবে : তাকে মানুষের পথ
নিরন্ন, ক্ষুধিত শীর্ণ মানুষের পথ,
ধর্ষিতা মায়ের শিশু ক্রন্দনের পথ। [১৬০]

পাকিস্তানে শুধু অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারই প্রতিষ্ঠিত হবেনা, হজরত মোহাম্মদ/দঃ/ এর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে পাকিস্তানীরা ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশও সাধন করবে — কবি

১৬০। পথ, আজাদ করো পাকিস্তান, পৃঃ ৮

Dhaka University Institutional Repository



তা-ও কামনা করেছিলেন ঃ

সব পুঞ্জিত মনে জেগেছে আজাদ পাকিস্তান,
সকল সুপ্তির বুকে উঠায়েছে আজ সে-তুফান;
বন্ধু বালুকণা দেখে শাঁখমুক্ত সাহারা শিরাজ।

সে বালুতে কান পেতে আমি শুনি কাসিদা নতুন
সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তার মাঝে পাই পূর্ণ ব্যাপ্তির আশ্বাস ঃ
সব দুর্দিনের দিন দুর্কাল কাটুক তখন।

যদি দৃষ্টিকণা মোর নড়িয়াছে সমস্ত আকাশ
নিঃশ্বাস শিরায় শুনি উজ্জীবিত রক্তের স্পন্দন
বধীর দিগন্তে জাগে জীবনের একাগ্র বিশ্বাস।[১৬১]

ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় একটি ধারা ফররুখ আহমদের জীবনে পূর্বাপর লক্ষ্য করা যায়। যে-বিশেষ আদর্শ প্রচারের জন্য কবিতা রচনা করেছিলেন সে-আদর্শ প্রচারের খাতিরেই তিনি ব্যঙ্গ কবিতার আশ্রয় নেন। ব্যঙ্গের শাণিত চাবুক দিয়ে তিনি নির্বিচারে স্ব-সমাজের লোকদের দুর্নীতি ভণ্ডামী ও আত্মস্বার্থপরতাকে আঘাত করেছেন, বামপন্থী আদর্শানুসারীদের ও মুসলিম লীগ রাজনীতির বিরোধী নেতাদের আক্রমণ করেছেন। এটা অবশ্য প্রাক-পাকিস্তান যুগের রচনার কথা। এ-ধরনের কবিতা লেখার পটভূমি সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, অনেক সময় যেমন বিশেষ জীবকে তাড়াবার জন্য বাঁশের ব্যবহার অনিবার্য হয়ে ওঠে, তেমনি সাহিত্যিককেও অনেক সময় বাঁশী ছেড়ে বাঁশ হাতে নিতে হয়।[১৬২] অবশ্য এ-মনোভাব প্রাধান্য পাওয়ায় কাব্যরসে যে ঘাটতি পড়েছে সে-কথা বলাইবাহুল্য।[১৬৩] 'অনুস্বার' শীর্ষক কবিতাগুচ্ছে 'উর্দু বনাম বাংলা' শীর্ষক একটি কৌতূহলোদ্দীপক কবিতার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। বাঙালী মুসলিম সমাজের এক শ্রেণীর লোক যে সামান্য শিক্ষালাভী হলেই উর্দু জবান এস্তেমাল করে আভিজাত্য ফলার হাস্যকর প্রয়াস চালায় সে-বিষয় উপলক্ষ করেই কবিতাটি রচিত ঃ

দুইশো পঁচিশ মুদ্রা যে অবধি হয়েছে বেতন
বাংলাকে তালাক দিয়া উর্দুকেই করিয়াছি নিকা,

---

১৬১। পাকিস্তানের কবি /আল্লামা ইকবাল/, ঐ, পৃঃ ১৩
১৬২। ভূমিকা, অনুস্বার, মাসিক মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২, পৃঃ ২৯৩
১৬৩। আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মুসলিম বাংলায় কাব্যসাধনা, দৃষ্টিকোণ, ১ম সং, ঢাকা ১৯৬৬, পৃঃ ৬৮

Dhaka University Institutional Repository



বাগানে শ্রমের ফলে উঠেছে আশার চামচিকা
উর্দু নীল আভিজাত্যে /আনে তা নিকট বন্ধুগণ/ ।
আতরাফ রক্তের গন্ধে দেখি আজ কে করে বমন ;
খাঁটি শরাফতি নিতে ধরিয়াছি যে অজানা বুলি
তার দাপে চমকাবে এক সাথে বেয়ারা ও কুলি
সঠিক পশ্চিমী খাঁচে যে মুহূর্তে করিব অর্জন ।
... ... ...
পূর্বোক্ত তালাক সূত্রে শরাফতি করিব অর্জন
নবাবী রক্তের ঝাঁঝ আশা করি পাবে পুত্রগণ ।।[১৬৪]

পাকিস্তানোত্তর কালে 'হায়াত দারাজ খান পাকিস্তানী' ছদ্মনামে তিনি পুনরায় ব্যঙ্গ কবিতার আসরে অবতীর্ণ হন । এই নামে লিখিত কবিতাগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে 'ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য',[১৬৫] তসবীর নামা[১৬৬] এবং ১৩৬০ সালের মাসিক মোহাম্মদীর বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত 'টুকরো নছিহত', 'কথা ও কবিতা' এবং 'কয়েকটি কবিতা' শীর্ষক কবিতাগুচ্ছ । প্রথম কবিতাটি প্রায় হাজার লাইনের দীর্ঘ কিন্তু শেষোক্ত কবিতাগুলি আকারে দুই থেকে দশ লাইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ । এই কবিতাগুলিতে আক্রমণ করা হয়েছে স্বদেশের লোকদের ভণ্ডামী, দুর্নীতি, চারিত্রিক দুর্বলতা ও আদর্শহীনতাকে । এগুলি রচনার কারণ হিসাবে তিনি সাহিত্যে ও জীবনে পাকিস্তানী আদর্শ বজায় রাখা এবং নিজ কওমের ইজ্জত রক্ষার চেষ্টায় কথা উল্লেখ করেছেন :

নিতান্ত বিস্বাদ, তিক্ত
এবং বিরক্তিকর
ব্যঙ্গ কবিতার রূপে টুকরো নছীহত
/কেননা দারাজ খান গোঁড়া পাকিস্তানী
আর
সর্বাগ্রে খোঁজে সে তার কওমী ইজ্জত/ ।।[১৬৭]

ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য-টি মীর জাফরের জবানীতে লেখা । দারাজ খান একদিন অফিসের প্রাসাদে গভীর ধ্যানমগ্ন ছিলেন;এমন সময় মীর জাফর সশরীরে তাঁর সম্মুখে

---

১৬৪। উর্দু ও বাংলা, অনুসার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৯৫
১৬৫। সাপ্তাহিক 'আজ', ১৪ই আগস্ট, ১৯৫৭
১৬৬। মাসিক পূবালী, শ্রাবণ ১৩৭০
১৬৭। উপসংহার, টুকরো নছীহত, মাসিক মোহাম্মদী, আষাঢ় ১৩৬০, পৃঃ ৬৯৬

Dhaka University Institutional Repository


আবির্ভূত হয়ে স্বীয় কর্মের ব্যাখ্যা দেয় এবং পাকিস্তানী জাতির ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে। প্রথম অংশটি 'মীর জাফরের কৈফিয়ত' এবং শেষাংশটি 'মীর জাফরের স্বীকারোক্তি' শীর্ষে রচিত হয়েছে। স্বীয় কর্মের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সে জানায় যে, জাতির দুর্দিনের ও পরাধীনতার জন্য তাকে সার্বিকভাবে দায়ী করা ঠিক হবেনা কেননা সমগ্র জাতির মধ্যেই পতনের কারণগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এবং বর্তমানে পাকিস্তানের জাতীয় জীবনেও সে কারণগুলি নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়ে উঠেছে। কাব্যের শেষাংশে তার সমস্ত বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ হয়েছে নিম্নরূপ ঃ

আজাদীর সোজা অর্থ বুঝেছিল উলটোভাবে যারা,
আজাদীর অর্থে যারা বুঝেছিল কর্মহীন ধারা,
স্বার্থ-সন্ধানেই যারা আজাদীকে চিনেছিল, আর
জেনেছিল স্বাধীনতা তামাসা আর ফূর্তির ব্যাপার
রাত্রি দিন নৃত্যগীত, সুরাচুর শরাব, কাবাব
আলস্য অপরিমাণ, সাকী, গজল, দোসর,
বিজাতীয় ঐতিহ্যের আনুগত্য, নৈতিক স্খলন,
গুপ্ত পাপ, ষড়যন্ত্র, শোষণ অথবা নির্যাতন
যথাযোগ্য প্রতিফল পেয়ে গেছে তারা যথাকালে।
খ্যাতি, সাফল্যের দেওয়া [illegible] জোটেনি কপালে।
মিটেছে পিপাসা, আশ, মিটে গেছে ফূর্তির হেতের
মানুষের ইতিহাসে মূল্য যার হয়নি দেবের।

'' তোমাদের পালা ফিরে এতদিনে এসেছে এবার,
আশা করি পারো যদি স্বার্থ কিংবা উদর-সেবার।
হীন প্রবৃত্তির পথে দুষ্কর্মে যা নিক্ষিপ্ত জীবনে
অর্জন করেছো যেটা বিসর্জিত হবে তা মরণে।
কর্মকুন্ঠ ভিক্ষোপজীবী, স্বার্থান্বেষী মজলিসী মেজাজ
চায়নি কখনো কেউ পৃথিবীতে, চায়না তা আজ।

'' একথাটা মনে রেখো — তোমাদের আগে বহুবার
বহু সুকৌশলী ধূর্ত করে গেছে ধোঁকার কারবার,
যদিচ শিখরে গর্বে পৌঁছে গেছে সে লাভের গুড়
পড়েছে জাতির বুকে কিম্বা পৃষ্ঠে প্রচণ্ড লগুড়।
দুর্নীতি, জুলুম, পাপ, বিলাস অথবা ব্যভিচার
দুদিন আগে বা পরে গেছে খুলে ধ্বংসের দুয়ার।[১৬৮]

---

১৬৮। সাপ্তাহিক আজ, ১৪ই আগস্ট ১৯৫৭, পৃঃ ৪৩

Dhaka University Institutional Repository


ফররুখ আহমদ বিভিন্ন সময়ে প্রচুর সনেট রচনা করেছেন । এগুলির মধ্যে একষট্টি 'মুহূর্তের কবিতা'য়[১৬৯] সংকলিত হয়েছে । এই কাব্যের নামকরণের মধ্যে রুমী জুনায়েদের 'কণিকা'র প্রভাব থাকতে পারে । এই সনেট-সংকলনের মাধ্যমে 'পাক-বাংলা' সাহিত্যের ঐতিহ্যের উৎস ও সূত্র নির্মাণের কবির প্রয়াস লক্ষ করা যায় । 'মুহূর্তের কবিতা পাঠে স্বাভাবিকভাবেই যে অনুভূতিটি আমাদের স্পর্শ করে তা হল এই, আদর্শানুগত্য এবং ঐতিহ্যমগ্ন হয়ে থেকে ফররুখ আহমদ যে কবিমানসটিকে গড়ে তুলেছেন মুহূর্তের রচনাও তা চরিত্রভ্রষ্ট হয়নি । ... ঐতিহ্যচেতনের যে বিকাশ ফররুখ আহমদের সাত সাগরের মাঝিতে লক্ষণীয়, মুহূর্তের কবিতায় তা ব্যাপকতায় সমৃদ্ধমান'।[১৭০] ফেরদৌসী, জামী, রুমী, সাদী, হাফিজ, শাহ ওলীউল্লাহ প্রভৃতি কবি-প্রশস্তিমূলক সনেটের মাধ্যমে তিনি 'পাক-বাংলা' সাহিত্যের উৎস নির্দেশ করেছেন এবং বাংলা ভাষার প্রীতি, মাতৃভাষার বুলি, গাথা ও গান, দাউদখানা মদিনা, শাহ ওলীউল্লাহর অসমাপ্ত পুঁথি প্রসঙ্গে, পুঁথির আসর, পুঁথি-পড়া : মুহাররম মাসে /১, ২/, শহীদে কারবালা, তাজকেরাতুল আউলিয়া, কাসাসুল আম্বিয়া, শাহনামা, আলিফ লায়লা, চাহার দরবেশ, হাতেম তায়ী প্রভৃতির মাধ্যমে ঐতিহ্যের প্রবাহটি নির্মাণের প্রয়াসী হয়েছেন ।

মুহূর্তের কবিতা প্রকাশকালে কবির ঐতিহ্য-সাধনায় অবসাদ দেখা দিয়েছিল বলে মনে হয় । এই কাব্যটি তিনি উৎসর্গ করেছেন 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির প্রত্যেক কর্মী ও সমর্থকদের'। এই গ্রন্থে তিনি যে সনেটটি রচনা করেছেন সেখানে কবির দ্বিধা, ক্লান্তি, সংশয় ও অন্ধকার-ভীতির কথা আছে :

> এখন মনের স্রোতে জেগে ওঠে ক্লান্তি ও সংশয়,
> দূরান্তে নহর দেখে আর প্রাণ খোঁজেনা আশ্বাস,
> ঘূর্ণী হাওয়া বয়ে আনে সেদিনের সুরভি সুবাস,
> প্রতি পদক্ষেপে তবু জেগে ওঠে আঁধারের ভয় ।[১৭১]

কয়েকটি সনেটেও কবির এই মনোভাব লক্ষ্য করা যায় :

> আমার হৃদয় মুগ্ধ, বোবা হয়ে আছে বেদনায়,
> যেমন পদ্মের কুঁড়ি নিমজ্জ থাকে হিমরাতে,
> যেমন নিঃসঙ্গ পাখী একা আর ফেরেনা শাখাতে,
> তেমনি আমার মন বুঝি আর খোঁজেনা কাহায় ।[১৭২]

'হাতেম তায়ী' দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে কাব্যাকারে বের হয় ১৯৬৬ সালের মে মাসে ।[১৭৩] সে-বছরই তিনি এর জন্য আদমজী

---

১৬৯। মুহূর্তের কবিতা, ১ম সং, সেপ্টেম্বর ১৯৬৩, ঢাকা ।
১৭০। মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ, মুহূর্তের কবিতা — একটি স্মরণীয় গ্রন্থ, পূবালী, কার্তিক ১৩৭০, পৃঃ ১৯৩ ।
১৭১। উৎসর্গ পত্র ।
১৭২। ক্লান্তি, পৃঃ ১১ ।
১৭৩। বাংলা একাডেমী, ঢাকা ।

Dhaka University Institutional Repository



পুরস্কার লাভ করেন এবং বিভিন্ন সাহিত্যসভা দ্বারা প্রশংসিত হন । উচ্ছ্বাসপ্রবণ হয়ে কোনো-কোনো সমালোচক একে [illegible] মহাকাব্য বলতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন[১৭৪] কিন্তু যাঁদের উৎসাহ এত প্রবল ছিল না তাঁরা এতে মহাকাব্যের রূপ-রস বিশেষ খুঁজে পাননি।[১৭৫] যে-জীবনাদর্শের কথা তিনি তাঁর বিভিন্ন কাব্যে ও রচনায় স্পষ্ট ও অস্পষ্টভাবে বলে আসছিলেন, হাতেম তায়ীর চরিত্র-সৃষ্টির মাধ্যমে তা এক সামগ্রিক রূপ লাভ করেছে । এই কাব্যের কাহিনী তিনি গ্রহণ করেছেন দোভাষী পুঁথি থেকে কিন্তু নিজের মনোগত প্রয়োজনে তাতে অনেক পরিবর্তন সাধন করেছেন । এটি তিনি উৎসর্গ করেছেন 'বহু যুগের সাধনায় যাঁরা আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডার ঐতিহ্যবাহী দোভাষী ভাষার পুঁথিতে সমৃদ্ধ করেছেন' সেই প্রাচীন পুঁথি রচয়িতাদের ।[১৭৬] এই কাব্যে গল্পরসের প্রচুর উপাদান থাকলেও এর প্রধান আকর্ষণ হাতেম তায়ীর চরিত্র । কাহিনী বিশেষ জটিল নয় । খোরাসান দেশের সওদাগর-জাদী হুসনাবানু প্রতিজ্ঞা নেয়, তার সাতটি প্রশ্নের জবাব যে এনে দিতে পারবে তাঁকেই সে জীবনসঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করবে । সওদাগরজাদীর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে অনেক দেশের অনেক বাদশাজাদা ও সওদাগরজাদা প্রশ্নের উত্তর আনতে চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে যার যার দেশে প্রত্যাবর্তন করে । শেষ পর্যন্ত ঠেকে যায় প্রমত্ত আশেক [illegible] শাহজাদা মুনীর শামী । সে-সময় রাজ্যপাট ত্যাগ করে ইয়েমেনের শাহজাদা হাতেম তায়ী ও মুসাফিরের জীবন গ্রহণ করেছিলেন । তিনি মুনীর শামীর সাহায্যার্থে নিজে সাত প্রশ্নের জবাব এনে দেন এবং মুনীর শামী ও হুসনাবানুর মিলন ঘটিয়ে পুনরায় পথে বেরিয়ে পড়েন ।

বলেছি, এই কাব্যের প্রধান আকর্ষণ হাতেম তায়ীর চরিত্র । তাঁকে কবি সৃষ্টি করেছেন অনন্ত যাত্রী হিসেবে ।[১৭৭] রাজ্যপাট, ঐশ্বর্য ও ভোগবিলাস ত্যাগ করে তিনি পথে বেরিয়ে-ছেন মানুষের সেবার জন্য ও সৃষ্টির বিপুল রহস্য অবগত হয়ে মুক্ত প্রজ্ঞার অধিকারী হতে :

যাব আমি এই ভাবে দূর হতে দূরে, দূরান্তরে
সম্পূর্ণ অচেনা পথে, অজানা সৃষ্টির মাঝখানে

---

১৭৪। আবুল কালাম শামসুদ্দিন, ফররুখ আহমদের মহাকাব্য : হাতেম তায়ী, মাসিক পূবালী, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, পৃঃ ৫৩১ – ৩২ ।

১৭৫। ক. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, কবি ফররুখ আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৫ – ৪৬ ।

খ. 'হাতেম তায়ী মহাকাব্য কোন অর্থেই নয় ।' — জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, ফররুখ আহমদের কবিতা : আলোচনার সূত্র, মননের সীমানা, ১ম সং, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬, পৃঃ ১৩২ ।

১৭৬। উৎসর্গ পত্র, হাতেম তায়ী ।

১৭৭। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, চলে গেছেন অপরাজেয়, আরণ্যক দৃশ্যাবলী, ১ম সং, ডিসেম্বর ১৯৭৫, ঢাকা, পৃঃ ৭৭ ।

Dhaka University Institutional Repository



অপরিচয়ের বাধা দীর্ণ করে যাব আমি একা
সহি আদমের মুক্ত বিচ্ছিন্ন মিছিলে; দেশে দেশে
যাব আমি মানুষের অক্ষুণ্ন আত্মীয়তা নিয়ে
অগণন আত্মার দাবীতে। পার হয়ে এই পথে
পূর্ণ মনুষ্যত্ব, জ্ঞান, — জীবনের অভীপ্সা আমার
দুর্লক্ষ্যে নাই ভয়, চাই শুধু মদদ খোদার ।। ১৭৮

হুসনবানুর প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে হাতেম তায়ী অচিন্তিত-পূর্ব পরিস্থিতি এবং ঘটনার সম্মুখীন হয়। এভাবে তাঁর অভিজ্ঞতার পরিসর বৃদ্ধি পায় এবং নব-নব জ্ঞানে জীবন সমৃদ্ধতর হয়ে ওঠে :

পহেলা সওয়াল শুধু দিল এই আশ্চর্য ইঙ্গিত
বিশ্বাস, মৃত্যুর তীরে অনির্বাণ যে ভোগ পিপাসা
পরিতৃপ্ত হয়না সে জীবনে কখনো; অশান্তির পঙ্ক
কুণ্ডে যতক্ষণ না মনে বাঁধাবে। সওয়ালের
দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখি পূর্ণ মনস্কাম সেই জন
— সঞ্চয় বিলালো তার যে আত্মার সৃষ্টির খিদমতে।
তিসরা সওয়ালের পথে বিবস্ত্রের অন্ধ আত্মা এক
জানালো লোভের ফল — দৃষ্টিহারা সার্থক জীবন।
চোথা সওয়ালের পথে দেখি মূল্য সাচ্চা জবানের
জেনেছি সত্যের পথ — অবিশ্রান্ত সাধনার পথ।
পঞ্চম প্রশ্নের পথে দেখি আমি দুনিয়া জাহানে
চলেছে প্রাণের খেলা মরণের পটভূমিকায়;
জেনেছি অনিবার্য মৃত্যু সব সৃষ্টির জীবনে।
পেয়েছি মোতির জোড়া ষষ্ঠ সওয়ালে, মখলুকের
আশ্চর্য সুরত আর রূপান্তর দেখি আমি চেয়ে,
আত্মার স্বরূপ দেখি শান্তিময় দুই যুক্ত প্রাণে।
সত্যের ঐশ্বর্য পাই বাদগর্দ হাম্মামের মাঝে
সপ্তম সওয়ালে। ১৭৯

---

১৭৮। হাতেম তায়ী, পৃঃ ১৫ – ১৬ ।
১৭৯। ঐ, পৃঃ ৩২০ – ৩২১ ।

Dhaka University Institutional Repository

যুবতী নারী ও হুসনাবানুর মিলনের পরে হাতেম আল্লার দরবারে দুহাত তুলে প্রাণভরে খোদাপাক কর সমস্ত মানুষের মুক্তি দাও — যেন হিংসা বিদ্বেষ শোষণ বিভেদ অজ্ঞানতা ও অন্যায় মুক্ত হয়ে সর্বকালের ও অনাগত কালের সকল মানব সন্তান আল্লার নির্দেশিত পথে প্রেম প্রীতি জ্ঞান প্রজ্ঞা ন্যায়বিচার ও সাম্যের ভিত্তিতে পৃথিবীতে এক মহামানব সমাজ গড়ে তুলতে পারে :

লুপ্ত হবে বিপর্যস্ত মানুষের বিচ্ছিন্ন সমাজ
সকল বিভেদ মুছে করে যেন শান্তির আবাদ
সকল বিশ্বাসী প্রাণ — ঈমানে কামিল। আর যারা
পড়ে আছে দলিত ধূলায়, নির্যাতিত সেই সব
মজলুমান পায় যেন বাঁচার অকুণ্ঠ অধিকার,
সব মানুষের সাথে জীবনের পূর্ণতার পথে
চলে যেন সে মিছিল কেবলি সম্মুখে ।[৮০]

এখানে ফররুখ আহমদ তাঁর সুপ্রিয় হাতেম তায়ী'র যে চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, তিনি বীরত্বে, ত্যাগে, মানবপ্রেমে, সত্যসন্ধানে, ঔদার্যে ও মহিমায় এক দেবদুর্লভ মহামানব। মর্ত্যের মানুষেরা এই আদর্শ অনুসরণ করে অমর্ত গৌরব লাভ করুক, কবির হয়ত এই আশা ছিল।

তিন

ফররুখ আহমদের জীবনের ট্র্যাজিক উপসংহার আমাদের মনে এখনো এত জ্বলজ্বলে যে, তাঁর কবিতার মূল্যায়ন এর দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য। তিনি যে যথার্থ কবি-শক্তির অধিকারী ছিলেন, সে-বিষয়ে সবাই একমত। সঙ্গে-সঙ্গে এ-ও স্বীকার্য, তাঁর প্রথম কাব্যই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি। এর পরে তিনি অক্লান্তভাবে কবিতা লিখে গেলেও সাত সাগরের মাঝি-র সাফল্য তিনি আর অর্জন করতে পারেননি। কাব্যরসিকদের কাছে এটা নিশ্চিতভাবে শোকাবহ সংবাদ কিন্তু তা-থেকে এই সত্য প্রকাশিত হয় যে, সমকালীন সমাজকে অবলম্বন না-করে কিংবা চলমান জীবনের স্বপ্ন ও বেদনাকে স্পর্শ না-করে সাহিত্য-রচনা করলে তাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

---

৮০। হাতেম তায়ী, পৃঃ ৩২৭ ।

Dhaka University Institutional Repository



## তালিম হোসেন

১৯১৮ সালে রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমায় তালিম হোসেনের জন্ম হয়। তিনি নওগাঁ কে,ডি, হাইস্কুল, রাজশাহী কলেজ, কুষ্টিয়া কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং ১৯৪৬ সালে বি-এ পাশ করে ছাত্রজীবনে ইতি টানেন। এ-সময় কবি হিসাবে তাঁর কিছু খ্যাতি হয়েছিল এবং সে-সুবাদে মাসিক মোহাম্মদীতে সম্পাদক হিসাবে চাকুরি লাভ করেন। দেশ বিভাগের পর অনেকদিন কর্মহীন থাকার পর ১৯৫১ সালে তিনি মাসিক 'মাহে নও' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক পদে যোগ দেন এবং ১৯৬৪ সালে সম্পাদক পদে উন্নীত হয়ে স্বাধীনতা-যুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত সে-পদে বহাল থাকেন।

বিভিন্ন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। তিনি বাংলা একাডেমীর প্রথম কাউন্সিলের ও লেখক সংঘের আঞ্চলিক শাখার প্রথম কার্যকরী সংসদের সদস্য ছিলেন। ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান মজলিস ও ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত নজরুল একাডেমীর তিনি সম্পাদক ছিলেন।

তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য ছিল সাহিত্যরচনার অনুকূল। তাঁর পিতা জৈমউদ্দিন চৌধুরী বিশেষ শিক্ষিত না-হলেও নিজের চেষ্টায় প্রভূত জ্ঞানার্জন করেন। তাঁর পাঠাগারটি ছিল সকল প্রকার সাহিত্যগ্রন্থে ভর্তি। নিজেও তিনি সাহিত্যচর্চা করতেন এবং 'নকশা' /১ম সং ১৯৫২/ ও 'ভিখা দান' / ১ম সং ১৩৫৩/ নামক বলিষ্ঠ সমাজ-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির দুটি নকশা কাব্য তিনি রচনা করেছিলেন।[৮১]

তালিম হোসেনের কাব্য-সংখ্যা বেশি নয়। দীর্ঘদিন কবিতা-রচনা করলেও দিশারী /১৯৫৬/ ও শাহীন /১৯৬২/ নামক দুটি কাব্যই তাঁর প্রকাশিত হয়েছে। এগুলিতে পাকিস্তান ও ইসলামী আদর্শ বিষয়ক কবিতাগুলিই শুধু সংকলিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত শিশু ও কিশোরদের উপযোগী ছড়া ও গান তাঁর রয়েছে; আর রয়েছে দুটি অনুবাদ গ্রন্থ — সুর্যচারণ[৮২] ও দানবীর এন্ড্রু কার্নেগী[৮৩]।

---

৮১। কবির জীবনী ও কর্মজীবন সংক্রান্ত তথ্যগুলি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে গৃহীত হয়েছে।

৮২। ফ্রাংকলিন পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১ম সং ১৯৫৯।

৮৩। ঐ, ১ম সং ১৯৬২

Dhaka University Institutional Repository



দুই

তালিম হোসেন ইসলামী রেনেসাঁর কবি । পৃথিবীতে ইসলামের বিস্তার ও ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা কামনা করেছেন তিনি প্রাণপণে । একজন আদর্শবাদীর মত তিনিও প্রধানত জোর দিয়েছেন ইসলামের তৌহিদবাদ, অর্থনৈতিক সাম্য, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার ওপর । পাকিস্তানে এদেশের কায়েম হবে জেনে সে আন্দোলনের পক্ষে তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন । তাঁর প্রথম কাব্য 'দিশারী'তে[৮৪] প্রাক-পাকিস্তান ও পাকিস্তানোত্তর কালের এ ধরনের লেখার সমাহার ঘটেছে । ভূমিকায় তিনি সেকথা বলেছেন ঃ

> একালে ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলনের যে বিভিন্ন ধারা পাকিস্তানের অনুরূপ স্বপ্নে এসে সংহত রূপ পেয়েছিল, তার বাস্তব রূপায়ণের পথে প্রেরণা ও উদ্দীপনার সাথে এক অকুণ্ঠ আত্মানুসন্ধানের স্বাক্ষর বিধৃত রয়েছে এই লেখাগুলোতে ।

মুসলমানরা কোরান ও তৌহিদকে অবলম্বন করে দৃপ্ত ব্যক্তিত্বে এগিয়ে চলেছে শোষণ মুক্ত সুন্দর সমাজের দিকে একথা তিনি বলেছেন 'দিশা' কবিতায় ঃ

ত্রিলোকবীর আজাদী-অনল
            এনেছি আল-কোরান,
এনেছি দিশারী আল-আমীনের
            তওহিদী ফরমান —
...            ...            ...
বুকেতে দৃপ্ত অভিযান সেই
            মানব-প্রবরে
শোষণ-শাসন-পীড়ন-মুক্ত
            প্রশান্তি-পথ ধরে ।[৮৫]

কিন্তু পৃথিবীতে জালিমেরা বড় প্রবল । ধর্মের নাম নিয়ে তারা সমাজে যে অত্যাচার চালায় তা দেখে কবির ঈমানের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে । পৃথিবীতে যখন মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ

---

৮৪ । ১ম সং ১৯৫৬, ঢাকা

৮৫। দিশা, পৃঃ ২

Dhaka University Institutional Repository



করে তারা আজ মুনাফার বহু শোষণে ও বিলাস-ব্যসনের এন্তেজাম করে ।

ঈমান এনেছি-হে নবী, রাহমাতুল্লিল আলামীন ।
বিশ্বের তরে আশিস-রূপা বিলাইলে তব দীন ।
তবু, আজিকে সেই ঈমানের ভিত্তি যে টলমল,
সবার বক্ষে জেগেছে অবিশ্বাসের জগদ্দল ।
পেটে পেটে আজ জ্বলেছে অনল, ঘরে ঘরে হাহাকার,
চোখে চোখে জ্বলে প্রলয় বহ্নি জাহান্নামের দ্বার ।
তুমি দেখিছ কি — তোমার উপর শাসন দণ্ড ধরে
কোন ইস্‌হাক করিতেছে আজ তব উম্মত পরে ;
চেয়ে দেখ আজ — দৌলত যত তোমার আনুসার
দস্যুর মতো লুটিতেছে ধন, ভরিতেছে তার ঘর ।
মরিছে অভাগা উম্মত তব সহস্রে লাখে লাখে,
পুঁজিপতি তার হারামের জমা গণিয়া গণিয়া রাখে ।
তোমার নায়েব, আল্লার ছায়া, হুকুমত বরদার
সেই দস্যুর সুজন, তারাই মোদের কাঁধার ।[৮৬]

কবি আশা করছেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে এসব দূর হয়ে যাবে । ফেরাউন, কারুন, শাদ্দাদ-দের বদলে খালেদ, মুসা, উমর, আবুবকর-রা স্থান করে নেবে, জুলুম পীড়ন দুর্নীতির বদলে সাম্য মৈত্রী ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে । পাকিস্তান হবে চির ঈদের ময়দান । বিভিন্ন কবিতায় এই একই বক্তব্য ঘুরে-ফিরে এসেছে ঃ

ক. জামানার অভিশাপ
পরাধীনতার পাপ
পাকিস্তানের হাম্মামে ধুয়ে হয়ে যাবে পাক সাফ ।
কাফেলা চলেছে বরাবর সেই পাকিস্তান —
ইসলাম যার অমলিন, বুকে যার পাক কোরান ।
আপনা আওতান সেই দেশে আজি ফিরে চল মুসলিম —
পতাকা যাহার বিশ্বে পাঠালো আলোকের তাজিম ।
আসিবে সেথায় আবার সে হজরত উমর,
সেই শেরে খোদা, সাইফুল্লাহ, সে হায়দর,

---

৮৬। ঈদের কবিতা, পৃঃ ৬

Dhaka University Institutional Repository



আসিবে আবার নয়া জামানার সালাহ্‌দীন
শাহ্‌জাহাঁ যার আলমগীরের এই সে ঘর।
হেথা ইসলামী সুলতানাৎ
ফিরাবে আবার দীনের তখ্‌ত,
ফিরাবে আবার দুনিয়ার বুকে
মুসলমানের মুলুক বখ্‌ত।
নয়া চাঁদের আলো দুয়ারে আসমানে ছোঁয় লাখ মিনার
পাকিস্তানের মিনার হবে ঈদগাহ মুসলিম বিহার। ৬৭

খ.
এবার হেথায় জালিমের দিন শেষ
এবার হেথায় মানুষের ইনসাফ,
এ পাক ওয়াতান চির-মানুষের দেশ,
এখানে তাহার তকদীর আফতাব। ৬৮

হজরত মোহাম্মদকে তিনি মানবজগতের দিশারী বলেছেন। তাঁর প্রদর্শিত পথেই মানবতার প্রকৃত মুক্তি ও কল্যাণ আসতে পারে বলে কবির দৃঢ় বিশ্বাস। জ্ঞান-প্রেম-বিত্তের সমন্বয়ে যে-শান্তির জীবন ও সমাজ সৃষ্টি করা যায় তা তিনি কামনা করেছেন তাঁর কাছে:

তাই বেঁচে যেতে চাই,
যেমন করিয়া আবার বাঁচিতে চাই —
অনু জ্ঞান অনু প্রেম লয়ে,
সকল বিত্তে মহা ধনাঢ্য হয়ে,
যেমন করিয়া প্রাণে প্রাণে তুমি বেঁচে আছো প্রিয়,
জীবনে-মরণে মানব-স্মরণে হয়ে আছো বরণীয়। ৬৯

তাঁর দ্বিতীয় কাব্য শাহীন-এ[৭০] একই ভাবের অনুসরণ চলেছে। তবে প্রথম কাব্য থেকে এখানে ভাবের সূক্ষ্ম পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ইকবালের খুদী তত্ত্বের যে-ধারণা দিশারী-তে অস্ফুট

---

৬৭। পাকিস্তান, পৃঃ ৩৫ – ৩৬
৬৮। পাক ওয়াতান, পৃঃ ৪৫
৬৯। দিশারী, পৃঃ ৬০
৭০। ১ম সং, ১৯৬২, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository



ছিল তা এখানে সুপরিস্ফুট হয়েছে। শাহীন, একটি পাখী — যাকে তিনি চিত্রিত করেছেন অতীব সাহসী ও উর্দ্ধগামী আকাঙ্ক্ষার। পূর্ণ মুক্ত আকাশই তার মুখ্য উদ্দেশ্য। বর্তমানের এই যুগ, যেখানে 'যন্ত্রযুগ-পৃথিবীতে সভ্য-অসভ্যতা জেগেছে, তবে তা স্বার্থকেন্দ্রিক হলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ এর দ্বারা সম্ভব হবেনা :

সমুদ্র বিক্ষোভ হলো শাহীনের এই যাদুচক্রে
মৃগতৃষ্ণিকার চক্রে কণ্ঠে জাগে তৃষ্ণা অতুলন।
যেন নাই তৃপ্তি নাই চাহি নাই সে দিনের শান্তি —
নিষ্ফল যৌবনাবেগ বিলাস এ নির্বাক যাপন;
যুক্তির সহিত তবে তুলে দিতু দীন আমরণ
সভ্য অতৃপ্তার যাতে আকৃতি অনু-অনুক্ষণ।[১১]

আত্মার বিকাশ সাধন করার ও মুসলমানদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বের মধ্যে ও পৃথিবীর মধ্যে শান্তি আনয়ন করা। হিংসাদ্বেষ ও দুর্নীতিযুক্ত পৃথিবীর মানুষ ও শান্তি অভ্যন্তরে অভাব হয়েছে। তাই উদ্ভব হয়েছে বিভিন্ন মত ও পথের। কিন্তু 'সবুকে সার্বভৌম ভেবে যাত্রা শুরু হয়েছে' বলে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্যবাদ, ডারউইন, ফ্রয়েড, মার্কস ব্যর্থ হয়েছে। কবি বলেছেন ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে হবে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি আনতে হলে সবাইকে ফিরতে হবে ইসলামের দিকে :

শান্তির আসান হলো বিশ্বেরি মধ্যে,
তারি দূর-অন্তের সওগাত পৌঁছে দাও বিশ্বের কাছে —
সে আমাদের গতি দিবে দাও মুহম্মদের কাছে —
নাম যার — আল আমীন,
চারিত্র্য যাঁর — ইসলাম,
মহনাম যাঁর, 'সাদাকত'
শান্তি।[১২]

'নিশান' কাব্যে তালিম হোসেন কিছু বাস কবিতা রচনা করেছিলেন যা কালাকালে মুদ্রিত হয়নি। প্রচলিত রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুর্নীতি স্বজনপ্রীতি দুর্নীতি প্রভৃতি নিয়েই তিনি

---

১১। দুই বাণ, পৃ ১

১২। শান্তির কথা পৃ ৭২

Dhaka University Institutional Repository



অবলম্বন করেছিলেন। দেশবিভাগের বৎসর পূর্তি সম্বন্ধে প্রকাশিত দুটি কবিতার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন উচ্চপদে — রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, এম-এল-এ প্রভৃতি — লোক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞাপনের ভাষা হচ্ছে :

এস মজলিসী বক্তিবাজ যার
দাপাদাপি হোচেচার
গণকল্যাণ — ভাসিকা কাঁদিয়া
কর কিছু তোড় জোড়।
মহান একটা আদর্শ রাখ
জনগণ সম্মুখে
মহাদুঃখেও স্বর্গীয় হাসি
ফুটুক তাদের মুখে।[১১৩]

কবিতার শেষে আদেশ করে কবি বলেছেন :

যেমন করেই দেশের সেবায়
কিরিস্তি করি নাকো
সব ঠাঁই দেখি দলবল নিয়ে
তুমি পুরোভাগে থাকো।
অতএব এই পুণ্য দেশের
পরকাল জনগণে
কতকাল যার কাটিল আসন
দাঁত হল নড়নড়ে।

দ্বিতীয় কবিতাটি 'পঞ্চমবাহিনী'; প্রকাশের তারিখ শ্রাবণ ৩০, ১৩৫৫। এতে কবি বলছেন, পাকিস্তান ও ভারত দুই দেশেই যথাক্রমে ইসলামী হুকুমত ও রাম রাজত্বের দোহাই

---

১১৩। কর্ণধারি, সাপ্তাহিক নওজোয়ান, শ্রাবণ ২২, ১৩৫৫

Dhaka University Institutional Repository



দিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রতারণা করা হচ্ছে । তাই পঞ্চমবাহিনীর লোকেরা সত্যের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তৈরী হচ্ছে ।

তোমরা মিথ্যুক, নিষ্ঠুর মতলববাজ
তোমরা মুখচোরা ধর্মের ভেলকীবাজ,
তোমাদের 'ইসলামী হুকুমত' আর
'রাম রাজত্বে' ভাওতায় আমরা বিশ্বাস
করেছিলাম,
আর তাই নিরস্ত্র হয়ে
তোমাদের দেওয়া পতাকা বহন করেছিলাম
সারি দিয়েছিলাম তোমাদের শিবিরে ।[১২৪]

মোটামুটিভাবে দেশবিভাগের কয়েক বছর পর থেকে তালিম হোসেন প্রকৃতপক্ষে কাব্যচর্চায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন । যে আদর্শের জন্য তিনি সংগ্রাম করেছিলেন, অবচেতন মনে এর অসারতা সম্পর্কে স্বত তাঁর ধারণা জন্মেছিল । তাই দীর্ঘদিন নিশ্চুপ থাকার পর বন্ধুবান্ধবদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য 'জবাবদিহি' নামক এক কবিতায় নিজের মনোভাব তিনি ব্যাখ্যা করেন । তিনি বলেন, রোমান্টিক প্রেমের বা শ্রেণীসংগ্রামের কোনো কবিতা রচনাই তাঁর পক্ষে সম্ভব না, সেজন্যে তিনি সবার কাছ থেকে দূরে থাকতে চান ঃ

মাথায় দিয়ে হলোনা সব ধরা –
বেতাল পায়ে সবার সাথে
নাচের ঘুঙুর পরা ।
তাই যদি আজ বেসুরো গাই
চলি বেতাল পায়ে –
দূরেই রবো, তোমরা বেদার
সব সোহাগের হাওয়া লাগাও গায়ে ।[১২৫]

তিন

দিশারী-র চেয়ে শাহীন-এর কাব্যমূল্য নিম্নতর । প্রথম কাব্যে ঐকান্তিক আবেগ ও রোমান্টিক কল্পনার সমন্বয়ে স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার যে মায়াময় জগত তিনি নির্মাণ করতে পেরেছিলেন, দ্বিতীয় কাব্যে তত্ত্বকথা ও আদর্শবাদের চড়া সুর লাগায় তা অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে । অবশ্য তিনি এখানে অর্জন করেছেন আঙ্গিকের নৈপুণ্য । শাহীন-এর সনেটগুলি ভাবের সংহতি ও আঙ্গিকের দৃঢ় বুননীর জন্য প্রশংসা পেতে পারে, কিন্তু কবির দৃষ্টিভঙ্গি এখানে কবিজনোচিত হয়নি ঃ

> শাহীন-এর অধিকাংশ কবিতা কোন ব্যক্তি, নবী বা আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত । নিবেদিত, কিন্তু কবিতা নয় । এতে তালিম হোসেনের বিশ্বাসী অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, আর এ গুণাবলী কোন কবির নয়, বরং ধার্মিকের, মোমিনের ।[১২৬]

---

১২৪। পঞ্চম বাহিনী, ঐ, শ্রাবণ ৩০, ১৩৫৫ । ১২৫।

১২৬। আল মাহমুদ, শাহীন /পুস্তক সমালোচনা/, সমকাল, আশ্বিন ১৩৬৯, পৃঃ ১২৬

১২৫। তালিম হোসেনের [illegible]

Dhaka University Institutional Repository



## মুফাখ্‌খারুল ইসলাম

১৯২১ সালের ৩০-এ এপ্রিল টাঙ্গাইল জেলায় পিতৃগ্রাম নূরপাড়ার সন্নিহিত মাতুলালয় কুমুল্লিপাড়া গ্রামে মুফাখ্‌খারুল ইসলামের জন্ম হয়। তাঁর পিতা মৌলভী ময়েজউদ্দিন আয়ুসি গ্রামের অভিজাতদের ব্যক্তি ছিলেন। কবির এক পূর্বপুরুষ ফকির বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং নিজের পুত্রের নাম রাখেন ফকির মাহমুদ। ফকির মাহমুদ নিজের জন্মভূমি ত্যাগ করে নূরপাড়া গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

মুফাখখারুল ইসলাম টাঙ্গাইলের বিন্দুবাসিনী হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে সাদত কলেজে লেখাপড়া করেন। ১৯৪৯-৫০ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে এম-এ ডিগ্রী লাভ করে অধ্যাপনায় যোগ দেন এবং বিভিন্ন সময়ে পাবনা এডোয়ার্ড কলেজ, রংপুর কারমাইকেল কলেজ, ঢাকা কলেজ, খুলনা বি-এল কলেজে অধ্যাপক হিসাবে কাজ করে ১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাসে ঢাকার জিন্নাহ কলেজে (বর্তমান তীতুমীর কলেজ) যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি সেখানে বাংলা সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত আছেন।

কবির পিতা সাহিত্যানুরাগী ছিলেন এবং বিষাদসিন্ধু ও আনোয়ারা-উপন্যাস পাঠের জন্য তাঁকে গ্রামে গ্রামে নিমন্ত্রণ করা হত। দীওয়ানে হাফিজের ভাব অবলম্বনে রচিত সদ্ভাব শতক (কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, ১৮৬৮) তাঁর প্রিয় পাঠ্যপুস্তক ছিল। বাল্যকালে শিশু-কবিকে তিনি এর থেকে কবিতা শুনিয়েছেন। এভাবে তাঁর মনে সাহিত্যপ্রীতি জাগ্রত হয় এবং পরবর্তীকালে এক চাচা (প্রিন্সিপাল ইবরাহিম খাঁর ভাগ্নে) ও প্রিন্সিপাল ইবরাহিম খাঁর সাহচর্যে এসে তা বর্ধিত হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য ছিল ছাত্রজীবনে তাঁর প্রিয় পাঠ্য বিষয়।[১৭]

কবি নিজে একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান এবং এক বিশেষ সাধন-পথের পথিক। তাঁর পুরা নাম হচ্ছে শাহ মুফাখখারুল ইসলাম আয়ুসি এবং চর্মচক্ষে কিভাবে আল্লার দিদার লাভ করা সম্ভব সে-সম্পর্কে তিনি একটি পুস্তিকাও রচনা করেছেন।[১৮] তাঁর একমাত্র কাব্য 'হে পাক জমিন' তিনি উৎসর্গ করেছেন 'পুণ্য-নগরীর একমাত্র তোরণ, জগৎ-প্রসিদ্ধ আসহাবে সুফফার অধিবেত্তা

---

১৭। কবি-সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে।

১৮। আল্লাহকে দেখা যায় (দীদার-ই-ইলাহী), (ঢাকা: একতার প্রকাশনী, মার্চ ১৯৭৪)

Dhaka University Institutional Repository



মুজাহিদের পূর্ণতম ও একতম আদর্শ, সুলতানুল আউলিয়া হায়দরে-কাররার, শিশু কবি-শ্রেষ্ঠ হজরত আলী মর্তুজা' এবং 'তারি আদর্শে উদ্বুদ্ধ' কবির 'ধ্যানলোকের 'পাক জমির' পাকিস্তান কওমী সিপাহী' দিগকে।[১৯৯]

দুই

মফাখখারুল ইসলামের প্রকাশিত সমস্ত কবিতা কাব্যাকারে গ্রথিত হয়নি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, বিশেষত মাসিক মোহাম্মদীর বিভিন্ন সংখ্যায় তা ছড়িয়ে আছে। এ-সমস্ত কবিতা এবং প্রকাশিত একমাত্র কাব্য 'হে পাক জমির' এর মধ্যে একটি ভাবের প্রচার স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। সেটা ইসলামের জাগরণ ও পৃথিবীর দিকে-দিকে এর প্রচার ও প্রসারের প্রয়াস সম্পর্কিত। এ-আদর্শের কাব্যিক প্রকাশ করতে গিয়ে কবি অনিবার্যভাবে আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দ, বাক্যাংশ, উপমা ও রূপকের বাহুল্য ঘটিয়েছেন এবং নির্বিচারে সেগুলির প্রয়োগ করেছেন।

ইসলামের নবজাগরণকে কবি রূপ দিয়েছেন 'নূরবুস্তান' কবিতায়। অবশ্য সে-জাগরণকে চিত্রিত করার চেয়ে এর ফলে সারা পৃথিবীতে যে আনন্দ-উদ্দেলতা জেগেছে, তার বর্ণনায়ই কবি অধিকতর উৎসাহ দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, খৈয়াম, ফেরদৌসী, জামী, রুমী, হাফিজ, নজরুল সবাই নতুন করে কাব্যসাধনায় মেতেছে, লায়লী-শিরি ফিরে পেয়েছে তাদের হারানো দয়িতকে, এবং দৃপ্তপদে কাফেলা এগিয়ে চলেছে মক্কা মোয়াজ্জমার পথে — পদতলে তাদের আবে জমজমের নহর, কণ্ঠে মারহাবা ধ্বনি ঃ

> পদ-তলোতে পাদাপ নিদারি চরণের নিক্কনে
> আজি আকর্ষি আলকার রূপ মরু-আব-জমজমে
> আজি গভর 'বালাদে আমীন' মক্কা শরীফ কাবা,
> মরুর-ধমনী হাঁক তারপর ঃ মারহাবা! মারহাবা!![২০০]

বিভিন্ন পরিচয়ে, বিভিন্ন স্থান থেকে দলে দলে কাফেলা অশ্রান্ত গতিতে ছুটে চলেছে সেই মহানবীর দেশে ঃ

> সুবি ঃ- কাজিমের নওনবী সেই খট-ঘন কুহেলীকে
> সাদিকের আলো অপসারি করি করিয়া তুলিছে ফিকে;
> কাফিলার পাসবান -
> সহ রাহ্ ছুটি পাইয়াছে আজ মনজিল-সন্ধান।

---

১৯৯। হে পাক জমির, ১ম সং, ঢাকা, ৫ই মাঘ ১৩৫৪, উৎসর্গপত্র।

২০০। নূরবুস্তান, মাসিক মোহাম্মদী, আশ্বিন ১৩৫৪, পৃঃ ৯৭৭ - ৭৮।

Dhaka University Institutional Repository



নবীন সূর্যের রাঙা সাগরের আহ্বান-রব' ধ্বনি,
অম্লান রহে সজ্জা তাহার ঝিলায়াতী সুরে স্তুতি।[২০১]

আজাদী ফৌজের দলও সে-বাণী দান করার জন্য যাত্রা করেছে কাবা অভিমুখে। সেখান থেকে বাণী নিয়ে তারা আবার ছড়িয়ে পড়বে চতুর্দিকে — সূচনায় হবে নতুন জামানা:

বীরের দৃপ্ত হইতেছে অগ্রগামী মশাল-কাফেলা:
যারা পথ ভুলেছিল মত্ততায় যাদুর পুরানে —
বিশ্বেরে বিধুর করি কাফিরীর পঙ্কিল নাচে
দলন হয়েছে তারা, নয়নে ভাসিছে দূর কাবা।
… … …
বন্য যাত্রা হবে শুরু সেথা হতে তার সুনির্দেশে,
আজাদী হবে শুরু আবার তাহার নবোন্মেষে।[২০২]

অন্যত্র কবি একদল অশ্বারোহী মুজাহিদের কথা বলেছেন যাঁরা নতুন জামাত প্রতিষ্ঠা করতে বেরিয়ে পড়েছে। অভিযানের জন্য রয়েছে তাঁদের সওয়ারী অশ্ব আর জালিমের জন্য জোলফিকার অসি:

আসহাবে-জাতীর আনোয়ার বাবে পাষাণ শৈল — হতে
নির্ঝরি পড়ে পেশানীর জ্যোতি তাহার আনন-পটে।
জামানার ফুরতি —
বিদ্যুৎ বাঁধি-সূর্য-অশ্বের জ্যোৎ-সনে যায় ছুটি।
একহাতে তার লোহকের জ্বালা জালিমে ভস্ম করে,
আর চোখে বহে বাঁধ-ভাঙার আলমাতের জ্বরে।
তাব পাশে তার সবারির বাধ, সামশানে দু দু বসু,
কালোমেঘ শিরে ছাতা ধরে — আসে বুকে রাহিমুল ভয়।
আল-ইশিতে প্রাচীনে শিখিছে বেকী ভগবান যত,
সুলতানের শিরে ভবন হয় নত-শির!
বিধত্ত হয় ভয়ে কাঁপিতে অবনি-অম্বরে,
বাঁধায় দ্রুতি শির পাতে চায় দুয়ার মূর্ছিয়ে যেতে।[২০৩]

---

২০১। কালিমার পয়গাম, মাসিক মোহাম্মদী, মাঘ ১৩৫০, পৃঃ ১৭২
২০২। আজাদী মশাল-দল, মাসিক মোহাম্মদী, বৈশাখ ১৩৫০, পৃঃ ৫৬
২০৩। আসহাবে-জাতীর মুক্ত আনোয়ার, মাসিক মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১, পৃঃ ৬৬

Dhaka University Institutional Repository



কবি পাকিস্তানের কথাও বলেছেন। 'ভারত-ভাগ্য-নিয়ন্তা' মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ পাকিস্তান কায়েমের সংগ্রামে সাড়া দিতে সবাইকে আহবান জানাচ্ছেন, সবার উচিত এ-আহবানে সাড়া দেওয়া। কেননা কাবার মধ্যে যেমন হজরে আসওয়াদ, মুসলিম জাহানের মধ্যেও তেমনি পাকিস্তান। সুতরাং সব কওমের সন্তানদের পতাকার কোনায় ধরতে হবে ঃ

পাকিস্তান কী তোমাদের ;
          শুনো গাযিদের সংবাদ ঃ
নবীন কাবার হজ্বের কেন্দ্র
          হাজরুল আসওয়াদ।
সব কওমের সরদার এসো,
          নবীন দামন ধরো;
আজাদীর সাইক্লোন দোল-খাদের সৃজন করো।
ভারত-ভাগ্য নিয়ন্তা কাইদ
          জানাইছে আহবান
          জাগে নওল পাকিস্তান।।[১০৪]

পাকিস্তানের সেনানীদের উদ্দেশ্য করেও তিনি কবিতা লিখেছেন। তাঁর কাছে মনে হয়েছে এঁরা ইসলামের প্রথম যুগের বীর মুজাহিদদেরই উত্তরসূরি। এঁরা এখনো সত্যনিষ্ঠ রয়েছেন, ইসলামের নাম ভাঙিয়ে নিজেদের স্বার্থ-কায়েমের রাস্তা খুঁজে চাননি; এঁরা চায় খোদার নামে মজলুম মানুষের জন্য নতুন জামানা সৃষ্টি করতে ঃ

ইসলাম-নামে সত্যের নামে আল্লার নামে যারা,
বিলাস পরিতে 'জিন্দি' পরদেশ করেছে সর্বহারা,
তোমরা তো নও তাহাদের দলে, তোমরা খোদার নামে
যুগ-মানবের বন্ধু আর শান্তির মুক্তি-কামে
তলোয়ার হাতে লিবাস-মত্ত ঃ দেখি পুনঃ প্রয়োজনে
তরী-দানায় 'ফিরদৌস' গড়ি তোলো মত অঙ্গনে।
মানবতার যে দুশমন, তারে করো তুমি নিশানার,
তোমার অসিতে বিদ্যুৎ হানে মুসাফির বরকার।[১০৫]

/রচনা ঃ নভেম্বর, ১৯৪৭/

---

১০৪। তারানা-ই-পাকিস্তান, মাসিক মোহাম্মদী, অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩৫১, পৃঃ ৯০
১০৫। হে পাক বীর, হে পাক বীর, পৃঃ ৪ – ৫

Dhaka University Institutional Repository



পাক-সিপাহীদের উদ্দেশ্য করে অনুরূপ ভাবে ও ভঙ্গিতে তিনি আরো কবিতা রচনা করেছেন। এ-ধরনের একটি কবিতা 'ঈদ' সংকলিত হয়েছে 'পূর্ব বাংলার কবিতা' গ্রন্থে।[২০৬]

তিন

মুফাখখারুল ইসলামের কবি-কৃতি সম্পর্কে একজন সহানুভূতিশীল সমালোচক যা-বলেছেন, তা-ই যথার্থ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

> মুফাখখারুল ইসলামও কাব্যক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ণে নিবেদিত প্রাণ। ... উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্প রচনায় তিনি মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ভাণ্ডারেই হাত পেতেছেন। এ-ব্যাপারে তিনি অনমনীয় মনোভঙ্গীর অধিকারী এবং প্রত্যয়বাদী। কিন্তু শব্দচয়নের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত অনুরাগ, এবং অকারণিক আরবী-ফারসী শব্দের সাথে দুরুচ্চার্য সংস্কৃতানুগ শব্দ ব্যবহারের বিশেষ প্রবণতা তাঁর অনেক রোমান্টিক কবিতাকেও মুক্ত হতে দেয়নি। অন্যপক্ষে তাঁর আদর্শ ও ঐতিহ্যবোধ যতখানি তীব্র, শিল্পদৃষ্টি ততখানি প্রখর নয়।[২০৭]

---

২০৬। সম্পাদনা মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ ও আবু হেনা মোস্তফা কামাল, প্রথম সং, ঢাকা ১৯৫৪, পৃঃ

২০৭। মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ, বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য, পৃঃ ২১৮ – ১৯।

Dhaka University Institutional Repository



## সৈয়দ আলী আহসান

১৯২২ সালের ২৬-এ মার্চ যশোর জেলার আলোকদিয়া গ্রামে সৈয়দ আলী আহসানের জন্ম হয়। ১৯৪৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে এম-এ পাশ করার পর কলকাতার ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, অল ইন্ডিয়া রেডিও এবং রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রে চাকুরী করে ১৯৪৯ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। তিনি ১৯৫৪ সালে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান, ১৯৬০ সালে ঢাকার বাংলা একাডেমীর পরিচালক ও ১৯৬৬ সালে নবগঠিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হন। শেষোক্ত পদে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন।[২০৮]

তাঁর কবিজীবনের পটভূমি সৃষ্টিতে পারিবারিক পরিবেশ বেশ ক্রিয়াশীল ছিল। তাঁর পিতা সৈয়দ আলী হামেদ ফারসী আরবী ও উর্দু ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ফেরদৌসীর শাহনামা তাঁর প্রিয় কাব্য ছিল। প্রায় প্রতিদিন বিকালে তিনি সুর করে মূল ফারসী থেকে শাহনামা আবৃত্তি করতেন। কবির মাতা ছিলেন এর নিয়মিত শ্রোতা। শিশু আলী আহসান এই ধ্বনি-ঝংকার তন্ময় শুনতেন।[২০৯] উত্তরকালে তাঁকে 'কবিতার মুখ্য উপাদান ধ্বনি ও শব্দ' এই মতবাদের একনিষ্ঠ অনুসারী করে তোলার জন্য অবচেতন মনে শৈশবের এই প্রভাব হয়ত অনেকাংশে কাজ করেছে।

সৈয়দ আলী আহসানের কাব্যজীবনে দুটি স্পষ্ট পর্যায় রয়েছে এবং দুটি সাহিত্যান্দোলনের সঙ্গে এই দুই পর্যায় বিশেষভাবে জড়িত। ১৯৪৩ সালে ঢাকায় 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' স্থাপিত হয় এবং তিনি ছিলেন এর অন্যতম উদ্যোক্তা ও প্রথম সাধারণ-সম্পাদক। সংসদের উদ্দেশ্য ছিল Irish Literary Revival এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে সাহিত্যিক পুনর্জাগরণ আনয়ন করা। ইসলামের গৌরবময় ঐতিহ্য থেকে উপাদান আহরণ কর

---

২০৮। জীবনীপঞ্জী, সৈয়দ আলী আহসান, কাব্য-সমগ্র, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৭৪, ঢাকা, পৃঃ ৪২৯। এই জীবনীপঞ্জীতে তারিখগত কিছু কিছু ত্রুটি আছে বলে মনে হয় কেননা তিনি আমাকে যে জীবনীপঞ্জী সরবরাহ করেছেন তার তথ্যাদি অন্যরকম। সেখানে তাঁর করাচী গমনের সময় ১৯৫৩ সনে উল্লিখিত হয়েছে।

২০৯। কবিতা সংখ্যা ৫৩, উচ্চারণ, কাব্য-সমগ্র, পৃঃ ২৩৬।

Dhaka University Institutional Repository



অথবা বঙ্গাব্দের মুসলমানী দৃষ্টিকে পরিমার্জিত করে প্রাচীন সাহিত্যের অঙ্গীভূত করা এবং পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত গ্রামাঞ্চলকে আরো বেশি করে সাহিত্যের বিষয়ীভূত করা — এই তিন ধারায় সংসদের আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল।[২১০] সৈয়দ আলী আহসানের কাব্য-সাধনার প্রথম পর্যায় এই আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক সাহিত্যসংস্থা পি-ই-এন। ১৯৫০ সালে ঢাকায় এর 'পূর্ব পাকিস্তান শাখা' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আলী আহসান মনোনীত হন সাধারণ সম্পাদক।[২১১] কিছুদিন পর তিনি পাকিস্তান শাখার সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সে দায়িত্ব পালন করেন। এই প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে দেশ-কাল-জাতির ঊর্ধ্বে উঠে সাহিত্য-সাধনা করা।[২১২] সৈয়দ আলী আহসানের দ্বিতীয় যুগের কাব্যসাধনা মোটামুটিভাবে এই লক্ষ্যাক্রান্ত।

আমাদের বিবেচ্য তাঁর প্রথম জীবনের কবিতাগুলি। তিনি তাঁর কাব্য-সমগ্রে এই কবিতাগুলিকে গ্রহণ করেননি। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে — 'আমার বিচারে সেগুলো আমার কাব্যরচনার উন্মেষের সংবাদ বহন করে সত্য কিন্তু কোনও প্রকার সিদ্ধির পরিচয় বহন করেনা।'[২১৩] কিন্তু দুই কারণে এই কবিতাগুলিকে আমরা বিবেচনাযোগ্য মনে করি : প্রথমত, কবির কাব্য-রচনার প্রারম্ভিক প্রয়াসে অপূর্ণতা থাকা অস্বাভাবিক নয় কিন্তু কবিকে বুঝতে হলে সে প্রয়াসকে অবহেলা করা কোনক্রমেই সমীচীন নয়; দ্বিতীয়ত, যে দেশ-কাল-সমাজে এগুলি রচিত হয়েছে তাকে জানতে হলেও এই কবিতাগুলির আলোচনা অত্যন্ত জরুরী। তাঁর এই কবিতাগুলি প্রধানত ইসলাম বিষয়ক। বিভিন্ন ইসলামী উপকথাকে অবলম্বন করে তিনি বাংলা সাহিত্যের নতুন ঐতিহ্যসৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেছিলেন। যে কবিতাগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য সেগুলি হচ্ছে : জোহরা ও মুশতরী,[২১৪] মক্কা মোয়াজ্জমার পথে,[২১৫] মোহররম,[২১৬] কোরবানী,[২১৭] আমালীকে,[২১৮] আদমের প্রতি ইবলিস,[২১৯] মুনাজাত[২২০] ও চাহার দরবেশ। জোহরা ও মুশ-

---

২১০। সৈয়দ আলী আহসান, পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যের ধারা, মাহে নও, আগস্ট ১৯৫১, পৃঃ ৫০ - ৫১।

২১১। আমাদের মোজারেন, মাহে নও, জানুয়ারী ১৯৫০, পৃঃ ৫৬। ২১২। ঐ

২১৩। ভূমিকা, পূর্বোক্ত কাব্য-সমগ্র, পৃঃ ১৭।

২১৪। মাসিক মোহাম্মদী, অগ্রহায়ণ ১৩৫০, পৃঃ ৫৪। ২১৫। ঐ, পৌষ, ১৩৫০, পৃঃ ৯৭।

২১৬। ঐ, মাঘ ১৩৫০, পৃঃ ১৪৭। ২১৭। ঐ, ফাল্গুন, ১৩৫০, পৃঃ ২২০।

২১৮। ঐ, ভাদ্র ১৩৫২, পৃঃ ৫০০। ২১৯। ঐ, ভাদ্র ১৩৬০, পৃঃ ৮৫৫।

২২০। মাহে নও, ভাদ্র ১৩৬২, পৃঃ ২৮।

Dhaka University Institutional Repository



কাব্যটির ভূমিকায় তিনি তাঁর উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ

> পৌরাণিক কাহিনী বলতে যা' বোঝায়, ইসলামে তা' নেই, কিন্তু এমন অনেক কাহিনী আছে যা' মনোহর ও মাধুর্যময়। সেগুলোকে অনেক গল্প-নাটক-কবিতার উৎস হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ... সে জন্যে অবশ্য সত্যিকার প্রতিভার প্রয়োজন। প্রতিভা যে আমাদের নেই তা' নয়, কিন্তু আমরা যুগরুচির অনুমোদনে 'কাস্তেটাকেই শান' দিতে ব্যস্ত আছি। পথ দেখাবার সাহস আমার নেই। আমি পথের বার্তা এনেছি মাত্র।

কিন্তু এদিকে তিনি বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। অবশ্য গভীরতা ও কাব্যভাষার পরিমার্জনা থাকলেও শব্দনির্বাচন বিষয়ানুগ না হওয়ায় সামগ্রিক আবেদন সৃষ্টিতে কবিতাগুলি ব্যর্থ হয়েছে। এই পর্যায়ের উত্তম নিদর্শন হিসাবে মক্কা মোয়াজ্জমার পথে-র নিচের অংশটিকে বিবেচনা করা যেতে পারে ঃ

আকাশে ছড়ানো রূপার রূপ অযুত সেতারাগুলি
দূরের পথের নির্দেশ দিয়া আদম-সুরাত
ঠোঁটেই তোলে অঙ্গুলি —
বায়ুর শীৎকারে খেজুর পাতারা তোলে মধু মর্মর
আলোর দোলায় কেঁপে ওঠে অম্বর,
মনের মাটিতে প্রাণের সুর ঃ
আল্লাহু আকবর !
আল্লাহু আকবর !!
বহু প্রদেশের বহু মাটি পার হয়ে
অনাহার কত মৃত্যু নিশার নিশ্বাস সয়ে সয়ে
রৌদ্রদগ্ধ দিনের প্রদাহ বয়ে
পার হয়ে কত বালুকার প্রান্তর
কাবার পথে যাদের স্বপ্নে জাগে প্রাণের সুর ঃ
আল্লাহু আকবর !
আল্লাহু আকবর !!

এই পর্যায়ের সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য কবিতা 'চাহার দরবেশ'[২২১] চাহার দরবেশে চারজন দরবেশের কাহিনী রয়েছে। তারা প্রথম জীবনে চরম ঐশ্বর্যের মধ্যে জীবন উপভোগ

২২১। কবি এর রচনাকাল বলেছেন ১৯৪৫ সাল/কাব্যসংগ্রহ, পৃঃ ১৮, কিন্তু আমি এর চারটি স্তবক দেখেছি মাসিক দিলরুবার ১৩৫৩ সালের কার্তিক সংখ্যায়/

Dhaka University Institutional Repository



করে কিন্তু এক সময় পরম আকাঙ্ক্ষিত পৃথিবী লাভে ব্যর্থ হয়ে দেওয়ানার হালে পথেপ্রান্তরে ঘুরতে থাকে এবং জীবন তাদের সংশোধন করে। সে সময়ে দৈববাণী তাদের 'নূর' দেশে যেতে নির্দেশ দেয়, যে দেশের নিঃসন্তান রাজার জীবনও চরম নিঃসঙ্গতায় ও বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। চার দরবেশ নূরের রাজধানীর নিকট এক গোরস্থানে মিলিত হয় এবং কালক্রমে বাদশা-সহ শাহজাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে যার যার দেশে প্রত্যাবর্তন করে।

কাহিনীকে সমকালীন জীবনের পটভূমিতে উপস্থাপন করার ইচ্ছা কবির ছিল। এ সম্পর্কে তাঁর নিজের বক্তব্য হচ্ছে ঃ

> ১৯৫৫ সালে আমি 'চাহার দরবেশ' রচনা করি। ... যদিও কাহিনীটি দোভাষী পুঁথি থেকে নেয়া, কিন্তু কাব্য নির্মাণ কৌশলের মধ্যে আমি টি.এস. এলিয়টের 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' — এর অনুসরণ করেছিলাম। 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' – এ যেমন আদি থেকে দীর্ঘ যাত্রাপথে উদারতা, রুক্ষতা এবং বন্ধ্যাত্ব এবং পরিশেষে সত্তার সৃষ্টির অনুরোদ্যাম, তেমনি 'চাহার দরবেশ' কবিতায় আমি অসহায়তা, নৈরাশ্য এবং হাহাকারের শেষে একটি আশ্বাস এবং নবীন জীবনের পরিচয় আনবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু শব্দ-ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই কবিতাটিও আমাকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারেনি। এখানেও আমি আমার ভাষাকে আবিষ্কার করিনি। একটি রোমান্টিক আবহের মধ্যে আবর্তিত হয়ে অনেক ছন্দ ও অলংকারের চাতুর্য প্রকাশ করেছি কিন্তু আমার নিজস্ব বক্তব্য মূর্ত করতে পারিনি। তাই এ-কবিতাটি আমার নিকটে কোনও কাব্যগত সিদ্ধির পরিচয় বহন করছে না।[222]

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর মতও অনুরূপ ঃ

> চাহার দরবেশ পুঁথির কাহিনীকে তিনি অনেকটা Retold করেছেন, অর্থাৎ তাঁর হাতে প্রাচীন পুঁথির কাহিনীটি নতুন কোন দ্যুতি বা তাৎপর্য লাভ করেনি — আধুনিক ভাষা ও আঙ্গিকে কাহিনীটি পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে মাত্র।[223]

কবি ও সমালোচকের মত মান্য করেও বলা যায় যে, কবিতাটির মধ্যে সমকালীন সমাজের অবক্ষয়িত অবস্থার সামগ্রিক রূপ হয়ত মূর্ত হয়নি কিন্তু দরবেশদের উক্তিতে শূন্যতা নৈরাশ্য ও নিঃসঙ্গতার একটি করুণ সুর প্রগাঢ়ভাবে ধ্বনিত হয়েছে ঃ

পৃথিবীর আদি অন্তিম দূর, এখানে গভীর রাত
সত্তার দেশে অনেক রাত্রে দেখেছে এখানে মৃত্যু অকস্মাৎ

২২২। কাব্য সম্ভার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯
২২৩। বাংলা কাব্যে আধুনিক প্রতিভা, পৃঃ ২১৯

Dhaka University Institutional Repository



জীবিত প্রাণের চিহ্ন নাই,
                    পায়ের তলায় বিশীর্ণ মাটি কাঁপে
আমরা রয়েছি সবাই এখানে বঞ্চিত অভিশাপে
এখানে মাটিতে ক্লান্ত বিষণ্ণতা
এখানে শঙ্কা রয়েছে মলিন পথে
অনেক আগের দিনগুলি ছিল দীপ্ত আলোকময়
প্রায় – আবেশে মুহূর্ত ছিলো একান্ত মধুর
আহবান ছিলো অনেক পাখীর নীড়
রাতের আকাশে জেগেছে সেতারা জেগেছে অনেক চাঁদ
বিলাস – আবেশে স্ফূর্তি জাগালো মধুর আর্তনাদ
সে-সব দিনের চিহ্ন মুছেছে এই রাত্রির মলিন অন্ধকারে
নিবৃত্তি বিহীন অনেক আকাশে জেগেছে এখনো চাঁদ
কিন্তু এখন জীবনে জীবনে জেগেছে কিসমত
একাকী ছিলাম সঙ্গিবিহীন, হয়েছি চারণ
নীরব ব্যথায় সহজে ঘটেছে প্রীতির সমর্পণ,
অন্ধ আঁধারে হাতড়ে চলেছি অবলম্বহীন আশ্রয়হীন
ব্যর্থ হয়েছে অতীত কালের অনেক দীপ্তদিন ।[224]

সৈয়দ আলী আহসান কোরান এবং ইকবালের কবিতার কিছু কিছু অনুবাদ করেছিলেন । সূরা শামস[225], সূরা দোহা[226] এবং 'একদা কে-এসেছে রাত্রিকা ... সূরা সহ আরো দুএকটি সূরার ভাব-অবলম্বনে রচিত 'সংকেত'[227]-এর কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে । সংকেত কবিতাটি কবির 'অনেক আকাশ'[228] কাব্যে সংকলিত হয়েছে । ধ্বনি-গাম্ভীর্যে ও ভাব-সংহতির ফলে কবিতাটি যথেষ্ট সার্থকতা লাভ করেছে ঃ

অন্তর উদ্যান ছিল মেঘ-বিচরণ,
পর্বত, সিন্ধুর সত্তা । রাত্রির গুহায়

---

২২৪। মাসিক দিলরুবা, বৈশাখ ১৩৫৬, পৃঃ ২৫
২২৫। মাসিক মোহাম্মদী, চৈত্র ১৩৫৪
২২৬। ঐ, বৈশাখ ১৩৫৫
২২৭। মাহে নও, ভাদ্র ১৩৬০
২২৮। গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, আষাঢ় ১৩৬৬

Dhaka University Institutional Repository



আশ্চর্য সে আশির্বাদ — পাঠ করো
ব্যাধ-মেঘ আচ্ছাদিত পুরুষ-প্রবর
পাঠ করো তাঁর নামে — প্রথম বাণীর প্রাণ
প্রথম আল্লার সত্যা, রাত্রির তারার ফুল,
উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত বালু-বন্যা উটের খুরের,
মধ্য দিন, মধ্য রাত্রি, মরুভূমি, জড়-বিক্ষোভ
সমস্ত সৃষ্টির সাক্ষ্য।[229]

ইকবালের 'আসরারে খুদীর' সপ্তম অধ্যায় পর্যন্ত তিনি অনুবাদ করেছিলেন। এটি মূলের যথাযথ অনুসরণ নয়, বরং 'মূলীভূত তত্ত্ব এবং আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রেখে স্বাধীন অনুবাদ।[230]

বুদ্ধিবৃত্তির অনুমোদনে যারা 'কাস্তেটাতে শান' দেয় সে ধরনের সাম্যবাদী শিল্পী বা রাজনৈতিক কর্মীদের কার্যকলাপের প্রতি আলী আহসানের কোনো সমর্থন ছিলনা। এদের ব্যঙ্গ করে সে সময় তিনি 'ক্যাপিটাল ও একটি তুরিং'[231] এবং 'লাল মজুরের গান'[232] নামক দুটি কৌতুকোদ্দীপক কবিতা রচনা করেন। সাম্যবাদীদের আবেগ অকৃত্রিম নয়, দেশের চেয়ে বিদেশের প্রতি তাদের আনুগত্য অধিক এবং রাজনীতিতে তারা সুযোগসন্ধানী ও সুবিধাবাদী—এ সত্যতার দ্বারাই তিনি ব্যঙ্গ রস সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন।

সাড়ম্বর তোমাদের উদাত্ত আহ্বান
স্বদেশ লাঞ্ছিত করি বিদেশের খুশিকলা
করিয়াছ একান্ত আপন।
তোমাদের সব বিদ্যা জমা থাকে পার্টির সিক্রেট খাতায়
বোকামুখে শোনা বুলি আহরণ করে রাখো মনের খাতায়;
অ্যাদামটি তুরিদের কথা শোনা আছে পড়া নাই
তাতে কিবা ক্ষতি
ক্যাপিটাল বন্ধ থাক, দল বেঁধে একত্রে লভিয়াছ গতি
ধর্ম যে আফিম মাত্র বলেছেন বিদেশী নায়ক,
ভাগ্যবান তোমরাই, চরম স্বীকৃতি দিয়া হলে তার
প্রধান গায়ক। ২৩৩

এই কবিতাদ্বয় পাঠে মনে হয় ধর্মীয় বিশ্বাস অবলম্বনে তাঁর কবিতা রচনার প্রয়াস শুধু সাহিত্যিক নয়, আদর্শগত।

---

২২৯। অনেক আকাশ, পৃঃ ২৯।
২৩০। সৈয়দ আলী আহসান, ইকবালের কবিতা/সম্পাদনা/, ১ম সং আগস্ট ১৯৫২, ঢাকা, ভূমিকা, পৃঃ পাঁচ।
২৩১। মাসিক মোহাম্মদী, আষাঢ়, ১৩৫২।
২৩২। ঐ, শ্রাবণ ১৩৫২। ২৩৩। 'ক্যাপিটাল ও একটি তুরিং', পৃঃ ৩৪৯ – ৩৫০

Dhaka University Institutional Repository



পাকিস্তানের সৃষ্টিতে কবি খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। অন্ধকার থেকে আলোর অভ্যুদয়ের সঙ্গে তিনি এর তুলনা করেছেন। এই ঘটনায় আনন্দোৎসব করার জন্য বেহেশতের হুরপরী ও সুদূরের রাজকুমারীরা অনেক আতর লোবান ও সুগন্ধিজল এবং নানা প্রকার মেহেদী লেবাসে সজ্জিত হয়েছে, জোহরা সেতারা মর্তে নেমে এসেছে সেকথা তিনি উল্লেখ করেছেন আবেগদীপ্ত ভাষায়ঃ

এসেছে নতুন দিন,
ভয় নাই আর, আলোক উঠেছে হাসি,
গভীর তিমির বেদনায় পড়ে ঢলে।
ভয় নাই আর ভয় নাই,
সংকোচন, অশ্রুমগ্ন শোন শোন কান পাতি।[২৩৪]

মোটামুটিভাবে বলা চলে, ১৯৪৩-৫০ সময়েই সৈয়দ আলী আহসান ইসলামী বিষয় ও পাকিস্তানী আদর্শ নিয়ে কবিতা লেখায় উৎসাহী ছিলেন। এর পর তাঁর সে উৎসাহ ধীরে ধীরে কমে আসে। অনুবাদ কবিতাগুলি এর পরের রচনা। প্রথমে যে আবেগ ও আনন্দ নিয়ে তিনি কাব্যরচনা শুরু করেছিলেন, নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে তার সে আবেগ ঝিমিয়ে যায়। নতুন উপলব্ধি ও অনুভূতি তাঁকে তখন ভিন্নদিকে চালিত করে। এ সময়ে রচিত একটি কবিতায় তাঁর এই ভাবান্তরের সাক্ষ্য রয়েছে।

সেদিনের সেই ইতিহাস
আজ আর সত্য নয়
মৃত্যুহীন পৃথিবীর অশেষ যন্ত্রণা
আজ হলো একান্ত অসহ্য
তাই আজ আমি আর কবিতা লিখিনা।[২৩৫]

---

২৩৪। বেদনা বিহীন সূর্যের দিন, মাহে নও, বৈশাখ ১৩৫৬, পৃঃ ৩২

২৩৫। আমি আর কবিতা লিখিনা, মাসিক মোহাম্মদী, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭, পৃঃ ৬৩-৬৪।

Dhaka University Institutional Repository



৯ কয়েকজন অপ্রধান কবির কয়েকটি কাব্য

উপরে আলোচিত কবিগণ ব্যতীত আরো অনেকে এ-প্রসঙ্গ নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে বিস্তর কবিতা রচনা করেছেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কাব্য নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

এক

আমিনুল ইসলাম চৌধুরীর 'জবাব' [২৩৬] প্রকাশিত হয়েছে ১৩৫৬ সালে। ইকবালের 'শেকোয়া' কাব্যের জবাব তিনি দিয়েছেন এ-কাব্যে। প্রথম কবিতার নামানুসারে কাব্যের নামকরণ হয়েছে।

নাম কবিতাটিতে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে মুসলমানদের অবনতির কারণ হিসাবে কবি মুসলমানদিগকেই দায়ী করেছেন। মুসলমানদের সত্যভ্রষ্টতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা পরিত্যাগ, পারস্পরিক অনৈক্য, ধর্মে আস্থাহীনতা প্রভৃতিই কবির মতে তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী; এর জন্য আল্লাহকে দোষী করা বৃথা।

চোখ মেলে চাও, আরশেতে নব-আজ তোমাদের নিজ পানে,
প্রাণের খাতায় হিসাব করি যাচি খোদার দোষ পানে!
আজ তোমাদের অত্যাচারে উৎপীড়িত তোমরা সব
তোমাদেরি শয়তানী আজ;তোদের শিরে দেয় গজব! [২৩৭]

'বিশ্বনবী' কবিতায় হযরত মোহাম্মদ /দঃ/-এর আবির্ভাবের ঐতিহাসিক কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। সমগ্র পৃথিবীতে অন্যায়-অত্যাচারে পীড়িত মানবতার উদ্ধারের জন্য তাঁর আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল। বর্তমানে মুসলমানেরা পুনর্বার অধঃপাতের দিকে যাচ্ছে কিন্তু ভাগ্যক্রমে ইসলামের পুতবাণী নিয়ে এসেছে পাকিস্তান:

আজকে আবার শুনছি ধ্বনি, ডাক দিয়ে যায় কোন বেলাল,
পর্বতের গুহা হতে উঠল হাসি নও হেলাল।
যুগ জামানার কুফরীস্থানে একি মধুর পাকপ্রীতি,
তুর-মীনারে উঠছে আজি, নূর জীনার শুভ-স্মৃতি। [২৩৮]

'আমানত' একটি রূপক কবিতা। কবি স্বপ্নে দেখেছেন এক মহান পুরুষ সভা করে বসেছেন। সে-সভায় সমবেত হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিরা। সভাপতির

---

২৩৬। ১ম সং, চাঁদপুর, কুমিল্লা, পূর্ব পাকিস্তান
২৩৭। পৃঃ ৭
২৩৮। পৃঃ ৮

Dhaka University Institutional Repository



সামনে পড়ে আছে ভোঁতা তলোয়ার, ছেঁড়া কোরান ও লুণ্ঠিত হেলালী ঝাণ্ডা। সেই মহান পুরুষ সবাইকে আহবান জানালেন পাক ঝাণ্ডা ও অস্ত্রের দায়িত্ব নিতে ক্রমে ক্রমে চার খলিফা, আরব, ইরান, মিসর ও তুরস্কের প্রতিনিধিরা দাঁড়ালেন কিন্তু তিনি কাউকেও সে-গুরুদায়িত্ব দিতে ভরসা পাইলেন (পেলেন) না। এমন সময় —

শির দৃপ্ত রাখি, উন্নত তনু — শিরেতে সবুজ তাজ
চাঁপার বরণ শেরওয়ানী তার শোভিছে দেহের সাজ[২৩৯]

শেষে পাকিস্তানী প্রতিনিধি দাঁড়ালেন এবং বললেন —

চির আমানার কুর্সিস্থানে — সুমানা এলাহীর
গড়েছি রাজ্য পাঞ্জাব ভূমি — এশিয়ার বাদশাহীর।
'সিন্ধু' বুকে আমাদের দোলে — 'খৈবর' দেয় হাঁক
আজ কাবুলের আফগানের সালাম দেখায় দলের বাঁক।
বীর খালেদের শিখা সে তেজ — ঘোড়াদের ক্ষুরে জ্বলে,
খোদেজা — ফাতেমা, খাওলা কাহিনী সব ধরিয়া চলে।
তব পয়গাম বক্ষে ধরিয়া — অটল অমর, বুকে
টানিয়া আনিব বিশ্বেরে মোরা — তব সাথী রাজপথে।[২৪০]

সল্লাল্লাহু নবী খুব খুশি হয়ে পবিত্র ঝাণ্ডা, মরচে পড়া তলোয়ার এবং অনাদৃত কোরান তাঁর হাতে সমর্পণ করে বললেন :

লোভ ক্রুদ্ধের গর্দান পরে হান পয়মালাঘাত
রক্ষা করিবে দীন ও এতিমে — যাদের নাইকো নাথ।
বিলাস বিভেদ — শাপানল হতে করি পুনঃ সাবধান
(পোড়ালে) পাকিস্তান ধরার শত বীর হাতে — পতাকিত হক্কান।
চল দৃঢ় পদে আল্লার ফৌজ — আল্লারে করি ভয়,
বরিবে না কভু দুনিয়াতে তুমি অপমান পরাজয়।[২৪১]

'পাকিস্তান-বার্ষিকী' রচিত হয়েছে ১৯৪৮ সালের আগস্ট মাসে। পাকিস্তানের সৃষ্টিতে অনেকে দুঃখিত হয়েছিল এই ভেবে যে মুসলমানদের তৈরী তাজমহল, মুক্তা মসজিদ, মতি মসজিদ, লাল কেল্লা, ফতেপুর সিক্রি প্রভৃতি ভারতের অংশে পড়ে গেছে; কিন্তু কবি সন্তোষ করেছেন

---

২৩৯। পৃঃ ২২ ২৪০। ঐ

২৪১। পৃঃ ২৩

Dhaka University Institutional Repository



পাকিস্তানেই এমন গড়ে উঠতে হবে । এবং

নেমে আসুক মুক্তি পাকিস্তানী এ পাক মাটিতে
স্বার্থপরতার উৎখাত ভুবন হতে
শান্তির প্রাণ সন্ধ্যা পানে
'কবরের' মত ।[২৪২]

কবি আরো বলেছেন এ-যুগে কোনো [প্রত্যেক] জাতিই পরজাতির পদানত না-থেকে নিজেই নিজের ভাগ্য গড়তে প্রয়াসী । এ-দাবির ভিত্তিতেই পাকিস্তানের অভ্যুদয় —

সাম্রাজ্যের দিন আজ অবসান
মৃত্যুঘন্টা তার বেজে উঠছে সারা জাহানে
থাকিবেনা নিজ ঘরে আর কেহ পৃথিবীর শোষিত,
শোষিত, লুণ্ঠিত পরবাসী ।
জনতার মুক্তি জাতির — আজাদ আবাসভূমির
স্বাধীন জীবন সংগঠনের,
তার প্রতিষ্ঠার পুণ্যালোকে ।
হাসেল করেছি আমরা এ আজাদ পাকিস্তান —
জাতীয় আবাসভূমি ।[২৪৩]

'কায়েদে আজম স্মরণে' লিখিত হয়েছে ১৯৪৮ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে । জিন্নাহ্‌র ঐতিহাসিক ভূমিকা, পৃথিবীর মুসলিম সমাজে এর গুরুত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিতভাবে তিনি মনের কথা বলেছেন । জিন্নাহ্‌ যে নিপীড়িতের জন্য সংগ্রাম করতেন; ইন্দোনেশিয়া, ফিলিস্তিন, ভিয়েতনামের ব্যাপারে তিনি যে সর্বদা অন্যায়ের বিরুদ্ধাচারণ করেছেন তা-ও কবি বলেছেন । তাঁর স্বপ্ন ছিল অন্যায়-অবিচার মুক্ত পাকিস্তান গড়ে তোলা ।

সে পাকিস্তান নষ্ট হতে নাপাক লোভীর অত্যাচার,
ধ্বংস করতে মূল সহ তার ছিল অঙ্গীকার ।
সেই সে পাপী শয়তানেরা আজো জাতির রক্ত খায়,
উধাও কেন হলে ইমাম — হায়রে এমন অবেলায় ।[২৪৪]

'নির্বাসীর মুক্তি' কবিতায় রয়েছে মানব জাতিকে আল্লার নির্দেশিত পথের দিকে ফিরিয়ে আনার আহবান । পৃথিবীতে হত্যা, ক্লেদ ও রক্তস্রোত আল্লার বাণীকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে ।

---

২৪২। পৃঃ ৯১
২৪৩। পৃঃ ২৮
২৪৪। পৃঃ ৩৫

Dhaka University Institutional Repository



কোরআন, নজরুল ও ফাররুখের যুগ গত হলেও হিজাযের সেতারা এখনো জীবিত রয়েছে। খোদা অসীম দয়াশীল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁর ধৈর্যেরও শেষ আছে। কবি লক্ষ করেছেন মানুষের লোভ–হিংসা আকাশের কোণে মেঘ এনেছে।

শুভ্র কিন্নরী

দূর কর লোভ – জন্ম, মত্ত সর্বনাশী
স্বার্থের সরাব মনে। আজি যাত্রী পথে
নেমে এস হে মানুষ পুনঃ সত্য ঘরে
বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, কল্যাণ দীপিকা
যুক্তি–ন্যায় – রাজদণ্ড, প্রজ্ঞাদীপ শিখা
মনুষ্যের পূর্ণাঙ্গ, তারি প্রতিনিধি
সুযোগ্য খলিফা সব।[245]

অন্যান্য কবিতায়ও – 'মুসলমান', 'পাকিস্তান সঙ্গীত' – কবি অনুরূপ ভাব প্রকাশ করেছেন।

দুই

আবদুস সালাম চৌধুরীর 'কাব্যিয়াত'[246] ১৩৭৫ সালে প্রকাশিত হলেও রচিত হয়েছিল 'সাতচল্লিশের আগে'।

কবি ইসলামী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। এই জাতীয়তাবোধের প্রেরণাতেই পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু পরবর্তী কালে ইসলামী শাস্ত্র মোতাবেক দেশ–শাসনের কোনো আয়োজন দেখা যায়নি, বরং দেশের আনাচে–কানাচে সমাজের রন্ধ্রে–রন্ধ্রে অন্যায় অসত্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠে, ফলে ইসলামাদর্শের বাণী পরিত্যক্ত হয়। এতে দেখে কবি ব্যথিত হয়েছেন। এবং সমাজের অনাচার ও অবক্ষয় দূর করতে অকৃত্রিম ইসলামে প্রত্যাবর্তন করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। প্রকৃত মোমেন যারা হলে সমাজের দুর্গতি লোপ পাবে বলে কবির দৃঢ় প্রত্যয়।

সমাজের অধঃপতিত অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলছেন :

ক. ভবিষ্যতের আদর্শবান তোমরা এ কি করছ সব
রংমহলে নাম নিয়াজীর চলছে আজি মহোৎসব।

---

২৪৫। পৃঃ ৩৬
২৪৬। ১ম সং, বই কেন্দ্র পাবলিশার্স, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository



যুগ-খাখানা সমাজে খেলো মানুষ খাঁটি মদ-ঈমান
মুখোশ পরা মানুষ যেন দিন পঞ্চকের মুসলমান ।[২৪৭]

খ. দেখে লও প্রতি সমাজরন্ধ্রে ছোট-বড় কত জোঁক
ঘুষ খোরাকেকী অসৎ উপায়ে হইতেছে বড় লোক
কন্ট্রাকটার – দারোগা-পুলিশ মানুষের খুন চোষে
নিত্য দেখিয়া মরমে যে মরি ধরণী ছাইলো দোষে ।[২৪৮]

সমাজপতিদের অত্যাচার অবিচার ও দুর্নীতিতে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে । তারা শান্তি ও সুস্থি চায় ।

তোমার আজিকে চারিদিকে শুনি জনতার কোলাহল
শান্তি শান্তি শান্তির নামে দিকে দিকে হলাহল ।
অকল্যাণের পথ বেয়ে কেবো শান্তি আসেনা কভু
নিশি দিন তুমি আপন স্বার্থে পথ খুঁজিতেছ তবু[২৪৯]

এই নৈরাজ্য বিশৃংখলা ও অবনতির সমাধান আছে ইসলামী আদর্শের পুনরুজ্জীবনে । একথা কবি বলেছেন কয়েকটি পদে ঃ

ক. তাই চিত্তে আজিকে মুক আমার কেঁদো হসে মন কথা
হাল-যামানার ইতিবৃত্ত বুকে জাগায় সে ব্যথা ।
এসো জাগো ভাই পুকারো আজান আল্লাহু আকবর ।
আঘাত পড়িয়া মৃত মিল্লাতী পুনরুদ্ধার কর ।[২৫০]

খ. পরিতাপ আজি ছেড়ে দাও কেন জাগ্রত কর মন
পুরো-ইসলামী বিপ্লবাদ আজিকে যে প্রয়োজন ।
উমর খালেদ গাজীরা এসো – সব হারাদের ব্যথী
দেশকে বাঁচাও জাতিকে উঠাও কতি রয় বানো ক্ষ্যাতি ।[২৫১]

---

২৪৭। পৃঃ ৯ ২৪৮। পৃঃ ৪৯
২৪৯। পৃঃ ২৪ ২৫০। পৃঃ ৪৪
২৫১। পৃঃ ৫০

Dhaka University Institutional Repository



তিন

আজহারুল ইসলাম /জন্ম ১৯১৩/ ১৯৩৬-৩৭ সাল থেকেই নীতিমূলক কবিতা লিখতে শুরু করেন। তাঁর তিরিশ বছরের রচনা থেকে বাছাই-করা কবিতা নিয়ে 'ছায়াপথ'[২৫২] প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে। এতে রোমান্টিক প্রেম-সৌন্দর্য এবং পাকিস্তান ও ইসলাম বিষয়ক অনেক কবিতা স্থান পেয়েছে। তবে কোনো নতুন জিজ্ঞাসা বা অনুভূতির পরিচয় এখানে নেই, সর্বত্রই কবি পরিচয় দিয়েছেন সরল আবেগ-উচ্ছ্বাস ও গতানুগতিকতারই.

'পাকিস্তান' নামক কবিতায় তিনি নিম্নরূপ ভাব প্রকাশ করেছেন :

সাম্য-মৈত্রী-প্রেম আনিয়াছে মোদের পাকিস্তান,
আনেনি অনল, আনেনি কলুষ, আনেনিক অভিমান,
হেথায় কখনো পায়নিক ঠাঁই নাদির-কালাপাহাড়,
শুধু হেথায় ধ্যানের মানুষ, তাঁরি নীতি করি সার।
সাদী হাফিজের ধ্যান ও ধারণা হেথা হয় একাকার,
ফেরদৌসী-রুমী-গাজ্জালী-প্রাণ-ধারা মিশে বার বার,
ইসলামের সে 'খুদীর' জয় প্রতিটি পাকিস্তানী
মনের গহনে লুকায়ে রাখিছে নিজেরে ধন্য মানি।[২৫৩]

অন্য একটি কবিতায় তিনি জিন্নাহর ভূমিকা নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। জিন্নাহ দাঁড়িয়ে-ছিলেন শোষণের বিরুদ্ধে, তাঁর অভিযান ছিল অন্ধকারকে বিদূরিত করে আলোকের প্রতিষ্ঠা করার এবং এই সংগ্রামের দ্বারা তিনি মুসলমানদের নতুনভাবে সঞ্জীবিত করেছেন।

তোমারে স্মরণ করি হে কায়েদ, গাহি তব গান,
নিরন্ধ্র রাত্রির বাঁধ বিদারিয়া জ্বালালে আলোক,
কাল রাত্রি মাঝে মোরা শুনি তব নব আহ্বান
লভিনু চলার পথ, শিহরিল সারা বিশ্বলোক।
জ্বালালে আগুন তুমি শোষণের পাষাণ কারায়,
অনন্ত জীবনের বহ্নিমুখী প্রাণের ধারায়
তুলিয়াছ কলতান! শতাব্দীর তমিস্রা গুহায়
দুলায়েছ মুক্তিকামী উড়াইয়া জয়ের পতাকা।[২৫৪]

---

২৫২। ১ম সং, ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
২৫৩। পৃঃ ১৭ ২৫৪। কায়েদে আযম, পৃঃ ১৯

Dhaka University Institutional Repository



একালের দুঃখদারিদ্র্য, অশান্তি ও অকল্যাণের মূলে রয়েছে মানুষের ধর্মহীনতা। তাই সবাইকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে ইসলামের দিকে। একদা আরব ভূমি থেকে মানব-শ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ বিশ্ববাসীর জন্য যে-বাণী প্রচার করেছিলেন, এযুগেও তাকে অনুসরণের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। 'মদীনা-পথিক', 'আরাফাতে চলো তুমি' এবং 'তওহীদ' এই তিনটি কবিতায় কবির সে-বিশ্বাসের পরিচয় আছে।

> যাও ফিরে তাদেরে জানাও
> ধর্ম-প্রেম মানবতা আছে যার – সাথে আরো থাক্
> মুক্তির অন্বেষা। যা-কিছু অসার হয়ে গেছে আজি
> ভবিষ্যত আসেনি এখনো, ঘুচে যাবে দুর্বিপাক।
> এবার মদিনা পথে চলো, শোন গান ওঠে বাজি।
> যে গান নবীজি শুনে কেঁদেছেন। নিশান উড়াও
> তৌহিদের। আকণ্ঠ পুরিয়া পিয়ো শান্তির সিরাজী
> দুঃখ-শোক অতিক্রমী যাও।[২৫৫]

চার

মহম্মদ সিরাজুল হক খানের 'সৈনিক'[২৫৬] ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। কাব্যরচনার পটভূমি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কবি ভূমিকাতে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। কবিকে ও কাব্যকে জানার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে বিবেচনা করে নিম্নে তা বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করা হল –

> দুর্নীতি-প্রপীড়িত দেশ ও জাতির উদ্ধার ও নিয়ন্ত্রণকল্পে বিগত ইংরেজি ১৯৫৮ সালে ৮ই অকটোবর যখন সমগ্র পাকিস্তানে 'সামরিক আইন' জারি হয়, সেইদিন হইতেই সৈনিক কাব্যগ্রন্থের রচনা আরম্ভ করি। বীর সেনানায়ক মহম্মদ আয়ুব খানের সর্বাধিনায়কত্বে সমগ্র দেশব্যাপী সেদিন সৈন্যদলের দেশোদ্ধার অভিযান শুরু হয় — এ অভিযান দুর্নীতির বিরুদ্ধে, চোরাচালানীর ও কালোবাজারীর বিরুদ্ধে, অনাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং ন্যায়, সত্য ও সততার পক্ষে। সমগ্র দেশব্যাপী যেন ছায়াচিত্রের মতই এক অভিনব আলোকচিত্র ফুটিয়া উঠিল – পাকিস্তানের আদর্শবাদী সৈন্যদল এবং অবহেলিত, অত্যাচারিত ও প্রবঞ্চিত জনসাধারণের ভেতর এক চঞ্চল মানব-স্রোত যেন দুর্বার বেগে ছুটিয়া চলিল।

---

২৫৫। মদীনা পথিক, পৃঃ ১৬০

২৫৬। প্রকাশক মুহম্মদ খলীলুল হক খান, কুষ্টিয়া

Dhaka University Institutional Repository



পাকিস্তান Muslim-Majority-State এবং এদেশের শাসনভার মুসলমানদের উপরই ন্যস্ত থাকিবে – এই ভিত্তিতেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছিল। মুসলমানগণ তাহাদের জাতীয় কৃষ্টি, সাহিত্য, ধর্ম-কর্ম, জ্ঞান-সাধনা ও সামাজিকতা ইসলামের সর্বজনীন আদর্শে গড়িয়া তুলিবে, ইহাই এই নবগঠিত রাষ্ট্রের লক্ষ্য-বস্তু ছিল। কিন্তু দেশের কতিপয় ভণ্ড, স্বার্থান্ধ, বিপথগামী, মতলবসর্বস্ব ব্যক্তির পরিচালনায় সেই মহান আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হইতে পারে নাই। ... ... ...

আমাদের সেই জাতীয় জাগরণ ও উদ্বোধনের সুদিন ফিরিয়া আসিয়াছে। ইসলামের মহান ভাবধারা ও শিক্ষার বলে যে অদ্ভুত আরব-বেদুইন একদিন তিন মহাদেশ ব্যাপিয়া অপূর্ব এক মানবীয় মহা-শক্তির আলোড়ন আনিয়াছিল, সেই দিনের শক্তি, সামর্থ্য আবার আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে দেখা যাইতেছে। সর্বাধিনায়ক ও সামরিক শাসন পরিচালক জেনারেল মহম্মদ আইয়ুব খানের নেতৃত্বে ও আদর্শে আমাদের অতীত জাতীয় গৌরবের পুনরুদ্ধার হোক এবং আমাদের দেশের কচি-কাঁচা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মানব-শিশুগণ এই মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হোক – ইহাই কামনা করি। আল্লাহ্ আমিন্।

এই ভূমিকা থেকে কাব্য-বিষয় সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। সুতরাং কবিতা সম্পর্কে বিস্তৃত বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। দু-একটি কবিতা অবলম্বনে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

'সামরিক আইন জারী হওয়ার প্রত্যুষে মনোল্লাস'কে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে 'সঙ্গীত জলে যেন ভাসিছে তরণী' কবিতাটি। কবি বিস্তৃতভাবে সে-দিনের কথা বলেছেন। সেদিন আকাশ-বাতাস ছিল আনন্দোচ্ছল। সোনালী সূর্য-কিরণে ঝলমল করছিল চারদিক। কবি শয্যায় শুয়ে-শুয়ে স্বপ্ন দেখছিলেন আর গুন-গুন করে গাইছিলেন 'গীতাঞ্জলীর গান। সহসা তিনি শুনতে পেলেন বাইরে লোকজনের চীৎকার ও উল্লাসধ্বনি। তিনি দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন এবং খবরের কাগজে পড়লেন সামরিক আইন জারীর ঘোষণা। পরক্ষণেই তাঁর নজরে পড়ল কুষ্টিয়া শহরের পথে-পথে সামরিক বাহিনীর লোকজনের সগর্ব পদচারণা এবং সমাজ বিরোধীদের ধরপাকড়ের জন্য তাদের তৎপরতা। কবির মন আনন্দে নেচে উঠল। তিনি ভাবলেন জাতির জীবনের দুর্যোগ কেটে শুভ প্রভাতের সূচনা হয়েছে। সেই আনন্দোজ্জ্বল মুহূর্তে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি রচনা করলেন :

পাকিস্তান জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ!
চোরাচালানীর দফা শেষ
ভণ্ড নেতা নিরুদ্দেশ
জাগল আজি নূতন দেশ.

Dhaka University Institutional Repository



আয়ুব খান জিন্দাবাদ ! জিন্দাবাদ ! জিন্দাবাদ !
শান্তির ভাগ্যে সূর্যোদয়
আজ এসেছে পরম অভয়,
অত্যাচারী হল পরাজয়,
পাকিস্তান জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ ! জিন্দাবাদ !
অত্যাচারীদের অত্যাচার
সারটি বছরের দিন-রাতার
আজকে হল তার প্রতিকার
আয়ুব খান জিন্দাবাদ ! জিন্দাবাদ ! জিন্দাবাদ ![২৭]

পরের কবিতাটির রচনাকাল ১৭ই অক্টোবর, ১৯৫৮ সাল ; কবি এখানে বলেছেন, যুগে-যুগে মুসলমানদের কীর্তি অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল, কিন্তু হালে অত্যন্ত বিলুপ্ত ও ম্লান । তাই কবি সামরিক বাহিনীর নেতাদের আহ্বান করছেন মুসলমানদের জাগিয়ে দিতে ।

আয়ুব তরে মৃত্যু ও শান্তি, হতভাগাদের ঘরে
শক্তি সাহস ঝাঁকুনী জাগাও লৌহ-কঠিন করে ।
এই মুসলিম জাগিবেনা আর ; কেন জাগিবেনা ভবে,
কেন উঠিবেনা ; তার পিঠে জোর-চাবুক মারিতে হবে ।
আজিকে বুকে না দুর্দম বলে কোন সে উন্মাদনা,
শিকার-খুঁজে বসিয়াছে আবার চঞ্চল উল্কা ।[২৮]

---

২৭। পৃঃ ২৪

২৮। ইসলাম শুধু নাম শুনি আর, পৃঃ ৩২

Dhaka University Institutional Repository

## ১০  পাকিস্তান ভিত্তিক ব্যঙ্গ কবিতা

ব্যঙ্গ কবিতার মূল অবলম্বন থাকে সমকালের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের বা ব্যক্তি-চরিত্রের দুর্নীতি, ভ্রান্তি, অসঙ্গতি বা কদর্য দিক। ব্যঙ্গের তীব্র চাবুক হেনে কবিরা সমাজকে শোধরাতে চান। নতুন পাকিস্তানবাদী কবি ফররুখ আহমদ ও তালিম হোসেনের কবিতায় আমরা এধরনের লেখার নিদর্শন পেয়েছি। পাকিস্তান তাঁদের কাছে পরম সম্ভাবনাময় রূপে মনে হয়েছিল কিন্তু বাস্তবে এর চেহারা তাঁদের আশাহত করে। ফলে সামাজিক ভূমিকা পালনের জন্য তাঁরা ব্যঙ্গ কবিতার আশ্রয় নেন। এগুলি সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এই কবিরা ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছেন খণ্ড-খণ্ড ভাবে, পূর্ণাঙ্গ কাব্য তাঁরা প্রকাশ করেননি। কিন্তু এমন কেউ-কেউ ছিলেন যাঁদের পূর্ণাঙ্গ কাব্য পাওয়া যায়। সেগুলি নিয়ে এখানে আলোচনা করা হল।

### এক  যেহেতু

আবদুর রশিদ ওয়াসেকপুরীর 'যেহেতু'[২৮ক] ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন কবিতার মধ্যে কবির দরদী মনের কথা সহজেই লক্ষ করা যায়। একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে চালিত হয়ে তিনি কবিতা রচনায় হাত দিয়েছেন বলে এগুলির আবেদন বহুদূর পরিব্যাপ্ত। সমাজ-শোধরানোর উদ্দেশ্যেই যে তিনি ব্যঙ্গ কবিতার আশ্রয় নিয়েছেন, তা তিনি ভূমিকাতে স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন:

> মানবদেহের স্বাস্থ্য সারাবার জন্য যেমন ঔষধাদির প্রয়োজন, তেমনি সামাজিক দুষ্ট-বিষ-ক্ষত সারাবার জন্য প্রয়োজন ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের। আমি, লেখকদের কাছে

---

২৮ক। ঢাকা: নয়া দুনিয়া প্রকাশনী, অক্টোবর ১৯৫৪

Dhaka University Institutional Repository



ঔষধ চিরকালই তিক্ত, একটু কষ্টে সয়ে সেবন করলে দ্রুতই রোগ সেরে যায়। 'যেহেতু' তেমন একটি ঔষধ—যা তিক্ততায় ভরা, অথচ রোগ-মুক্তির ব্যাপারে অত্যাশ্চর্য [illegible]।

পাকিস্তানের সৃষ্টিতে পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ কোনো উন্নতি সাধিত হয়নি, বরং অবস্থা দিনে-দিনে অবনতির দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়েছে। অথচ প্রতি বছর আজাদী দিবস এসেছে, সরকারীভাবে মহোৎসব পালিত হয়েছে এবং দেশের উন্নতি করার জন্য জানমাল কোরবানী করার প্রতিশ্রুতি উচ্চকণ্ঠে ব্যক্ত হয়েছে। এই সীমাহীন প্রতারণা বিধৃত হয়েছে কয়েকটি কবিতায়। একটি কবিতায় দেখা যাচ্ছে, এক ব্যক্তি স্বাধীনতা দিবসে তার দুর্ভোগের কথা কর্তার কাছে বলতে গিয়ে হাকিমের চাল-ডালের কথা জানতে পেরেছে :

কোর্মা-পোলাউ দাও

আজাদীর দিনে ভাত খেতে হয় ভুলে গেলে নাকি তাও ;
কি বলিলে তুমি ; ঘরে চাল নেই ; ওকথা এনোনা মুখে,
বেশী খাব খালে পেটটি ফুলা নিয়ে থাকিতো পরম সুখে !
আজাদ দেশের আজাদ মানুষ খানার কি প্রয়োজন ;
শাহ ও বাদশার 'ডিনার' দেখিয়া ক্ষুধা হবে নিবারণ।
হাসিবা, কেঁদোনা তুমি
সোনা-সবুজে নাপাক কোরোনা আজাদ এ-পাক ভূমি।[২৮৩]

অথবা —

প্রাণধারণের প্রশ্ন উঠে ঃ ভুখারি, [illegible] নবাবী ভাব
বড়ের ঘরের কথা ভাঙ্গিবে প্রাসাদের তোলা [illegible] !
শীর্ণ কুক্ষি যাক—ধসে যাক
সোনা-তনু প্রাণে বেঁচে থাক
মগজে যার বাদশাহী খাব কেন হবে তার অনুতাপ,
সর্বনাশের চাতুড়ে চড়ে নতুন করিয়া জীবন লাভ ![২৮৪]

---

২৮৩। আজাদীর গান, পৃঃ ১৭
২৮৪। যেহেতু, পৃঃ ৫

সুতরাং এই স্বাধীনদেশে উর্ধ্বতনে চরণ তুলে নৃত্য করা ছাড়া গত্যন্তর কি ? বেকার জীবন, জীর্ণবস্ত্র ও শিরন্ন উদর নিয়েও সবাইকে স্বাধীনতার গান গাইতে হবে :

চরণ দু'খানি উর্ধ্বে তুলিয়া নাচ ঠেকাইয়া ধরিব ধর,
স্বাধীন দেশের মুক্ত হাওয়ায় আমরে আকাশ জয়া কর !
ছিন্নবস্ত্র গোবরেতে জড়া
রেশমী নিশান আসমানে উড়া
যেহেতু আমরা স্বাধীন আজিকে, সেহেতু সবাই ভক্তি কর
বেকার আছিস ? ক্ষুধার সময় খোদাকে ডাকই জীবন ভর ।[২৮৭]

একটি কবিতায় রাজনৈতিক নেতৃত্বের আন্তরিকতার প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে । সমকালীন নেতারা প্রকাশ্যে যা বলেন, গুপ্তভাবে নিজেরা তা বিশ্বাস করেননা । ইসলামের কথা তারা প্রায়ই উচ্চারণ করেন, কিন্তু নিজেদের জীবনাচরণে সর্বদা আনুগত্য দেখান অনৈসলামিক রীতি-নীতির প্রতি । রাষ্ট্র দেশের উন্নতি, সদাচরণ সবই এদের মুখে, জীবনচর্যায় নয় ।

আরবের সিন্ধু গুপ্তির টুপি দোরা যদি মোটা লোক,
আমাদের তরে আ-মরি মরু কাঁপিছে বিশ্বলোক !
বিড়াল দেখিলে হয়েছে পালাই সাহসে করিয়া ভয়,
বুকে করি শত পরিকল্পনা তাসের খেলায় রয় !
ফকি তাতা উড়াই আমরা সালাম সালাম পরে
'জিন্দে ইসলাম' বল গান করি কত উল্লাস ভরে ।[২৮৮]

'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপেষু' কবিতাটিতে আমাদের সমাজের একটি অতি করুণ দিক উদ্ঘাটিত হয়েছে । কবি শাহাদাৎ হোসেনের /১৩০০–১৩৬০/ মৃত্যুতে পাকিস্তানের প্রধান-মন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর শোকজ্ঞাপনকে উপলক্ষ করে কবিতাটি রচিত । শাহাদাৎ হোসেন

---

২৮৭। যেহেতু, পৃ: ৫

২৮৮। আমরা আমরাদের গজব, পৃ: ২০

Dhaka University Institutional Repository



সাহিত্যক্ষেত্রে প্রভূত সাফল্য লাভ করলেও আর্থিক দুরবস্থা তাঁর কখনো ঘোচেনি। দেশ বিভাগের পর ভাগ্যান্বেষণে তিনি ঢাকা এসেছিলেন এবং রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রে তাঁর একটি চাকুরিও জুটেছিল কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁকে ছাঁটাই করা হয়। ভগ্নমনোরথ কবি কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং প্রায় বিনা-চিকিৎসায় কলকাতার হাসপাতালে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী এক শোকবার্তাতে 'মর্মাহত' হবার কথা প্রকাশ করেন। এই রাজনৈতিক প্রতারণাকে কবি তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন।

আস্সালামু আলায়কুম শাহ আকুল জনাবে আলী
ব্যাঙেও শাঁসা হাসেও সেদিন দেখেছিল কাঁদি
যেদিন কবি শাহাদাৎ হোসেনের মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন
করলেন আপনি, কবির শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনার মতোন
এত সুন্দর ভাষা এই শোক সূচনায়
আপনার মুখে। আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেলাম
যখন স্বীকার করলেন তাঁর সাহিত্য সাধনাকে।
আমি অধম জানাই আপনাকে
তারিফ করবার মতো ভাষা নাই
আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন, এই দোওয়া চাই।[২৮৮]

নিজের কাব্য সাধনাকে উপলক্ষ করে সমকালীন সাহিত্য জগতের একটি ধারাকে আক্রমণ করেছেন কবি। চারপাশে যখন অনাহারে মৃত্যুবরণ করছে, কাপড়ের অভাবে কুলবধূরা গলায় দড়ি দিচ্ছে, তখন অনেক সাহিত্যিক নীতিবাক্য ও অলীক প্রেমের কাহিনী ফেঁদে আসর জমিয়েছেন। কবি বলছেন, তিনিও এই মহাজনবাণী অনুসরণ করবেন, কারণ এতে অর্থ আসে, যশোলাভ হয়, জীবনের নিরাপত্তাও থাকে।

আজ হতে মোর প্রাণান্তে আর সন্ধ্যা সেবা সার
সবাকে ডেকে আজি লুটে শুধু দিচ্ছি সেবা হোক সার।

---

২৮৮। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপেষু, পৃ: ৩৬

Dhaka University Institutional Repository



নূহের কাহিনী যার জানা নূহী কবিতায় তাঁই পাক,
লব সূরা পিয়ার কাহিনী কবিতায় ভরে থাক।
খেতে নাহি পেয়ে ঘুমাইল যারা কাতর করুণ সুখে
বুকের রক্তে রাঙায়ে ধরা মাটিকে যাহারা চুমে –
অসহায়, দেশে বিদায় মাগিল তাদের স্মরণ করে
লিখিওনা কিছু, সাবধান, যেন কবিতা যায় না ভরে।[২৮৮]

এছাড়াও 'যেহেতু' কাব্যে আরো অনেক শ্লেষপূর্ণ কবিতা রয়েছে। সমাজের বিভিন্ন দিকের নানা বৈপরীত্য, জীবনের পরাজয় ও আদর্শের বিচ্যুতি এসবের বিষয়বস্তু।

## দুই খোলাই কাব্য

সাতচল্লিশের পর পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম লীগের নীতি ও আদর্শ বিরোধী বিভিন্ন শক্তির বিকাশ ঘটতে থাকে। সামগ্রিকভাবে এবং অসাম্প্রদায়িকতা, ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা এগুলির মূল অবলম্বন ছিল। এই শক্তিসমূহের পারস্পরিক ঐক্যের মাধ্যমে রাজনীতি পুনর্গঠিত হচ্ছিল। এই বিরোধ শুধু রাজনীতিতে সীমিত থাকেনি, তা পরিব্যাপ্ত ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতি চিন্তায়ও। সে পটভূমিতে পাকিস্তানবাদী কবিরা অনেক ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেন। সেসময়ে পাকিস্তানবাদের আবেদন ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছিল, কবিতাগুলিও তত হচ্ছিল আক্রমণাত্মক ও অমার্জিত রুচির। তাদের বিষয়বস্তু ছিল নতুন শক্তিসমূহ ও তাতে বিশ্বাসী নেতা ও কর্মীরা। কবিতাগুলি বেশির ভাগ প্রকাশিত হয়েছিল 'তমদ্দুন মজলিসের' মুখপত্র সাপ্তাহিক 'সৈনিক'-এ। এ-ধরনের ২১টি কবিতা নিয়ে সংকলিত হয়েছে 'খোলাই কাব্য'।[২৮৯] কবিরা সবাই ছদ্মনামে। এঁদের মধ্যে আছেন জালাল, খোলখান, মুন্সী তকলসবাজ, টিয়ারলাল, লোকমান বয়াতী, আবদুল্লা বয়াতী,

২৮৮। ঐ মোর কবিতা-রাণী, পৃঃ ১৩-১৪
২৮৯। ঢাকা : নয়া দুনিয়া পাবলিকেশন্স, জানুয়ারি ১৯৬৩

Dhaka University Institutional Repository

গদাই শেঠা হাজারী, খুদুরাম খান, শাহ মেয়াজ্জা সাউদ, কাকাখাড়ি, জাগেশ্বরী মুরারী, মিলনারাম, শাহনাজ খান, সদিা মুন্তো ও এ্যাবটনী ফিরিংগী । ছদ্মনাম নেওয়ার কারণ হতে পারে একাধিক ঃ প্রথমত, কবিতাগুলি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে স্পষ্টভাবে রচিত, সেজন্য রচনাকারদের স্বনামে প্রকাশিত হওয়া সুবিধাজনক ছিলনা, দ্বিতীয়ত, রচয়িতারা ছদ্মনামের দ্বারা নিজেদের স্বরূপকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, যেমন খুদুরাম খান, মেয়াজ্জা সাউদ, গোলবাজ, ইয়ারজাদ্র প্রভৃতি নাম বিশেষ ধরনের চরিত্রকে দ্যোতনা করে । সবকিছু মিলিয়ে দেখা যায়, কবিতাগুলিতে সাহিত্য রচনা না-করে ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার ইচ্ছা প্রকাশিত হয়েছে বেশি ।

প্রথম কবিতাটিতে অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্টভাবে কবিদের আদর্শগত মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায় । পাক-বাংলা /পূর্ব বাংলা/ ভৌগোলিক, অধিবাসীদের [illegible] ও পোশাক-পরিচ্ছদ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সাহিত্য-সংস্কৃতি দিকের বিচারে রাঢ়-বাংলা /পশ্চিম বাংলা/ থেকে পৃথক ও উন্নত — একথাটি 'ভাষায়' খুব স্পষ্ট করে বলেছেন । কবিতাটির একটি স্তবক নিম্নরূপ ঃ

> পাক-বাংলায় সাদা সোনার ফসল অপার,
> রাঢ় – বাংলায় সেরা কদর পায় মদ [illegible] ।
> পাক-বাংলায় সব মানুষের সমান অধিকার,
> রাঢ়-বাংলায় মানুষ শুধু রামভিটা তার ।
> বিশ্বাসের মধ্য এদের সকল সমাচার,
> 'মৌলিক' নাম দিয়ে ওরা লোকের মাথা খায় ।
> পাক-বাংলায় রাখে এরা দীঘি ও মন্দির
> মসজিদ আর যাত্রার আসরে রাখেন মজার্দির ।
> পাক-বাংলায় সংখ্যালঘু পায় যে খাঁটি মান,
> রাঢ়-বাংলায় পিঠে 'ডাঁগা' উঁচিয়ে গদা পান ।।[২৮৩]

---

২৮৩। পাক বাংলা ঃ রাঢ় বাংলা, পৃঃ ১২

Dhaka University Institutional Repository



১৯৫৭ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী কাগমারীতে একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। সম্মেলনের আয়োজন, পরিকল্পনা ও সাফল্য দেখে তৎকালীন শক্তিগুলি বিচলিত হয়ে পড়ে। ফলে নানাভাবে আক্রমণ হয় সম্মেলনের উপর। এ-বিষয়ে আমরা অন্যত্র সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। ব্যঙ্গ কবিতার মাধ্যমেও সে-আক্রমণ পরিচালিত হয়েছিল। নিচের কবিতাংশটি সে-প্রসঙ্গের একটি দীর্ঘ কবিতা থেকে নেওয়া।

ঢোঁড়া বুদ্ধি বোবা কাজী
আশির্বাদী সদর খান,
আসল কথা রাখলে চাপা
মা পুকুরির সু-সন্তান ।।
নাচের গুরু বিরোধ সান্যাল
বাঁদের কোণা ঐ হনুমান,
মিলন কেন্দ্র হচ্ছে বাঁশি
ভাবেন যারা নয় অনুমান ।।
তেমাবেশ নাসর পুর
উঠলো হয়ে সরগরম
এদিক ওদিক হচ্ছে বুঝি
পরিস্থিতি হয় চরম ।।
'নিশাবি' দিচ্ছে টেবে
জয়ং ভটাং দেয় শ্লোগান,
ভাসানুজী দেয় শুনিয়ে
'সোনাসোনাকম পাকিস্তান' ।।[২৮৬]

এখানে কাজী ও বিরোধ সান্যাল নামের আড়ালে যথাক্রমে সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত কাজী আবদুল ওদুদ ও প্রবোধকুমার সান্যালের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং মাওলানা ভাসানী হয়েছেন ভাসানুজী। তিনি সম্মেলনে পাকিস্তানী আদর্শ ও রাষ্ট্রীয় সত্তাকে 'ওয়ালাইকুম সালাম' জানিয়েছিলেন। শেষোক্ত পংক্তিটি তারই ইঙ্গিতবহ।

---

২৮৬। মোসলেম, মাঘমাসী ১৩৬৪-চৈত্র, পৃঃ ৪১

সেকালের রাজনীতিতে আরো একজন বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান । রাজনীতিতে তাঁর বিরোধী পক্ষীয়রা তাঁকে অর্ধশিক্ষিত, মূর্খবিলাস, গণতন্ত্র ও শাহেদ আলীর /প্রাদেশিক পরিষদের ডেপুটি স্পীকার/ হত্যাকারী বলে ঘৃণা করত । সে মনোভাবে চালিত হয়ে রচিত হয়েছে একটি কবিতা ।

শুনেছি বটে শ্যাক সাহেব
ছল কিসিমে ভরেন ভোল,
খলাকে তাই বলেন চোর
দেশের মধ্যের খোঁড়েন কবর,
বিদ্যা ফাঁকা মাঠ সমান
তাইতো নেতার আসন চান ।।
সকল জায়গায় রাখেন ইট
গণতন্ত্রের ভাঙেন পিঠ
সুযোগ পেলে ভাঙেন ঘাড়
মারেন আলী শাহ বাহাদুর ।[২৮২]

ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহারলাল নেহেরুকে উপকথার শিয়াল পণ্ডিতের সঙ্গে তুলনা করে রচিত হয়েছে 'ভেংচী' কবিতাটি ।

পণ্ডিতজী সব আদাতে করেন পণ্ডিতী
খণ্ডিত ভারত জাগিয়ে মুখে, চালান হিংসা-নীতি ।।
যবে ঘোরেন পণ্ডিতজী, পরের মুণ্ডু খান,
সাঁঝ সকালে রাজনীতির বস্তাপচা গান,
হ্যাডক্লিফের নেত্রী হবে শিক্ষা অনেক পান;
সাধনাতে সে গায়-মনীষীদের শিরে রক্ত কাটি ।।[২৮৩]

---

২৮২। স্যারণাস্ত্র, শ্যাক সাহেব, পৃঃ ৪৯-৫০
২৮৩। শাহবাজ গান, ভেংচী, পৃঃ ৬৬

Dhaka University Institutional Repository



এতদ্ব্যতীত এই সংকলনে আরো অনেক কবিতা আছে যেগুলিতে একই রুচি ও সাহিত্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে একটি কবিতায় অনুরূপ যুবকের শক্তিদীপ্ত পরিচয় আছে। পাকিস্তানের শাসনে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ প্রতিফলিত হয়নি, বরং গণবিরোধী আমলাতন্ত্রই বেড়ে চলেছে, কবি সে ভ্রান্তি প্রকাশ করেছেন একটি সরল কবিতায়।

স্বাধীন হয়ে দেখতে পেলাম
সঠিক আমলাতন্ত্র
নাকে দড়ি দিয়ে আমায়
চালায়, যেমন যন্ত্র।
গর্দানে সে সোয়ার হয়ে
চালায় আধিপত্য;
আমার কাছে দাবী করে
শুধু আনুগত্য।[২৫৮চ]

১১ ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতা

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত সংঘর্ষের সময় পূর্ববাংলার কবিরা তীব্রভাবে আলোড়িত হয়েছিলেন। যুদ্ধ পূর্ব বাংলায় সম্প্রসারিত না-হলেও এই কবিরা কল্পনায় যুদ্ধকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং অনেক গল্প-নাটক-কবিতা-প্রবন্ধ-গান রচনা করে তাঁদের উত্তেজিত ও উদ্দীপ্ত মনোভাবকে প্রকাশ করেছেন। কবিতায় তাঁদের সেই জাতীয়তাবাদী চেতনা তীব্র ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে।

---

২৫৮চ। কাছাকাছি, [illegible], পৃঃ ৫১

Dhaka University Institutional Repository



ক. একশ্রেণীর কবি পাকিস্তানীভাবে ভাবিত হয়ে কবিতা রচনা করেছেন। পরশক্তির হামলা প্রতিরোধ করতে গিয়ে পাকিস্তানীরা নতুন করে ঐক্যবদ্ধ ও উজ্জীবিত হয়েছে এবং শত্রুর হামলা প্রতিহত করতে দৃপ্তপদে এগিয়ে চলেছে — মোটামুটিভাবে এই মনোভাবটি এ-কবিতাগুলিতে লক্ষ করা যায়।

১. শান্তিতে মোরা কপোত কিন্তু
সংগ্রামে শার্দুল যে
ঐক্য-ঈমান-শৃঙ্খলা শিখা
এই আজ নির্দেশ সে।
এতদিন সেই বোধ ছিল প্রচ্ছন্ন
প্রমাণিত হই তারা যদি দুশমন
শত্রুর যত দুষ্ট অলীক কথা
আকাশ বাণীর ক্রুর রচনা
কুণ্ঠিত মোহমুগ্ধ সে।
দুর্বার তাই হামলা করেছি
সংঘাতে ভঙ্গুর যে।[২৫৯]

২. রক্তের পথে পেয়েছি আমরা
প্রাণের এদেশ পাকিস্তান
সত্যের তরে রুধির ধারায়
আমরা রাখবো তাহার মান।[২৬০]

৩. হামলা করেছ, পাক জোয়ানের পরে
দুশমন আমি কভু না ক্ষমা, কভু না।
আগুন জ্বেলেছ এই শান্তির ঘরে
জালিম তোমাকে না ছেড়ে আমি মরব না।[২৬১]

---

২৫৯। আ,ন,ম, ফজলুর রহীম, এদেশ আমার, চির উন্নত শির, /দেশপ্রেমমূলক কাব্য সংকলন/, পাকিস্তান কাউন্সিল, ১ম প্রকাশ ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৬, পৃঃ ২ – ৩

২৬০। আবদুর রহীম খান, সত্যের পথে জেহাদী জোয়ান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪০ ৫

২৬১। তালিম হোসেন, ক্ষমা করবনা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩

Dhaka University Institutional Repository



৪. পেশোয়ার থেকে এই সুদূরের চট্টল অবধি
জনতা-জোয়ার দেখি বিশাল হয়ে যায়।
নদী-মাঠ সমস্ত পিছে ফেলে প্রাণের জোয়ার
ভেঙে সব বাধা ভয় প্রতিরোধ এবং পাহাড়
এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দীপ্ত প্রাণাবেগে ধায়
বিশাল সমুদ্র হয়ে জেগে ওঠে নব প্রাণ-নদী।
উচ্ছল আবেগ নিয়ে সংহত হয়েছে কোটি প্রাণ
জনতা-সমুদ্রে তাই জাগে এক কলকণ্ঠ গান।[২৬২]

খ. দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিরা জাতীয়তার উদ্বোধনে ইসলামকে অবলম্বন করেছেন এবং এ-যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধের সমতুল্য ভেবে সব মুসলমানকে জেহাদে অংশ নিতে আহ্বান জানিয়েছেন। মুসলমানরা যুগে-যুগে যুদ্ধ করেছে এবং প্রতি যুদ্ধে ইসলাম নতুনভাবে সঞ্জীবিত হয়েছে — এ-সত্যতা এ-শ্রেণীর কবিদের রচনায় পাওয়া যায়।

১. জাগে জেহাদ! জাগে জেহাদ
এল জেহাদের দিন!
চল মুজাহিদ জেহাদী আযানে
উদাত্ত সঙ্গীন।।
চল নিয়ে দিলে আল্লার নাম
খুন খোশরোজ এল পয়গাম
গাজী না শহীদ হবে তুমি জানো
দ্বিধা সংশয়হীন।[২৬৩]

২. মোরা মুজাহিদ মুসলিম বীর
এক আল্লাহ বিনা কারও সামনে
নোয়াতে শিখিনি শির;

---

২৬২। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, জন্ম স্পন্দনের গান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০

২৬৩। ফররুখ আহমদ, জাগে জেহাদ, আবদ-আল্লাহ জহীর-উদ-দীন (সংকলন ও সম্পাদনা), জেহাদের ডাক, ন্যাশনাল রাইটার্স অ্যান্ড ফ্রন্ট, আবদ আল্লাহ একাডেমী, ঢাকা সেপ্টেম্বর ১৯৬৫, পৃঃ ৩১

Dhaka University Institutional Repository



উদ্যতে মোহাম্মদী মোরা
প্রতিজ্ঞায় দুর্জয় কঠোর
শিশু মহিমার
মোরা মুজাহিদ মুসলিম বীর।[২৬৪]

গ. শেষোক্ত তৃতীয় কবিতায় জাতীয়তাবোধের প্রেরণা পূর্ব বাংলার প্রকৃতি-ঐতিহ্য-আচার-সংস্কারকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছে। এই কবিরা নতুনভাবে দেশপ্রেমের আবেগ অনুভব করেছেন বিচ্ছেদের মধ্যে — তা এতদিন সুপ্ত ছিল এবং এই যুদ্ধের অভিঘাতে প্রবল ধারায় উৎসারিত হয়েছে।

১. প্রচণ্ড সিংহের মত উদ্দাম ব্যাঘ্রের মত
সমস্ত আমাকে তুমি অকাতরে গড়েছ, তুমি অস্ত্র
শত্রুদের হাতে, তাই
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আমি যদি, প্রতিরোধে
প্রখর সূর্যের মত আমি জ্বলি
তোমার বিচিত্র স্নেহরসে শত ভিন্ন শত শিখা আমি
ঘরে ও বাইরে ভালবাসতে ও অভয়ে দাঁড়াতে
ভুল করি নাই কোনদিন।[২৬৫]

২. যেমন নদীকে তার স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়না
পাখীকে তার গান থেকে
এবং ফুলকে তার সৌরভ থেকে
তেমনি আমার সত্তা থেকে এই দেশকে।
... ... ...
রক্তের দামে কিনেছি এদেশ
আমার স্বদেশ, তবে আর কেন ভয়?[২৬৬]

৩. শহীদের আত্মদানে ধর্ষিত মাটিতে ফোটে ফুল
সুপ্রচুর মহিমায়, গাছ বেড়ে ওঠে, ধ্বংসস্তূপে
বাগে কারুকাজ — আন্দোলিত কালের শাখায়
প্রাণবন্ত হে স্বদেশ তুমি রক্ত গোলাপ আমার।[২৬৭]

---

২৬৪। আবদ-আল্লাহ জহীর-উদ-দীন, মুজাহিদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯
২৬৫। হাসান হাফিজুর রহমান, বিপদে বিষণ্ন বর্ম, চির উন্নত শির, পৃঃ ৩৫-৩৬
২৬৬। আবু হেনা মোস্তফা কামাল, আমার সত্তা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬-৭
২৬৭। শামসুর রহমান, চেনা রাস্তাগুলি দিয়ে, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩

১২ আলোচ্য বিষয়ে রচিত আরো কিছু কাব্যের তালিকা

আলোচ্য পর্ব আদর্শ অনেক কবিকেও আকৃষ্ট করেছিল। কেউ-কেউ আদর্শের প্রেরণায়, আবার কেউ-কেউ নিছক কবিযশপ্রার্থী হয়ে স্বীয় সীমিত সামর্থ্য নিয়ে এ-বিষয়ে কবিতা লিখেছেন। বলাবাহুল্য, এগুলির কাব্যমূল্য তেমন কিছু নয়। 'বাংলা সাহিত্যের গ্রন্থপঞ্জী'[২৬৮] অবলম্বনে এ-ধরণের কাব্যের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

১। মোঃ আবদুর রশিদ ছিদ্দিকী, পাকিস্তান বিষয়ক কবিতা, ১৯৪৭

২। মীজানুর রহমান, পাকিস্তানী গান, ১৯৪৮

৩। নূর আহম্মদ শাহ, কায়েদে আজম, ১৯৪৯

৪। শেখ মোছলেম আহমদ, শাহরাবান জহুরা, ১৯৪৯

৫। দেওয়ান আবদুল হামিদ, পাকিস্তান কাব্যমঞ্জরী, ১৯৪৯

৬। মোহাম্মদ হোসেন, গুলবাগে পাকিস্তান, ১৯৫০

৭। জহীর উদ্দীন মোহাম্মদ হাসেম চৌধুরী, দিন আগত ঐ মুসলিম জাগ কই, ১৯৫২

৮। নূর আহম্মদ শাহ, তওহীদ, ১৯৫৪

৯। এস,কে,এম, রুস্তম আলী, ১ম জাগিয়াছে পাকিস্তান, ১৯৫৫
২য় জাগিয়াছে পাকিস্তান, ঐ

১০। আ,ন,ম, বজলুর রশীদ, মরুসূর্য, ১৯৫৬

১১। মাহমুদ লস্কর, আমাদের আজাদী, ১৯৫৬

১২। সদরুদ্দীন, ১৪ই আগষ্ট ১৯৫৬

১৩। সাদেক মিয়া, আজাদ প্রভাত, ১৯৫৬

১৪। মীর আবদুল মতীন, আজাদী উৎসবে, ১৯৫৭

১৫। তাজাম্মুল হোসেন চৌধুরী, মহরম, ১৯৫৭

১৬। সৈয়দ আসাদউদ্দৌলা সিরাজী, পূর্বনাদ, ১৯৫৮

১৭। মীজানুর রহমান, জাতির জীবন-তরী সাগর দোলায়, ১৯৫৮

১৮। আসাদ আল্লাহ জহীর উদ্দীন, নও হেলাল, ১৯৬০

১৯। আবুল হাসেম, খোসরু নামা, ১৯৬০

২০। ইকবাল নজরুল ফালাহ সোসাইটি, ইনকেলাব, ১৯৬০

২১। মীজানুর রহমান, ইকবাল নজরুল নামা, ১৯৬০

২২। মুহম্মদ আবু বকর, কাফির নামা, ১৯৬১

২৩। আবুল হোসেন, জিন্নাহ নামা, ১৯৬১

---

২৬৮। শামসুল হক, ১ম সং, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository



২৪। এস,এম আনসার আলী, নূর-ই মাহ্মুদ, ১৯৬২

২৫। আহমদ নওয়াজ, নবীগীতিকা, ১৯৬৩

২৬। শ্যামাপদ সর্বন, রসুল বাবা, ১৯৬৩

২৭। এমদাদ আলী দেওয়ান, দীওয়ান-ই-মুজাক্কির, ১৯৬৪

২৮। ইকবাল নজরুল ইসলাম সোসাইটি, ইকবালিকা, ১৯৬৪

২৯। আখলাকুর রহমান, জেহাদ ময়দান, ১৯৬৫

৩০। মীর আবদুল মতীন, এগিয়ে চল, ১৯৬৫

৩১। দেওয়ান এম হামিদ ও মাহমুদ মস্কুর (সম্পাদিত), জেহাদের গান কবিতা, ১৯৬৫

৩২। আহমদ নওয়াজ, ক. আজাদী দিবস, ১৯৬৫

খ. ঈদ-এ-মিলাদ উননবী, ১৯৬৫

গ. ঈদ-উল-আযহা, ১৯৬৬

ঘ. ঈদ-উল-ফেতর, ১৯৬৬

ঙ. কায়েদে আজমের জন্মদিবস, ১৯৬৬

চ. মোহররম, ১৯৬৬

ছ. নূরাকান, ১৯৬৬

৩৩। এস,এম,এ, রশীদ, মুসলিম কাহিনী, ১৯৬৮

৩৪। কুসুম আলী আহমদ, শোক সাগর, (মিলাদ সিন্ধুর পদ্যরূপ), ১৯৬৯

৩৫। মকবুল হোসেন, বিশ্বধর্মে মুসলিম শিক্ষা, ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository



# অষ্টম অধ্যায়

## উদারনৈতিক মানবতাবাদের কবিতা

Dhaka University Institutional Repository



১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের ফলে পূর্ব বাংলার অর্থনীতিতে কয়েকটি গুরুতর পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু জমিদার জোতদার তালুকদার মহাজন ব্যবসায়ী প্রভৃতি হিন্দুসম্প্রদায় দেশত্যাগ করে এবং মুসলমানরা এদের স্থান দখল করে। ফলে শোষণের পরিবর্তন না-হলেও শোষক শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক চরিত্রের পরিবর্তন হয়। দ্বিতীয়ত, ১৯৫০ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের ফলে এবং কলকারখানা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারের কারণে সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় শুরু হয় এবং গ্রামে কিছু পরিমাণে হলেও পুঁজির প্রতিষ্ঠা ঘটে। তৃতীয়ত, পাকিস্তান আমলে অর্থনীতির এই স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত করার নানাবিধ চেষ্টা চলে। ভূমি সংস্কারের নামে মাথাপিছু জমির পরিমাণ সর্বোচ্চ একশ বিঘার স্থলে তিনশ পচাত্তর বিঘা করে কার্যত সামন্ততন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়, এবং পূর্ব বাংলার শিল্পায়নকে দেশীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে না দিয়ে শিল্প লাইসেন্স, জমি, ঋণ ও বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের তথা সাম্রাজ্যবাদী বড় পুঁজির উপর নির্ভরশীল করে তোলা হয়।[1] এভাবে পাকিস্তান আমলে এদেশের গ্রামাঞ্চলে একটি কুলীন আধা-সামন্তবাদী শ্রেণী ও শহরাঞ্চলে কুলীন মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্ম হয়।

এই সময়ের মধ্যে শোষক শ্রেণীদ্বয়ের পুঁজি সঞ্চিত হলেও সাধারণ মানুষের জীবনে দারিদ্র্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৯ সালে একজন কৃষি শ্রমিকের বার্ষিক আয় ছিল ৪৯৭ টাকা, ১৯৬৬ সালে তা পরিণত হয় ৪০৯ টাকায়,[2] ১৯৪৯–৫০ সালে মাথাপিছু চাষযোগ্য জমির পরিমাণ যেখানে ছিল .৫৭ একর, ১৯৬০–৬৪ সালে তা হয় .৪১ একর;[3] পরিবার পিছু ঋণের পরিমাণ ১৯৫৬ সালে ছিল ৮৬ – ৩০০ টাকা এবং ১৯৬৪ সালে তা দাঁড়ায় ৪০৭ টাকায়।[4] এ প্রক্রিয়ায় গ্রামাঞ্চলে একদিকে জমির কেন্দ্রীভবন ঘটতে থাকে, অন্যদিকে বৃদ্ধি পায় ভূমিহীন চাষীদের সংখ্যা।

---

১। বদরুদ্দীন উমর, 'বাংলাদেশে সামন্ত সংস্কৃতি ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব', <u>বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমস্যা</u>, /ঢাকা ঃ মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭৬/, পৃঃ ১-৭

2. Swadesh R. Bose, 'Trend of Real Income of the Rural Poor in East Pakistan 1949-66', <u>The Pakistan Development Review</u>, Vol. VIII, 1968, Table V, p.457

3. Ibid, Table II, P. 456

4. (Dr) Mirza Shahjahan, 'Trend of Per family Indebtness in Bengal', <u>Agricultural Finance in East Pakistan</u>, (University of Dacca, Deptt. of Economics, 1968), p. 26

Dhaka University Institutional Repository



এই সময়ে শিক্ষার মোটামুটি প্রসার ঘটে। নতুন-নতুন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বাড়ে। শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, অনুপাতে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাও বাড়ে। ১৯৪৭ সালের উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩৯৮১, ১৯৬৭ সালে সে-সংখ্যার পরিমাণ হয় ৪,৩৯০;[5] এই সময়ে ছাত্র সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫২৯,০২০ ও ১,০৫৩,৫৩৬ জন।[6] ১৯৫৩ সালে বিভিন্ন ধরনের কলেজ ছিল ৭৫টি, ১৯৬৭ সালের মধ্যে আরো নতুন ১২১টি কলেজ স্থাপিত হয়;[7] ছাত্রসংখ্যাও ২৪,৮৪৯ থেকে উন্নীত হয় ১,৪৫,৫৪৩-এ।[8] দেশ বিভাগের কালে ঢাকাতেই ছিল পূর্ববঙ্গের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় এবং এতে পড়াশোনা করত ১৬২০ জন শিক্ষার্থী।[9] পরবর্তীকালে রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও সাভারে তিনটি নতুন সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকাতে একটি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯৬৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পাঠরত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৮,৮৩১ জন।[10] ১৯৪৯–৬৮ সময়ের মধ্যে স্নাতক ডিগ্রি প্রাপকদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৮০ হাজার এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রাপকদের সংখ্যা ছিল আনুমানিক ২১ হাজার।[11]

দেশের শিক্ষার হার কিন্তু বিশেষ বাড়েনি, কারণ সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কথা ক্রমিক উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হলেও বেশি ঝোঁক দেওয়া হয়েছে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের দিকে। উল্লিখিত অনুযায়ী উচ্চবিদ্যালয়ে মহাবিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে যথাক্রমে ২ গুণ, ৬ গুণ ও ৫.৫০ গুণ।

এই নতুন শিক্ষা প্রাপকদের মধ্য থেকেই এসেছে পূর্ববাংলার ক্রমবর্ধিষ্ণু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। এদের মধ্যে রয়েছে কেরানী, টাইপিস্ট, স্টেনোগ্রাফার, অফিসার, আমলা, প্রকৌশলী, ডাক্তার, ম্যানেজার, প্রচারবিদ, শিক্ষক, অধ্যাপক, সাংবাদিক, শিল্পী, উকিল ও এডভোকেট প্রভৃতি। তুলনামূলকভাবে পুঁজির মালিক বুর্জোয়া শ্রেণী কিংবা বিত্তহীন প্রলেতারিয়েতের চেয়ে এদের বিস্তার ও বৈশিষ্ট্য দুইই বেশি। দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতিতে এদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি সর্বাধিক স্পষ্ট।

---

5. Pakistan Statistical Year Book 1967, (Karachi : Govt. of Pakistan), Table 163
6. Ibid, Table 164
7. Ibid, Table 174
8. Ibid, Table 176
9. Ibid, Table 178
10. Ibid, Table 179
11. A. Farouk, A.N.M. Muniruzzaman, T. Islam, Science Trained Manpower (University of Dacca, Bureau of Economic Research, 1972), Table 5, p. 8

Dhaka University Institutional Repository



এই সমস্ত শ্রেণি ঢাকাসহ বিভিন্ন বিভাগীয় ও জেলা শহরকে কেন্দ্র করে বিকাশ লাভ করে। এগুলির মধ্যে ঢাকার গুরুত্ব সর্বাধিক। পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সাহিত্য-সংস্কৃতি মূলত ঢাকা কেন্দ্রিক হওয়ায় এই নগর সম্পর্কে সামান্য আলোচনা দরকার। সাড়ে তিনশ বছরের ঐতিহ্যশালী হলেও ১৯৪৭ সালের পর থেকে এর যথার্থ বিকাশ শুরু হয়। রাজধানী শহর হিসাবে শিক্ষা, প্রশাসন, ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে এর গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং অনুপাতে পরিবর্তিত হয় এর আকার আয়তন জনসংখ্যা ও প্রকৃতি। দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা থেকে উত্তরে রমনা পর্যন্ত বিস্তৃত বারো বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট ও আড়াই লাখ লোক অধ্যুষিত ১৯৪৭ সালের ঢাকা, ১৯৭১ সালে কমলাপুর, তেজগাঁও, ধানমণ্ডি, মোহাম্মদপুর, মীরপুর, গুলশান, টঙ্গীকে গ্রাস করে চল্লিশ বর্গমাইলে বিস্তৃত হয়, এবং লোক সংখ্যা স্ফীত হয় দশ লাখের উপরে। এই বিরাট অঞ্চলের এলাকায়-এলাকায় গড়ে উঠেছে শিক্ষা-ব্যবসা-শিল্প ও প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু এবং এর চারপাশকে বেষ্টন করে আছে নারায়ণগঞ্জ, আদমজীনগর, তেজগাঁ, টঙ্গী ও হাজারীবাগের শিল্পাঞ্চলসমূহ।

ঢাকার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে চার কারণে : প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়, ভারত থেকে মুহাজিরদের আগমনে, শিক্ষা-ব্যবসা-প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এবং গ্রামীণ অর্থনীতির ক্রমিক ধ্বসের ফলে ভাগ্যবিড়ম্বিত লোকদের ঢাকায় আশ্রয় গ্রহণে।[12] ১৯৬৭-৭০ সালের হিসাব অনুযায়ী এই জনসমষ্টির ৪৫% এর মাসিক আয় দুহাজার টাকার মধ্যে, ৩০ শতাংশের আয় দুহাজার থেকে ছহাজারের মধ্যে, ১৪ শতাংশের আয় ছহাজার থেকে দশ হাজারের মধ্যে, এবং বাকি ৮ শতাংশের আয় দশ হাজারের ঊর্ধ্বে।[13] এই জনসমষ্টির এক বৃহৎ অংশ, বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা ছিন্নমূল মানুষেরা, বাস করে শহরের বিভিন্ন বস্তিতে। ১৯৭২ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে এদের সংখ্যা প্রায় ৪ লাখ।[14] বাঁশ, বেত, কাঠ, কাগজ, ঘাস, কাদা, পাটকাঠির তৈরী ছোট-ছোট কুটিরে

---

12. 'Urbanisation in Bangladesh', Squatters in Bangladesh Cities, ( A Survey of Urban Squatters in Dacca, Chittagong and Khulna, 1974), (University of Dacca, The Centre for Urban Studies, Deptt. of Geography, 1976), pp. 11-12.

13. Dr. Mahbub-ud-Din Ahmed, Urban Housing Demand Survey in Bangladesh, A Research Report, (University of Dacca : Institute of Statistical Research Training, 1974), Table 4, P. 25.

১৪। 'বস্তির শহর ঢাকা: একটি সমীক্ষা', সাপ্তাহিক বিচিত্রা, জুন ৮, ১৯৭৩, পৃ: ২৯

বস্তিবাসীরা সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকে এরা বাস করে। প্রায় পুরো একটি পরিবার বাস করে এক কামরায়। পরিবার বলতে স্বামী, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, শিশু, বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী সবাই থাকে এবং এ অবস্থায় এদের পারিবারিক ও যৌন জীবনে কি বিপর্যয় আসতে পারে তা কল্পনা করা দুঃসাধ্য নয়। সকল প্রকার অপরাধ সমাজ বিরোধী কাজের উৎস এখানেই। চোর বাটপার পকেটমার দেহোপজীবী ভিখারী কুলিমজুর ফেরিওয়ালা রিক্সা ঠেলাগাড়ির চালক দিন মজুর ঠিকাওয়ালা সরকারী বেসরকারী অফিসের পিয়ন চাপরাশী বেয়ারা এখানেই বাস করে। এখান থেকে অনেক মেয়ে অনুমোদিত পতিতালয়ে গিয়ে উঠে। ঢাকার তিনটি অনুমোদিত পতিতালয়ের ১৫৫০ জন পতিতার ৫৫ শতাংশ এ পথে নেমেছে অর্থনৈতিক কারণে।[১৫]

ঢাকার জনসংখ্যার ২৪ শতাংশের মধ্যে পড়ে মধ্য, উচ্চমধ্য, উচ্চশ্রেণীর লোকজন।[১৬] এদের বাসস্থান ছিল ধানমন্ডী, গুলশান, বারিধারা, নীলক্ষেত, পুরানা পল্টন, শান্তিনগর, মতিঝিল ও উয়ারী প্রভৃতি আবাসিক এলাকায়। এদের জীবনের সুখের উপকরণ অনেক। পাকাবাড়িতে এরা বাস করে, পৌর সভার প্রদত্ত বৈদ্যুতিক আলো, পানি পায়। ফ্রিজ, টেলিফোন, টেলিভিশন, রেডিও অনেকেরই আছে, কেউ-কেউ গাড়ীরও অধিকারী।

এভাবে বিভিন্ন জীবনধারার জটিলতা নিয়ে গড়ে উঠেছে ঢাকার আধুনিক সমাজ।

আধুনিক নগরী হিসাবে ঢাকার বিবর্তনের আলোচনাও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হবে। দেশবিভাগের আগের ঢাকা সম্পর্কে আশালা ঢাকাবাসী একজন কবি লিখেছেন:

> যদি বলি, একজন ভিস্তি রোজ দুবেলা আমাদের বাড়িতে পানি দিয়ে যেতো, বড় বড় রাস্তায় পানি ঢালতো মশকের মুখ খুলে রেখে, একজন বাতিওয়ালা রোজ সন্ধ্যেবেলা মইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা একটা বাতিদানে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে যেতো তাহলে কি পুরোনো ঢাকার কোনো ছবি ফুটে উঠবে? ... আর যাঁরা

---

১৫। ডাঃ আরিফুর রহমান ও আবু মুসা, 'ঢাকার পতিতালয়', সাপ্তাহিক বিচিত্রা, মার্চ ৮, ১৯৭৭, পৃঃ ২২।

১৬। Dr. Mahbub-ud-Din Ahmed, Ibid, Table 4, P. 25.

Dhaka University Institutional Repository



ভাষাআন্দোলনের মধ্যে । সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের কল্যাণে প্রত্যক্ষ কার্য সাম্প্রদায়িকতা ও সামন্তবাদী ধারণা এদের মন থেকে মুছে যায় । চার, বাংলা এক অংশ সৃষ্টি হয়েছে সমাজ বিকাশের স্বাভাবিক পদ্ধতিতে । গ্রামবাংলার সমাজ থেকে যারা উঠে এসেছে তাদের মধ্যে গ্রামপ্রীতি, লৌকিক মানসিকতা, সামগ্রিক চেতনা ও সম্মিলিত ধ্যানধারণা বর্তমান । পাঁচ, এই সময়ের শেষাংশে শিল্পায়নের দ্রুত বিকাশ ঘটতে থাকলে তরুণ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নিঃসঙ্গতাবোধের অনুভূতি জাগ্রত হয় ও হতাশা নিঃসঙ্গতা শূন্যতা এদের মানসে ছায়া ফেলে ।

এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে জন্ম নিয়েছেন একদল শক্তিশালী কবি, যাঁদের কবিতা সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক মানবতাবাদের মূল লক্ষণে চিহ্নিত । এদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সূক্ষ্ম পার্থক্য অবশ্যই আছে, সবার চৈতন্য-সাফল্যও একই পর্যায়ের নয়, কিন্তু উত্তরণের ভিত্তি সাধারণ চৈতন্যভূমি সমাজ রচনায় প্রত্যক্ষভাবে দক্ষ করার মত । তাঁদের সাধনায় এই ধারাটি সবচেয়ে বেশি বিকাশলাভ করে পূর্ব বাংলার কবিতার মূল ধারা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে । এই কবিরা হলেন বেগম সুফিয়া কামাল /জ. ১৯১১/, সিকানদার আবু জাফর /১৯১৯–৭৫/, আহসান হাবীব /জ. ১৯১৭/, সৈয়দ আলী আহসান /জ. ১৯২২/, সানাউল হক /জ. ১৯২৩/, আবদুল গনি হাজারী /জ. ১৯২৫–৭৬/, আশরাফ সিদ্দিকী /জ. ১৯২৭/, শামসুর রাহমান /জ. ১৯২৯/, হাসান হাফিজুর রহমান /জ. ১৯৩২/, সৈয়দ শামসুল হক /জ. ১৯৩৫/, আল মাহমুদ /জ. ১৯৩৬/, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান /জ. ১৯৩৬/, শহীদ কাদরী /জ. ১৯৩৬/ ও ফজল শাহাবুদ্দিন /জ. ১৯৩৬/ ।

Dhaka University Institutional Repository



হুট করে মোটরকার হাঁকিয়ে চলে যান পুরানো পল্টনের পথে, যাঁরা রিক্সায় চড়ে চারপাশের ঘরদালানের দিকে দৃষ্টি বুলোতে বুলোতে চলে যান যে যাঁর গন্তব্যে, যারা দোকানে দোকানে ঘুরে ঘুরে সওদা করেন, তাঁরা কী করে জানবেন যে একদা পুরানো পল্টন ছিলো প্রায় এক উদ্যান।[১৭]

নির্বাচিত শহরের মধ্যে বিপুল ঢিলেঢালা ছায়াঢাকা পাখীডাকা মফস্বল শহর ঢাকা আধুনিকতার সকল বৈশিষ্ট্য ধারণ করে — রিক্সা সাইকেল মোটর-সাইকেল বেবিট্যাক্সি বাস ট্রাক গাড়ি ভলভোর কার ট্যাক্সি জনাকীর্ণ রাজপথ খোলা ফুটপাথ সুউচ্চ ইমারত উজ্জ্বল নিয়নের ঝিলমিলানি বিরক্তিকর হর্ন রেস্তোরাঁ নাইটক্লাব মোটরবোটের মুখর খাস্তা বেলায় খাস্তা রেস্তোরাঁর টেবিলে একবিংশতে মিছিল ধর্মঘট স্লোগান সোনামানির মানুষ বিরক্তি ও ক্লান্তি নিয়ে এক মহানগরীতে পরিণত হয়।

এ-প্রসঙ্গে পূর্ব বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মানসিকতার উল্লিখিত সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে উল্লেখ করা যেতে পারে। এক, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জীবনচর্যায় এরা পাশ্চাত্য উদারনীতির আদর্শবাদের পুষ্টি লাভ করেছে। বুর্জোয়া শ্রেণীর মতবাদিতায় প্রভাবিত হওয়ায় বুর্জোয়া উদারনীতিতে এরা আস্থাশীল। উদারনীতির মূল কথাগুলি — ধর্মনিরপেক্ষতা তথা ইহলৌকিকতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, মানবিক মমতা, আইনের শাসন, চিন্তা-মত প্রকাশ ও জীবনাচরণের স্বাধীনতা এদের মনের পরতে-পরতে প্রভাব বিস্তার করেছে; কিন্তু শ্রেণী স্বার্থের বিশেষ কারণে এগুলিকে বাস্তব রূপ এদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। দুই, পূর্ব বাংলায় পুঁজির মালিক, মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক — এই তিনটি শ্রেণীর সমানুপাত বিকাশ ঘটেনি। এখানে মধ্যবিত্তই সর্বাধিক বিকাশ লাভ করেছে ও সমাজের নিয়ন্ত্রণে এদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়েছে নিরঙ্কুশভাবে।[১৭ক] কিন্তু শ্রেণীগতভাবে মধ্যবিত্ত কখনোই স্বাধীন হতে পারেনা, কেননা এদেশের এশ্রেণী সংখ্যাগত ভাবে নিজেকে নির্দ্বিধ স্বাধীন মনে করলেও মূলত সে পরাধীন ও দুর্বল। তাই উচ্চ আদর্শের জন্য জীবনপণ ঘোষণা ও ঝুঁকি গ্রহণে সর্বদা দুইই তার মনে পাশাপাশি অবস্থান করে। তিন, এই শ্রেণীর একাংশ আক্রান্ত হয়েছে মেধাবিত্তাশ্রিত

---

১৭। শামসুর রাহমান, 'আমার প্রাণের ঢাকা', সাপ্তাহিক বিচিত্রা, এপ্রিল ৯, ১৯৭৫, পৃঃ ১৯

১৭ক। মহম্মদ নজরুল হাকিম, 'বাংলাদেশের রাজনীতি ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী', বাংলাদেশের সামাজিক অর্থনীতির সমস্যা (বাংলাদেশ লেখক শিবির; ঢা: মুক্তধারা, ১৯৭৫), পৃঃ ৮১-৮৮

Dhaka University Institutional Repository


## বেগম সুফিয়া কামাল

১৯১১ সালের ২০-এ জুন বরিশালের বিখ্যাত শায়েস্তাবাদ নবাব পরিবারে মাতামহের বাড়িতে বেগম সুফিয়া কামালের জন্ম হয়। তাঁর পিতা সৈয়দ আবদুল বারির বাড়ি ছিল কুমিল্লা জেলার শিলাউর গ্রামে।[১৮] কন্যা সুফিয়ার যখন ৭ মাস বয়স তখন তিনি আধ্যাত্মিক জগতের আকর্ষণে গৃহত্যাগ করেন।[১৯] মাতামহের বাড়িতে, সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে, বড় হয়েছেন তিনি। 'ঘরে বাইরে পুরোপুরি মোগলাই আদবকায়দা, চালচলন, শিক্ষাসংস্কৃতি। বাইরে ইংরেজ নব্যকালচার, কেতাদুরস্ত চালচলন, শিক্ষাদীক্ষা'।[২০] এই পরিবেশ মেয়েদের আধুনিক শিক্ষার জন্য অনুকূল ছিলনা। তিনি আরবী ফারসী ও ধর্ম শিক্ষা পেয়েছেন কিন্তু অন্য ভাষা জানার অনুমতি সুযোগ পাননি, এমনকি বেগম রোকেয়া স্বয়ং এসেও তাকে স্কুলে পাঠানোর জন্য অভিভাবকদের রাজি করাতে পারেননি।[২১] তবে মায়ের কাছে তিনি বাংলা শিক্ষা করেন এবং বাড়ির বিরাট গ্রন্থাগারে 'প্রবাসী' 'বসুমতী' ও 'ভারতবর্ষ' নিয়মিত পড়ে সাহিত্য রচনায় আগ্রহী হয়ে উঠেন। ১৩।১৪ বছর বয়সে তাঁর প্রথম রচনা 'সৈনিক বধূ' নামক একটি গল্প বরিশাল থেকে প্রকাশিত 'তরুণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[২২] তাঁর খাতা থেকে একটি কবিতা বাছাই করে কাজী নজরুল ইসলাম সেটি প্রকাশ করেন 'সওগাত'-এর মহিলা সংখ্যায়।[২৩] তার পর থেকে তিনি নিয়মিতভাবে লিখে চলেছেন এবং ১৯৭১ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে ৮টি কাব্য সংকলন : সাঁঝের মায়া /১৯৩৮/, মায়া কাজল /১৯৫১/, মন ও জীবন /১৯৫৭/, উদাত্ত পৃথিবী /১৩৭১/, দীওয়ান /১৩৭৩/, প্রশস্তি ও প্রার্থনা /১৯৬৮/, অভিযাত্রিক /১৯৬৯/ ও মৃত্তিকার ঘ্রাণ /১৩৭৭/। তাছাড়া রয়েছে গল্পগ্রন্থ 'কেয়ার কাঁটা' /১৩৪৪/ ও ভ্রমণকাহিনী 'সোভিয়েটের দিনগুলি' /১৯৬৮/। সাহিত্য সাধনার জন্য পেয়েছেন বাংলা একাডেমী পুরস্কার /১৯৬১৬২/ ও লেনিন সেনটেনারী পদক /১৯৭০/।

---

১৮। বেগম সুফিয়া কামাল, 'একালে আমাদের কাল', মাসিক সমকাল ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৭১, পৃঃ ৩

১৯। 'একালে আমাদের কাল', মাসিক সমকাল, কার্তিক ১৩৭১, পৃঃ ১৯

২০। 'একালে আমাদের কাল', ঐ, আশ্বিন ১৩৭১, পৃঃ ৩

২১। ঐ, আষাঢ় ১৩৭২, ৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, পৃঃ ৮৬৯-৭০

২২। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'বেগম সুফিয়া কামালের কবিতা', মাসিক বই, ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৬৭, পৃঃ ৫০-৫৫

২৩। ঐ

তিনি বিভিন্ন সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক-সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশেষ ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন পাকিস্তান লেখক সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, ও পর্যায়ে 'ছায়ানট', বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ' ও 'বাংলাদেশ-সোভিয়েট মৈত্রী সমিতি'র সভানেত্রী। বিদেশে গিয়েছেন প্রচুর — ১৯৬৪ সালে মস্কো ও ১৯৭২ সালে বুলগেরিয়া, পূর্ব জার্মানী ও রাশিয়া। পাকিস্তান সরকার তাঁকে ১৯৬০ সালে 'তমঘায়ে ইমতিয়াজ' খেতাবে ভূষিত করেন কিন্তু ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের নির্যাতনের নীতির প্রতিবাদে তা বর্জন করেন।

বেগম সুফিয়া কামালের কাব্যগঠনে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল ছিল পারিবারিক প্রভাব। তাঁর মায়ের [illegible] তাঁকে 'কাব্যজগতের সংস্পর্শে আসার প্রেরণা দেয়'।[24] নিজের জীবনেরও প্রথমদিকে দাম্পত্যজীবনে যে নিঃসঙ্গতা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তা-ও তাঁর কাব্যের বিষয় প্রবণতার একটি প্রধান উৎস। তিনি বলেছেন 'সৌন্দর্য, মননশীলতা ও বেদনাবোধ থেকেই কবিতা' জন্ম নেয়।[25]

দীওয়ান[26] অনেক পরে প্রকাশিত হলেও এতে 'তাঁর কয়েকটি কিশোর কবিতা' সন্নিবেশিত হয়েছে। এ-কাব্যে তাঁর যে-মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে তা হল নিজেকে পৃথিবীর মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেবার আকাঙ্ক্ষা।

ক    জীবন দিয়ে গাথা মেলে
পৃথিবীর পথে পথে। কল্যাণে তটিনী সিঞ্চে
কী দিনু প্রাণের দেউলায় দিতে দিতে।[27]

খ    হে শ্বেত কপোত! ওরে মেলে দাও ডানা
দিকে দিকে দাও হানা,
কোথায় জেগেছে নতুন বাতির ঢেউ
প্রাণপণে শ্যাম শান্তিতে মোহনায়।[28]

---

২৪। 'একালে আমাদের কাল', মাসিক পূর্বাণী, কার্তিক ১৩৭১, পৃ ১২০
২৫। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, পূর্বোক্ত
২৬। সিলেট ঃ [illegible], ১৩৭৩
২৭। 'ঐ', পৃ ৪৯
২৮। 'হে শ্বেত কপোত', পৃ ৮০

Dhaka University Institutional Repository



সাঁকোর মায়া[২৯] তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য । এটি তাঁর প্রথম স্ত্রী সৈয়দা মেহরান হোসেনকে উৎসর্গ করা । মেহরান হোসেনের অকাল বিয়োগে তিনি প্রাণ্যবয়সে যে-আঘাত পেয়েছিলেন, তা তাঁর কবিতায় সর্বাঙ্গে শান্ত বিষণ্ণতার চিহ্ন — একথা অনেকে বলেছেন । এই কাব্যের অধিকাংশ কবিতায় সেই বেদনাবিধুরতার ছাপ স্পষ্ট, এমনকি নামকরণেও । প্রকৃতির পটভূমিতে কবি এখানে নিজেকে স্থাপন করেছেন ।

ক　শাপ হলো সব বর্ণ, কোলাহল হলো অবসান
　দীপ-আর্তি-ছায়া গৃহে এখনি সন্ধ্যায় যেন তোমার আহবান
　গোধূলি-দিগন্তে আসে ।[৩০]

খ　কবিতা　কহিল সে কাছে সরে আসি :
　　রূপসী উজ্জীবন আসেনি সন্ন্যাসী
　গিয়াছে চলিয়া ধীরে গুম্ফানো শিথানের পথে
　ছিন্ন করু । তাহাদেরই গড়ে মরণ, বুঝিতে পারিনা কোন মতে ।[৩১]

মায়া কাজল[৩২] কাব্যেও একই ভাবের পুনরাবৃত্তি লক্ষণীয় । ব্যক্তিগত ব্যর্থতা দুঃখ পৃথিবীর অনেক স্মৃতির মধ্যে একান্ত সর্বজনীন ব্যর্থতার রূপ লাভ করেছে । কবিমন নিয়তই সুন্দর ও আকাঙ্ক্ষার প্রত্যাশী, কিন্তু সবাই মায়াময় পৃথিবীর পরিণামে প্রতিকূল । এখানে শাবহাসিদ্ধি অতীতের, সুন্দর মুকুলের ঝরে পড়াই অমোঘ নিয়তি ।

ক　কোথায় খুঁজে যাবি আর মোর নিরবধি এ মন
　অদৃশ্য তরিল্য আর উদাসীন এ ছিন্ন জীবন ।
　প্রথম সভার আর দূর মোর, উৎসবের আসর সজ্জিতা
　এ শিল্প নিদ্রামগ্ন শুধু আমি — চির নির্বাসিতা ।[৩৩]

---

২৯। স্ব মুদ্রণ, ঢাকা : ১৩৭৫
৩০। 'সাঁকোর মায়া', পৃঃ ৮
৩১। 'তাহাদেরই পড়ে মনে', পৃঃ ৩৫
৩২। স্ব মুদ্রণ, ঢাকা : ১৩৭৫
৩৩। 'নির্বাসিতা', পৃঃ ৫৬

Dhaka University Institutional Repository



৪ শীতার্ত গভীর রাত্রি। পরিশ্রান্ত বিহঙ্গ পাখা
বন্ধ নীড়। শুধু শীত ঝাপটিয়া চলে তবু পাখা।
রাত্রির রহস্যাবৃত অচেনা অজানা দীর্ঘ পথ,
যাযাবর যাযাবর তিনি আহত সে পথ ক্লান্ত, মুখ।[৩৪]

মন ও জীবন[৩৫] কাব্যে কবির মনের দিগন্ত আলো প্রসারিত হয়েছে। তিনি মনে ও জীবনে ধারণ করেছেন শিশুপ্রবৃত্তিকে, তার নিষ্পাপ সৌন্দর্যকে ও দুঃখতাপময় বিত্ত-সংস্থানহীন মানুষকে।

আলোর স্রোতের ভাসে মানবের প্রতিচ্ছায়া যদি
দিনের দিনের স্বপ্ন সকলের সাথে, আমি কবি
সমতুল। আরও আমি কবি মানুষের —
নিপীড়িত আর্ত ক্লিষ্ট মানুষ, তাদের দুর্ভাগ্যের মেঘ
সকল জীবন ভরি।[৩৬]

এর ফলে তাঁর মনের দুঃখ-বেদনা অনেকাংশে অপসৃত হয়ে গেছে এবং মনের দিগন্তে মানুষ ও পৃথিবীর বিচিত্র লীলা বিলাস দেখে তিনি মুগ্ধ ও নিশ্চিন্ত চিত্ত।

আমার দিগন্ত ভরি নিত্য চলে এই আয়োজন
দুই আঁখি ভরিয়া হেরি, তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠে মন।[৩৭]

উদার পৃথিবীর[৩৮] কোনো-কোনো কবিতায় তিনি সমগ্র পৃথিবীতে 'মানব-পৃথিবীর' মগ্ন হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বসুন্ধরা' কবিতার মত কবি এখানেও নিজেকে প্রসারিত করেছেন পৃথিবীর রূপ রসে গন্ধে নদী সাগর মেঘে আকাশে বৃক্ষে ও শস্যে।

---

৩৪। 'নীড় ভ্রষ্ট', পৃঃ ৬১
৩৫। স্ব মুদ্রণ, /ঢাকা : কার্তিক ১৩৭৩/
৩৬। 'আমি জানি', পৃঃ ৪২
৩৭। 'দিগন্ত', পৃঃ ৩৭
৩৮। /ঢাকা : শ্রাবণ ১৩৭১/

Dhaka University Institutional Repository



এখানেই তিনি স্বীয় জীবনের তৃপ্তি ও পূর্ণতা আস্বাদনে অভিলাষী ।

আমার পূর্ণতা হবে প্রাপ্ত রূপে রসে ও রসনে
উচ্ছ্বসি ঝাঁপিয়া যাবে নদী হতে সাগরের জলে
সেথা হতে মেঘে মেঘে ঊর্ধ্বে উঠি পাখি-শিশু সাথে
আমার স্বপন রবে আমাদের দুঃখ ঘুচাতে
সবুজ উর্মি রবি মৃত্তিকার রস শুষে প্রাণে
নবীন শস্যের বুকে ক্ষীর হবে সুধা-স্বাদ দানে
তৃষিত চাতক কণ্ঠে জলবিন্দু হবে পড়ি ঝরি
সম্পূর্ণ জীবন মোর শেষ হবে তৃপ্তিতে[৩৯]

স্বদেশের মাটিতে ও জনপদেও নিজেকে বিস্তৃত করে দিয়ে তিনি জীবনের চরিতার্থতা সন্ধান করেছেন 'আমার দেশ' কবিতায় । সর্বশেষ কাব্য 'মৃত্তিকার ঘ্রাণ'-এ[৪০] অনুরূপ তাদের সন্ধান পাওয়া যায় ।

মোর মন
জড়িত শিকড় মতন
বিস্তৃত আছে
নাহি অন্ত
নাহি যেন পার
অসীম পাথার ।[৪১]

সুফিয়া কামালের কবিতা-সম্পর্কে একজন সমালোচক লিখেছেন 'পরিপূর্ণতার জগত ও জীবনকে বড় বড় কাব্যপ্রেরণায় নিবিড়রূপে তিনি তুলে ধরতে পেরেছেন । বিশ্বচেতনার এমনি দৃষ্টিভঙ্গি

---

৩৯। '[illegible]', পৃঃ ৬৩-৬৪

৪০। ঢাকা : শ্রাবণ ১৩৭৭

৪১। 'মোর যাদু', পৃঃ ১৬

Dhaka University Institutional Repository



পরিচায়ক। তিনি প্রধানতঃ তিরিশের মনোভঙ্গীর ধারক ও বাহক'।[৪২] এই মন্তব্য পুনর্বিবেচনার যোগ্য। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক মূলত একই সুরে আবর্তিত, অপরিবর্তনশীল, যদিও কবিতার প্রেক্ষাপট ক্রমশঃ উদার ও মুক্ত হয়েছে। প্রকৃত ও ঈশ্বরের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের পরিচয়ও বেশি নেই, তাঁর রচনায় 'ঈশ্বরবোধের প্রতিষ্ঠার লক্ষযোগ্য প্রমাণ নেই এবং তাঁর আঙ্গিক পরিপূর্ণ নাগরিক'।[৪৩] তাঁকে তিরিশের মনোভঙ্গীর ধারক ও বাহক বলাও যথার্থ নয়, কেননা তিনি ও তিরিশের কবিরা সমাজসমস্যাকে একই দৃষ্টিতে অবলোকন করেননি। সুফিয়া কামাল মূলত উনিশ শতকী রোমান্টিক কবিমানসের অধিকারী। তাঁর প্রেমভাবনা, নিসর্গপ্রেম, প্রকৃতিচিন্তা, মানবিক মমতা ও সাম্প্রতিক সংকটের অনুধাবন — বাংলা কবিতার গত শতাব্দীর ঐতিহ্যানুসারী। তিনি প্রায় চল্লিশ বছর ধরে কবিতা লিখলেও এই দীর্ঘ সময়ের পরিবর্তিত সমাজের ছাপ তাঁর লেখায় দুর্লভ। ফলে তাঁর মানসিকতা একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে সীমিত থাকেনি। পারিবারিক প্রেমবোধ ও সন্তানবাৎসল্য অনুভবগুলোকে তিনি ক্রমশঃ সমর্পণ করেছেন প্রকৃতি ও প্রকৃতির উদার পরিমণ্ডলের মধ্যে। ফলে প্রথম দিকের বেদনাবিধুরতা ধীরে ধীরে কেটে গেছে শেষের দিকের রচনায়। মুসলমানদের পর্বভিত্তিক কয়েকটি কবিতাও তিনি রচনা করেছেন। এগুলিতে ধর্মের অলৌকিক দিক নয়, বরং মানবিক দিকটাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। অথচ মানুষ, সৃষ্টি, পৃথিবী ও নিখিল প্রকৃতির মমতারসে সিক্ত হয়ে ধরা পড়েছে তাঁর কবিতায়। 'Now my overall inspiration lies in Nature, Love and above all in Humanity'[44] — বলেছেন তিনি এক সাক্ষাৎকারে। তাঁর কবিতার ভাষা সহজ সরল, যদিও তা প্রায়শঃ সাধারণত্বকে অতিক্রম করে ব্যঞ্জনার সুরে উন্নীত হতে পারেনি।

---

৪২মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৩

৪৩। হাসান হাফিজুর রহমান, আধুনিক কবি ও কবিতা, (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৬৫) পৃঃ ১৭০

৪৪। Shamsud-Duha Chowdhury, 'With Sufia Kamal', The People (Daily), Feb. 18, 1973.

Dhaka University Institutional Repository



## সিকান্দার আবু জাফর

১৯১৯ সালের জুন মাসে খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার তেঁতুলিয়া গ্রামে সিকান্দার আবু জাফর এক সৈয়দ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষ মধ্য প্রাচ্য থেকে হিজরত করে এখানে এসেছিলেন। তাঁর পিতৃব্য সৈয়দ জালালুদ্দিন হাশেমী ভারতীয় কংগ্রেস ও ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্য ছিলেন। দেশবিভাগের পূর্বে তিনি ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের স্পীকার। তিনি বাস করতেন কলকাতার ১৪ নং কড়েয়া রোডে। সিকান্দার আবু জাফরের শৈশবকাল এখানে কেটেছে। পিতৃব্যের সংস্পর্শে তিনি প্রগতিশীল রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। ফলে তাঁর নামের পদবীটুকু খসে পড়ে — সৈয়দ সিকান্দার আবু জাফর পরিণত হন সিকান্দার আবু জাফরে।

কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে তিনি বি-এ পাশ করেন। দেশবিভাগের পর থেকে ঢাকা রেডিও-তে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন। কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়ও বিভিন্ন সময়ে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং ঢাকার দৈনিক মিল্লাত, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকাও সম্পৃক্ত ছিলেন অনেকদিন। ১৯৫৭ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন মাসিক সমকাল ও সমকাল প্রকাশনীর। ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত সমকাল ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং সে যুগের পূর্ব বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য মাসিকে পরিণত হয়।

স্বাধীনতার পর সাহিত্যাঙ্গনে তিনি বেশি সক্রিয় ছিলেন না। প্রাক-স্বাধীনতা কালের কবিতা নিয়ে কয়েকটি কাব্য সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ তিনি গ্রহণ করেছিলেন। সেসময়ই ১৯৭৫ সালের ৫ঠা আগস্ট মূলত হাঁপানী রোগে ঢাকার পি,জি হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যের সব শাখায় তাঁর সঞ্চরণ ছিল স্বচ্ছন্দ। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি চারটি উপন্যাস — 'মাটি আর অশ্রু', 'পূরবী' 'নতুন সকাল' ও 'জয়ের পথে' — এবং থর্নটন ওয়াইল্ডারের 'সেতু' উপন্যাসের অনুবাদ প্রকাশ করেন। 'মহাকবি আলাওল',

Dhaka University Institutional Repository


'সিরাজউদ্দৌলা', 'শকুন্ত উপাখ্যান' ও 'মাকড়সা' নামক চারটি নাটকও তিনি রচনা করেছিলেন। তা ছাড়া রয়েছে ওমর খৈয়ামের কবিতা, জি,এম, সিং-এর নাটক, ইকবাল জীবন ও মাদারের শ্রেষ্ঠ কাব্যের অনুবাদ। তাঁর প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য কাব্য সংকলন হচ্ছে প্রসন্ন প্রহর /১৯৬৫/, তিমিরান্তিক /১৯৬৫/, বৈরী বৃষ্টিতে /১৯৬৫/, কবিতা ১৩৭২ /১৯৬৬/ কবিতা ১৩৭৪ /      / বৃশ্চিক লগ্ন /মার্চ ১৯৭১, বাংলা ছাড়ো।[৪৫]

সিকান্দার আবু জাফরের কবিতার আলোচনা করতে গিয়ে সবাই তাঁর পরিবেশ ও কাল-সচেতনতার কথা উল্লেখ করেছেন। আবু জাফর শামসুদ্দিনের ভাষায় 'তাঁর শিল্পী জীবনের আসল সমাজ-সচেতন শিল্পী হিসাবে'[৪৬] আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁর লেখক-জীবনের কেন্দ্র-বিন্দু হিসেবে 'দেশ সমাজ সম্পৃক্ততার' কথা বলেছেন,[৪৭] মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের মতে তিনি কাল ও সমাজ সচেতন, সুস্থ সুন্দর সন্ধানী, উচ্চকণ্ঠ রোমান্টিক সাম্যবাদী কবি[৪৮] হাসান হাফিজুর রহমান বলেছেন 'জাগ্রত চেতনা ও সেই সঙ্গে বলিষ্ঠ সংলগ্নতার সূত্রই আমাদের সমাজ সচেতন বাংলার কবি সিকান্দার আবু জাফরের সুস্পষ্ট শিল্পবোধের ভিত্তিকে চিহ্নিত করেছে,'[৪৯] আবদুল গনি হাজারী মনে করেন তিনি কালের প্রশান্ত ধারণ করে কালোত্তীর্ণ হবার সাধনা করেছেন।[৫০] আর স্বয়ং কবি বলেছেন:

জীবনের আলোছায়ে অসংখ্য মূর্তি মুহূর্ত নানারূপে অনাবৃত হয়েছে আমার সামনে।

---

৪৫। জীবনী: সংক্রান্ত ও অন্যান্য তথ্য সংগৃহীত হয়েছে কবির বন্ধু সৈয়দ আলী আহসানের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এবং আরো কয়েকটি গ্রন্থ অবলম্বনে — 'কবি সিকান্দার আবু জাফর', ছোটদের খেলাঘর, /সেপ্টেম্বর ১, ১৯৭৫/, পৃঃ ৯, 'সিকান্দার আবু জাফরের কবির জীবন', মাসিক সমকাল, ১৬শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১ম সংখ্যা; মাঘ ১৩৮২, পৃঃ ৮৩-৮২, মোঃ মোমতাজউদ্দীন, 'অনুভব আলোকে সিকান্দার আবু জাফর,' ঐ, পৃঃ ৩-৮।
৪৬। চিন্তার বিবর্তন ও পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্য, /ঢাকা: মহকুমা কর কালচারাল প্রিন্টার্স, পাকিস্তান কমিটি, ১৯৬৪/, পৃঃ ৯৬
৪৭। 'সিকান্দার আবু জাফরের একটি কবিতা', মাসিক সই, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ-৫ম সংখ্যা, জুন-জুলাই ১৯৭০, পৃঃ ১১

Dhaka University Institutional Repository



আমি কোনো কোনো সময়ে সেই সব মুহূর্তের স্বাক্ষর লিপিবদ্ধ করেছি সত্য-বিচ্যুতি না ঘটিয়ে। সেই আমার কবিতা।... কিন্তু সাম্প্রতিককালে আমি মাটিতে শিকড় মেলে দাঁড়াবার চেষ্টাতেই বেশী ভরসা রাখি। সমাজের একজন মানুষ হিসেবে সেই সমাজের আর সকলের সঙ্গে কথা বলতেই আমার বেশী আনন্দ। অবশ্য সর্বকালের সর্বদেশের মানুষের যা কিছু সাফল্য আমি তার গৌরবের অংশভাগী।[৫১]

সমাজচেতনা সিকানদার আবু জাফরের কবিতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও এটিই একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। প্রেমকে অবলম্বন করে তিনি প্রচুর কবিতা রচনা করেছেন এবং সেগুলির সাফল্যও গণ্য করার মত। তাঁর কবিতার আরো একটি বড় অংশ জুড়ে আছে নিসর্গপ্রকৃতি ও ধূলির ধরণীর অপার্থিবের ঐশ্বর্যের গাথা। এধরনের কবিতা অবশ্য তাঁর কবি-ব্যক্তিকে বিভক্ত করেনা কেননা এগুলি পাঠ করতে গেলে সমাজনায়ককে ভুলে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। যেমন:

বহু বর্ষ চলে গেছে ব্যর্থ অন্বেষণে
আর প্রাণ জলাঞ্জলি মনে
ব্যাপ্তিহীন জীবনের অগোচর ভূমি
সৌরভে জড়িয়ে এলো মৃত্যুর শিয়রে,
পৃথিবী আকাশ আলো সবার উদ্দেশে
অন্তহীন কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেলাম।[৫২]

---

৪৮। 'সিকানদার আবু জাফরের সাহিত্য সাধনা', ঐ, পৃঃ ১৫
৪৯। আধুনিক কবি ও কবিতা, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৫), পৃঃ ২৫৩
৫০। 'কালায়নের কবি: সিকানদার আবু জাফর', মাসিক বই, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০-১৩
৫১। 'প্রসঙ্গ কথা', প্রসন্ন প্রহর, (ঢাকা: সমকাল প্রকাশনী, ১৯৬৫), পৃঃ ক-খ
৫২। 'আমি কুসুম নই', তিমিরান্তিক, (ঢাকা: সমকাল প্রকাশনী, ১৯৬৫), পৃঃ ৮০

Dhaka University Institutional Repository



'প্রসন্ন প্রহর'-এর কবিতাবলি রচিত হয়েছে ১৯৪৬-৫০ সালের মধ্যে অর্থাৎ পাকিস্তান-পূর্ব যুগে রচিত কবিতাবলি সংকলিত হয়েছে এখানে। প্রথম কবিতাতে কবির চিন্তাধারার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা-ই ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করেছে।

মৃত-মৃত্যু পৃথিবীর পথে পথে
আলেয়ার হাসি ছড়ায় আজিকে প্রেত,
অন্ধকারের শীতল-মৃত বুকে আগুন,
সভ্যের বুকে বিদ্ধ বল্লম ।[৫৩]

দ্বিতীয় কাব্য 'তিমিরান্তিক'-এ রয়েছে পাকিস্তান আমলের প্রথম ছ-সাত বছরের কবিতাবলী। সঙ্গত কারণেই প্রথম দিকের কবিতাবলি নূতন আশায় প্রদীপ্ত। একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন অত্যাচারীর দিন শেষ হয়েছে, এবার লাঞ্ছিত ও পীড়িতরা মাথা তুলে দাঁড়াবে।

তোমার অধিক চাপে যেখানে ভেঙেছে তুমি
মানুষের একান্ত আশ্রয়,
সে-পৃথ্বী সমাধি-তীর্থে তোমার পূর্ণতার
এবার তুমিও হবে চির নিরাশ্রয়।
অত্যাচার কাহিনীর নব নব দুঃখ
অজ্ঞাত শীতের স্তব্ধ প্রান্তরে রেখেছে অঙ্কুর
প্রদীপ্ত ক্ষমায় মূর্ত সবে দেশী দূর ।।[৫৪]

কিন্তু শীঘ্রই কবির আশা নৈরাশ্যের তিমিরে ঢেকে গেছে। ১৩৫৯ সালের প্রথম দিকে তিনি যে-কবিতাটি রচনা করেছেন তাতে তিনি নিজের সমাজকে কামনা করেছেন একটি অন্ধকারার মতো, যেখানে মনে-প্রাণে ৫-৬ পড়েছেন এর পরিণতির জন্য বাংলা আজও তৈরী

---

৫৩। 'প্রসন্ন প্রহর', পৃঃ ২
৫৪। 'সন্তাড়ু', পৃঃ ৭

Dhaka University Institutional Repository



হচ্ছে এবং বাড়িয়েই এই কষ্টে অকল্যাণের নাশ স্থান পাবে।

আমি বাস করি আমার অনেকের সাথে
নির্জন নদীর এক সুজীর্ণ কারাগারে।

.. ..

কোনো একদিন
এ-কারাগার নিশ্চয়ই ভেঙে হবে
দীন হবে সুনিশান একটি করে,
মানুষের অকল্যাণ নাশ হবে
সেদিন সেখানে।[৫৬]

সমাজের সাধারণ মানুষকে যাঁরা শোষণ করে, তারা নিজেদের স্বার্থ সাধনের কৌশল হিসাবে ধর্মকে ব্যবহার করে। অদৃষ্টবাদ, পরলোক, বেহেশত প্রভৃতি দ্বারা মানুষকে প্রবঞ্চনা করার উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ক্ষুধানাশা মানুষেরা বেহেশতের আশায় ইহলোকের সুখ বিসর্জন দেয়। দুঃখে নিদ্রেমে ধৈর্য ধারণ করতে সমাজপতিরা নিয়ত পুরালোচনা দেয়। এই বিষয়কে অবলম্বন করে একটি ব্যঙ্গ কবিতা রচিত হয়েছে।

ইহকাল সব নয় জানবে
পরকাল রয়েছে অনন্ত
সহ্য করতে হবে নির্ভীক
দুঃখকে সন্তোষে হবে পূর্ণ ;
তবে তো মিলবে স্বর্গ
তবে তো জীবন হবে ধন্য।[৫৭]

১৩৬৩ থেকে ১৩৭১ সালের মধ্যে রচিত ৩৬টি কবিতার সংকলন 'ঠেঙ্গী পুষ্টিতে'[৫৮]। এ-কাব্যে কবির সমাজচেতনা একটি ব্যক্তি রূপে উপনীত হয়েছে। চারটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ

---

৫৬। '১৩৫৯', পৃঃ ৪১
৫৭। 'আকাশ', পৃঃ ৬০
৫৮। ঢাকা ঃ নবকাল প্রকাশনী, ফাল্গুনী ১৯৬৫

Dhaka University Institutional Repository



কবিতায় (এখন তুমি ঘুমাও, ইদের চিঠি, খেলনা ও পরজন্ম) সমাজের বিভিন্ন স্তরের কিছু মানুষের দুঃখের কাহিনী গদ্যছন্দে বর্ণিত। প্রথম কবিতাটিতে দরিদ্র পিতা অনাহার-ক্লিষ্ট কন্যাকে ঘুম পাড়াচ্ছে এবং বলছে, রিলিফের চাল এখনই এসে পড়বে এবং তখন তোমাকে দুধ ভাত ও খাসীর মাংস রেঁধে দেওয়া হবে।

দূরের মোড়ের
সে-বাসার থেকে থেকে
তোমার শীর্ণ বুকের রেখায়
তৃপ্তি উঠবে ভরে।
জেগে বসে দেখে
দুই হাতে চোখ মুছে
আমি তা দেখবো
এ প্রাণ উজাড় করে।[৫৯]

অন্যান্য কবিতায় কবি তার মধ্যবিত্ত গণ্ডিকে [illegible] ভেঙে দূরের গ্রামীণ [illegible] [illegible] ও নিত্যদিনের সংগ্রামের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে দিয়েছেন।

[illegible] চোখে
হাল কাঁধে জোড়া বলদের পায়ে পায়ে
ধান [illegible] কৃষকের চোখে চোখে
আমি আছি,
হাতে – হুঁকো পায়ে – দাঁড়টানা জেলে
শীত কুয়াশায় [illegible]
মাছে জালে একাকার
সেও আমার পৃথিবী।[৬০]

---

৫৯। 'এখন তুমি ঘুমাও', পৃঃ ৪
৬০। 'যেখানে আমি', পৃঃ ৪৩–৪৪

Dhaka University Institutional Repository



আণব অস্ত্রের স্তূপ আবিষ্কারের চেষ্টায় অক্লান্ত হবে এবং পৃথিবীনাশী অবস্থার সম্ভাবনা দেখে তিনি শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়েছেন এবং আশংকা করছেন শয়তানের উপস্থিতির জন্যই হয়ত এই পৃথিবী এত সুন্দর। আল্লা ঈশ্বর ও শয়তান একই ধারণার এপিঠ-ওপিঠ কিংবা শয়তানের জন্যই ঈশ্বরের ধারণা মানুষের চেতনায় স্থায়ী রূপ নিয়েছে। 'ঈশ্বর, ঈশ্বর ..'[৬১] কবিতায় এ-ভাবনাটি পাওয়া যায়।

এই ধারণারই সম্প্রসারণ ঘটেছে 'পারস্পরী' ('কবিতা' ১৩৭২)[৬২] কাব্যে। সমাজ চেতনা ও প্রকৃতিচেতনার সূক্ষ্ম মিশ্রণই কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কোলাহল ও কলকারখানার মধ্যে নিঃসঙ্গ সমাজের রূপ ধরা পড়েছে কবির দর্শনানুভূতিচেতনায়। কবি দেখেছেন, স্বামী-স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে সৃষ্ট পরিবার ও সমাজের প্রতিটি সদস্য একে অন্যকে স্বার্থ সাধনের হাতিয়ার হিসাবেই ব্যবহার করে।

সংসারের অলিতে গলিতে
আমরা আস্বাদন বিলাসী কুকুর
লোলুপ শকুন
ক্ষুধিত শার্দুল।
তুমি আমি আর সন্তানসন্ততি
একে অপরের শিকার স্বার্থলোভে।[৬৩]

অন্য একটি কবিতায় আপন শিশুর পরিচয়ে এই মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। নির্মল হাসি সম্পূর্ণ করার জন্য কবি একদিন তাঁর আত্মজকে মানুষের সমাজে পাঠিয়ে দিলেন। কয়দিন পরে সমাজের শিকারে পরিবেশ থেকে কুণ্ঠ ভারাক্রান্ত আত্মা নিয়ে এল এবং জানাল :

সাদিক আমাকে উচ্চতম আদালতে দিয়ে
দেখেছি অন্যের মাঝে
শিকারের মুখোশে মানুষ ঈশ্বর।

---

৬১। পৃঃ ৭৫
৬২। ঢাকা : সমকাল প্রকাশনী, মার্চ ১৯৬৬
৬৩। 'সংসার', পৃঃ ৩

Dhaka University Institutional Repository



> অদ্ভুত আঁধারের চক্রান্তে আর-অন্ধকারে
> সৃষ্টির আসন-ঘরে সুপ্ত মূর্খ তিনি।[৬৪]

শেষ পর্যন্ত কবির আস্থা পুরাণের ভক্ত হল।

ঈশ্বরকে তাঁর কাছে মনে হয়েছে দারুণ স্বেচ্ছাচারী জল্লাদের। যে শানিত সংগ্রামী মনোভাব সিকানদার আবু জাফরের মানস-বৈশিষ্ট্য, তাতে তাড়িত হয়ে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন সামন্তবাদী ঈশ্বরের বিরুদ্ধে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বিস্মিত হয়েছেন সমাজের বুকে অসংখ্য নকল ঈশ্বরের দাপট দেখে।

> হায় অদৃষ্ট হায় অদৃষ্ট
> কোথা থেকে এলো এত ঈশ্বর
> কত ঈশ্বর, কত ঈশ্বর।।[৬৫]

'কবিতা ১৩৭৪' মুদ্রিত কিন্তু অপ্রকাশিত। এ কাব্যে কবির মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। জীবনভর তিনি মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন কিন্তু সংগ্রামের অবসানে তিনি অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করলেন তাঁর সাধনা বিফলে পর্যবসিত হয়েছে — তিনি শুধু মৃত্যুর কবিতা রচনা করেছেন আত্মরোষে।

> যে কোটালের সারা শাসন জুড়ে
> দিন কেটেছে তাইত মাটি খুঁড়ে
> হায় যখন
> তাকিয়ে দেখি আমার চতুর্দিকে
> সন্ধ্যা সকাল সাজিয়ে গেছি শুধুই মরু কল্পনা।

---

৬৪। 'পুরানের আয়না', পৃঃ ৫৫-৫৬

৬৫। 'কত ঈশ্বর', পৃঃ ২৯

আমার যত দুঃখ রাত্রি রাত্রি
দুঃসময় সেই কণ্ঠের মাঝে।৬

তাঁর অপর দুটি কাব্য 'বৃশ্চিক লগ্ন' ও 'বাংলা ছাড়ো' সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে।

সিকানদার আবু জাফর কবিতা লিখেছেন প্রায় তিরিশ বছর ধরে। তাঁর কবিতায় বিকাশের পরিচয় আছে। প্রাথমিক পর্বে তিনি আত্মগণ্ডিতে সমর্পিত, পরেই সমাজের দিকে সপ্রাণে উৎসর্গিত। নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠীগত পরিসর নয়, মধ্যবিত্ত-সর্বহারা শ্রেণীভুক্ত সবারই ঐসময়ে তাঁর শিল্পভূমি। পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে সেকালের বাঙালী মুসলমানদের মনে সর্বজনীন আবেগের উচ্ছ্বসিত রূপ দেখা দিয়েছিল, তার ছাপ তাঁর সেকালের কবিতায় লক্ষ্যযোগ্য। কিন্তু ধীরে-ধীরে তাঁর চিন্তাধারা সংহত হয়ে নির্দিষ্ট সমাজ ও এলাকায় নিবদ্ধ হয়েছে। একসময়ে আত্মগণ্ডিতে তিনি আস্থা রাখতে শুরু করেছেন, সমাজে অন্যায়ের প্রবল প্রতাপ ও নিষ্ঠুর রূপ দেখে শঙ্কিত হয়েছেন। রাজনৈতিক ভাবনা তাঁকে ক্রমশঃ আকর্ষণ করেছে। শেষ পর্যন্ত তিনি হয়েছেন বাঙালী জাতীয়তাবাদী, পাকিস্তানী স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে ফেটে পড়েছেন শব্দে ও আক্রোশে। ফলত, পরিবর্তনশীল সমাজ ছাপ রেখেছে সিকানদার আবু জাফরের চেতনায়, রচনায় ও রচনাভঙ্গীতে।

---

৬। 'সুন্দর', পৃঃ ৮

Dhaka University Institutional Repository



# আহসান হাবীব

১৯১৭ সালের ২রা জানুয়ারী বরিশাল জেলার পিরোজপুর মহকুমার শংকর পাশা গ্রামে আহসান হাবীব জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৫ সালে স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করার পর দেড় বছর আই-এ পড়েছিলেন, কিন্তু পরীক্ষা না দিয়ে মাসিক ১৭ টাকা বেতনে ফজলুল হক সেলবর্ষীর দৈনিক 'তকবীর' পত্রিকায় সাংবাদিকতায় চাকুরী নেন। এটা ১৯৩৭ সালের কথা। অতঃপর মাসিক সওগাতের সাহিত্য সম্পাদক /১৯৩৯-৪৩/, কলকাতা স্টেশনের অল ইন্ডিয়া রেডিও-র স্টাফ আর্টিস্ট /১৯৪৩-৪৮/, দেশবিভাগের পর ঢাকায় সওগাত, মোহাম্মদী, ইত্তেহাদ, সাপ্তাহিক প্রবাহে কাজ করে ১৯৫৫ সালে তৎকালীন 'দৈনিক পাকিস্তানে' সাহিত্য সম্পাদক হিসাবে যোগদান করেন। অদ্যাবধি সেখানে তিনি কর্মরত আছেন।

বাল্যকালে বাড়িতে পড়বার উপযোগী কিছু-কিছু বই পেয়েছিলেন — এগুলোর মধ্যে বিদ্যাসুন্দরের পুথি, ভারতচন্দ্র ও মীর মশাররফ হোসেনের গ্রন্থাবলী তিনি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পড়তেন। এ-থেকেই সাহিত্যচর্চায় ঝোঁক আসে এবং তের-চোদ্দ বছর বয়সে 'মায়ের কবর পাশে কিশোর' নামক কবিতা লিখে স্কুল ম্যাগাজিনে প্রকাশ করেন। তারপর থেকেই নিয়মিত লিখে আসছেন গল্প, কবিতা, উপন্যাস ও কিশোর-সাহিত্য। এ-পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে পাঁচটি কাব্য — রাত্রিশেষ /১৯৪৭/, ছায়া হরিণ /১৯৬২/, সারা দুপুর /১৯৬৪/, আশায় বসতি /১৯৭৪/ এবং মেঘ বলে চৈত্রে যাবো /১৯৭৬/। তাছাড়া রয়েছে উপন্যাস 'অরণ্য নীলিমা', 'জাফরানী রং পায়রা', কিশোর গল্প 'জোছনা রাতের গল্প', 'ছোকা কাকাই', 'রাণী খালের সাঁকো', সম্পাদিত গ্রন্থ 'বিদেশের সেরা গল্প' ও 'কাব্য লোক'। সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতি-স্বরূপ লাভ করেন ১৯৬০ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ১৯৬৪ সালে 'সারা দুপুরে'র জন্য আদমজী পুরস্কার ও ১৯৬০ সালে Treasure Island-এর অনুবাদ কৃতিত্বের জন্য ইউনেস্কো পুরস্কার।[৬৬]

---

৬৬। জীবনী সংক্রান্ত ও অন্যান্য তথ্যের জন্য আমার অবলম্বন ছিল — আবদুর রাজ্জাক, বাংলাদেশের লেখক : জীবন ও গ্রন্থপঞ্জী /প্রকাশিতব্য/, সাযযাদ কাদির, 'একজন কবির প্রতিকৃতি আহসান হাবীব', সাপ্তাহিক বিচিত্রা, নভেম্বর ৪, ১৯৭৭, পৃঃ ২২-২৩, ও ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।

Dhaka University Institutional Repository



আহসান হাবীব সুকুমার মনের অধিকারী। অনগ্রসরতার নৈরাজ্য নিষ্ঠুরতা ও হৃদয়হীনতা তাঁকে ব্যথিত করে। এই দুর্বিষহ বাস্তবতা যে বিপুল জনগণকে শিকারে পরিণত করেছে সে-সম্পর্কেও তিনি সচেতন। তিনি চান, এর অবসান হোক: আবার শিশুরা হাসুক, মানুষ ক্ষুধা থেকে মুক্তি পাক, শিল্প-সংস্কৃতির প্রসার ঘটুক, যুদ্ধের অবসান হোক এবং প্রতিটি আধুনিক মানুষ এক-একজন প্রাণবন্ত ও জ্ঞানবান ব্যক্তি হয়ে উঠুক। লেবাননের কবি খলীল জিবরানের একটি কবিতা থেকে তাঁর এই মানসিকতার পরিচয় আবিষ্কার করা যেতে পারে। আহসান হাবীবকৃত সে-কবিতার অনুবাদের অংশবিশেষ নিম্নরূপ:

> প্রেমে কর্মে যখন সংযোগ
> তখন তোমার সেই কর্মে আর প্রেমে
> অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা
> তুমি নিজে
> পৃথিবীর সমস্ত মানুষ
> আর এই মানুষ ও পৃথিবীর
> স্রষ্টা নিজে।৬৯

এই সুকুমার চিত্তবৃত্তির প্রভাবে তিনি সমাজের দুঃখদৈন্যকে খুব স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেননি কিংবা সমাজের গ্লানিতাকে উন্মোচিত করতে উৎসাহ পাননি। তাঁর কাব্যসাধনা যতই এগিয়েছে ততই তিনি ইতিবাদী হয়ে উঠেছেন, সমাজদেহকে ছেড়ে অবলম্বন করেছেন সমাজচৈতন্যকে। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ তাঁকে বলেছেন 'পুরোপুরি রোমান্টিক'৭০, সৈয়দ আলী আহসানের মতে তিনি বস্তুত সমাজসচেতন কিন্তু অবশ্যম্ভাবীরূপে রোমান্টিক৭১ আর 'সারা দুপুর'-এর তিনি মনের কবি, মানসের কবি, আত্মাভিসারের কবি — বলেছেন মুনীর চৌধুরী।৭২

---

৬৯। 'খলিল জিবরানের 'প্রফেট' থেকে', মাসিক মোহাম্মদী, বৈশাখ ১৩৬০, পৃঃ ৪৯৪
৭০। 'সমকালীন কবিতার ধারা', সমকালীন সাহিত্যের ধারা, (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৫), পৃঃ ৩৯
৭১। 'পূর্ব পাকিস্তানের কবিতা', আধুনিক বাংলা কবিতা শব্দের অনুষঙ্গে, (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, নভেম্বর ১৯৭০), পৃঃ ১১২
৭২। 'সারা দুপুর' (পুস্তক পরিচয়), মাসিক বই, ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মে ১৯৬৫, পৃঃ ১২৪-১২৫

Dhaka University Institutional Repository



'রাত্রিশেষ'[৭৩] দেশবিভাগের পরে প্রকাশিত হলেও এর কবিতাগুলি ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে রচিত। বিভাগপূর্ব কালের যুদ্ধ, মহামারী, দাঙ্গা ও রাজনৈতিক অস্থিরতায় আলোড়িত বাংলাদেশ এই কাব্যের পটভূমি। 'এই প্রথম বইতেই আহসান হাবীব তাঁর মনন-পটের একটি সাচ্চা নক্সা পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন'।[৭৪] দেশবিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টি সুখী ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি বহন করে আনছে, মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী মুসলমানের এক বৃহদাংশ তাই ভাবছেন। এই কাব্যের নামকরণেও সেই দ্যোতনা লক্ষণীয় এবং অনেক কবিতায়ও সেই আশ্বাস-নির্ভরতা ও সূর্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিক্ষিপ্ত রক্তের আবরণহীন যে আভরণের তলে
এই পৃথিবীর কুৎসিত প্রাণ হীন কামনায় জ্বলে
শেষহীন সেই বন্ধুর দেশে কীট বাসনায় তবু
এই মন আর এ-পৃথিবীর বিচ্ছেদ নাই কভু।[৭৫]

'ছায়া হরিণ'[৭৬]-এর কবিতাগুলির রচনাকালের ব্যাপ্তি ১৯৪৭–১৯৬২ সাল। কবির স্বপ্ন ছিন্ন হয়েছে। শুধু নিশ্চিন্তে ও নিরুপদ্রবে জীবনধারণ করাটাই এখন তাঁর কাম্য। 'আত্মজৈবনিক কবিতা' 'সে নেই বলে' তিনি একথা স্পষ্ট করে বলেছেন। আবাল্য স্বপ্ন ফুল-পাখি-চাঁদ-সুরুজের রোদ্দুর বিনিময়ে তিরিশ বছরের ক্ষুধার্ত ছেলেটি এখন পৃথিবীর এককোণে মাথা গুঁজবার ও জীবনধারণের সুযোগ প্রার্থনা করছে:

এখন ছেলেটি
সারাদিন অন্নের ভাবনায়
পথে ঘুরছে
এখানে-ওখানে হাত পেতে
নিরবধি যাচনায়:

---

৭৩। ২য় সং, ঢাকা : [illegible], ১৩৬২
৭৪। সিকদার আমিনুল হক, 'কবি আহসান হাবীব', সাপ্তাহিক বিচিত্রা, নভেম্বর ৪, ১৯৭৭, পৃঃ ২৭
৭৫। 'এই মন-এ মৃত্তিকা', পৃঃ ১২
৭৬। ঢাকা : কথাবিতান, প্রকাশের তারিখ নেই, আনুমানিক ১৯৬২

Dhaka University Institutional Repository



গান দাও
সুর দাও
ফুল পাখি চাঁদ দাও
সমুদ্র ভোরের সোনা এই দাও।
দুঃখ দাও
একটি শিশির
        আর
        একটু ভরসা দাও মনে
একটু আশ্বাস দাও বেঁচে থাকবার
মাথা রাখবার ঠাঁই দাও।[৭৭]

যন্ত্রযুগের সভ্যতা যে মানুষকে তার শাশ্বত মহৎ মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত করে হৃদয়কে পণ্যের সমতুল্য করে তুলেছে, সেকথাও কবি স্পষ্ট করে বলেছেন ঃ

নির্জন নদীর তীরে অপরাহ্নে ঘাসফুলে
                                সোনার কলসে
চোখ রেখে, যে হৃদয় তোমাকে দেবার
কথা ছিল – সে আজ হাটের পণ্য।
    ...                    ...
সে হৃদয় আজ
মদালস সভ্যতার দ্বারে দ্বারে বিমূঢ় গণিকা।[৭৮]

এই অবস্থাকে পরিবর্তিত করতে হবে প্রেমের মাধ্যমে। প্রেমের সর্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা হলে আধুনিক যুগের রুক্ষতা, ঈর্ষা, নিষ্ঠুরতা, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও হানাহানি দূর করা সম্ভব; অর্থাৎ যে হৃদয় নষ্ট হয়েছে বা মৃতপ্রায় তার আবার পুনর্জাগরণ দরকার।

সেই ফুল ফুলের ঝরণা আর পাখপাখি
আবার মনের আর্শিতে ধবল স্থির
মনে হয় ঐ সব ঈর্ষা ভালোবাসা হবে
হৃদয় সম্রাট হবে পৃথিবীর।[৭৯]

---

৭৭। 'সে নেই', পৃঃ ২৯      ৭৮। 'অন্যদিন', পৃঃ ৫৭
৭৯। 'তারা মুখর', পৃঃ ১৪

Dhaka University Institutional Repository



এর জন্য প্রয়োজন সংগ্রামের। মনুষ্যত্বের ও ভালবাসার পরাজয়কে কবি মেনে নিতে প্রস্তুত নন; তিনি তার উদ্বোধনের জন্য শপথ নিয়েছেন:

প্রেম খেলা পলাতক,
জয় জয় জয় –
এমন পৃথিবী যদি হয়ে থাকি পূণ্য –
সেই পৃথিবীর বুকে প্রেম আর জয়ের
এবং প্রেমিক মানুষের
গজলের গান এবার।[৮০]

প্রবল আশাবাদের সুর লক্ষ করা যায় কোনো-কোনো কবিতায়। কবি মনে করেন মানবতার এই অপমান, মূল্যবোধের অবক্ষতি সমাজদেহে ব্যাধির মত। একদিন ব্যাধি দূর হলে সমাজ আবার পূর্ণ স্বাস্থ্যে দীপ্তিমান হয়ে উঠবে।

মনে হয়, আমি এই পৃথিবীর এক
সহিষ্ণু সন্তান
যার
আত্মার পিপাসার প্রতীক্ষার এই অবক্ষয়
এই নিঃস্ব শেষ হওয়া, মুছে যাওয়া এই অপমান
একদা সার্থক হবে পৃথিবীতে।
আসন্ন আগামী কাল
জন্ম দেবে সে অমর্ত্য শান্ত মহৎ প্রতিজ্ঞার।[৮১]

'সারা দুপুর'[৮২] এ বেদনা-বিধুরতার আমেজ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এর কারণ সম্পর্কে আপত্তি তুলেছেন শামসুর রাহমান। 'বইটির নাম যদিও সারা দুপুর তবু পুরোর সমস্তটা জুড়ে একটা অপরাহ্ণের ছাপ বেশ গাঢ় বলেই মনে হয়েছে আমার'।[৮২ক] কিন্তু স্মরণীয়, কাব্যের বেদনার আমেজ 'কখনও বিপ্লবের অজানা শব্দহীন গভীরতাকে স্পর্শ

---

৮০। 'প্রেম যাক মানুষ ঘোষণা', পৃঃ ৩৭-৩৮

৮১। 'অন্ধ মনের গান', পৃঃ ৬০

৮২। ২য় সং /ঢাকাঃ কাবিতাব, ১৯৬৬/

৮২ক। 'সারা দুপুর', /পুস্তক পরিচয়/, মাসিক পূবালী, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩৭২, পৃঃ ৭৭

Dhaka University Institutional Repository



করে, কখনও তার উত্তাল হাওয়ায় মর্মরিত পত্রের হাহাকারকে মূর্ত করে তোলে।'[৮৩] এর কারণ হতে পারে বহিরাগতের মানস ও আশ্রয়-হীনতা। জীবনের পূর্বাপর যখন লোপ পায়, তখন মনের মধ্যে শরণ নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

আমার
সব গেছে, মাঠের মধুর বংশী গেছে, আর
পুকুরের মাছ, গোলাভরা ধান নেই, দুধমাখা ভাতে
এখন বসে না কাক।
মনে হয়, শেষ শিখা সর্বশেষ ঝড়ে
নিভে যাবে, আমি নিভে যাবো।[৮৪]

কিংবা

হঠাৎ মনে হয়, আমি এক অভিশপ্ত মানব সন্তান
যুদ্ধের প্লাবনে পথ হারিয়েছি
এবং পথের সব আলো নিভে গেছে
আর কেবল
বিবৃত এক আর্তির ছলনা।[৮৫]

কিন্তু দুঃখের অবসাদের মধ্যেও কবি নিজের ভূমিকাকে বিস্মৃত হন নি। নিজের জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও ভবিষ্যত বংশধরেরা মুক্ত আলোবাতাসের উদার পরিবেশে জীবন-ধারণ করুক — এটা তিনি কামনা করেন এবং তাই তাদের জন্য উত্তরাধিকার হিসাবে রেখে যেতে চান ব্যবসা-বাণিজ্য বা কলকারখানা নয়, বরং কিছু মহৎ বাণী ও ফুলের উজ্জ্বলতা, যার আলোতে লোহা বা তাদের নাড়তে যাবার সময় তারা হৃদয়ের উপস্থিতিকে অনুভব করবে।

কি জানেন, আমি যাবো, আপনিও যাবেন,
শিশু আর কিশোর যুবক সন্তানেরা আমাদের

---

৮৩। মুনীর চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৪–১২৫
৮৪। 'এই ঝড়ে অন্ধকার', পৃঃ ২১
৮৫। 'তারা দুজন', পৃঃ ১৪

Dhaka University Institutional Repository



রয়ে যাবে। সেঞ্চুরীর তারা
দীর্ঘদিন পরে জানি ফুল দেবে।
দীর্ঘ দিন।
আমরা তখন বেঁচে নেই পৃথিবীতে।
অনেক অদ্ভুত
আমাদের সন্তানেরা এই পথে প্রত্যহ সকালে
সোনা কিংবা তাদের বাড়িতে যাবে যখন
তখন
আমাদের কিছু দুঃখ
কিছু সোনা বুকে বেঁধে নিয়ে যাবে তারা।[৮৬]

যান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে কবি সুরেনের ক্ষোভবাণী ও অনুভিতক প্রতিতে নিসর্গ সৃষ্টিতে আর সে আসে, তীব্র সমস্ত ঔদ্ধত্য মানুষকে অনেক আশ্বাস দেয়, কিন্তু তার আমাদের পক্ষতার নির্ণায়ক হয় 'ঘাস ফুল সরোবর বাগান'। অনন্ত দীর্ঘ করে তার ভবিষ্যবাণী দেয়, কিন্তু এখন প্রান্তর হয় এই তীব্র আলোকে। সে হারানো বাগানকে খুঁজে ফেরে এবং এই বাগানকে পৃথিবীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করার কথা ভাবে।

এবং এখন প্রান্তর এই সব দীর্ঘের প্রান্তরে
খুঁজে ফেরে হারানো বাগান
সরোবর ঘাস ফুল।
ফুলের অদ্ভুত বিস্ময়ের
এই সব নিঃশব্দে হারাতে হয় রাখি।[৮৭]

'আমার কোন দেশ'[৮৮] প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে, কিন্তু এর কবিতাগুলি রচিত হয়েছে পাকিস্তান আমলের শেষ দিকে। সে-হিসাবে আমাদের আলোচ্যপর্বের একটি শেষ ধারা। আকাশ কবিদের কবিতার সৌখিন নানা গুরু আশাবাদ, এ-ধারাতেও মুক্ত নয়। আসলেই

---

৮৬। 'হৃদয়ে বাজনা', পৃঃ ৩০—৩১

৮৭। 'সে আসে', পৃঃ ৩৯

৮৮। ঢাকা : খান ব্রাদার্স

Dhaka University Institutional Repository



সুতরাং প্রমাণিত যে, কবি এখনো আশাও সুন্দর রাজ্যে বাস করছেন। তাঁর আশা এক সুন্দর মধুর পৃথিবীর জন্য। ক্লান্তি নৈরাশ্য ও বিষন্নতাকে বিষয় করে যারা কবিতা রচনা করে, তাদের প্রতি রয়েছে কবির অপরিসীম অবিশ্বাস।

> আমি বড় অসুখী। আমার আজন্ম অসুখ। না না
> অসুখে আমার জন্ম।
> এই সব মোহন বাক্যের জাল ফেলে
> পৃথিবীর আনন্দ-প্রভাব কিছু বর্ণচোরা লোকে
> আবহ-সাগরে
> সম্প্রতি উধাও হাতে নৌকা বায়। আমরা বিমূঢ়।[৮৯]

পৃথিবীতে অভাব মনুষ্যত্বের ঃ একটি কবিতায় তিনি এমন একজন মানুষের কথা বলছেন সমাজের জনারণ্যে যে মানুষ গড়ার কারিগর খুঁজে বেড়াচ্ছে ঃ

> চিত্র নয় কাব্য নয়, চাই
> মানুষ গড়ার জন্য দক্ষ এক কারিগর তায়।[৯০]

কবি নিজেও ক্ষুধার অন্ধকার রাজত্ব থেকে মুক্তি প্রার্থনা করছেন অন্য একটি কবিতায় ঃ

> ক্ষুধার এই অন্ধকার থেকে মুক্ত করো
> আমাকে বাঁচতে দাও।[৯১]

সুতরাং আজাদ রাহমানের কাছে মানুষই বড় কথা। মানুষের মহৎ প্রবৃত্তিগুলি জাগরিত হোক, মানবজীবনের মৌলিক চাহিদাগুলি পূর্ণ হোক — এটা তার কাম্য। শিল্পসংস্কৃতি সবই মানুষের জন্য, শিল্পকে বাঁচাতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন মানুষকে বাঁচানোর। একটি কবিতায় আছে ঃ শিল্প-শালায় আগুন লেগেছে এবং তাতে আটকা পড়েছেন এক বৃদ্ধ,কবি অনুরোধ করছেন বৃদ্ধকে উদ্ধার করার জন্য, কেননা 'শিল্প মানুষের জন্য,মানুষ শিল্পের জন্য নয়'। এ-কাব্যের সর্বশেষ কবিতায় বলেছেন একজন মানুষের কথা যে পৃথিবীর

---

৮৯। 'অসুখ', পৃঃ ৪০

৯০। 'একটা লোক', পৃঃ ৩৪

৯১। 'আমাকে দাও', পৃঃ ৪৪

Dhaka University Institutional Repository



মানুষের হাটে যাবার সুযোগ করে দেবার বারংবার অনুরোধ করে ব্যর্থ হয়ে শেষে শাবল বানাতে গেছে —

যতবার পৃথিবীতে এসেছি দেখেছি এই দৃশ্য বারবার
অথচ এবার
কি আশ্চর্য, লোকটা চেনা, তার সেই বিভ্রান্ত দুচোখ
শান্ত, অর্থময়, বেদনা দুচোখে মিনতির ছায়া টেনে, তার
গলায় চীৎকার নেই, একমনে বসে
লোকটা শুধু একমনে বসে বসে শাবল বানায়।[৯২]

'মেঘ বলে চৈত্রে যাবো' প্রকাশিত হয়েছে পাকিস্তানোত্তর কালে এবং এর কবিতাগুলির রচনাকালও সে-সময়। সুতরাং তা ভিন্ন প্রসঙ্গে বিচার্য।

পাকিস্তানের কাল-পরিধিতে রচিত আহসান হাবীবের কবিতা কোনো একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্থির থাকেনি। সাধারণভাবে সমাজানুগত মানুষই তাঁর কবিতার মুখ্য আশ্রয়। তাদের দুঃখ-বেদনা ও স্বপ্ন-সম্ভাবনাকে তিনি অবলম্বন করেছেন তাঁর কবিতায়, অথচ লক্ষ্য করা যাবে, একই দৃষ্টিতে ও একই ভঙ্গিতে তিনি সর্বদা বিষয়ের পরিচর্যা করেননি। প্রধমাংশে তাঁকে আকৃষ্ট করেছে সমাজদেহ কিন্তু তিনি ক্রমাভিসারী সমাজচৈতন্যের। প্রথম কাব্যের প্রসন্ন প্রত্যাশা ও স্বপ্নপ্রয়াণ 'আশায় বসতি'তে বিপর্যস্ত হয়নি, কিন্তু মধ্যবর্তী কালে স্বপ্নভঙ্গের চিত্র ও প্রাণপণে আশাকে ধরে রাখার চেষ্টায় তাঁর ক্ষতবিক্ষত মানস পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। শব্দব্যবহারে প্রথম সংকলনে তাঁর রোমানটিকভাব কথা বলেছেন সৈয়দ আলী আহসান, কিন্তু 'সারা দুপুর'-এ তিনি-যে এদিকে অসতর্ক ও অমনোযোগী ও নতুন ছন্দ-নির্মাণে অনুৎসাহী তার ইঙ্গিত করেছেন শামসুর রাহমান।[৯৩] কাব্য জীবনের প্রথমদিকে তিনি কথা বলেছেন সহজ ও সরাসরি ভঙ্গিতে কিন্তু ধীরে-ধীরে গ্রহণ করেছেন সংকেতময়তা ও তির্যকভঙ্গি।

---

৯২। 'যতবার এবং এবার', পৃঃ ৫৬
৯৩। 'সারা দুপুর', /পুস্তক পরিচয়/, পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository



## সৈয়দ আলী আহসান

সৈয়দ আলী আহসানের কাব্যকর্মের প্রথম পর্যায় সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। সে-পর্যায়ে তিনি গোষ্ঠীচিন্তার বিস্তার, ধর্মভিত্তিক জাতীয় সাহিত্যাদর্শ নির্মাণে যত্নবান। ১৯৫৩/৫৪ সালে তিনি করাচী গমন করেন এবং ছ বছর সেখানে কাটান। এ-সময়ে পাশ্চাত্য সাহিত্যধারা ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সাহিত্য-সংগঠনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে এবং বিভিন্ন দেশে তিনি সফর করেন। তিনি ঢাকা ফেরেন ১৯৬০ সালের শেষের দিকে। পূর্ব বাংলার নতুন সামাজিক অবস্থার প্রভাব ও বিদেশ সফরের অভিজ্ঞতা মিলে তখন তাঁর কাব্যভাবনাকে নতুন দিকে পরিচালিত করে। এই সময়ের ফসল হচ্ছে অনেক আকাশ /১৩৬৬/, একক সন্ধ্যার বসন্ত /১৩৬৯/, সহসা সচকিত /১৩৭৩/, উচ্চারণ /১৯৬৮/ ও আমার প্রতিদিনের শব্দ /১৩৮৮/। এই পর্যায়ে কবির যে-পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তা হল তিনি আপন ব্যক্তিতার সূক্ষ্ম আবিষ্কারের প্রতি ও ব্যক্তিগত কবিভাষা উদ্ভাবনে অভিনিবিষ্ট।

জীবনদৃষ্টির ক্ষেত্রে কবির পুরানো ধারণা যে বিপর্যস্ত হয়েছে সে-বিষয়ে তিনি 'অনেক আকাশ'-এর একটি কবিতায় ইঙ্গিত দিয়েছেন।

> জেনেছি উঁচুর গায়ে ভেঙে পড়া কাঁকরের মতো
> জীর্ণ হয়ে রয়ে গেল সব সুখ, সমস্ত বিশ্বাস।[১৪]

এই অবস্থা তাঁকে বিচলিত করে দিয়েছে। পুরানো জীবনবোধ অপসৃত অথচ নতুন বোধও অনায়ত্ত। দেশ-কালের বোধ হারিয়ে তিনি কুয়াশাচ্ছন্ন চিত্তে জীবনের অর্থ হাতড়ে

---

১৪। 'উন্মুখ মেঘের প্রাণ', অনেক আকাশ, কাব্যসমগ্র /ঢাকা : আহমদ প্রকাশনী, ১৯৭৪/, পৃঃ ৬

Dhaka University Institutional Repository



চেয়েছেন এবং এই সত্যে উপনীত হলেন যে, দেহকে অবলম্বন করেই দেহাপারের চৈতন্যকে উপলব্ধি ও প্রাপ্ত করা সম্ভব।

ক. বিদ্রূপ নয়নে আমি জীবনের সন্ধান জেনেছি
দীপান্তর, লোকালয়, সূর্যাস্ত অনেক অতীত
নতুন নারীর দেহে উরু-পুষ্টি আকাঙ্ক্ষা চেয়েছি
মূর্ছিত নদীর স্রোতে আবাল্য করেছি সন্ধান।[১৫]

খ. দিন নেই রাত্রি নেই — অন্ত দুরাশা
তোমার দেহের তীরে একমাত্র বাঁচবার আশা।[১৬]

'একক সন্ধ্যায় বসন্ত'-তে দেহভাবনার সঙ্গে প্রকৃতি-চেতনা যুক্ত হয়েছে। 'নিরন্তর পাইনের বিস্তারের মধ্যে' ও 'অযাচিত সমুদ্রের আবর্তের মধ্যে' প্রকৃতির নিশ্চিন্ততায় আচ্ছন্ন পৃথিবীতে তিনি সত্যের সন্ধান করেছেন দেহ ও হৃদয়ের আকুলতার মধ্যে।

যেখানে প্রকৃতির নিশ্চিন্ততায়
প্রতি-মুহূর্তের সত্যের
মৃত্যুর মৃদুতা আনে
সেখানের উজ্জীবিত প্রগাঢ়তায়
আমি প্রার্থনা করলাম
তিমিরাচ্ছন্ন মুক্ত হয়ে ইতিহাস ফিরে আসুক
দেহ আর হৃদয়ের আকুলতার মধ্যে।[১৭]

'সহসা সচকিত'-এ তিনি পুনরায় প্রাধান্য দিয়েছেন দেহ সম্ভোগকে। দেহ মিলনের চূড়ান্ত মুহূর্তে সময় কাল ও পরিবেশ বোধ যখন লোপ পায় তখন চকিতে অনুভবের ও অনন্ত-সত্যের উপলব্ধিতে হৃদয়ের সর্বাঙ্গীণ জাগরণ হতে পারে বলে তাঁর বিশ্বাস জন্মেছে।

তার চেয়ে এসো — সমস্ত ভুলে
সময়, মানুষ চারিদিকের

---

১৫। 'নূতন স্বাদ', ঐ, পৃঃ ৫০
১৬। 'তোমার দেহের তীরে', ঐ, পৃঃ ৪৫
১৭। 'প্রার্থনা', একক সন্ধ্যায় বসন্ত, কাব্যসমগ্র, পৃঃ ১২৯

Dhaka University Institutional Repository



দেহ-দেহলীতে প্রদীপ জ্বালিয়ে
ভুলে যাই ভয় আবরণের
নিরাবরণের বিরল সলিলে
দুই দেহে হবে অবগাহন
সময় হারিয়ে দুইটি নয়নে
শুধু বিস্ময়ে অবগাহন ।।[৯৮]

এ-কাব্যেই তিনি বিশ্বাসে উপনীত হয়েছেন, দেহবাসনা হারিয়ে নির্বাণ লাভের মাধ্যমে পূর্ণতা অর্জনের কামনা যে করে, সে সুন্দরের বা আনন্দের প্রতিভূ হতে পারেনা, বরঞ্চ সর্বদা আকাঙ্ক্ষা ও কামনার মধ্যে জাগ্রত ও সচল থাকাতেই জীবনের চরিতার্থতা নিহিত ।

পূর্ণতা যার কাম্য প্রদীপ
সে নয় উপমা সুন্দরের
কামনার দাহ দেহে যার নেই
স্বাগত সে নয় আনন্দের ।[৯৯]

নারী ও প্রকৃতি এদুয়ের মধ্যে কোনো সমন্বয় ঘটেনি তাঁর চিন্তায়, ফলে এক সিদ্ধান্তহীনতার অসহায়তা লক্ষ করা যায় 'উচ্চারণ' কাব্যে । নিজের একটি স্বপ্নদর্শনের প্রসঙ্গ টেনে এমনোভাবকে তিনি প্রকাশ করেছেন । একদিকে দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরে সুরের প্রবাহ, অন্যদিকে পুকুরে স্নানরতা রমণীদের আহবান — দুইই তাঁকে টানছে অথচ তিনি সিদ্ধান্তহীনতায় বিমূঢ় ঃ

> সঙ্গে সঙ্গে পানির স্রোতে নিরাবরণ দেহগুলি যে আবর্ত তুলছে তার আকর্ষণ তীব্রতর হল । আমি পুকুরের দিকে যাব ভাবলাম । এমন সময় সুরের করুণতায় বিহবল হয়ে প্রান্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করলাম । আমি তখন সিদ্ধান্তহীন অসহায়তার মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলাম ।[১০০]

---

৯৮। /কবিতাসংখ্যা/ ২১, সন্ধ্যা সচকিত, কাব্যসমগ্র, পৃঃ ১৬৩
৯৯। /কবিতা সংখ্যা/ ৯, ঐ, পৃঃ ১৪৯
১০০। /কবিতা সংখ্যা/ ৫২, উচ্চারণ, কাব্যসমগ্র, পৃঃ ২৬

Dhaka University Institutional Repository



এর ফলে আর কোনো অগ্রগতি সৈয়দ আলী আহসানের কবিতায় নেই, কিংবা এই সিদ্ধান্তহীনতার অসহায়ত্বকে উন্মোচনের প্রয়াসও মূর্ত। সর্বশেষ কাব্য 'আমার প্রতিদিনের শব্দ'-এর মধ্যে এর একটি অকপট স্বীকৃতি আছে।

একদিন বাঁচার উৎসাহে
　　　　একটি দিগন্তকে রঙিন করেছিলাম
...　　　　...　　　　...
সে-দিগন্ত এখন বিলুপ্ত ইতিহাস
　　　　এখন আমি নিঃস্ব মুহূর্তের নাবিক।[১০১]

পাশ্চাত্য-সমাজে ধনতন্ত্র বিকাশের প্রাথমিক যুগে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ একটি ইতিবাচক তাৎপর্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল; কিন্তু ধনতন্ত্রের সর্বশেষ কালে, উদারনৈতিকতার অবক্ষয়ের সময়ে, তা ব্যক্তিসর্বস্বতার মধ্যে পরিণতি লাভ করে। অনেকের রচনায় ও চিন্তায় ব্যক্তিই বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে দেখা দেয়। পূর্ব বাংলায় বুর্জোয়া বিকাশ প্রাথমিক স্তরে থাকলেও পাশ্চাত্যের ব্যক্তিসর্বস্বতা সৈয়দ আলী আহসানকে প্রভাবিত করেছে। চারপাশের চলমান জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তিনি মগ্ন হয়েছিলেন ব্যক্তিসত্তার চিত্রায়ণে ও তার সূক্ষ্ম উপলব্ধিতে। এই মগ্নতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টায় তাঁর ব্যর্থতা ও অজ্ঞাত অসহায়তার কথা আমরা জানতে পারি 'আমার প্রতিদিনের শব্দ' কবিতাগুচ্ছে।

---

১০১। 'বেঁচে থাকা', আমার প্রতিদিনের শব্দ, কাব্যসমগ্র, পৃঃ ৩০৫–৩০৬

Dhaka University Institutional Repository



স্মরণীয় যে, তাঁর কাব্যরচনার ধারায় এর পরে একটি দীর্ঘ বিরতি এসেছে এবং তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর কাব্য-সমগ্র ।

কাব্যচিন্তায় পরিবর্তন ছাপ রেখেছে আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও । তিনি একজন পরিশ্রমী ও শব্দসচেতন কবি । কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ বলে তিনি বিবেচনা করেন । সুচিন্তিত ছন্দ ও স্তবকবিন্যাসে রচিত 'অনেক আকাশ'-এর নিয়ম অনেক বদলে গেছে 'সহসা সচকিত' ও 'উচ্চারণ'-এ এসে । এই বইদুটিতে কবিতার কোনো নামকরণ না-করে চিহ্নিত করেছেন সংখ্যাদ্বারা । 'উচ্চারণ'-এ কবিতার পংক্তিবিন্যাসের রীতি একেবারে ভেঙে দিয়ে গদ্যের কাছাকাছি নিয়ে গেছেন — একজন সমালোচক এগুলিকে কবিতা না-বলে বলেছেন 'কাব্যময় গদ্য রচনা' ।[৮২] তিনি শব্দকুশলী কবি হতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু অসতর্ক পাঠকেরাও লক্ষ করে কৌতূহল বোধ করবেন যে, বিশেষ কয়েকটি শব্দ তাকে একেবারে আবিষ্ট করে রেখেছে — সেগুলি হচ্ছে 'অনবরত', 'আবিষ্কার', 'জয়', 'আকাশ', 'প্রেম', 'সবুজ' ইত্যাদি ।

---

৮২। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'উচ্চারণ/ 'উচ্চারণ' /পুস্তক সমালোচনা/, মাসিক বই, আশ্বিন ১৩৭৪, পৃঃ ২৯৪

Dhaka University Institutional Repository



## সানাউল হক

১৯২৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি কুমিল্লা জেলায় সানাউল হক জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় স্কুলে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়। ১৯৪৫ সালে অর্থনীতিতে এম-এ ডিগ্রি লাভের পর কিছুকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে ১৯৪৯ সালে যোগ দেন পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে ও ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৭৩ সাল থেকে পরবর্তী তিন বছর ছিলেন বেলজিয়ামে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত।

শিক্ষা ব্যাপদেশে ও সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে ঘুরেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। লন্ডন, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, তুরস্ক, ফ্রান্স, ইতালী, নেপাল ব্যতীত গিয়েছেন আরো অনেক দেশে। যোগ্যতার স্বীকৃতি-স্বরূপ পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পেয়েছেন সিতারা-ই-ইমতিয়াজ খেতাব।

সাহিত্যপ্রীতি তাঁর ছেলেবেলা থেকেই। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বাংলা সাহিত্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। কবিত্বশক্তির স্ফুরণ ঘটে ছাত্রাবস্থায়। পরবর্তীকালে কবিতা-ব্যতীত ছড়া, ভ্রমণকাহিনী, গল্প, অনুবাদ ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রচনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রকাশিত হয়েছে কবিতাপুস্তক 'নদী ও মানুষের কবিতা' /১৯৫৬/, সম্ভবা অনন্যা /১৯৬২/, সূর্য অন্যতম /১৯৬৩/ ও বিচূর্ণ আর্শিতে /১৯৬৮/, এবং কাব্যানুবাদ 'বরিস পাস্তারনাকের কবিতা' /১৯৬৪/ ও '[illegible] প্রেমের কবিতা' /১৯৭০/। সাহিত্যপুরস্কার পেয়েছেন একাধিকবার — ভ্রমণকাহিনীর জন্য ১৯৬৪ সালে ইউনেস্কো পুরস্কার, কবিতার জন্য ১৯ বাংলা একাডেমী পুরস্কার ও ছড়ার জন্য ১৯ ইউনাইটেড ব্যাংক পুরস্কার। তাঁর সাহিত্যসাধনা তারপরেও অব্যাহত গতিতে চলছে এবং বেশ কয়েকটি সংকলন তিনি প্রকাশ করেছেন।[১০৩]

---

১০৩। UNESCO-ASIA, Quarterly, (Bulletin of Asian National Commission for Unesco), Vol. 9, No.2, 1977, published by Japanese National Commission for Unesco, (Tokyo), P. 1

Dhaka University Institutional Repository



'নদী ও মানুষের কবিতা'[১০৪] কাব্যের কবিতাসমূহ রচিত হয়েছে ১৯৪০—১৯৫৪ সালের মধ্যে। এতে দুধরনের কবিতা আছে। প্রথম শ্রেণীর কবিতা এই সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিতে রচিত। দাঙ্গা, মন্বন্তর ও দেশবিভাগ প্রভৃতি কারণে মনুষ্যত্বের যে অবমাননা কবি প্রত্যক্ষ করেছেন তা তাঁকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে মানুষের প্রতি। 'প্রেত-১৩৫০', 'সুবহ ঃ ১৩৫২', 'একটি গাথা'— কবিতাত্রয়ের পটভূমি দেশবিভাগপূর্বের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দুর্ভিক্ষ। কবি প্রশ্ন করেছেন

এদের স্বজাতি আমি। কাঁদে পথে দানাহারা গান
আমার হৃদয়ে আছে আমৃত্যু তাদের কোনো দাবী,
বিচ্ছায়ায় ঘুরে একা ফিরি দেহ খুঁজি আর ভাবি ঃ
কী আশ্চর্য এখনো শরীর রয়েছে মানুষের প্রাণ।[১০৫]

দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতা দেশের চিরচেনা মানুষ ও প্রকৃতি ভিত্তিক। 'কবির মন এ—দেশের মাটির গভীরে প্রোথিত সেটা পাঠকের জানা হয়ে গেল'— এই কবিতাগুলি থেকে।[১০৫ক] এগুলির মাধ্যমে তাঁর অভিপ্রায় হল দেশকে ও দেশের মানুষকে আবিষ্কার করা এবং নিজের চেতনায় অনুভব করা। ছায়াসুনিবিড় গ্রামের ও সে—গ্রামের মানুষদের যে ছবি কবির বাল্যকালের মনে চিরকালের মতো সুস্থির আবেশ নিয়ে মুদ্রিত হয়ে গেছে তার ভিত্তিতেই তিনি বহির্জগতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন।

ভাব গেছে উঁচু থেকে উঁচু হয়ে
যা গেছে ধাপে — ধাপে নেমে
মধ্যখানে সমতল
ছায়া সুনিবিড়
মনোরম — সে আমার গ্রাম ঃ
/নাম তার না—ই বলিলাম/
এখানেই পেয়েছি স্বদেশ
এখানেই দেশের মানুষ চিনিলাম।[১০৬]

---

১০৪। ঢাকা ঃ জ্যোতি বুক সেন্টার, ১৩৬৩
১০৫। 'সুবহ ঃ ১৩৫২', পৃঃ ১৩
১০৫ক। সৈয়দ আবুল মকসুদ, 'মাটি এবং মানুষের কবি', রোববারের সংবাদ, ২০।৪।৮২
১০৬। 'আমার গ্রাম', পৃঃ ৬৪

Dhaka University Institutional Repository



কবির বাল্য-কৈশোর কেটেছে তিতাসের তীরে-তীরে । স্বভাবতই তাঁর অন্তর্লোকে তিতাস স্থায়ী আসন পেতেছে । নদী যেমন গতিপথের দু'পারের জনপদকে উর্বরতা ও শ্যামলতা দান করে, জীবজগতকে তৃষ্ণার পানি যোগায়, কবিও খুঁজেছেন নদীর মতোন বিশিষ্ট মানুষকে, যার যার মন বিত্তসচ্ছল, প্রকৃতিবৎসলী ও স্নেহ-প্রীতি-মমতার রসে স্নিগ্ধ ।

তেমন মানুষ নাকি আছে
এখানে মাটির ঘরে, নগরের শহরের কাছে
ঘরে পরে ফিরি করে পিপাসার জল
শিশুরে অন্ন দেয়, শিকড়ে যোগায় বল,
ফুল দেয় ফল দেয় আর মিঠে হাওয়া
যতো দিতে পারা যায় যতো যায় দেওয়া
সব দিয়ে সব পেলে বুক চিরে-চিরে
তবু বিলায়ে দেয় চেনা তার অচেনার ভিড়ে ।[৬৭]

কবির আকাঙ্ক্ষা নদীর হৃদয়ের অধিকারী হওয়া । কিন্তু তাঁর মনে রয়েছে অন্তর্নিহিত এক শত্রু যে এই আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নের পথে বার-বার বিঘ্ন সৃষ্টি করতে চায় । কবির সংগ্রাম চলছে শত্রুদের সেই বিপুল সনে ।

আমারে সরিয়ে নেয় নদী আর মানুষের থেকে
প্রতিদিন মুখোমুখি হই তার আমার সংগ্রামে ।[৬৮]

'সূর্য সকাশে'[৬৯] কাব্যের কবিতাগুলি প্রকৃতি : প্রেম : পৃথিবী এই তিনখণ্ডে বিন্যস্ত । এখানে তিনি তাঁর মনের অবাধ সঞ্চরণের উপযোগী একটি ভিত্তিভূমি নির্মাণ করেছেন — সেটি বাংলাদেশের প্রকৃতির অফুরন্ত বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য, যার মধ্যে আবার তিতাসের স্থান সর্বাগ্রে । তিতাসের দুই পাড়ের সচল জীবনধারার বৈচিত্র্য, ঋতুচক্রে প্রকৃতির নব-নব সাজ, প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য প্রকৃতির ক্লান্তিহীন চিত্র পরম্পরা অঙ্কন করে তিনি স্বদেশকে উপস্থাপিত

৬৭। 'নদী', পৃঃ ৭২
৬৮। 'দূরন্ত বিদ্রোহ', পৃঃ ৭০
৬৯। ঢাকা : সমকাল প্রকাশনী, জানুয়ারী ১৯৬৩

Dhaka University Institutional Repository



করেছেন এবং এর মাধ্যমে স্বদেশের প্রাণের সন্ধান করেছেন ।

তীরে-তীরে কতোবা কল্লোল, নানা গীত পাখি
কত বড় কাহিনী: গান ও যবনের ইতিহাস ঃ
হাসিকরা শ্রীপুর, ফতুল্লা বাড়িশালী বাঁধি,
তাসাবাদ রাসাবাদ একঝাঁক ময়ূরপাখি হাঁস ।
কাপড় গো-বাথান আলেপাড়া বুড়োইমোবাড়ি ঃ
এই নদী কারিগর তাঁতী শিল্পী হয়তো বা কবি —[১১০]

প্রকৃতির গুরুত্ব কবির কাছে অনেক হলেও মানুষের গুরুত্ব ততোধিক । প্রকৃতির পৃথিবীতে প্রচুর সম্ভার ও সৌন্দর্য আছে আকাশে পাহাড়ে নদীতে ও সমুদ্রে, কিন্তু তারো চেয়ে মহীয়ান মানুষ, মানুষের মন ।

পৃথিবী অনেক বড় । আরো বড়
কোনো-কোনো মানুষের, মনীষীর মন —
ছুড়ে দিয়ে যখন
মশালের মতো জলসায়, ছায়া দেখায় —
উন্মোচিত বিদ্যার মুখোশ, পরিক্রমে মধুর জোছনা ঃ
সত্যময়ে, সত্তর প্রত্যয়ে ।[১১১]

'সত্তা অবধ্যা থ'[১১২] কবিতাগুলি কবির পশ্চিম ইউরোপের প্রবাস-জীবনে রচিত । দূর থেকে দেখায় যে সৌন্দর্যের আমেজ ও সামগ্রিকতা আসে তা এ কাব্যে লক্ষ করা যায় । এতে বিমুগ্ধ ও কবিমানসী পরস্পর সমানুরাগে প্রবাহিত হয়ে কবি প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেছে এদুয়ের সমবায়ে — প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও জারাশি এবং প্রেয়সীর হৃদয়ভরা প্রীতি-ভালবাসা — আপাততে কোনো অবধ্যায় মন্দ সম্ভাবনা আছে কি, সে প্রশ্ন কবির মনে জেগেছে ।

নদী মাঠ ঘাস আর প্রাণাদের গীত
দেশ ও বিদেশ — এই আশ্চর্য পৃথিবী

১১০। 'তিতাস', পৃঃ ৫
১১১। 'পৃথিবী অনেক বড়', পৃঃ ৭৯-৮০
১১২। ঢাকা ঃ পূর্বাণী, ডিসেম্বর ১৯৬২

Dhaka University Institutional Repository



এত ভাল লাগে কেন । পাতা ঝিরঝির
অচেনা ঘাসের তালে যেন সুরশিল্পী ।
যেখানেই যাই থমকে দাঁড়াই, দেখি ।
দেখে-দেখে সভ্যতার প্রকৃতির সীমা
কেবল হারাই । পূর্ণতা মাধুরিমা
ছড়ায় সংকেত — কিছু আশাবরীর সে কি ;

পৃথিবীরে আরো ভাল লাগে ঃ তুমি ছিলে
আমারো আছ — সভ্যতার অশ্রু ফসলে
একমুঠি শীষ, প্রকৃতি ছবির ভীড়ে
সভ্যতাবিলাসী । আমি প্রকাণ্ড নিখিলে
কত ক্ষুদ্র ক্ষীণ তুমি । কী শান্তি আঁচলে ঃ
ভালবাসা বেঁচে থাকা আলো ফিরে-ফিরে ।[113]

'বিচূর্ণ আরশিতে'[114] কবি নারীর আবেদনে সমাহিত চিত্তে শিল্পের মধ্যে ধারণ করতে সক্ষম হয়েছেন; কবি এখানে শান্ত স্নিগ্ধ জীবনের অভিলাষী ।

আমি যেন বন্দী এক
আস্তীন, তোমার সুন্দর রূপ
অবারিত আবেগের
পূর্ণ ছবি ঃ রূপালী সূর্য[115]

এ-গ্রন্থে পূর্ব বাংলার দেশ-রূপ ও চিত্র পাওয়া যায় তা-ও কবির মত আন্তর, ধ্যানময় ও শান্তশোভন ।

পূর্ব বাংলা, মোর স্বপ্নিলা
শান্ত শ্রী প্রতিমা
কী গানে গাবেনা, উদাসীনা
ধরিত্রী তিতিক্ষা ।[116]

---

১১৩। পৃঃ ৫৯ /কবিতার নাম নেই/
১১৪। ঢাকা ঃ সমকাল প্রকাশনী, ১৯৬৮
১১৫। 'আমি বন্দী', পৃঃ ২
১১৬। 'পূর্ববাংলা-দুই', পৃঃ ৫

Dhaka University Institutional Repository



তবে এর বাইরেও কিছু কিছু কবিতা আছে যেখানে মধ্যবিত্ত জীবনের স্বাদে আঁকা কবি-মনের পরিচয় লাভ করা যায়। 'দুই ত্রাস' কবিতাটির কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

'নদী ও মানুষের কবিতা' থেকে 'বিচূর্ণ আরশিতে' পর্যন্ত সানাউল হক ক্রমবিবর্তনের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছেন। চারপাশের সমাজের দুর্দশা, যন্ত্রণা ও আলোড়ন এবং নদীমাতৃক ভূভাগের জনপদ দুই-ই প্রথম কাব্যের বিষয়বস্তু, কিন্তু কাব্যপরিক্রমায় তিনি ক্রমশঃ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন দ্বিতীয় প্রসঙ্গের উপর এবং তা-ও আরো সঙ্কুচিত হয়ে শেষদিকের কবিতায় মুখ্য অবলম্বন হয়েছে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও তার উপর লেগে থাকা কবির ব্যাকুলতা। এ থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রকৃতির ও কবির যে-পরিচয় লাভ করা যায় তা হল নির্বি-রোধী, শান্ত সমাহিত ও বিক্ষোভবিহীন। ইতিমধ্যে কবিও ধীরে-ধীরে জনজীবন বিচ্ছিন্ন হয়ে অবস্থান নিয়েছেন প্রশাসনের মসনদে, বিদেশ-প্রবাসে।

একই সঙ্গে পরিবর্তন এসেছে আঙ্গিক-পরিচর্যার ক্ষেত্রেও। নতুন-নতুন প্রকাশরীতি, পুনরাবর্তন-মাত্রিক সমাবদ্ধ পদ, অলংকৃত শব্দ, স্তবকবিন্যাস ও চিত্রকল্প সৃষ্টিতে তিনি মনোযোগী হয়েছেন। সৈয়দ আলী আহসানের কাছে এটি প্রশংসনীয় বলে বিবেচিত হয়েছে।[১১৯ক] কিন্তু মনে রাখতে হবে এর পুনরাবর্তন হয়েছে নেতিবাচক কারণে। লেখার বিষয়বৈচিত্র্য কমে আসার সঙ্গে-সঙ্গে একই বস্তুকে বিভিন্নভঙ্গিতে, ঘুরে-ফিরে, বার-বার দেখে জ্ঞাপিত করার পুনরাবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। ফলে স্বতঃস্ফূর্ততা ও স্বাভাবিকতা ব্যাহত হয়েছে, প্রকাশ পেয়েছে কৃত্রিম প্রয়াস ও কষ্টকল্পনা। হাসান হাফিজুর রহমানের মতে 'আতিশয্য, অসংযম, অপরিচ্ছন্নতা ও অকারণ সর্বসংলগ্নতা এবং ছন্দ ও মিলের ক্ষেত্রে অমনোযোগ, অসতর্কতা এবং পরিশ্রম বিমুখতাই কবি সানাউল হকের পক্ষে সুকবি হয়ে ওঠার সম্ভাব্যতার অন্তরায় সৃষ্টি করেছে বলে ধারণা হয়'।[১১৯খ] মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহও তাঁর কবিতায় আঙ্গিকের প্রশংসা করতে পারেননি।[১১৯গ]

---

১১৯ক। 'পূর্ব পাকিস্তানের কবিতা', আধুনিক বাংলা কবিতা, শব্দের অনুষঙ্গে, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৫-১৭.

১১৯খ। আধুনিক কবি ও কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৬

১১৯গ। 'সমকালীন কবিতার ধারা', সমকালীন সাহিত্যের ধারা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৭

Dhaka University Institutional Repository



## আবদুল গনি হাজারী

১৯২৫ সালে পাবনা জেলার খাজিরপাশদের বড়াগ্রামে আবদুল গনি হাজারী জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করে তিনি বিএ ডিগ্রি লাভ করেন কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে। বিভাগ পূর্ব নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ছাত্রফ্রন্টের উদারনৈতিক দলের সঙ্গে ও এম,এন রায়ের র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। ১৯৫৪ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সম্মেলনের তিনি ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক।

সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক ও সাংবাদিক কার্যকলাপের সঙ্গে তিনি কৈশোর থেকেই যুক্ত ছিলেন। তিনি 'আলোড়ন' নামক একটি পাক্ষিক পত্রিকা /১৯৪৬/, 'চতুরঙ্গ' নামক লিটল ম্যাগাজিন ও র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্টদের মুখপত্র 'মুক্তি' ও ইংরেজি সাপ্তাহিক 'রিপাবলিক' সম্পাদনা করেন দেশ-বিভাগের পূর্বেই। পাকিস্তান আমলে ঢাকার পাকিস্তান অবজারভার ও সংবাদ-এর কাজ করেছেন। স্বাধীনতার পর সরকারী মালিকানাধীন সংবাদপত্র ও বার্তা সংস্থা ব্যবস্থাপনা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে আমৃত্যু /সেপ্টেম্বর ১৪, ১৯৭৬/ দায়িত্ব পালন করেন।

তাঁর প্রকাশিত কাব্য-সংকলন তিনটি: সামান্য ধন /১৯৫৯/, সূর্যের সিঁড়ি /১৯৬৫/ ও জাগ্রত প্রদীপে /১৯৭০/। দ্বিতীয় কাব্যের 'কতিপয় আমলার স্ত্রী' কবিতার জন্য তিনি আন্তর্জাতিক সাহিত্যসংস্থা পি,ই,এন, কর্তৃক পুরস্কৃত হন এবং কবিতার জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন ১৯৭২ সালে।[১১৭]

আবদুল গনি হাজারী মূলত পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের আশা ও হতাশা, বিকার ও অবক্ষয়, স্বপ্ন ও সম্ভাবনার সংবেদনশীল ভাষ্যকার। এই শ্রেণীর উদ্ভব, পরিপুষ্টি ও অনুরূপ

---

১১৭। সংবাদ, সেপ্টেম্বর ১৬, ১৯৭৬, ৫ম
'মরহুম আবদুল গনি হাজারীর কর্মময় জীবন', আবু হেনা মোস্তফা কামাল (সম্পাদক) সাকো (সাহিত্য-সাময়িকী), (আবদুল গনি হাজারী স্মৃতি সংখ্যা) প্রথম বর্ষ, সেপ্টেম্বর ১৯৭৭

Dhaka University Institutional Repository



জীবনালেখ্য তিনি রূপায়িত করেছেন অকৃত্রিমভাবে । মধ্যবিত্ত শ্রেণীই প্রধানত পূর্ব বাংলার শাসনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে কিন্তু এদের এক বিরাট অংশের উৎকট লোভলালসা, অশোভন জীবনচর্চা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে দেশের বৃহত্তর জনসমাজ ক্রমশঃ অধিকতর দুর্দশার মধ্যে পতিত হয়েছে । সাধারণ মানুষের ভাগ্যের এই ক্রমাবনতি হাজারীকে গভীর দুঃখাভিভূত করেছে । এই বেদনাবোধ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে তীব্র ব্যঙ্গ পাশাপাশি অবস্থান করেছে তাঁর কবিতায় এবং শেষের দিকে প্রথম মনোভাবই প্রাধান্য লাভ করেছে ।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন ঃ

> ১৯৪৮—এর পর রাষ্ট্রভাষার ভিত্তিতে জনসমাজে যে ব্যাপক আন্দোলন হলো তা পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে যায় । নতুন এক মধ্যবিত্ত সমাজ ক্রমে দানা বেঁধে ওঠে — চাকুরী সর্বস্ব আমলা, নতুন ধনিক অর্থাৎ অর্থলোভী ঠিকাদার, পারমিটবাজ, চোরাকারবারী এবং কিছু হিন্দুদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির সন্দেহজনক উত্তরাধিকার থেকে । অল্পকালের মধ্যেই বিশেষতঃ হিন্দুদের ওপর পা রেখে এবং আক্রমণশীল বণিক সমাজের সহায়তায় এঁরা স্বল্পবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত, বাড়ীওয়ালা ল্যান্ডলর্ড, এমন কি বণিক ও শিল্পপতির ধাপে উঠে গেলেন, কিন্তু মধ্যবিত্তের কি উচ্চবিত্তের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি তাদের মধ্যে দানা বাঁধলো না । তাঁদের নব উৎপাদনের এক অবাধ অসহিষ্ণু পদ্ধতি সমাজকে আরো বিশৃঙ্খল করে তোলে । দুর্নীতি সমাজগ্রাহ্য কর্মনীতি হিসেবে চালু হয়ে গেল । মধ্যবিত্ত জীবিকার এই 'নতুন প্রয়াস আমাদের গত সতের বছরের সংস্কৃতির ইতিহাসকে নিশ্চিত ভাবে কলংকিত করে দিয়েছে ।[১১৮]

'সামান্য ধন'[১১৯] হাজারীর প্রথম কাব্য । মোটামুটি ভাবে পাকিস্তানের প্রথম এক যুগের পটভূমিতে এর কবিতাগুলি রচিত । মধ্যবিত্ত শ্রেণী তখনো স্ফীত হয়ে ওঠেনি ।

---

১১৮। আবদুল গনি হাজারী, 'সংস্কৃতি চিন্তা', হায়াৎ মামুদ(সম্পাদনা), ব্যক্তিগত প্রবন্ধ,(ঢাকাঃ পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ১৩৭৭), পৃঃ ২৮–২৯

১১৯। ঢাকা ঃ বিণাবণিক পাবলিশার্স, ১৯৫৯

Dhaka University Institutional Repository



সামান্য লেখাপড়ার দৌলতে ছোটখাট চাকুরি ও ব্যবসাবাণিজ্য এদের অবলম্বন। গাঁয়ের সঙ্গে বন্ধন তখনো ছিন্ন হয়নি। কোলাহল মুখরিত নগরীর জনারণ্যে থেকে প্রায়ই মনে পড়ে গাঁয়ের কথা।

সেখানে পাটুনী পাড়া খায় কাঠালের
জয়ন্তী নিমের আর ডালিমের চিকন ছায়াতে
দিনান্তের কলরবে মুখরিত ছিল।

কোনদিন স্কুল-ফেরা বালকের চঞ্চল মুরতি
বই-বগল পথে ধাবমান
সুদীর্ঘ বৃক্ষের দেহে বিদীর্ণ বসন ফেলে
একদাও দিয়েছিল মেলে।
এইত সামান্য কথা, এই-ত সামান্য মনে পড়া
সন্ধ্যা ভাসিয়ে নেয় নাগরিক মন।[১২০]

পরিবারের দুঃখদুর্দশার খবর দিয়ে চিঠি আসে পিতার কাছ থেকে, কিন্তু টাকা পাঠাবার জন্য:

বাজারে এবার দাম উঠেছে
চাল খাওয়া হচ্ছে কিনে
তিরিশ টাকা মণে।
ভাইটার পথ্যাপথ্য
মৃত্যুর ইশারা দিচ্ছে।[১২১]

শহরে বসবাসকারী চাকুরী-নির্ভর মধ্যবিত্তদের জীবন বড় নিরানন্দময় ও একঘেয়ে। প্রতিদিন একই সময়ে কাজে বের হওয়া, একই কাগজ পড়া, একই অফিসে যাওয়া ও একই মুখ বারংবার দেখে-দেখে জীবন অর্থহীন হয়ে ওঠে:

প্রাত্যহিক প্রলাপ
প্রাণহীন রোদ
এক পেয়ালা চা
আর দৈনিক কাগজ।[১২২]

---

১২০। মনে পড়ে, পৃঃ ১৭
১২১। সার্কাসের মেয়ে, পৃঃ ২৬
১২২। '[illegible]', পৃঃ ৪৭

Dhaka University Institutional Repository



অথচ এই জীবন কারাগারের মত, এক অদৃশ্য দেয়াল যেন চারদিকে বেষ্টন করে আছে, যার হাত থেকে মুক্তি নেই, নিস্তার নেই।

ক.　এ কঠিন কারা থেকে মুক্তি নেই মুক্তি নেই।[১২৩]

খ.　তবুও সর্বদা মনে হয়
বাঁচি এক আশ্চর্য শারদে[১২৪]

সুতরাং শেষ পর্যন্ত অবলম্বন থাকে মন। মধ্যবিত্ত মানুষ জীবনের সকল অভাবকে পূর্ণ করে কল্পনাবিলাসের মাধ্যমে। প্রতিটি বছর বার-বার ব্যর্থ হয়ে যায় কিন্তু পুরোনো বছরের তীরে দাঁড়িয়ে ভাবতে ভাল লাগে, ভবিষ্যতের দিনগুলি সাফল্যে উজ্জ্বল হয়ে আসবে। কল্পনার এই সুযোগটুকুই মধ্যবিত্তের একমাত্র ধন।

তবু বুকের সামান্য ধন দুহাতে আঁকড়ে
দিনের কিনারে বসে প্রতীক্ষা ঐরাবতের।[১২৫]

'সূর্যের সিঁড়ি'[১২৬] কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৫ সাল। এর পরের কবিতাগুলি নিয়ে 'প্রাকৃত প্রদীপে'[১২৭] প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে। এই সময়ের মধ্যে সামরিক শাসনের ছত্রছায়ায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নানাবিধ কাঁচা পয়সা, ঠিকাদারী, দেশত্যাগী হিন্দুদের সম্পত্তি আত্মসাৎ প্রভৃতি ছিল সুলভে বিত্তবান হওয়ার উপায়।

এবং আসবাবপত্র আসন পিঁড়ের
ধানের মরাইয়ে বোঝা হাজার জমির
শিশি বোতল
পলাতক হিন্দুদের কৃতজ্ঞতা
...　...　...
একদা বন্ধুকে হাতে কয়েকটি প্রজেক্টের ভার
এবং আমার
মধ্যবিত্ত বাস্তু-পরিবার।[১২৮]

---

১২৩। 'মধ্যবিত্ত', পৃঃ ৯
১২৪। 'শারদ', পৃঃ ১
১২৫। 'সামান্য ধন', পৃঃ ৩
১২৬। ঢাকাঃ সুপ্রকাশ প্রেস, ১৯৬৫
১২৭। ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান,
১২৮। 'সেই লোকটিকে', পৃঃ ৩০-৩৫

Dhaka University Institutional Repository



উচ্চপদস্থ সরকারী আমলারাও এই প্রতিযোগিতায় সামিল হয়েছিল ঃ

বাড়ি ফিরেও হায়
বন্ধুর প্রমোশনে ঈর্ষিত
বেনামী ব্যবসার লাভক্ষতি
তারপর চৌদিকোণ
তারপর চৌদিকোণ
তারপরও চৌদিকোণ ।[১২৮ক]

বিত্তার্জনের জন্য প্রতিযোগিতায় মত্ত থাকার ফলে নিজেদের সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নের কোনো সুযোগ এদের ছিলনা । সুস্থভাবে অবসর বিনোদনের অভাবে হঠাৎ পাওয়া বিত্ত নিয়ে এরা সস্তা আমোদ-প্রমোদে মজেছে ঃ

অবশ্য কখনো রাতে ক্লাবে
খেলছে খুলে মদাক্রান্ত সাহেবের
কামুকী বিবির গার্শিতে
বটুয়ার মুখ
কেননা টানলে আপনি খান
মাথাটা আপনি এসে যায়
তাই করো খুশী করো
পৃথিবীর কামাক্রান্ত দেহ ধরোধরো ।[১২৯]

স্বভাবতই এদের পারিবারিক জীবনে বিপর্যয় এসেছে । স্বামীর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিতা স্ত্রী অবশ্য অবসরে প্রাচুর্যে ডুবে পরকীয় প্রেমের পাঠ নিয়েছে ঃ

হায় সাধু, তুমি দেখলে শুধুই বাণিজ্য বাবু
দেখলে না তুমি এখানে আদম
নারীর জন্য খেলা জুয়ার ।[১৩০]

---

১২৮ক। 'কবিতার আমলার পত্নী', পৃঃ ৫৭-৫৮
১২৯। 'সেই লোকটিকে', পৃঃ ৩৩
১৩০। 'অন্য ভুবন', পৃঃ ৪৫

Dhaka University Institutional Repository



এই সময়ে বাংলাদেশে আমলাতন্ত্র নতুন পুঁজিপতিশ্রেণী হয়ে উঠেছিল। সকল প্রকার উন্নয়ন পরিকল্পনার নীতি-নির্ধারণ এদের হাতেই ন্যস্ত ছিল। কিন্তু বিদেশী জীবনাচরণে অভ্যস্ত ও দেশের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ এদের রচিত পরিকল্পনায় কোনো সুফল আসেনি। অনেক প্রকল্প গৃহীত হয়েছে, প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হয়েছে কিন্তু সাধারণ মানুষের ভাগ্য নেমেছে ধীরে-ধীরে নীচের দিকে।

অক্ষুর অক্ষরে অক্ষোর শৃংখলায় পরিতুষ্ট
সিগ্রেটের ত্রিশংকু ক্ষয়ের মধ্য দিয়ে
মানতে ও জানতে
প্রত্যেক মন্ত্রী প্রত্যেকটার পর
অবিশ্রুত স্রোতে ফিরে আসি
সূর্যের এশিয়ান মস্তক ধরে
কারাগারের শিরায় দিয়ে
পদ্মার দুঃস্বপ্নের দুর্বলতায়।[১৩১]

সাধারণ মানুষের, কি গ্রামের কি শহরের, জীবনে কোনো সম্ভাবনা বা আশার আলো ছিলনা। বর্তমানের জীবনে ছিলনা সুখের উপকরণ, ভবিষ্যতেও দেখা যায়নি কোনো প্রত্যাশা

পি-আর-এদের বিবিধ সাবেক সেই প্রসঙ্গের
খোঁজ রাখে না লোক
ঠোঁটের গতি
বিদীর্ণ তালু
কালোশিরে চোখ
বিস্তৃত দাড়ি ...
এবং অদৃশ্য মুনাফার কারবারী জানোয়ার।[১৩২]

---

১৩১। 'অন্নপূর্ণার দেশে', আগুন পুরীতে,/ক পৃঃ ৩৫

১৩২। 'পি-আর-এদের প্রতিমার', সূর্যের সিঁড়ি, পৃঃ ৬

Dhaka University Institutional Repository



কিংবা —

প্রাইভেট রেস্তোরাঁর বাইরে ফুটপাতে
নিষ্কর্মা যুবক এক ঘুমোয়
নিঃসাড় বুকের ওপর আস্তীর্ণ গামছায় অক্ষমতার ফলশ্রুতি
তার বিবর্ণ মুখের ভবিষ্যত অনিশ্চিত।[১৩৩]

সামগ্রিকভাবে পূর্ব বাংলার দুর্দশা সম্পর্কেও সচেতন থেকে তিনি কয়েকটি কবিতা রচনা করেছেন। ইসলামী সাম্য ও আদর্শের উন্মাদনায় দেশবিভাগ করে নতুন রাষ্ট্র গঠনের যে-স্বপ্ন দেখেছিল এদেশের মানুষ, সতের বছর পর তা নিরর্থক প্রমাণিত হয়েছে। দারিদ্র্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ আরো প্রকট হয়েছে, দেশের দুই অংশের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধির পরিবর্তে অনাস্থা অবিশ্বাস ও সন্দেহ বেড়ে গিয়ে জাতীয় অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে।

ক. আমাদের সতের বছরের মহান সংগ্রাম সমাপ্ত
ভ্রাতৃহননে
উৎসর্গিত অক্ষৌহিণীর অস্থির ঘাস
পদ্মার বন্যা বালুতে বিশুষ্ক
পাঁচকোটি মশাল ক্ষুধার্ত শিশুর অশ্রুতে
ধোঁয়া ছড়ায়
বুর্জোয়ার দেনা তৃতীয় পুরুষের মস্তকে
জোয়ানের এখানে আমাদের প্র[illegible]
প্রতারিত সূর্যের পথে দিশাহীন যাত্রা
আমাদের বিশ্বাস ঐক্য প্রতিজ্ঞা
অনর্থে পর্যবসিত[১৩৪]

খ. তাই মার্কিন টেপরেকর্ডারে
[illegible] থেকে আমা

১৩৩। 'পুরুষের অন্ধকারে দুটি হাত', আবৃত প্রদীপে, পৃঃ ৬১

১৩৪। 'একটি আর্ত রাত্রি', সূর্যের সিঁড়ি, পৃঃ ২২-২৩

Dhaka University Institutional Repository



হাওয়াই সংগীত বাজালাম আমি ঃ
আ—লো—হা
এসো পশ্চিম থেকে অদূরে কিংবা সুদূর
এবং ধর্ষণ করো
আমার আনারসের জমিকে
আমার শর্করা চাষীর জননীকে
এবং কারাগারের অন্ধকারে পলায়মানা বালিকার
সতের বছরের ত্রাসিত যৌবনকে ।[১৩৫]

বিশ শতকের মানুষ মত ও পথের নানা প্রতিযোগিতায় বিভ্রান্ত । এই বিভ্রান্তি জাতির পক্ষে যেমন, ব্যক্তির পক্ষেও তেমনি অকল্যাণকর । এই বিভ্রান্তির হাত এড়াতে চেয়েছেন কবি । হয়ত পরস্পর-বিরোধী আদর্শের সমন্বয় হবেনা, এবং সমন্বয় সাধনের চেষ্টায় কবি যন্ত্রণাক্লিষ্ট হয়ে দুইয়ের পাশাপাশি অবস্থানই মেনে নিয়েছেন ।

আমার অসম্পন্ন পিরামিডে রেখে এসো
কোরানে মজিদ দাস ক্যাপিতাল
টি-বি সীল ও বোনাস ভাউচার
আমাদের অত্যন্ত সবুজ
পতাকায় জড়িয়ে ।[১৩৬]

কিন্তু কবি একটি নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের আশ্রয় প্রার্থনা করেন । দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে একটি সুস্থ নির্ভরশীল আশ্বাস তাঁর কাম্য ।

দীর্ঘ, দীর্ঘতর ক্লান্তির সমুদ্র সাঁতরে
... ... ...
আমি তোমার তট তেবে, হে মৃত্তিকা
আশ্রয় সন্ধান করেছি ।[১৩৭]

---

১৩৫। 'পি-আর-এসের স্টীমার ঃ গোয়ালন্দ', সূর্যের সিঁড়ি, পৃঃ ৮
১৩৬। 'যন্ত্রণার মৃত্যু', জাগ্রত প্রদীপে, পৃঃ ৩৮
১৩৭। 'আশ্রয় সন্ধানে', জাগ্রত প্রদীপে, পৃঃ ৬৬

Dhaka University Institutional Repository



নিজের সমাজের জন্যও তিনি নিরাপদ ভবিষ্যত কামনা করছেন। পৃথিবীতে শান্তি আসুক, জনপদ বৃদ্ধি পাক, আগামী দিনের শিশুরা নিঃশঙ্কচিত্তে বসবাসের সুযোগ লাভ করুক বর্তমানের এই বাতক, নিরানন্দ পৃথিবীতে।

কখন আমাদের সন্তানের জন্য রইবেনা
শিশু ঘাতকেরা
ওৎ পেতে ;
কখন ঈশ্বরের এই নির্মল বায়ু
নিশ্বাসের যোগ্য হবে
এবং বিশ্বাসের ছায়ায় শবরীদের
ধূর্ত পদক্ষেপ নিবৃত্ত হবে
কখন সূর্যের সিঁড়ি বেয়ে আসবে পৃথিবীতে
শান্তির দূতেরা
এবং আমাদের উর্বর তেতুল গাছের
উষ্ণ ছায়ায়
আবার হাট বসবে মানুষের ;[১৩৮]

আবদুল গনি হাজারীর কবিতার মুখ্য অবলম্বন পূর্ব বাংলার ক্রমবর্ধনশীল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ। প্রথম কাব্যে এর উদ্ভব, পশ্চাৎপট ও জীবনের সীমিত গন্ডী, দ্বিতীয় কাব্যে বিকাশ, বিকৃতি ও অবক্ষয়, এবং শেষ কাব্যে সংকটমোচনের আর্তি অত্যন্ত বেদনা ও

১৩৮। 'বিছানায় শায়িত রোগী', জাগ্রত প্রদীপে, পৃঃ ৪৮

Dhaka University Institutional Repository



সংবেদনশীলতার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে । পুনঃপুনঃ এসেছে শ্রেণীস্বার্থ, বৈদেশিক শোষণ ও স্বদেশের সামগ্রিক দুর্দশার চিত্র । জীবনের আলেখ্য তিনি রচনা করেছেন অনুপুঙ্খভাবে ও অনবদ্য ভঙ্গিতে ।

অত্যন্ত শক্তিবিশিষ্ট ছিলেন তিনি আঙ্গিক ও আবহ সৃষ্টিতে । ব্যঙ্গাত্মক তির্যক দৃষ্টি, দৃষ্টিগ্রাহ্য ছবি অঙ্কনের রীতি ও বক্তব্য উপস্থাপনে নাটকীয়তা তাঁর কবিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য । পংক্তি নির্মিতিতে ক্রিয়াপদ উহ্য রাখা, আরবী ও ইংরেজি বাক্য ও বাক্যাংশের বাংলা হরফে হুবহু প্রয়োগ, বাংলা স্ল্যাং-এর ব্যবহার এবং কবিতাকে ছোট-বড় বিভিন্ন আকারে স্তবক ব্যবহার করে নানাভাবে দৃষ্টিগ্রাহ্য করার চেষ্টা প্রায়ই নজরে পড়ে । স্থান ও কালের বিস্তার ও চলমানতা এনে সমকালের সমস্যাকে উপস্থিত করার প্রয়াস তাঁর কবিতাকে বিরাট ব্যাপ্তি দান করেছে । 'সামান্য ধন'-এ রয়েছে স্বদেশের গ্রামের ও শহরের জীবনচিত্র, কিন্তু পরের দুটিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিরাট পটভূমি, প্রাচীনত্ব ও নবীনত্ব নিয়ে, হাজির হয়েছে । সব কিছু মিলিয়ে বলা যায়, আবদুল গনি হাজারী পূর্ব বাংলার আধুনিক জীবনকে, আধুনিক রীতিতে তুলে ধরতে পেরেছেন চমৎকার সাফল্যের সঙ্গে ।[১৩ক]

---

১৩ক। কবীর চৌধুরী, 'আবদুল গনি হাজারীর কাব্য বিচার : একটি ভূমিকা', সাঁকো, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১-৩১

Dhaka University Institutional Repository



## আশরাফ সিদ্দিকী

১৯২৭ সালের ১লা মার্চ আশরাফ হোসেন সিদ্দিকীর জন্ম হয় টাঙ্গাইল জেলার নাগবাড়ি গ্রামে। লেখাপড়া করেছেন ময়মনসিংহ জেলা স্কুল, শান্তিনিকেতন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে। শেষের প্রতিষ্ঠান থেকে ১৯৬৬ সালে লাভ করেন লোক সাহিত্যে পি-এইচ,ডি ডিগ্রি।

তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় সরকারী কলেজে বাংলা সাহিত্যের শিক্ষক হিসাবে। কিছুকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপকরূপে কাজ করে পুনরায় সরকারী কলেজে যোগ দেন। ১৯৬৮-৭২ সালে ছিলেন কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালক। জেলা গেজেটিয়ারের প্রধান সম্পাদকরূপে কাজ করে /১৯৭২-৭৬/ তিনি ১৯৭৬ সালের জুন মাস থেকে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক পদে নিযুক্ত হন। অদ্যাবধি /২৬।৪।৭৬/ সেপদেই অধিষ্ঠিত আছেন। যোগ্যতার স্বীকৃতি হিসাবে পাকিস্তান সরকার তাঁকে ১৯৬৩ সালে 'তমঘায়ে ইমতিয়াজ' খেতাবে ভূষিত করেন।

ছাত্রজীবন থেকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন পাকিস্তান লেখক সংঘ ও আন্তর্জাতিক সাহিত্যসংস্থা পি.ই.এন.-এর কার্য পরিষদের সদস্য /১৯৫২-৫৩/। তাছাড়া আর.সি.ডি.-র ঢাকাস্থ কালচারাল ইনস্টিটিউটের পরিচালক হিসাবে তিনি কাজ করেছেন /১৯৬৮-৭১/।[১৩৯]

তাঁর রচিত কাব্যের মধ্যে রয়েছে 'তালেব মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা' /১৯৫০/, 'সাত ভাই চম্পা' /১৯৫৫/, 'বিষকন্যা' /১৯৫৫/ ও 'উত্তর আকাশের তারা' /১৯৫৮/। অধুনার সমবায়ে প্রকাশিত হয়েছে 'তিরিশ বসন্তের ফুল' /১ম খণ্ড/ ১৯৭৫

---

১৩৯। আবদুর রাজ্জাক, বাংলাদেশের লেখক : জীবন ও গ্রন্থপঞ্জী /প্রকাশিতব্য/

Dhaka University Institutional Repository



সালে । এর দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে এ-সময়ে রচিত অগ্রন্থিত কবিতাগুলি । তাছাড়া রয়েছে কিশোর কবিতা 'কাগজের নৌকা' /১৯৬২/ ও 'ছোটদের কবিতা' /১৯৫৫/ । ১৩৫৬ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'নতুন কবিতা' পূর্ব বাংলার কাব্যান্দোলনে একটি স্মরণীয় ঘটনা । কবিতা-রচনা ব্যতীত তিনি গল্প, স্মৃতিকথা, শিশুসাহিত্য, রচনা ও লোক সাহিত্যে গবেষণা করেছেন ।

তিনি সাহিত্য-পুরস্কার পেয়েছেন বেশ কয়েকটি : শিশু সাহিত্যে বাংলা একাডেমী পুরস্কার /১৯৬৪/, গবেষণা সাহিত্যে দাউদ পুরস্কার /১৯৬৪/, ইউনেস্কো সাহিত্য পুরস্কার /১৯৬৬/ বাতীত ইংরেজি 'ভোম্বল দাস' শীর্ষক গ্রন্থের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Children Digest Award লাভ করেছেন ১৯৬৪ সালে ।

আশরাফ সিদ্দিকীর কবি মানস গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তাঁর বাল্য-পরিবেশ । এমনও বলা যেতে পারে, সে-প্রভাব তাঁর মনে চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হয়ে আছে ।

> যে পরিবেশে আমার বাল্যজীবন কেটেছে তা হল উচ্ছল নদী মেখলা চিরসবুজ লোকায়ত বাংলা, বিভিন্ন রসের লোকগীতি, কথা, যাত্রা কথকতা, জারি, সারি, পুঁথি মেলা, উৎসব অনুষ্ঠান, হিন্দু-মুসলমানের প্রেম-প্রীতি-পূর্ণ সহঅবস্থান-এর লোকায়ত বাংলা, যুগ যুগান্তর, কাল কালান্তরের এই সনাতন ঐতিহ্যে অবগাহন করে আমি ধন্য হয়েছি ।[১৪০]

এই প্রভাবে তাঁর কবিতায় কিছু বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে । প্রথমত, আধুনিক সমাজভাবনা, জীবনচেতনাকে তিনি রূপকথা ও লোকগীতিকার খাটে স্থাপন করে প্রকাশ করতে চেয়েছেন 'সাত ভাই চম্পা', 'কুঁচ বরণ কন্যা', 'মধুমালা', তালিম কুমারী', 'চম্পাবতী'

---

১৪০। আশরাফ সিদ্দিকী, 'পূর্বলেখ', তিরিশ বসন্তের ফুল, ১ম খণ্ড, /ঢাকা : কাবুক প্রকাশনী, জুন ১৯৭৫/

প্রকৃতি লৌকিক ঐতিহ্য আধুনিক সমাজব্যবস্থাকে প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার করেছেন । ফলে আধুনিক জীবন ও লোকায়ত জীবন একই সাথে গ্রথিত হয়েছে । নিসর্গ, দেশ ও সমাজকে তিনি ভালবেসেছেন আন্তরিকতার সাথে । তাঁর মানববাদী দৃষ্টিভঙ্গি বাংলার প্রকৃতির মতই শ্যামল, স্নিগ্ধ ও সহজ সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত ।

> চিরন্তনী শ্যামল বাংলার মানুষ, প্রকৃতি এবং ঐতিহ্যকে আমি ভালোবেসেছি — আমার বাংলার শ্যামলিমা রূপ দেখে পুলকিত – শিহরিত হয়েছি – যুগে যুগে তার উপর কবি ও ঋষিদের অত্যাচার — শাসকের-শোষণের-সাম্প্রদায়িকতার অত্যাচার সুতারাং ই এমন কবিতে অনুভব করেছে ।[১৪১]

রূপকথা উপকথা রাজপুত্র রাজকন্যা বগোই নদী ও ময়নামতীর দীঘির যে-জীবনকে ছেড়ে কবি আধুনিক জীবনে প্রবেশ করেছেন, সে-জীবনে প্রত্যাবর্তন করার এক তীব্র আকুতি তার কবিতায় সর্বদা লক্ষ করা যায় । শৈশবের স্বপ্ন তার মনে সুদূরের স্বপ্ন আনে ।

জীবনে বড়ো ইচ্ছা ছিল
কোন একবার সময় করে
যাবো সেই শাপলী দীঘির
যেখানে বগোই নদী ঘুমু যায়
আজ্ঞাপী মেয়ের মত ।[১৪২]

কিন্তু তাই আজ, জীবনের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে আর পেছনে ফেরার সুযোগ থাকেনা । এক-একটা ছোট স্বপ্ন মানুষের ভিতরেই হারিয়ে যায় । কবিরও তাই হয়েছে । শেষে তাঁকে বলতে হয় :

সময় কোথায় !
সময় সোনার কোথায় ? ![১৪৩]

---

১৪১। ঐ

১৪২। 'সময়', তিমির অন্তরে সূর্য / ৭৮, পৃ ১২

১৪৩। ঐ, পৃ ১৪

Dhaka University Institutional Repository



কবির বয়স যতই বাড়ছে, ততই তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়েছে দুঃখ দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের ছবি। ফলে প্রেমও তার পূর্ব মাধুর্য হারিয়ে ফেলেছে।

প্রেয়সী নারীরে মোর বুকে টেনে নিতে দেখি –
কোথা নারী! একি!
কোথা নারী – কোথা নারী! এ কাহারে দেখি!
সারা গায়ে দুর্ভিক্ষের আঁকা আলপনা!
ফুটে আছে দুঃখ দুখে প্রেমের কাকলি।
আমার কল্প পৃথ্বী দেখি অনুলোক –
সারা দেহে আঁকা মোর ক্ষুধার চাবুক।
দুর্ভিক্ষের দেশে প্রেম বুঝি অভিশাপ
দিয়ে দুঃখ, দিয়ে আঁখি-অশ্রু-নির্বাণ![১৪৪]

মৃত্যুবতী এদেশে মেনে নিতে কবি রাজী নন। যে-সমাজে প্রেম তার মাধুর্য হারিয়ে ফেলেছে, সে সমাজকে বদলাতে হবে। তাই কবি তার প্রেয়সীসহ কাস্তে শাবল গাঁইতি নিয়ে মিছিল বানাতে চলেছেন।

সাথীরা, তার চেয়ে চলো আমরা এই মাটির পথে পা বাড়াই
তার চেয়ে চলো আমরা এই মাটির মানুষের পা ছুঁয়ে দাঁড়াই
যেখানে বাংলা জাতি যেখানে ইতর মেথর কামার কুমার
জেলেনী অরণ্যের অবলে মাটির মানুষ তাঁতীরা আমার
এই পায়ে পদযাত্রাতে চলো আমরা অঙ্গীকার বানাই
এই পায়ে মুক্তিপথায় চলো আমরা অস্ত্র শানাই
কাস্তে শাবল আর গাঁইতি নিয়ে চলো আমরা মিছিল বানাই
সাথীরা, চলো আমরা মিছিল চালাই।[১৪৫]

---

১৪৪। 'নারী-অশ্রু', ঐ, পৃঃ ১২০

১৪৫। 'সাথীদার কথা', ঐ, পৃঃ ৮০

Dhaka University Institutional Repository



'তাদের বাগান' ও অন্যান্য কবিতা'য়[১৫৬] পরিচিতি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : 'শুধু ফেলে সংঘাত : ভোরা বাগানে উপর বর্ণিত শ্রীতলার সমাজের মুখোমুখী সংগ্রাম — জীবনে ও মনে : এবং তারই বাস্তব রূপায়ণ তাদের বাগান'। এখানে শুধু মনের মত করে পৃথিবী গড়ার, যেখানে ভালোবাসারই প্রাধান্য থাকবে । কবি বলছেন, বর্তমানের অন্ধকার ও দুর্বোধ সত্য নয়, এরও শেষ আছে ।

তোদের ধরাকে গড়বো আমরা তোদেরি মনের মত
আর থেকে শুধু ভালোবাসবার ব্রত ।।
এই রক্তজল এই দেখাদেখো যাচ্ছে যাচ্ছে অবশেষে
এই দেশেরও পরে আছে এক দেশ ।[১৫৭]

'সংঘাত' গ্রন্থে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত এদেশের কথা আছে । তেরশ পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষ এদেশে স্থায়ী চিহ্ন রেখে গেছে । গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়েছে, গ্রামের পুকুর মজেছে, জনপদ উচ্ছন্ন গেছে । দুর্ভিক্ষে যারা মরেছে, তাদের অতৃপ্ত আত্মা এখনো আকাশে ঘুরে বেড়ায়; বাতাসে কান পাতলে শোনা যায় তাদের আর্তনাদ :

এখানে বিস্তৃত রাতে শন্‌শন্‌ হিমেল বাতাসে
কাদের শহীদ প্রাণ শুনি যেন কাঁদিছে তিয়াসে
কাদের রোদন ধ্বনি শুনি যেন ভেসে ভেসে আসে
কাদের পায়ের ধ্বনি শুনি যেন বাজে মোর পাশে ।[১৫৮]

অথবা

এই খানে এই ছোট নদী পার দিয়ে —
সেদিন যেসব লোক যাযাবরী হাতে বোঝা
ঢাকাই জামির আর উড়নী উড়িয়ে
তাম্বুল রাঙানো ঠোঁটে অস্ফুট হাসির মত
ছোটা নদী পার হয়ে হেঁটে হেঁটে যায়
অন্নহীন বস্ত্রহীন কাঙালের বন্দর
এই পথে হাটে আজো যারা বেচবার ।[১৫৯]

---

১৫৬। ঐ সং, ঢাকা: বুক প্রমোশন লিমিটেড, ১৯৬৩
১৫৭। 'দেশ চিঠি', তিরিশ বসন্তের ফুল, আষাঢ়, পৃঃ ৫
১৫৮। মহানগরীর পথ', ঐ, পৃঃ ৬   ১৫৯। একটি নদীর পাড়', ঐ, পৃঃ ২৯

Dhaka University Institutional Repository



'সংগ্রাম' কবিতায় কবি নিজেকে পৃথিবীর নির্যাতিত শোষিত মানুষের দলের বলে ভেবেছেন এবং শোষকের বিরুদ্ধে শেষ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছেন। এসব কবিতা পাঠে অনিবার্যভাবেই নজরুল ও সুকান্তের কথা মনে হবে কিন্তু তবু তাঁর আবেগকে অস্বীকার করা যায় না। 'বন্ধুবরেষু' কবিতায় এক সৈনিকের কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তিনি যখন ইংরেজের পক্ষে জাপান ও ইউরোপের রণাঙ্গনে লড়াই করছেন, সে-সময় দুর্ভিক্ষে তাঁর মা প্রাণ হারায়, স্ত্রী ও বোন মনুর মতো গোরা সেনাদের অঙ্কশায়িনী হয়। যুদ্ধশেষে ঘরে ফিরে তিনি পুনরায় যুদ্ধের প্রতিজ্ঞা নেন:

আজ আমি যুদ্ধ চাই!
মজুর কৃষাণ তাঁতী জোলা জেলে মাঝো —
তুমি তাদের খবর দাও: তারা আশীর্বাদ করুক
তুমি তাদের বলো: তারা যুদ্ধ করুক
যে শিশু মধু দিয়েছে কান: তাকে নিয়ে এসো:
সে যুদ্ধ শিখুক!
বিপ্লব সার্থক হোক।
মহাপ্রতিবাদের জয় হোক।
আমার দেশ নিষ্কণ্টক হোক।
আমি শুধু মুক্ত আমার বাঁধ ভেঙে দিয়ে যেতে চাই —
যে স্রোত — আমার আদম সন্তান নিজেকে জানবে।
যে স্রোত বাঁধবে এক নতুন ইতিহাস লেখা হবে।।[৫০]

'সাত ভাই চম্পা'র কবিতাগুলি ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে রচিত। এই কাব্যের ভাবপ্রেরণা সম্পর্কে বলা হয়েছে:

> দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সাত ভাই চম্পায়' দেশের শত সহস্র আবার দুঃস্থো জনগণের তিনি দেখেছেন 'রক্ত সাগরে' 'সবুজ তিমির মধুর' ভাসাতে — আশাবাদী কবি অভিনন্দন জানিয়েছেন তাদের সবুজ দেশ ও ভাষায়।[৫১]

---

৫০। 'বন্ধুবরেষু', ঐ, পৃঃ ৯

৫১। বিবক্ষা, (ঢাকা: ১৯৫৫), লেখক পরিচিতি অংশ।

Dhaka University Institutional Repository



কোনো-কোনো কবিতাতে এই দৃষ্টিভঙ্গি দেখা গেলেও অধিকাংশ কবিতাই নতুন, বাংলার কিংবদন্তি ও ইতিহাসের পটে স্থাপিত। প্রথম কবিতা 'মধুমালা'র কবির বক্তব্য ভাষা পেয়েছে। রাজকুমার মদন দেশে-দেশে মধুমালার সন্ধান পেল। কিন্তু মৃত্যুর মধু-মালার সঙ্গে তার মদন থাকিল। সে এখন কাঁদের বাঁধের মতো বক্ষোদরে বাস করে, ছিন্নকন্থা তার মদনের ভূষণ। আবার আশ্চর্য মদন মধুমালা জানান :

> মদনের খুঁজেছ তুমি, কিন্তু কোথাও কি বুঝি
> মৃগদের পুরী ঘুরে মরেছ যে যাচ্ছ
> হাজার হাজার প্রাণ দিয়েছে শায়ার বণ।
> দাঁড়াও ক্ষণেক রাতি দেখবে এখনি।[৫২]

এই অবস্থার যে পরিবর্তন হবে সে-বিষয়ে কবি আশাবাদী। পূর্ববাংলা হাসি গানে আনন্দে ভরে উঠবে ঝিলিমিলি। পাখি গাইবে, গাছে কুঁড়ি ফুটবে, নবীন বাংলার চারদিক ভরে যাবে।

> ঝড়ের পরে আবার মানুষ আনবে ফসল আনবে কড়ু
> নতুন পাতার নিটোল শাখে বাঁধবে আবার নতুন ঘর
> পাখির নতুন দিবস ভর।[৫৩]

বর্গীদের দুর্বিষহ অত্যাচার দূর করার জন্য যুদ্ধাভিযান শুরু হয়েছে, সেনারা রক্তের সাগরে জাহাজ ভাসিয়েছে আবার দস্যু এবং চম্পাবতীকে উদ্ধার করার জন্য।

> আমাকে হঠাৎ জাগায় রাতের কথা
> চম্পা, জাগো – কাঁপিছে পরোয়ার
> চম্পা, জাগো – সাতশ হাজার সেনা
> কত সাগরে ভাসায় মরুর!
> ওদের চোখে বিন্দু ধানের মাস।
> ওদের মশাল জ্বলছে দিকে দিকে
> জ্বালাই জানি একটা ইতিহাস।[৫৪]

---

৫২। 'মধুমালা', ঐ তিমির কন্যের ফুল, ১ম পর্ব, পৃঃ ৬২
৫৩। 'নয়া ধানের গান', ঐ, পৃঃ ১২
৫৪। 'সাত ভাই চম্পা', ঐ, পৃঃ ১৫

Dhaka University Institutional Repository



'বিষকন্যা' র কবিতাগুলি রচনাকাল ১৯৪৯–৫৪ সাল। এই কাব্যের বক্তব্য কবির ভাষায় নিম্নরূপ ঃ

> হাজার হাজার বছর আগের কথা–সুন্দরী তরুণীদের দিনের পর দিন থাকিত বাইরে বিষাক্ত করে রাখা হতো আর তাকে ভোগের সামগ্রী হিসাবে পাঠিয়েই শত্রু হত্যা হতো নিষ্পাপ কতো কতো সোনার প্রাণ। বিদেশী সভ্যতা ব্রাইডেল ড্রেসার কী 'বিষকন্যা' র মতই আমাদের সৌন্দর্য্য গ্রাস করেছিল এদেশের দেওদার বৃক্ষকে। কিন্তু কৃষ্টি ও সভ্যতার বৈশিষ্ট্য আপনা বলেই সে আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে। 'বিষকন্যা' এই ভাব ভাষা ও দেশাত্মবোধেরই এক অপূর্ব রূপায়ণ।[৯৫]

'সাত ভাই চম্পা' সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, এ-কাব্য সম্পর্কেও তা বলা যায়। কবির বক্তব্য সমগ্র কাব্যে রূপায়িত হয়নি, কোনো-কোনো কবিতায় প্রকাশিত। নাম কবিতাটি রূপক। রূপক অতি স্পষ্ট। এক গ্রামে একটি পুরাণ দেওদার গাছ ছিল। পাতার বাহারে ও সৌন্দর্যে সেটা ছিল সে এলাকার সেরা। পাখিরা নীড় বাঁধত, শ্রান্ত মানুষ জিরাত এর ছায়ায়। ইতিমধ্যে এল এক ইংরেজ সাহেব। সেখানে চায়ের বন করল এবং বিলাত থেকে ব্রাইডেল ড্রেসারের বীজ এনে দেওদার গাছে ছড়িয়ে দিল। ব্রাইডেল ড্রেসারে যখন রঙীন ফুল ফুটলো তখন উগ্রগন্ধে চারদিক আমোদিত হল কিন্তু এর বিষাক্ত পরিবেশের চাপে শুকিয়ে যেতে থাকল দেওদার গাছের স্নিগ্ধ শোভা। অবশেষে এক সময়ে ইংরেজ সাহেব দেশে চলে গেল। পরিচর্যার অভাবে ব্রাইডেল ড্রেসারের লতা শুকাতে থাকল আর সাথে-সাথে নব সবুজ কুঁড়ি মেলতে লাগল দেওদার বৃক্ষ।

> ব্রাইডেল ড্রেসারের বিষাক্ত লতার আচ্ছাদনে
> ঢাকা পড়ে গেছে এদেশের দেওদার গাছ।
> উপরে তার ব্রাইডেল ড্রেসারের সুরভি
> কিন্তু ভেতরটা স্যাঁতসেঁতে আর অন্ধকার।
> সবুজ স্বাস্থ্য আর ডালপালা মিইয়ে পড়েছে
> পাতার ভেতরে মৌসুমী পবনের গান বাজছে না –
> গাছ আর বাড়ছে না।

৯৫। <u>বিষকন্যা</u>, (ঢাকা: ১৯৫৫), শেষ মলাটের কবিতা পরিচিতি অংশ।

Dhaka University Institutional Repository



এই শহরে হাজন সাহেবরা উত্তরোলে চলে গেলেন ।
দুটি বাড়ির বোগেনভিলাস, ম্যাগনোলিয়ার সাথে সাথে
অযত্ন এবং পরিচর্যার অভাবে ব্রাইডেল ক্রীপার ও শুকিয়ে আসছে ।

ব্রাইডেল ক্রীপার বাঁচবেনা ।
সবুজ হয়ে উঠছে ফ্যাকাশে দেওয়াল গাছ ।
আগামী বসন্তেই হয়ত আমের বড় শাখা তুলে দাঁড়াবে ।[২৬]

চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'উত্তর আকাশের তারা' রচিত হয়েছে ১৯৫৪-৫৮ সালের মধ্যে । তিনি এ-কাব্যেও পূর্বতন কাব্যগুলির মতই সমাজে পরিবর্তন আকাঙ্ক্ষার কথা বলেছেন, তবে তাঁর মনোভাবের তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন এখানে লক্ষণীয় । বসন্তে হেমন্তে শীতে বা শরতে উত্তর আকাশে উজ্জ্বল যে-তারকা দীপ্যমান থাকে, যা শিল্প সাহিত্য দেবত্ব মনুষ্যত্ব শান্তি ও সৌন্দর্যের প্রতীক বলে কবির কাছে বিবেচিত, তাকে অবিচলভাবে লক্ষ করে সাধনা করতে হবে এগুলির স্থাপনের জন্য ।

অনিমিখ
সময়ের তীরে
মানুষের
অজস্র তিমিরে
কি অপূর্ব
অমর সুন্দর
আকাশ-ইশারা
উত্তর আকাশ পারে
একটি তারকা ।[২৭]

এই কাব্যে কবি রোমান্টিক — যে রোমান্টিকতা আধ্যাত্মিকতা বা মরমীচিন্তার কাছাকাছি । গভীর রাতে তিনি ছাদে উঠে আসেন এবং আকাশের সঙ্গে মাটির ও

২৬। 'বিষকন্যা', তিমির বসন্তের ফুল, ১ম পর্ব, পৃঃ ১২৬-২৭

২৭। 'উত্তর আকাশের তারা', ঐ, পৃঃ ৬১

Dhaka University Institutional Repository



প্রকৃতির রহস্যালোক খুলবার চেষ্টা করেন। কবি তখন অন্য জগতে নীত হন। তাঁর তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত হয় ও তিনি নতুন জগতকে উপলব্ধি করেন।

ছাদের কার্নিশ ধরে তখন নিজেকে নিয়ে শুধু ঘুরে মরা
তখন জোনাকী সব উড়ে চলে যেতে চায় কোন সরোবর
মনে হয় এ পৃথিবী হাওয়ার নগর।
আত্মার প্রজ্ঞার চক্ষু খুলেছে তখন
খুলে গেছে তৃতীয় নয়ন
আর দেখি খুলে গেছে আকাশের নীল বাতায়ন।[৫৮]

আশরাফ সিদ্দিকীর কবি-জীবন ব্যাপ্ত প্রায় তিরিশ বছর — ১৯৪৬ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত। তিনি সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছেছেন প্রথম যুগেই, তারপর তাঁর কাব্যসাধনা ব্যাহত না-হলেও প্রথম পর্যায়ের সাফল্য অনতিক্রান্তই থেকে গেছে। এর একটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে যে, ইতিমধ্যে পূর্ব বাংলায় যে নতুন নগরজীবন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছে, তার জীবনাবেগকে তিনি আত্মস্থ করতে পারেননি। স্বভাবতই সে-শ্রেণীর ভাষাও তাঁর অনায়ত্ত থেকে গেছে। ফলে একটি বিশেষ বিন্দুর পর তাঁর অগ্রগতি আমাদের নজরে পড়েনা। রূপকথা ও লোকগাথার কাহিনী ও চরিত্রকে প্রতীকী তাৎপর্য দিয়ে আধুনিক জীবনযন্ত্রণাকে প্রকাশিত করার যে-প্রয়াস তার মধ্যে লক্ষণীয়, তা-ও সফল হয়নি। তিনি নিজেও এসম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং গ্রন্থের প্রচ্ছদ-ফ্ল্যাপে নানা ব্যাখ্যা দিয়ে কাব্যের প্রেরণা সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করতে চেয়েছেন। তবে তাঁর সাফল্য হল, গ্রামবাংলার চিরায়ত জীবনপ্রবাহ, প্রকৃতির সরল স্নিগ্ধতা ও সাবলীলতাকে কবিতায় ধরার অনায়াসে সক্ষমতা। আধুনিক মানসে সেগুলি রোমান্টিক আনন্দ ও আবেগ নিয়ে হাজির হয়। লোকসাহিত্যের প্রভাব, অপরদিকে, তাঁর কবিতার রূপ দিয়েছে অতিকথন, ভাবালুতা ও ঢিলেঢালা, বৃত্তান্তধর্মীর। ইঙ্গিতধর্মিতা, গাঢ়তা ও সংহতি তাঁর কবিতায় দুর্লভ। তাই বলে তাঁর কৃতিত্ব অস্বীকার করার মত নয়, তাঁর সরল মানবিকতা, জীবনপ্রীতি, আবহমানকালের ঐতিহ্যের প্রতি নিষ্ঠা অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার।

---

৫৮। '[illegible]', ঐ, পৃঃ ১৪৬–১৪৭

Dhaka University Institutional Repository



## শামসুর রাহমান

পূর্ব বাংলার কবিতাঙ্গনের সর্বাধিক প্রতিনিধিত্বশীল কবি-ব্যক্তিত্ব হিসাবে শামসুর রাহমান খ্যাতিলাভ করেছিলেন। মধ্যবিত্ত-মানসের হতাশা বিক্ষোভ যন্ত্রণা ও অবক্ষয়কে অসাধারণ-ভাবে রূপ দিয়ে তিনি খ্যাতিলাভ করেন এবং এদেশের কবিতার মূল ধারাকে প্রভাবিত করতে সমর্থ হন। একজন সমালোচক লিখেছেন 'শামসুর রাহমান আমাদের বিবেকের কণ্ঠস্বর'।[৯৯]

১৯২৯ সালের অকটোবর মাসে ঢাকা শহরে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা একটি প্রেসের মালিক ছিলেন এবং এর আয় দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করতেন। শহরের পুরোনো এলাকায় ছিল তাঁদের বাড়ি। এখানেই কবি জীবন কাটিয়েছেন। ঢাকা শহরকে এত অনুরক্তভাবে জানেন বলেই নগরমনস্কতা তাঁর কবিতার প্রধান উপাদান হয়ে উঠেছে।

ঢাকার পোগোজ হাইস্কুল, ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ছাত্র-জীবন কেটেছে। কিছুদিন ইংরাজী সাহিত্যে অনার্স পড়েছিলেন। পরে পাসকোর্সে গ্রাজুয়েশান ডিগ্রি নিয়ে পুনরায় এম-এ-তে ভর্তি হন। এবারও ডিগ্রি লাভ হয়নি, কিছুদিন পরে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেন।

কর্মজীবন শুরু করেন ঢাকার 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকার দেড়শ টাকার মাইনের সাব এডিটর হিসাবে। পরে কিছুকাল রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রে কাজ করে ফিরে আসেন 'মর্নিং নিউজে'। এবারে বেতন চারশ টাকা, পদ সিনিয়র সাব এডিটর। ১৯৬৪ সালে 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকা প্রকাশিত হলে এতে যোগ দেন সহকারী সম্পাদক রূপে। তারপর আর কোথাও যাননি। সম্পাদক পদে উন্নীত হন ১৯৭৬ সালে। সাংবাদিক হিসাবে ১৯৬৫ সালে ইন্দোনেশিয়া ও ১৯৬৭ সালে তুরস্ক সফর করেছেন।[১০০]

---

৯৯। রফিকুল ইসলাম, /সম্পাদনা/, আধুনিক কবিতা, /ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮, পৃঃ ৭০

১০০। অন্যগুলি কবির সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে গৃহীত

Dhaka University Institutional Repository



পাকিস্তান-আমলে তাঁর পাঁচটি কাব্য প্রকাশিত হয় : প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে /ফাল্গুন ১৩৬৬/, রৌদ্র করোটিতে /জুলাই ১৯৬৩/, বিধ্বস্ত নীলিমা /ফাল্গুন ১৩৭৩/, নিরালোকে দিব্যরথ /আশ্বিন ১৩৭৫/ এবং নিজ বাসভূমে /ফাল্গুন ১৩৭৬/। তাছাড়া রবার্ট ফ্রস্টের ও বাংলা কবিদের কবিতার অনুবাদও করেছেন এবং শিশুদের জন্য 'এলাটিং' নামক ছড়ার বই দিয়েছেন। 'রৌদ্র করোটিতে'র জন্য আদমজী পুরস্কার লাভ করেন ১৯৬৩ সালে এবং সামগ্রিক কবিকর্মের জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান ১৯৬৯-এ।

'প্রথম গান ও দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে'[১৬১] প্রকাশের মাধ্যমে পরিবেশ সচেতন ও প্রতিশ্রুতিশীল কবির জন্মবার্তা ঘোষিত হয়েছে। শামসুর রাহমানের বিশেষ মানসপ্রবণতাসমূহ এ-কাব্যে বিশিষ্টভাবে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তাঁর কবিমানস গঠনে কোন-কোন কবি প্রভাব বিস্তার করেছেন তা-ও এ-বই থেকে জানা যায়। নতুন কাব্য সংকলন হিসাবে 'এ-কাব্য অনির্বচনীয় না হলেও বহুল বচনীয়'।[১৬২]

একটি কবিতায় কবি বলেছেন, সাধারণ বুদ্ধি ও পার্থিব বুদ্ধি পৃথিবীতে তাঁর একমাত্র অনুভূতি ছিলনা।

দৈনন্দিন পৃথিবীর পাশে চাইনি জুড়াই
শুকনো রুটির টুকরো খাই কুকুরের মত।[১৬৩]

কিন্তু তবু সাধারণ পৃথিবীর অতি সাধারণ মানুষ হিসাবেই তাঁকে ছককাটা জীবন যাপন করতে হয়, বলেন্দ্র না বুদ্ধের কোনো প্রাপ্তি জীবনে ঘটেনা।

ইচ্ছা যায় অবিচ্ছেদ্য জীবনের রূপ ঠেলে
হায়রে তুমি কী-ই বা পেলে ;
দিনরাত্রি পুঁথির পর পাহাড় খুঁড়ে দেখলে শেষে
পোড়া কপাল ; মূষিক খেলে।[১৬৪]

---

১৬১। ঢাকা : বার্ডস এ্যাণ্ড বুকস, ফাল্গুন ১৩৬৬

১৬২। শাহাবুদ্দিন আহমদ, 'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' /পুস্তক পরিচয়/, মাসিক পূবালী, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬৯, পৃঃ ৭০৭-৭০৮

১৬৩। 'রূপালি স্নান,' পৃঃ ৫

১৬৪। 'বিষম পাপ', পৃঃ ৩১

Dhaka University Institutional Repository



ব্যক্তিগত জীবনেও যেমন মানবের উপকরণের অভাব, সমষ্টিগত জীবনও তেমনি নিরানন্দময়। সে-সমাজে কোকিলের চেয়ে কাকের প্রাধান্য বেশি, অনীড় স্থানে ঠাঁই খুঁজে পায়, ভাঙা চাঁদ আলো জোগায় এবং ফুলের বাগান ভরে উঠে ফণিমনসার যৌবনে।

এখানে সমুদ্র নেই, আছে শুধু বদ্ধ এঁদো ডোবা
উইঢিপি সগৌরবে জুড়ে রয় পর্বতের স্থান;
আর কিছু বায়সের গণ্ডগোলে কোকিলের গান
হারাবে অকস্মাৎ, দূরে ভাঙা চাঁদ একান্ত শোভা।
এবং অনীড় পার্কে মূর্খ-জাত ভিড়ের বাহবা
প্রতিদিন বিশ্রামহীন, নিমেষেই সাপের বাগান
ভরে ওঠে সমস্তই ফণিমনসায়, অতঃপর
দুঃস্বপ্নের স্রোত বয়ে আনাগোনা; চোখের পাখি, বোবা।[১৬৫]

এভাবে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের প্রতিকূল প্রভাবে কবির হৃদয় নির্জন নগরের মত হয়ে উঠেছে। সেখানে চলছে শূন্যতা, নির্জনতা ও প্রেতের সর্বব্যাপী রাজত্ব।

আমার হৃদয় যেন পরিত্যক্ত নির্জন নগর,
যেখানে প্রেতের মতো ভাসা ভাসে নিশাচর হাওয়া
মাথা কোটে অবিরাম, শূন্যতায় জাগায় রৈরব।[১৬৬]

কাব্যের নাম কবিতাশ্রিত এই ভাবটি — যা কাব্যের মূল ভাবও বটে — বিস্তৃতভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে। চারপাশের নিরন্তর সমাজকে তিনি কল্পনা করেছেন কবরের উপমায়। সেখানে চিরদিন মৃতের মত কাটিয়ে পুনর্জীবনের মাধ্যাকর্ষণে আবার পৃথিবীর কোলে প্রত্যাবর্তন করেছেন, তবু প্রাক্তন জীবনের স্মৃতিবাহী বিষাদ তাঁকে ত্যাগ করেনি।

মনে হয় আমি যেন সেই লোকশ্রুত ল্যাজারাস
চিরাদিন ছিলাম কবরে, মৃত — পুনর্জীবনের

---

১৬৫। 'গোলাপ এবং মন', পৃঃ ৬২

১৬৬। 'একান্ত গোলাপ', পৃঃ ৪০

Dhaka University Institutional Repository



মায়াস্পর্শে আবার এসেছি ফিরে পৃথিবীর স্বাদে।

. . .          . . .          . . .

সত্তায় এনেছি বয়ে অস্থির আশ্চর্য বিষাদ।[১৬৭]

সমা

সমাজে মনুষ্যত্ব হননকারী পরিবেশ থাকলেও উদার প্রকৃতির কোথাও-কোথাও বিষাদকে ভুলে থাকার ব্যবস্থা আছে : জ্যোৎস্না, শিশির এখনো পৃথিবী থেকে লোপ পায়নি।

ক. তবু সান্ত্বনা : আকাশ পাঠায় সূর্য-শিশির,
জোনাকি মেয়েরা বিন্দু বিন্দু আলোর নূপুরে ভরে দেয় মাঠ
গাছ গাছিরে ঝিকমিকে : তোমার রাজ্যে একা-একা হাঁটি
আমি সম্রাট।[১৬৮]

খ. যেখানে সূর্যের সঙ্গে আকাঙ্ক্ষিত সুন্দরের গাথা
নিঃশব্দে মধুর মতো, ফুলের পাপড়ির মতো ঝরে
অথবা যেখানে গাঢ় চন্দ্র-জোড়া পাখিদের শাখায় আকুল,
শব্দের মধুর রসে ঘরাঙ্গনে, সেখানে আমার অভিলাষে
অভিসারী।[১৬৯]

সুতরাং দেখা যায়, 'শামসুর রাহমানের প্রথম কাব্যে 'একদিকে অমৃতের আস্বাদনে এবং সৌন্দর্যে নিবিড় অনুভবের উল্লাস এবং অপরদিকে তার বিপরীত পারিপার্শ্বিকের সংঘাতে অমৃতে বিষাক্ত নীল বিষের সংক্রমণের সচেতনতা মিশে আছে'।[১৬৯ক]

বিষাদের ভাব 'রৌদ্র করোটিতে'[১৭০] নতুনতর তাৎপর্য লাভ করেছে। যেই প্রকৃতি পরিবেশের জন্য এই বিষণ্ণতা, প্রথম কাব্যে তা বিশেষ স্পষ্টতা লাভ করেনি, বরং অনেকটা

---

১৬৭। পৃঃ ২৩     ১৬৮। 'ক্লান্তি স্নান', পৃঃ ৬

১৬৯। 'সুন্দরের গাথা', পৃঃ ৪৯

১৬৯ক। হাসান হাফিজুর রহমান, 'শামসুর রাহমানের কবি', সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, এপ্রিল ১৯৭৬, পৃঃ ৫৭-৫৮

১৭০। ঢাকা : লেখক সংঘ প্রকাশনী, আষাঢ় ১৩৭০

Dhaka University Institutional Repository



অলৌকিক ও বস্তুবিধান বলে ধারণা হবে। দ্বিতীয় কাব্যে পরিবেশ পরিচিত হয়ে ঢাকাকেন্দ্রিক হয়েছে, কবির ভাবনাচিন্তাও মীমাংসিত হয়ে এসেছে। নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের তুচ্ছতা একঘেয়েমি হতাশা ও নোংরামিই এই কাব্যের পটভূমি হিসাবে ব্যবহৃত

ফিরে আসে পার্কে এই নিরাশ্রয় বাদামের খোসা
ভবঘুরে কাগজের অভ্যস্ত প্রহরে
যেখানে খর্বাঙ্গ
সাঁতরায় ময়লা শিশিরে আর অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার
পরস্পর আর ভিড় রঙিন ফানুস
অর্ধনগ্ন অনাথা উন্মাদিনী হেঁটে আসে
এসে জোটে সন্ধ্যার আড়ালে।[১৭২]

দৈনন্দিন জীবনেও অনুরূপ গতানুগতিক, ক্লান্তিকর ও নিরাবেগ চিত্র প্রধান হয়ে উঠেছে।

মলত্যাগ, প্রাতরাশ, বাস, ছকবাঁধা কাজ, আড্ডা,
খাদ্য, স্নেহ, ঘুম, জাগরণ, সোমবার এবং মঙ্গলবার,
বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি আর রবিবার একই
বৃত্তে আবর্তিত ... ।[১৭৩]

এমন জীবনে দুঃখ অনিবার্য এবং কবি তাঁর জীবনের চারপাশে শুধু দুঃখের নিষ্ঠুর রূপই প্রত্যক্ষ করেন।

আমাদের বারান্দায় ঘরের চৌকাঠে
কড়িকাঠে চেয়ারে টেবিলে আর খাটে
দুঃখ তার লেখে নাম। ছাদের কার্নিশ, খড়খড়ি
ফ্রেমের বার্নিশ আর মেঝের ধুলোয়
দুঃখ তার আঁকে চক্খড়ি।[১৭৪]

---

১৭২। 'পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জ', পৃঃ ১০

১৭৩। 'আত্মহত্যার আগে', পৃঃ ৩১

১৭৪। 'দুঃখ', পৃঃ ১

Dhaka University Institutional Repository



এই পরিবেশের শিকার হয়েছেন কবি । তাঁর মনে কোনো অলৌকিক আবেগ বা গভীর ভাব ছায়া ফেলেনা, সর্বদা সেখানে চারপাশের জীবনই আবর্তিত হয় ।

আমার মাথাটা যেন বহ্নিমান একটি শহর
যেখানে মানুষ, যান, বিজ্ঞাপন, রেডিয়োর গান,
ভিখিরির চ্যাঁচামেচি বেশ্যার বেহায়া অনুরোধ
কানাঘুষো, মাথাহীন মৃত শিশু আবর্তিত হয় ।[১৭৫]

পরিণতিতে সকল প্রকার প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ বিনষ্ট হয়ে পড়েছে । পৃথিবী ও সমাজ-সভ্যতার উদ্ভব-বিকাশ-বিলয় সম্পর্কে যে-সুদৃঢ় ধারণাগুলি পূর্বপুরুষেরা নিশ্চিন্তে লালন করে নিরুদ্বেগ জীবন কাটিয়েছেন, কবি সেগুলি থেকে বিচ্যুত হয়ে শূন্য সিদ্ধান্তে পৌঁছে-ছেন । সে সিদ্ধান্ত নঞর্থক ও শূন্যতার ।

ক. আদিতে কিছুই নেই, অন্তেও নেই কিছু
মধ্যে শুধু এই থাকা না থাকার জ্যোৎস্না চমকিত
উর্ণাজাল ।[১৭৬]

খ. ঈশ্বর কি পিছিয়ে গেছেন অন্তরালে ; উদ্ভূতের
কসাইয়ের তীব্র ঘ্রাণে ঢুকছে যান কাগজের মতো ;
যদি বলি পুষ্পকন্যা ঈশ্বরের অন্য নাম তবে
সত্য থেকে সঠিক কতটা দূরে আমার সম্পর্ক
গনগনে ;[১৭৭]

কিন্তু একাকীত্বের ও বিশ্বাসহীনতার বা সংশয়াকীর্ণতার জগত ভয়াবহ । চিন্তা-ভাবনা-বিশ্বাসের অবলম্বনহীনতার অসহায়তার ধারা এড়াতে গেলে দুটি পথ খোলা থাকে : আত্ম-হত্যার পথ বেছে নেওয়া বা অলৌকিক বিশ্বাসের জগতে প্রত্যাবর্তন করা । জীবনানন্দ দাশের নায়ক আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিল সুস্থাবের অনির্বাহিত উৎসবের যন্ত্রণা থেকে

১৭৫। 'স্বগত ভাষণ', পৃঃ ৬৪
১৭৬। 'হূতোর দর্পণ', পৃঃ ৮
১৭৭। 'আত্মজার খাদে', পৃঃ ৩৩

Dhaka University Institutional Repository



মুক্তি পাওয়ার আশায় আর শামসুর রাহমানের আয়ুক্ত একই পদের অনুসারী আত্ম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধতার কারণে ।

যেহেতু উপায় নেই ফেরবার, আমার সম্মুখে
দুটি পথ অবারিত, আমরণে মুক্তি চাই —
আর কিছু নয় কিংবা অলৌকিক বিশ্বাসের
রাজ্যে শুধু অন্ধের স্বভাবে বিচরণ ...[১৭৮]

তৃতীয় কাব্য 'বিধ্বস্ত নীলিমা'য়[১৭৯] আধুনিক মানুষের দুটি প্রধান সুর — শূন্যতা ও নিঃসঙ্গতার বোধ — প্রবলভাবে সংযোজিত হয়েছে । নৈঃসঙ্গ্যবোধ ও আধুনিক কবিতায় এর প্রতিফলন সম্পর্কে কবি একটি প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন । এই কাব্য-গ্রন্থের সমসাময়িককালে /১৯৬৪/ প্রকাশিত সেই প্রবন্ধ থেকে কবির বোধ ও চিন্তার সূত্র পাওয়া যেতে পারে ।

আধুনিক মানুষ আত্মনির্ভর হল সত্য, কিন্তু তার বদলে হারাল নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্তি — যাকে অবলম্বন করে সে দীর্ঘকাল এক তৃপ্তিকর মসৃণতায় বসবাস করে আসছিল । সে পর্যন্ত আত্মনির্ভরতার ভিত্তিটিও ভেঙে গেল — থেকে গেল অশান্তি শাসিত এক মূল্যবিহীন, বিরোধী জগত । ...এই মূল্যবিহীন, বিপন্ন, নিঃসঙ্গ মানুষ প্রায় এই প্রবল হতাশায় তলিয়ে যেতে যেতে দেখলো যে তার জীবন অনন্ত মূল্য-বিচ্ছিন্নতার এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নয় ।...কিন্তু আধুনিক কবি নিঃসঙ্গতাকে উপভোগ করতে অক্ষম, কেননা ইতিমধ্যে পরিবর্তমান এই বিরূপ বিশ্ব তাকে এমন অদ্ভুতভাবে নিঃসঙ্গ করে ফেলেছে যে, নৈঃসঙ্গ্যবোধ তার কাছে প্রায় সর্বনাশেরই নামান্তর মাত্র । পারিপার্শ্বিক স্থান ও কালের চক্রান্তে সে এতটা পর্যুদস্ত ও বিপন্ন যে তার পক্ষে একাকীত্বকে আত্মবিলাসের বস্তু হিসাবে স্বীকার করার সাহস ওঠেনা । নিঃসঙ্গতার অবারিত মাঠে সে সুখী বিহারী নয়, অতএব আধুনিক কবি সেই ভীরু নৈঃসঙ্গ্যবোধের অসহায় শিকার মাত্র ।[১৮০]

---

১৭৮। ঐ,

১৭৯। বিধ্বস্ত নীলিমা : ফাল্গুন ১৩৭৩

১৮০। শামসুর রাহমান, 'নৈঃসঙ্গ্যবোধ ও আধুনিক বাংলা কবিতা', ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৮–৫১

Dhaka University Institutional Repository



'বিধ্বস্ত নীলিমা'র অনেক কবিতা নিঃসঙ্গতার অনুভূতিকে অবলম্বন করে রচিত। বস্তুত, এই গ্রন্থটি পাঠ করতে গেলে মনে হয়, জীবন ও সমাজের আসন্ন অবক্ষয় প্রত্যক্ষ করে নিঃসীম শূন্যতায় দাঁড়িয়ে বেদনাভারাক্রান্ত নিঃসঙ্গ কবি অসহায়কণ্ঠে হাহাকার করে চলেছেন। 'উৎসর্গ' কবিতায় এই ধ্বংসের চিত্র পাওয়া যায়।

আজীবন যে নীলিমা ভালোবাসো তা-ও অধিকৃত
সর্বত্র পড়েছে ধসে ভয়ানক দ্রুত চাপ চাপ মৃতের মাংসের মতো।

অন্য একটি কবিতায় আরো স্পষ্টভাবে লিখেছেন:

দুটি ডানায় সব শিশুকে মুড়ে
পাঁজরের খাঁচায় পিশাচের তান শুনি।
কার নিঃশ্বাসে ফুলেরা ভস্মীভূত;
নিরালায় শুধু ধ্বংসের কাল গুনি।[৮১]

কবি-আত্মার নৈঃসঙ্গ ও একাকীত্বকে অবলম্বন করে আরো অনেক কবিতা রচিত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ চয়ন করা হল।

ক. জনশূন্য ফুটপাত চির নিঃসঙ্গতা
মুহূর্তে চোয়াল দিলো মেলে আবহমণ্ডলে; চতুর্দিকে
অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ে,[৮২]

খ. জমা হেলিকপ্টারের ভিড়ে জীবন যেমন বা ছায়া এক শূন্যতায়
ভীষণ হাঁপিয়ে ওঠে, পালাই পালাই বলে রাত
নতুন নেশায় আবদ্ধ হতে চায়, মুখ বুজে পড়ে, দেখি
কেমন ঘুরিয়ে চোখ সন্দিগ্ধভাবে বাঁধ খায় একেকটি
নিঃসঙ্গ পেরিয়ে যায়,[৮৩]

---

৮১। 'কোনো পর্বতারোহীকে', পৃঃ ১৭
৮২। 'বৃষ্টির দিনে', পৃঃ ৩০
৮৩। 'জমা হেলিকপ্টারের ভিড়ে', পৃঃ ৩৬

Dhaka University Institutional Repository



গ. অথচ এখন আমি ভয়ানক দুর্যোগে একাকী
বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। জোড়ো হাওয়া তাঁবুর বনাত
কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেছে আর ছিলায় ঝুলছে।[৮৪]

ঘ. প্রস্তুত প্রধান বক্তা, সাড়ম্বরে সভা উদ্বোধন
হলো গেলো যথারীতি, কিন্তু একি শ্রোতারা কোথায়?
... ... ...
আমরা সবাই সেই বক্তার মতোই শূন্যতায়
কেবলি চলেছি হেঁকে প্রাণপণে ভাষাহীন গানে।[৮৫]

ঙ. বাইরে কিছু আর যায়না আমি দেখা
কোথাও কেউ নেই, ত্রিলোকে আমি একা।[৮৬]

দারিদ্র্য, নির্জনতা, ভীতির পরিবেশ, মূল্যবোধের বিপর্যয়, নিরানন্দ ও শ্বাসরোধকারী পরিবেশ থেকে কবি পালাতে চান, পাখিদের আশ্রয় নিতে চান আকাশের নীলিমার মধ্যে। ঔদার্য, মহত্ত্ব, সৌন্দর্য ও আনন্দে ভরা জীবনের সমার্থক হয়ে আকাশ-নীলিমা এখানে দেখা দিয়েছে।

ক্ষুধার চীৎকার থেকে, বর্ষার উঁচু পাঁক থেকে
দারিদ্র্যের দাঁত নখ থেকে, আতঙ্কের থেকে দূরে
সমস্ত কানাকানি, ক্ষুদ্রতার থেকে
আর কিছু খোয়ারার গলি থেকে দূরে
নীলিমায় বহুদূর শূন্যে-শূন্যে যাবো ঊর্ধ্বে যাবো,
আরো ঊর্ধ্বে আরো।
না, আমি কখনো আর নীচে নামবো না,
নামবো না,
নামবো না,[৮৭]

---

৮৪। 'সেই কণ্ঠস্বর', পৃঃ ৬৭
৮৫। 'স্টেজে', পৃঃ ৭২
৮৬। 'কোথাও কেউ নেই', পৃঃ ৭৬
৮৭। 'মনু এখন পাইলট', পৃঃ ৮২

চতুর্থ কাব্য 'নিরালোকে দিব্যরথ'[১৬৮] যখন প্রকাশিত হয় তখন আইয়ুব খানের মহাড়ম্বরপূর্ণ উন্নয়নদশক উদযাপন সমাপ্ত হয়েছে। ঔপনিবেশিকতাকে যে গণতন্ত্রাবরণে আবৃত হয়ে তাঁর শাসনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার ভবিষ্যত নির্ধারিত করে দিয়েছিল, তার প্রকাশও এই গ্রন্থে লক্ষ করা যায়। এর আবরণের দ্বারা অন্তরালের মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলীয় স্বার্থের যে ভাবনা নির্মিত হয়েছে তা তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের অবসান কামনায় এক প্রতিবাদমূর্ত প্রকাশ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। বস্তুত, বিস্ফোরণোন্মুখ গণমানসের ছায়া পড়ে এই কবিতা-পুস্তকটিকে পূর্ববর্তী কাব্যধারা থেকে অনেকাংশে পৃথক করে তুলেছে। এই পার্থক্য নানাদিকে সূক্ষ্মানুভাবিত ও স্পষ্ট। প্রথমত, প্রাক্তন কাব্য-পুঁথির ব্যক্তিক অনুভবজাত নিঃসঙ্গ ও শূন্যতার কথা, আত্মিকমানসের অসহায় আর্তনাদের কথা এখানেও আছে কিন্তু তা ক্রমশঃ বিলীন হয়ে সমষ্টির আবেগ ও ইচ্ছা ধীরে-ধীরে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। 'আমরা কজন তৈমুর অতিক্রান্ত এলাম পৃথিবী ঘুরে পুড়ে' /সংবাদদাতা/ কিংবা 'পাতালে বিশেষ স্থান আছে তবে আমরা সদলবলে খুব / সবুজ হিল্লোল তুলে চক্ষু দিয়েছি ডুব' /পাতালে বিশেষ স্থান আছে/ প্রভৃতি কবিতায় এই পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয়ত, আত্মবিশ্লেষণের জটিলতা ও বিষাদময় প্রকাশের জন্য যে-শব্দাবলী বহুদিন ধরে প্রচলিত ছিল এবং স্বভাবতই বহু ব্যবহারে জীর্ণ ও ম্লান হয়ে পড়েছিল সেগুলি বর্জন করে নতুনতর শব্দ সংগ্রহের চেষ্টা এই কাব্যে লক্ষণীয়। কবি হাত বাড়িয়েছেন সম্ভাবনাময় লৌকিক শব্দভাণ্ডারের দিকে এবং এর দ্বারা কবিতার পরিধিকে প্রসারিত করার চেষ্টা করেছেন। এর মধ্যে অবহেলিত পল্লীজীবনকে কাব্যের বিষয়বস্তু করার সম্ভাবনাও প্রস্ফুট হয়েছে।

যদি তুমি কৃষিকাজ জানো না বলেই
শকুন হাহাতে বিষ কাটিছি মাটি উজাড় বসিতে, তারপর
পিছিয়ে পড়িতে আমি, কাঁথাখানি ঘুরিয়ে নিতে চাই
পড়িতেছে, তাই তাই জলে ওঠে রঙিন নকশা কাঁথাতেও
সজায় ছেঁড়া ভিতে। বিবেক কলুষ করে ভাবি যদি আবেগেরা শিশু
নতুন বিবেক নিয়ে এসে যায় আমাদের পুরোনো দখলে ...
এমন মানব প্রতিম বৃষ্টিরা পড়িত
অনাবাদে ফলে থাকে সোনা।[১৬৯]

---

১৬৮। ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, আশ্বিন ১৩৭৫
১৬৯। 'আমি হই বর্তমান', পৃঃ ৯২

Dhaka University Institutional Repository



দ্বিতীয়ত, প্রথম দিকের কাব্যগুলিতে যে পরিবেশের পরিচিতি আছে তার চেয়ে এই কাব্যে বর্ণিত ভূভাগ অপরিচয় এবং তা ক্রমশঃ পূর্ব বাংলার রূপ ধারণ করেছে। এবং যে পূর্ব বাংলার পরিচয় আমরা এখানে পাই তা দুর্ভিক্ষপীড়িত, পরাজিত পদানত, রুগ্ন, গৌরবম্লান ও নৈরাশ্যভারাতুর।

ক. আমাদের শহরের শোক জরা ব্যাধি বড় বেশি
ভাবিত, বিপন্ন করে। দীর্ঘদেহী ইতিহাস অবেলায়
ছায়া ফেলে যায় যুগান্তের কবিতারে। প্রভুদের সাদা
ঘোড়াদের কিরীটের মতো সূর্য আমরা দেখিনি
কতকাল ...।[110]

খ. আপনার বিশ্বস্ত সংবাদদাতা, হে বিশ্বপালক, এই আমরা অনেক
পৃথিবীতে বহুদিন করেছি ভ্রমণ,
কখনো শাদের রোদ্দুরে, কখনো বা পৌষের ধোঁয়ায় পথ হেঁটে
অনায়াসে দেবদূতী পাখাগুলো ছেঁটে।
দেখেছি পেছনে ফিরে পল্লীগ্রাম হয়েছে উজাড়
চোখের পলকে আর শহরে ও মড়কের নৃত্যনাট্য, পূজার
মণ্ডপ এবং শান্ত মসজিদে জ্যোৎস্না ডেকে যায় হা-হা সুরে
শূন্যতায়, অথচ কোথাও কোনো লোক নেই ঘরে।[111]

গ. পশ্চিমে অন্য কেউ জেগে ওঠে, প্রাণময়ী কাল ...
... ... ...
এবং আমার বুক পূর্ব বাংলার মতোই রুগ্ন, তীব্রতম
কাশির দমকে রক্ত ঝরে যায়, কুঞ্চিত চাদর
গোধূলি-তরল রক্তে বারবার ওঠে ঝলকিয়ে।[112]

---

১১০। 'অধমর্ণের গান', পৃঃ ৬

১১১। 'বিশ্বস্ত সংবাদ দাতা', পৃ ১২

১১২। 'প্রকাশ', পৃঃ ৫৮

Dhaka University Institutional Repository



শ্বাসরুদ্ধকর এই পরিবেশ থেকে মুক্তির আশায় জনগণ অস্থির হয়ে উঠেছিল । মিছিল মিটিং আন্দোলন হরতাল প্রভৃতি চলছিল স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ।

অন্তত আপনা
অসংখ্য প্রতিজ্ঞা দৌড়ে তারুণ্যের উত্তাল মিছিলে,
সংস্কৃতির উচ্চকিত স্বাধিকারে, পর্বত-টলানো হরতালে ।[১১৩]

'টেলেমেকাস' কবিতায় রূপকের আড়ালে কবির মনোভাব আরো স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে । ইথাকার অধিপতি অডিসিয়াসের প্রবাসের সুযোগে বিদেশীরা ইথাকার দখল করে সেখানে অত্যাচার শুরু করেছে । পুত্র টেলেমেকাস অস্থির আগ্রহে অপেক্ষা করছে পিতার প্রত্যাবর্তনের জন্য । তিনি ফিরে এলে পুরানো অস্ত্রে পুনরায় শান দেওয়া হবে, অস্ত্রশালা তূর্যধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠবে এবং ইথাকা পূর্ণ শত্রুমুক্ত হবে । এখানে ইথাকার আড়ালে সেকালের পূর্ব বাংলার ছবি সহজেই মনে হতে পারে ।

এখানে আগামের মতো
অসংখ্য ইথাকা, গহ্বরে জনগণ প্রতিষ্ঠিত
অনাচার, অত্যাচার ইত্যাদির চায় প্রতিকার ।[১১৪]

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতেও সে সময় আশার বা শান্তির কোনো লক্ষণ ছিল না । পর্তুগালের সালাজার ও আমেরিকার জনসনের মত খুনীরা দেশে-দেশে রক্তের প্রবাহ বইয়ে দিয়েছিল । ভিয়েতনামে-যে বোমা পড়েছে তা নয়, অহিংস শান্তিবাদী মার্টিন লুথার কিং পর্যন্ত ঘাতকের আঘাত এড়াতে পারেননি ।

ক.　　সকল প্রশংসা তাঁর, করুণা অপার
বুঝি তাই যুগে যুগে সোৎসাহে বিশ্বে পাঠান
জনসন আর সালাজার ।[১১৫]

---

১১৩। 'অধমর্ণের গান', পৃঃ ১০
১১৪। 'টেলেমেকাস', পৃঃ ৯৫
১১৫। 'সকল প্রশংসা তাঁর', পৃঃ ৫১

Dhaka University Institutional Repository



ঘ. সুনিশ্চিত ঘুণ

ধরে গেছে দিবারাত্রি পাদপীঠে, নইলে কেন আর
মাটির দুয়ার কিংবা দুটোন বিহ্বল ; ঝাঁঝাবার
আতঙ্কে পাখা কেন কম্পমান নিশ্চিত প্রহরে ;[১১৬]

সর্বশেষ কাব্য 'নিজবাসভূমে'র পটভূমি উনসত্তরের পূর্ব বাংলা। বিক্ষোভ ও আন্দোলনের সঙ্গে সাযুজ্য অনুভব করে বৃহত্তর জনজীবনের সমীপবর্তী হওয়ার কবির রচনাতেও গুণগত পরিবর্তন এসেছে। এ-কাব্য, তাই, আলোচিত হয়েছে ভিন্ন প্রসঙ্গে।

শামসুর রাহমানের কবিতা-নিয়ে অনেকে আলোচনা করেছেন, কিন্তু কবিতার রূপনিষ্পত্তি সম্পর্কে সবাই একমত হতে পারেননি। তাঁর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য, নাগরিক চেতনার অকৃত্রিমতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন সৈয়দ আলী আহসান। তিনি বলেছেন 'শামসুর রাহমানের নাগরিকতার সজ্জাটা অনেকটা বিদেশী' এবং 'তাঁর প্রায় কবিতার মধ্যেই ... বিদেশী আবহ এসেছে যা আমাদের পরিবেশের জন্য সত্য নয়'।[১১৭] আরো কঠোর কথা বলেছেন [illegible] শামসুদ্দীন। প্রথম দুটি বই বিশ্লেষণ করে তিনি উপসংহারে পৌঁছেছেন যে, 'সমাজবিমুখ আত্মকেন্দ্রিক ভাববাদী' শামসুর রাহমানের কবিতার ভাববস্তু দেশি-বিদেশি কবির কবিতা থেকে আহরিত, তাঁর কবিতার নির্মাণ কৌশল প্রশংসনীয় হলেও 'নতুন বোতলে পুরাতন মদ চালানোর কার্যে তার ব্যবসায়বুদ্ধি এত কম যে, পানশালার নিয়মিত গ্রাহক ও দূরের কথা, কালেভদ্রে আগন্তুকেরও প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা কম'।[১১৮] মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ এই বই দুটিতে লক্ষ করেছেন জীবনানন্দ দাশের রোমান্টিকতা ও

---

১১৬। 'রাজা', পৃঃ ৩৭

১১৭। 'পূর্ব পাকিস্তানের কবিতা', আধুনিক বাংলা কবিতাঃ শব্দের অনুষঙ্গে, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৭

১১৮। চিন্তার বিবর্তন ও পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭০

Dhaka University Institutional Repository



দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সমাজচেতনার উপস্থিতি, তবে তিনি এ-ও বলেছেন 'উভয়ের কাব্য পরিমণ্ডল ও কাব্য বিন্যাসকে আশ্রয় করে এক ধরনের সমন্বয়ের মাধ্যমে তিনি ক্রমান্বয়ে তাঁর কবি চরিত্রকে গড়ে তুলেছেন'।[১৯৯] জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর মতে Shamsur Rahman is individual, urban, universal and international এবং is undoubtedly one of the most powerful and successful poets of present day East Pakistan. কিন্তু তিনি আরো Between his poetry and that of many other similar successful poets of his time there is but little difference and distinctiveness.[২০০] এই কাব্যধরে শামসুর রাহমানের চেতনালোকের বিকাশের তিনটি স্তর নির্দেশ করেছেন হাসান হাফিজুর রহমান তাঁর আলোচনায়: প্রথম স্তরে তিনি 'স্বাভাবিক উল্লাসে সঞ্চরণশীল, জীবনের রূপবৃক্ষে আত্মআবেগে উচ্চকিত, দ্বিতীয় স্তরে জীবনের বাস্তবতর সত্য, যুগীয় ঘটনা ও সমাজতথ্যের সংশ্লিষ্ট ও সংশ্লিষ্ট তাৎপর্য সম্পর্কে সজাগ এবং তৃতীয় স্তরে এসে এই চেতনাই ব্যক্তি অধিকারের অবিচ্ছিন্নতায় পরিব্যাপ্ত হয়ে নিজস্ব শিল্প অভিজ্ঞান, জীবনবীক্ষা, বোধ ও দর্শন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া-সম্পন্ন হয়ে উঠেছে'।[২০১] সাম্প্রতিককালে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হচ্ছে হুমায়ুন আজাদের 'শামসুর রাহমানের কবিতা'। 'ব্যক্তিগত, বিষাদবাচিত মনোবিশ্ব থেকে কারাগারীয় পরিবেশ পৃথিবী অভিমুখে শামসুর রাহমানের যাত্রা'-কে নয়টি কাব্যের মাধ্যমে অভিনিবেশসহকারে অনুসরণ করেছেন তিনি এই প্রবন্ধে।[২০২]

সব কিছু মিলিয়েই শামসুর রাহমানের পরিচয়। পূর্বোক্ত বহু কবির মতই সমকালের প্রতি সজাগ ও দেশি-বিদেশি সাহিত্যের ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তিনি কবিতা-রচনা শুরু করেছেন এবং ক্রমশঃ এগিয়ে গেছেন নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও রচনাশৈলী অর্জনের দিকে। অগ্রজ কবিদের প্রভাব প্রাথমিক পর্যায়ের কবিতা থেকে বের করা দুঃসাধ্য নয়, কিন্তু দ্বিতীয় সংকলনেই 'তার গড়ে ওঠার পরিচয়টা পাওয়া যায়'।[২০৩] ১৯৫৮-১৯৭০ এর যুগেই তাঁর

---

১৯৯। 'সমকালীন কবিতার ধারা', সমকালীন সাহিত্যের ধারা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬১

২০০। 'Focus on Poetry : Two Poets', Bengali Academy Journal, Vol. I, No.1, April, 1970, p. 118

২০১। আধুনিক কবি ও কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬২

২০২। বক্তব্য, /প্রবন্ধ পত্রিকা/, ৪র্থ খণ্ড, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৪, পৃঃ ২৮

২০৩। আবু হেনা মোস্তফা কামাল, 'রৌদ্র করোটিতে', /গ্রন্থ সমালোচনা/, মাসিক পরিক্রম, ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৭১, পৃঃ ৫৭১-৭৭

Dhaka University Institutional Repository



কবিতার পটভূমি। এই সময়ের শুরুতে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নৈরাজ্য ও অবক্ষয়ের যে পরিস্থিতি বিরাজ করছিল, এবং পরবর্তী বছরগুলিতে যা আরো ব্যাপকতার ধারণ করেছিল, তা-ই শামসুর রাহমানকে বিষণ্ণ ও ব্যথাদীর্ণ করেছে। সেজন্যই প্রথম তিনটি কাব্যে লক্ষ করা যায় মৃত্যু ও ধ্বংসের এত বিস্তার। এর পর থেকে দেশের রাজনীতি ও সংস্কৃতি নির্দিষ্ট দিক ও গতি লাভ করলে, সে প্রভাবে তাঁর কবিতাও ব্যক্তিগত বিষাদের বৃত্ত থেকে সমষ্টির বিক্ষোভের বলয়ে উন্নীত হয়। অর্থাৎ আলোচ্য সময়ে সমাজে ভাঙা-গড়ার যে-ধারা চলছিল, সে-ধারার ভাষার দিকটি রূপায়িত হয়েছে তাঁর কবিতায়। জরার দৃশ্য কবির চোখে পড়েছে, কিন্তু তিনি প্রত্যাশী ছিলেন প্রেম, সৌন্দর্য, নীলিমা, জ্যোৎস্না ও রৌদ্রের। তাঁর কবিতার বাক্‌প্রতিমা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একজন সমালোচক যথার্থই নির্দেশ করেছেন, একদিকে বিষাদ, বিতৃষ্ণা, শূন্যতা, মৃত্যু, শব, করোটি, কবর; অপরদিকে পাখি, নৌকা, হরিণ, বাগান, ঘোড়া, সূর্য ঘুরে-ঘুরে এসেছে কবিতাবলীতে।[১৪]

শামসুর রাহমানের কবিতার গঠনকৌশলের প্রশংসা সবাই করেছেন। অনিবার্য শব্দবোধ, প্রবাদের সাবলীলতা, শব্দের সঙ্গীত ধর্মিতা, বস্তুকণাকে অঙ্গীকার, চিত্রকল্পের আত্মনির্ভরতা তাঁর কবিতাবলীকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। 'এ ভাষায় শামসুর রাহমান .. অনায়াসে যে কোন আবেগ ও অভিজ্ঞতাকে কবিতায় রূপান্তর করতে পারেন, ... এই ভাষার সাহায্যেই শামসুর রাহমান সর্বশ্রেণীর পাঠকের কাছে আবেদন সৃষ্টি করেন'।[১৫]

---

১৪। বিশ্বনাথ বড়ুয়া, কবিতার বাক্‌প্রতিমা, ৪র্থ অধ্যায়, /শামসুর রাহমান সম্পাদিত আলোচনায়, /ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৭৬/, পৃঃ ৫০-৮৪

১৫। রফিকুল ইসলাম, আধুনিক কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬২

Dhaka University Institutional Repository



# হাসান হাফিজুর রহমান

ময়মনসিংহ জেলার জামালপুরে ১৯৩২ সালে হাসান হাফিজুর রহমানের জন্ম হয়। শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হয় ১৯৫৫ সালে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে এম-এ ডিগ্রি লাভের মাধ্যমে। কর্মজীবন তাঁর বহুবিস্তৃত ও ব্যাপক। তিনি 'দৈনিক ইত্তেহাদ' -এর সহকারী সম্পাদক /১৯৫৫-৫৭/, জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক /১৯৫৭-৬৪/, 'দৈনিক পাকিস্তানের' সহকারী সম্পাদক /১৯৬৪-৭১/, 'দৈনিক বাংলার' প্রধান সম্পাদক ও প্রশাসক /১৯৭২-৭৩/, মস্কোতে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস কাউন্সিলার /১৯৭৩-৭৪/ হিসাবে কাজ করেছেন। তিনি পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সম্পাদক /১৯৫৪-৬০/, নিখিল পাকিস্তান [illegible] লেখক সংঘের সম্পাদক ও পাকিস্তান লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখার সম্পাদক /১৯৬৬-৬৯/ ছিলেন। তাছাড়া আরো নানাবিধ সাহিত্য-সংস্কৃতি সংগঠনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

কবি ও সাহিত্য সমালোচক হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। তাঁর 'আধুনিক কবি ও কবিতা' /১৯৬৫/ পূর্ব বাংলা কবিতার উপর একটি উল্লেখযোগ্য সমালোচনা গ্রন্থ। ১৯৭২ সালের পর আরো পাঁচটি সাহিত্য-সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। কাব্যগ্রন্থ রয়েছে পাঁচটি: বিমুখ প্রান্তর / ৬ই আষাঢ়, ১৩৭০/, অন্তিম শরের মতো /শ্রাবণ ১৩৭৫/, আর্ত শব্দাবলী /ভাদ্র ১৩৭৫/, যখন উদ্যত সঙ্গীন /আশ্বিন ১৩৭৯/ এবং বজ্রেচেরা আঁধার আমার /১৯৭৬/। 'আরো দুটি মৃত্যু' নামক একটি গল্পগ্রন্থও তাঁর রয়েছে। তিনি ১৯৫৩ সালে প্রথম একুশের সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সম্পাদনা করেন। তাছাড়া রয়েছে সম্পাদিত গ্রন্থ 'উত্তর বঙ্গের মেয়েলী গীত' এবং ১৯৬৫ সালের যুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ 'সীমান্ত শিবির'।

সাহিত্য-সংস্কৃতি সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি অনেকবার পুরস্কৃত হয়েছেন। ১৯৬৭ সালে '৬ই সেপ্টেম্বর পুরস্কার', ১৯৬৬ সালে 'আদমজী পুরস্কার', ১৯৭২ সালে বাংলা

Dhaka University Institutional Repository



একাডেমী পুরস্কার এবং ১৯৭৬ সালে 'সুফী মোতাহার হোসেন পুরস্কার' তিনি লাভ করেছেন।[২০৬]

পাকিস্তান-আমলে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থে সংকলিত কবিতাগুলি রচনার কালানুক্রম সম্পর্কে জানি। 'বিমুখ প্রান্তর' প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৩ সালে। তৃতীয় কাব্য 'আর্ত শব্দাবলী'র কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৫২-৬০। দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে 'আর্ত শব্দাবলী'র এক মাস পূর্বে এবং এতে ১৯৬০ সালের পরে রচিত কবিতা যে স্থান পেয়েছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সুতরাং গ্রন্থের প্রকাশ কাল অনুসারে আলোচনা না-করে তিনটি সংকলনকে একত্রে আলোচনা করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে। মোটামুটিভাবে বলা চলে পাকিস্তান-আমলের প্রথম বিশ বছরের পটভূমিতে বিচার করতে হবে তাঁর তিনটি কাব্যকে।

হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতার একটি প্রধান দিক হচ্ছে স্বাদেশিক চেতনা। তিনি মাতৃভূমিকে ভালবাসেন, নিজের অস্তিত্বকে স্বদেশের প্রকৃতি ও ঐতিহ্যে সমর্পণ করে আবিষ্কার করতে প্রয়াসী হন, তেমনই স্বীয় নিবৃত্তি থেকে নিরন্তর এর মধ্যে পরিব্রাজক হিসাবে তার রূপ ও রস অনুভব করতে চান। ভালবাসার সে স্বদেশ পূর্ব বাংলা।

হয়তো অতুল নই আমি, নই বার্ণিতের
তবুও স্বস্তি আমি এক আমারই স্বদেশে।
... ... ...
মর্মের মুদ্রিত অঙ্কিত সত্তার নিচে ঘুমিয়ে
স্বদেশের পরিব্রাজক আমি, দক্ষিণ থেকে উত্তরে
সমুদ্র থেকে পাহাড়ে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে
সকল থেকে উৎসে — আমার স্বদেশের
একাকারে আমার যাত্রার শেষ নেই।[২০৭]

---

২০৬। 'হাসান হাফিজুর রহমান', স্মরণিকা,/সুফী মোতাহার হোসেন সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৭৬/, /বাংলা সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত/, পৃঃ ১৮-১৯

২০৭। 'স্বদেশ পরিব্রাজক', অন্তিম শরের মতো,/ঢাকা : সন্ধানী প্রকাশনী, ১৯৬৮/,পৃঃ ৪০

Dhaka University Institutional Repository



কিন্তু দেশের অবস্থা কী, দুর্দশাগ্রস্ত ও দুঃখাক্রান্ত । আদিগন্ত বিস্তৃত শূন্য বিরাণ উষর প্রান্তরই এই দেশের সার্থক উপমা ।

বিরাণ বাগানে শেষ পড়ে আছে মৃত ম্রিয়মাণ ঘাস,
ম্লান পত্রহীন চোখ, প্রকৃতির নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস
আলোড়িত চারদিকে । মৃত্তিকার বুক গেছে ফেটে
কোথাও ঝরণা নেই, জল নেই সুদূরে নিকটে
সমুন্নত পাহাড়ের উৎসারিত অনিঃশেষ মুখ
শুষ্কশূন্য প্রাণহীন । কোথাও কি এক ফোঁটা সুখ
পিপাসার তৃপ্তি দিয়ে ঝরে যাবে প্রান্তরে অন্তরে
যেমনা পরম কালে, অতিক্রান্ত তৃষিত অন্তরে ;[208]

আবার কখনো-কখনো সুন্দর করে সাজানো বাগানের উপমাই স্বদেশের জন্য যথার্থ মনে হয় — যে-বাগানে জৌলুস আছে, প্রাণ নেই, ফুল আছে, গন্ধ নেই ।

নিয়নের রঙ আলিমার
আমাদের মনের সেউতিয়া দোপাটি,
অত — ঝলমলে দলে কেয়ারি-করা বন
বাগানের সুবাসে আছে ছেয়ে, এই বুঝি মরুভূমি ;
স্রোতবহ সম্ভ্রান্ত খাঁড়ুর ঘর ; বংশ পরম্পরায়
কলোনী স্বদেশ আমার ;[209]

কিন্তু এদেশ রুক্ষ ও উষর হলেও বন্ধ্যা নয় — সৃষ্টি-বিমুখ কিন্তু সৃষ্টিতে অপ্রসন্ন নয় ।

প্রসবে প্রসন্না
অথচ সন্তানে রুচি নেই এই
বন্ধ্য চরাচর ।[210]

---

২০৮। 'অনিকেত প্রত্যাশী,' আগুন শব্দের মতো, পৃঃ ৪৮

২০৯। 'প্রবাসগ্রস্ত নগরী', ঐ, পৃঃ ২৪

২১০। 'বিমুখ প্রান্তর', বিমুখ প্রান্তর, /ঢাকাঃ পারাবত প্রকাশনী, ১৩৭০/, পৃঃ ৭

'আর্ত শব্দাবলী'র দুটি কবিতায় (সূর্য, মল্লরাজা) পাকিস্তানের সামরিক শাসন পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই কবিতাগুলিতে এমন একজন সর্বশক্তিমান রাজার কথা আছে যে ঈশ্বরের মত প্রতাপশালী বলে নিজেকে মনে করে এবং স্তাবকেরা মুহুর্মুহু তা প্রচারও করে। তার রাজত্বে বাইরের দিকে দেশের জৌলুস বাড়ে কিন্তু ভেতরে-ভেতরে শক্তি ও সম্ভাবনা ক্ষয় হয়ে আসে।

অটল দৈবতে বসে
হঠাৎ হুংকারে করেন চকিত চারদিক। আর সারাক্ষণ
অজ্ঞান গরিমায় বিচ্ছুরিত হন।
কখনোবা পরিণামী কণ্ঠে ওঠে হেঁকে: আমিই একাই দেশ,
... ... ...
সকল সমর্থ দল না থাকলেও তো
চলন চলে যাবে এবং মোড়লেরা যতদিন
একচ্ছত্র রইবেন আমার আগে, অদ্ভুত সর্বা ঘুমভোলা বাবাদের
সুনিশ্চিত আশ্বাস রইবে, তখন দুঃখ কী আর।[211]

এই বিরূপ সমাজের প্রভাব পড়েছে কবির মনে। তিনি হারিয়েছেন প্রচলিত মূল্যবোধে আস্থা কিন্তু কোনো নতুন মূল্যবোধ অর্জন করতে পারেননি নিশ্চিত বিশ্বাসে। প্রেম সৌন্দর্য দেশপ্রেম মনুষ্যত্ব প্রভৃতি চিরায়ত ধারণা হারিয়ে শূন্যতার এক জগতে বিচরণ করছেন।

একাগ্র অনাস্থা গাঢ় মনেতে আমার। আস্থা নেই
সৌন্দর্যে, আশ্বাসে, প্রত্যাশায়, আস্থা নেই
দলিত জনারণ্যে। আস্থা নেই আলোকে যৌবনে
দিন রাত্রি পার হয়ে যাওয়া প্রজাপতি সময়ের
লীলাচলে। আস্থা নেই মানুষে মানুষে
সমাজে সম্ভোগে, রীতিনীতি চাণক্য — কৌশলে
হঠকারিতায়, আত্মজা চৈতন্যে প্রসারিত মহিমায় আর
আলোয় আঁধারে।[212]

---

২১১। 'সূর্য', আর্ত শব্দাবলী, (ঢাকাঃ পুঁথিপত্র প্রকাশনী, ভাদ্র ১৩৭৫), পৃঃ ৫৯–৬০
২১২। 'ভ্রান্তি', বিমুখ প্রান্তর, পৃ: ৭৩

Dhaka University Institutional Repository



কবির কাছে হয়ে উঠেছে 'অন্ধকার', ঘৃণা, যন্ত্রণা ও অবিশ্বাসের চারণভূমি, কারণ তিনি একালের মানুষ এবং একালে মানুষ তার স্বভাব প্রকৃতি ও ঐতিহ্যকে বিস্মৃত হয়েছে ।

যে প্রকৃতি থেকে তাঁর জ্ঞান থেকেই মানুষ বয়সকে নিয়ে
বেড়ে বেড়ে চলে, আর তার সূর্যকে প্রসারিত করে
স্বাভাবিক সত্তায়, সে যদি হারায় মাটিকে, মানুষ যদি
তার প্রকৃতিকে ভুলে যায়, তাহলে ;
আমরা সবাই আমাদের নামকে
ভুলে গেছি, মনুষ্যত্বের নিশ্চিত সত্তাকে ভুলে গেছি ।
মৃত্যুর নামকেও ভুলে গেছি ।[২১৩]

কিন্তু পরিচিত পৃথিবী ও বিশ্বাসের জগত পেরিয়ে কোথায় সেই অনন্ত যাত্রা ; কোন শূন্যতা, নৈঃশব্দ, নির্বাণ বা অলীক স্বপ্নে সমাপ্ত হবে এই সর্পিল পথ ; এ প্রশ্ন কবির, এ প্রশ্ন এ যুগের যন্ত্রণাদগ্ধ মানুষের ।

শূন্য অন্বেষা

এক অনিমেষ কৃষ্ণকাল ভেদ করে যেন আমি
একলাই বেরিয়ে যাচ্ছি । চেতনাহীন, অকূল শূন্য ।
কিন্তু কোথায় যাচ্ছি ? শূন্যতার আদিমূলের দিকে ?
উজ্জ্বল বৃহৎ হৃদয়ের নিঃশব্দ বৈরাগ্যে ?
গালিচার মতো জলতলে এক চতুর মাসের স্বপ্ন থেকে
আরেক অলীক স্বপ্নে ? অন্ধের গভীরে, না
অন্ধকারের দীপালোয় ? নির্বাণে, আবেগে ?
না, আত্মার উন্মুক্ততায় ?[২১৪]

এই প্রশ্নের কোনো সমাধান কবি পাননি । ঈশ্বরের দুঃখ অবাধাতে 'জীবন্ত বিহঙ্গ'

---

২১৩। 'কালের নায়ক', আর্ত শব্দাবলী, পৃঃ ৫২

২১৪। 'চিরায়ত ছায়াছবি', অন্তিম সময়ের মতো, পৃঃ ৬

Dhaka University Institutional Repository



কবি নিজেকে প্রকাশ করেন অনাকাঙ্ক্ষার শ্মশান ভূমির প্রতীকে, যা আমার ব্যথিত পূর্ববাংলার চৌচির প্রতিচ্ছবি।

আমি শায়মান বিদীর্ণ-হৃৎপিণ্ড মৃত্তিকা
নরমুণ্ড নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলার
অনাকাঙ্ক্ষা রাত্রির শ্মশান ভূমি ;
আমি ব্যথিত পূর্ব বাংলার ঈপ্সিত আলেখ্যের
চৌচির প্রতিচ্ছবি, মুখ থুবড়ে থাকা মানবতা
উদার প্রকৃতির ধূম্রাণু – আন্দোলনে ;[25]

'মহব উদ্যাত নবীন'-এর ছিন্ন-ভিন্ন কবিতা ১৯৭১ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসের মধ্যে রচিত। সে সময়ে স্বাধিকার ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় পূর্ব বাংলায় আন্দোলনের যে-পটভূমি তৈরী হচ্ছিল, তার প্রভাব কবিতাগুলিতে পড়েছে। একটি কবিতায় তিনি বাংলার মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে দেখেছেন সব মানুষের মিছিলের মধ্যে। মেঘনার জল যেমন সবকিছুকে ভেঙে একাকার করে দেয়, তেমনি এই মিছিলও শহরের কৃত্রিম জীবনযাত্রা ভেঙে দেশের বাকি অংশের সঙ্গে একই সমতলে এসে নবজীবনের জন্ম দেবে।

শহরের আভিজাত্য সাজানো চত্বরে আজকাল
কোটি কণ্ঠ একটি আওয়াজ হয়ে যায়,
অযুত বাহু একটি মানুষের মতো দুলে ওঠে।
স্বদেশের সমস্ত বাড়িঘাটি করে অবহ
এবার প্লাবিত করে একাকার বুঝি এই জল। মেঘনার মতোই
আজল শহর ভোলে, মুহূর্তে বদলায় রূপ, ভীষণ অবিনাশিত
এই কি নরম বাংলা দেখি ভেঙে আকাশার মহাবন,
মৃত্তিকে কোথায় ফুল, উচ্চকিত পতাকায় নতুন জন্মের সংবাদ।[26]

---

২৫। 'জীবনের মনটারোলে', অন্তিম পত্রের মতো, পৃঃ ১৪

২৬। 'সূর্য মেঘনার জল', মহব উদ্যাত নবীন, চট্টগ্রাম : বইঘর, ১৩৭৮, পৃঃ ১২

Dhaka University Institutional Repository



হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে একজন সমালোচক মন্তব্য করেছেন, 'স্বদেশ আর স্বজাতির বিশ বছরের প্রকৃতি, তার সংগ্রাম, তার পরাজয়, তার আশা আর হতাশা পূর্ব বাংলার আর কোন কবির কবিতায় এমন বিশ্বস্তভাবে ধরা পড়েনি।... হাসান হাফিজুর রহমান আমাদের রাজনৈতিক ও সমাজ-জীবনের কবি-ভাষ্যকার'।[২১৭] সমালোচকের এই মতকে গ্রহণ করতে হবে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে; কেননা হাসান হাফিজুর রহমানের স্বদেশ-চেতনা অত্যন্ত প্রখর থাকলেও, স্বদেশকে নিয়ে বেশ কিছু ভাল কবিতা রচনা করলেও সামগ্রিকভাবে তাঁর কোনো কাব্যই এই উচ্ছ্বসিত উক্তিকে সমর্থন করেনা। তাঁর কবিতায় পাওয়া যায় উষর ও নিষ্প্রাণ দেশের পটভূমিতে আধুনিক মানুষের অসহায় আর্তনাদের ধ্বনি। কিন্তু সেই দেশটি ১৯৪৮–৬৮ সালের পূর্ববাংলা কিংবা মানুষ সে-সময়ের বাঙালি নয়। সে বিশ শতকের আধুনিক সমাজের একজন বিশুদ্ধ প্রতিনিধি মাত্র। অর্থাৎ হাসান হাফিজুর রহমান যতটা স্বাদেশিক তার চেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক। এবং এই বোধ সাহিত্যের সূত্রে প্রাপ্ত বলে তাঁর কবিতায় প্রকাশিত উপলব্ধিকে প্রায়ই মননপ্রসূত, ব্যক্তি অনুভবজাত নয়, বলে ধারণা জন্মে। 'বিমুখ প্রান্তর'-এর সঙ্গে The Waste Land /১৯২২/ এর নামসাদৃশ্য শুধু আকস্মিক নয়, তা ভাবের দিক থেকে গভীরতম নৈকট্যের ইঙ্গিতবহ, কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ইংলণ্ডের তথা ইউরোপের সমাজে The Waste Land - এর রচনা যেমন স্বাভাবিক ও অনিবার্য ছিল, পাকিস্তানোত্তর পূর্ব বাংলার পরিবেশে 'বিমুখ প্রান্তর'কে তেমন স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা হয়। পূর্ব বাংলায় যে নগরটিকে আমরা জানি তা সাম্প্রতিক কালেও মহানগরীর চারিত্র্য পুরোপুরি অর্জন করতে পারেনি, অথচ ষাটের দশকের শুরুতে তিনি লিখেছেন:

শহরের শূন্যতার শব্দ
হয়ে গেছে বহু স্যুটকেশ, মান খসে গেছে, খসে গেছে
সম্ভ্রম সম্মান, অহেতুক এই মিছে মোহ স্বপ্ন লোভে
কতকাল রব আর ;
আস্তুত বাবুদের সোয়াবাবো, তার চুটানো মূর্তির
একপেশে বাড়িয়ে আমূল বিবর্ণ কাবুলাজ মহত্ত্ব
দেখে দেখে কাটে না এ কালবেলা।[২১৭ক]

সেজন্য নিরাশ্রয় চেতনা অনিবার্য হয়ে পড়ে, তিনি তাঁর কবিতায় নগরমনস্কতা এনেছেন আধুনিক কবিতার একটি বিশেষ ধারার অনুশীলন করতে গিয়ে, তা পরিবেশ সমর্থিত না-হলেও। তাঁর শেষ দিকের কাব্যগুলিতেও একই বক্তব্য অর্থাৎ, ব্যক্তির নৈঃসঙ্গিক সুষমামণ্ডিত হয়েছে। তা থেকেও মনে হয়, তাঁর কাব্যভাবনায় আবর্তন আছে, বিবর্তন নেই, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন একই বিন্দুতে।

২১৭। রফিকুল ইসলাম, আধুনিক কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৬

২১৭ক। 'রক্তিম কুসুম কুল', বিমুখ প্রান্তর, পৃঃ ৭৭

Dhaka University Institutional Repository



## সৈয়দ শামসুল হক

রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম মহকুমায় ১৯৩৫ সালের ২৭-এ ডিসেম্বর সৈয়দ শামসুল হকের জন্ম হয়। স্থানীয় স্কুলে কিছুকাল লেখাপড়া করে ঢাকার কলেজিয়েট হাই স্কুল থেকে ১৯৫০ সালে ম্যাট্রিক ও ১৯৫৪ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে আই.এ. পাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল ইংরেজিতে অনার্স পড়েছিলেন, কিন্তু তা সমাপ্ত করেননি।

সাংবাদিক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। প্রথমে ঢাকার সিনেমা সাপ্তাহিক 'চিত্রালী'তে সহকারী সম্পাদকরূপে কাজ করে মাসিক 'অনুপম'-এর সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন ১৯৬৯ সালে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় দেশত্যাগ করে /সেপ্টেম্বর, ১৯৭১/ চলে যান লণ্ডনে 'বৃটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন'-এর বাংলা বিভাগে। এখনো সেখানে আছেন।

তিনি ঢাকা সিনে ক্লাব /১৯৬৯/, বর্ণি সাহিত্য চক্র /১৯৭০/-এর প্রতিষ্ঠাতাসদস্য ও বাংলা একাডেমীর কর্ম পরিষদের সদস্য ছিলেন। ইংরাজী মাসিক 'এক্সপ্রেস'-এর সাহিত্য-উপদেষ্টা হিসেবেও তিনি কাজ করেছেন ১৯৭০-৭১ সালে।

তিনি মূলত কথাসাহিত্যিক। ছোটগল্পের জন্য ১৯৬৬ সালে তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। কিন্তু কবি হিসেবেও তাঁর প্রতিষ্ঠা আছে। পাকিস্তান আমলে তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা তিন: একদা এক রাজ্যে /১৯৬১/, বিরতিহীন উৎসব /১৯৬৯/ ও বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা /১৩৭৬/। শেষোক্ত গ্রন্থের জন্য ১৯৭০ সালে তিনি আদমজী পুরস্কার লাভ করেন।[২৮]

---

২৮। আবদুর রাজ্জাক, বাংলাদেশের লেখক: জীবন ও গ্রন্থপঞ্জী, /প্রকাশিতব্য/

Dhaka University Institutional Repository



'একদা এক রাজ্যে'[219] সৈয়দ শামসুল হক ব্যক্তির মানসিক জগতের স্তর উন্মোচন করতে চেয়েছেন। মনের তিনটি স্তর : চেতন, অচেতন ও অবচেতন। চেতন জগতের যা আমরা সবকিছুর জানি আর অচেতন জগতের মর্মোদ্ধার এখনো সম্ভবপর হয়নি। এই দুই রাজ্যের মধ্যে বিরাজ করছে রহস্যেভরা আলোআঁধারির অবচেতন জগত। ঐতিহাসিক ও ব্যক্তিগত সূত্রে প্রাপ্ত প্রতিটি উপলব্ধি ও অনুভূতি সেখানে স্তরে-স্তরে সঞ্চিত হয়ে একে সমৃদ্ধ ও জটিল করে তোলে। স্বপ্নে ও বিশেষ মানসিক অবস্থায় এই স্তরের নানা অনুভূতি বিশেষ-বিশেষ প্রতীকের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে — শান্ত স্থির নদীতে অকস্মাৎ ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হলে তলদেশে সঞ্চিত নানা আবর্জনা যেমন ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে স্রোতোবেগে ভেসে চলে, তেমনি। এই রাজ্যের ভাবনারাজিকে ধরতে চেষ্টা করেছেন কবি তাঁর কাব্যে। যেহেতু সে-রাজ্যে সবকিছুই আপাতদৃষ্টিতে অসংলগ্ন, অব্যবস্থিত ও বিকৃত আকারে বিরাজিত সেহেতু কবির চিত্রিত জগত ও হয়েছে অসংলগ্ন এবং বিক্ষোভ চিন্তার সমাবেশে আপাত দুর্বোধ ও অসংলগ্ন।

তুই আমার অদ্ভুত সঙ্গিনী, শুধু, নাক ঝাঁকানো মাথায়,
এমনকি রাখিসনা অথবা ক খ, দিসনা, রাখিস না,
রাখিস না ক'চিমটি লবণ হলে তা বিষ,
কখনো কোলের অজগরকে তুলে দিস তোর মুখ, কখনো
চোখের জলটা মুছ নবীন, বেড়ালটা আদর,
আর চাঁদটা চুরি করা যাবনা,
ভালো আছিস, তুই ভালো আছিস।[220]

'বিবৃতিহীন উৎসব'[221] তিনি অন্তর্জগতের সীমা অতিক্রম করে বহির্জগতের স্তরে উপস্থিত হয়েছেন। বাইরের জগতের নানা ছবি ও ঘটনায় বিশিষ্ট দর্শক হিসাবে এর উৎসবমুখরতার অন্তরালবর্তী ব্যক্তিকে চিত্রিত করার প্রয়াস লক্ষ করা যায় এখানে। কখনো-কখনো নিজেকেও তিনি দেখতে চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন ভঙ্গীতে।

বারান্দায় সারি সারি রঙীন টব। তাতে ফুল।
আমারো নিজস্ব যত অবশ্যই আছে।

---

২১৯। ঢাকা : সব্যসাচী প্রকাশনী, ১৯৬১। রচনাকাল ১৯৫৫–৬১

২২০। 'শূন্যতায়, শুধু শূন্যতায়', পৃঃ ৫৮

২২১। ঢাকা : বর্ণমিছিল, ১৯৯৯

Dhaka University Institutional Repository



যথাযথ সম্ভব আমি আজীবন বসে থাকি
চেয়ারে, চাঁদের কাছে — বলা ভালো
চাঁদের মতো চেয়ারে ।।[২২২]

সংসারের বৃত্তকে তিনি যে-প্রসঙ্গে অতিক্রম করেছেন — যে-প্রসঙ্গ তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত ও শিল্প — সেখানে অবশ্য বৃহৎ কিংবা বর্ণাঢ্য কিছু নেই । সমাজের আর দশজনের মতই সংসারের নানা প্রাপ্তি সীমাবদ্ধতা যন্ত্রণা উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা তাঁকে আলোড়িত করে ।

কিছুতে আসে না স্বস্তি; শোনা যায় তাকে বাঁধা পাখি,
কোনো কোনো রাতে যায় ঘুম ছিঁড়ে খুঁড়ে, জেগে উঠি
কন্যার গোলাপটাতে ভুলে যাই পানি দিতে তাজা কুয়ো থেকে ।
এ কথা নতুন নয়, মেয়েটার বাড়ছে বয়স
ছেলেটা বখাটে হতে আর দেরী নেই,
আমার সংসার চাই, আর ছাড়া তিনি না অপর ।[২২৩]

একারণে নিজেকে স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব বলে তাঁর মনে হয়না । সাধারণ দশজনের মতোই তাঁর জীবনযাত্রা চলছে, প্রৌঢ় বয়সে নকল দাঁত লাগিয়েছেন আর সন্ধ্যায় সিনেমা দেখে দিন কাটিয়েছেন ।

বরং মনে রেখো নকল দাঁতের পাটি
সন্ধ্যায় চলচ্চিত্র আর বয়স্ক শ্রেণী ।
আমি এসেছি, দেখেছি কিন্তু জয় করতে পারিনি ।
যে কোন কাব্যজ্ঞার আন্দোলনে
পথিক, সান্ত্বনা যদি থাকে তোমার,
আমার দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাবে ।।[২২৪]

---

২২২। 'আত্মপ্রতিকৃতি', পৃঃ ৫৮

২২৩। 'কিছু আসে একদিন', পৃঃ ৪১

২২৪। 'এপিটাফ', পৃঃ ৬০

Dhaka University Institutional Repository



দেশ পরিস্থিতির দখল করার মত। জীবনের ব্যর্থতাবোধসঞ্জাত মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস কবি ছড়িয়ে দিয়েছেন বাংলার আকাশে ও প্রকৃতিতে, তাই বাংলার সমাজকে পরিবর্তনের যে-কোনো সংঘবদ্ধ চেষ্টার মধ্যে কবির দীর্ঘশ্বাস অবশ্যই যুক্ত হবে। এ-ধরনের আন্দোলন এসেছিল উনসত্তরের জানুয়ারি-মার্চে। জীবনের তুচ্ছ প্রাত্যহিকতা ও সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে এক বৃহৎ উদার ও মহৎ জীবনের আহ্বান তখন প্রতিটি বাঙালীকে আলোড়িত করে তুলেছিল।

কিন্তু আসে একদিন, তরুণ বৃহৎ সূর্য, আকৃতির থেকে
ছিঁড়ে যায় দৃশ্যপট; কর্কশ ধূম্র ধূলিতে, মাটিতে,
নীল রং লাল হয়ে আসে;
রক্ত ফেটে পড়ে কণ্ঠস্বরে;
প্রান্তর-পাহাড়-নদী একাকার কার কণ্ঠে ভরে;
ধরিত্রীর উত্তাপে যেন পুড়ে যায় যা কিছু নশ্বর,
ক্ষুদ্র, তুচ্ছ সব প্রলোভন, ঘুম, মৃত্যু, দুশ্চিন্তা ও সংশয়;
ঘটে ইন্দ্রজাল – আমার হৃদয় থেকে
আশ্চর্য পাখির মতো কি যেন বেরোয়
শুধু অবিরল প্রবাহিত হয়,
শূন্য, উঁচু, নিঃস্ব, নিঃস্ব।[২২৫]

১৯৬৯ সালের যে বিপুল সম্ভাবনা লক্ষ্য করা গিয়েছিল তাতে সহসা যতি পড়ে যায়। এই ব্যর্থতা গভীরভাবে আহত করেছে কবিকে। বসন্তনদীকে নিয়ে অনুপম কাব্যরচনার যে-আকাঙ্ক্ষা তিনি করেছিলেন তা আর সম্ভব হল না।

ফিরে এলে আর তো গেল না লেখা একবর্ণ;
কাটাকুটি ভরে দিল পাতা,
যেন ছিঁড়ে পড়ে আছে বিবর্ণ ফুলের দল মাঠে মাঠে
আর আমি হেঁটে যাচ্ছি
দূরে কোনো পদ্মার সুর শুনতে পেয়ে সম্মোহনে,[২২৬]

২২৫। 'কিন্তু আসে একদিন', পৃঃ ৪১-৪২
২২৬। 'একটি গাথার সূচনা ও মৃত্যু', পৃঃ ৪৪

Dhaka University Institutional Repository



'বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা'[২২৭] রচিত হয় ১৩৭৬ সালের বৈশাখ মাসে। এটি একটি দীর্ঘ কবিতা, একজন নায়কের স্বগতোক্তির আকারে রচিত। এতে কবি ব্যক্তিগত জীবনের হতাশা উদভ্রান্তি নৈরাশ্য বিকার ও বিশেষতঃ সমকালীন জীবনের পটভূমিতে স্থাপন করে প্রকাশ করেছেন, ফলে এর মাধ্যমে সেকালের সমাজ ও সমাজমানসকে আবিষ্কার করা সহজ হয়ে পড়ে। বস্তুত নিজের চেতনা ও চরিত্রকে কবি যে-ভাবে অনাবৃত করেছেন তাতে যুগমানস ও ব্যক্তিমানসের অস্থিরতার চিত্র প্রকট হয়ে উঠেছে। ১৯৬৮ সালের দিকে পূর্ব বাংলার সমাজজীবনের ও সমাজমানসের অবক্ষয়ের একটি মূল্যবান দলিল হিসাবে এটি বিবেচিত হবে।

সে কালের বাংলাদেশের একটি অনুপুঙ্খ চিত্র :

ফিরে আসে বাংলায় বিদ্রোহ
বিস্মিত বছরে বছরে। যায় লোক
সস্ত্রীক শ্বশুর বাড়ী ঈদের ছুটিতে।
সিনেমায় ভীড় ভেঙে পড়ে। কারো কারো
বাড়ী গাড়ী হয়। আমেরিকা ইয়োরোপে
ছোটে ছাত্র, অধ্যাপক, ছাপা হয় ছবি,
দৈনিকের পৃষ্ঠে আজো ডুবে যায় কত
কাঁপানো বিক্ষোভ, খুন, দুঃখ, পরাজয়।
মানুষেরা বেঁচে থাকে, বংশে বংশে যায়
খাঁচায় বরাত দিয়ে সকলে লোবানে।
সুরাপাত্রে শয়তান ভাসে। বই লেখে
রমণীমোহন। অশিক্ষা, অবিদ্যা
সব।[২২৮]

---

২২৭। ঢাকা : সন্ধানী প্রকাশনী, ১৩৭৬

২২৮। পৃঃ ১৯-২০

Dhaka University Institutional Repository



এই নিরানন্দ একঘেয়ে জীবনে মহৎ চিন্তার অবকাশ থাকেনা। উদ্যমহীন ও নিরুপদ্রব জীবনে অনিবার্যভাবে তাই হতাশা ও উৎকেন্দ্রিক মনোভাবের জন্ম হয়, এবং এর অনুসৃতিতে স্থূলতা নৈতিকতা ও বোধবোধি সাধনার অন্যতম বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। এই পংক্তি আবর্তে পড়ে দেশের অনেক মহৎ সম্ভাবনাও নষ্ট হয়।

'কুড়ি আর চেয়োনাকো ভাই। দশটাকা
কম যায় বেশি, না হয় দশটা টাকা
বেশিই দিতেন। তবু সত্যি। এই দামে
কলমে তো অদূরবোধি কোথায় পেতেন?'
ব্রাহ্মণ নিপুণ নেতা, সেও এই ভাবে
যে আমার কবিতায় দেশপ্রেম খুঁজে
বিরক্ত হতাশ,[২২৯]

বাংলার সামগ্রিক হতাশা ও অবক্ষয়োন্মুখ অবস্থা সম্পর্কেও কবি দুয়েকটা মন্তব্য করেছেন।

গ্রামে যে থাকবে বলে ভদ্রাসন বিক্রী
করে নাই। মন্ত্রীরা বলেন দেখ গাছ
ঘুরে মরবার পথে, 'আমার সন্তান
যেন বাংলার গ্রামে থাকে দুধে-ভাতে'।
অন্তরা অশ্রু যাবে ফিরবে না সবে — [২৩০]

এই ধরনের বিকৃতিকর ও হতাশাপুঞ্জ পরিস্থিতি বদলে যায় বড়-বড় আন্দোলনে ও গণ-জাগরণে। দ্বিতীয় কাব্যে এর উদাহরণ আছে। এ-কাব্যেও সে-প্রসঙ্গ এসেছে। সে-সময়ে জীবনের নতুন অর্থ আবিষ্কৃত হয়, মহৎ সম্ভাবনা নিহিত হয়। জীবনের শত গ্লানি, সমাজের হাজারো অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও জীবনকে ও দেশকে গভীরভাবে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছা জাগে,

---

২২৯। পৃঃ ২১-২২

২৩০। পৃঃ ২৯

Dhaka University Institutional Repository



বার-বার বাংলার বুকে ফিরে আসার বাসনা উদিত হয়।

আবার উঠব জেগে বালুচরে চর
হবো তোমার পদ্মায়। শিমুল মহীর
স্রোতের প্রপাত দিয়ে টইটই যাবো আমি
স্মৃতির সাগরে। স্বপ্নে স্বপ্নে বারবার
কবি হয়ে ফিরে আসব আমি বাংলায়।[২৩১]

সাধারণ হিসাবে ১৯৫৮ থেকে ১৯৭০ – এই কবছরই সৈয়দ শামসুল হক কবিতা লিখেছেন। প্রথম গ্রন্থে তিনি বিষয়বস্তু করেছেন মধ্যবিত্তশ্রেণীর একজন মানুষের ব্যক্তিচেতনার গভীরতম অনাবৃত প্রদেশের চিত্র। এটি সফল কাব্য হিসাবে তেমন সমাদৃত হয়নি। এই জীবন থেকে বেরিয়ে আসার সংবাদ পাওয়া যায় দ্বিতীয় গ্রন্থে। আর স্বদেশবৃত্তিতে তাঁর অবলম্বন ছিল ব্যক্তিজীবনের পটভূমিতে নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনের একঘেয়েমি, সাধারণ অবক্ষয় ও অন্তঃসার শূন্যতা। বৃহৎ প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে উপস্থাপিত হওয়ায় এর আবেদনযোগ্যতা বেড়েছে। গতির অনিবার্যতা ও সাবলীলতা, প্রকাশের নাটকীয়তা, শব্দ ও ছবির প্রত্যক্ষতা এবং শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য। সব কিছু মিলে এটি একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

আলোচ্য দশকের রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমি যদি আমাদের স্মরণে থাকে, তাহলে দেখা যাবে 'একদা এক রাজ্যে'র ব্যক্তিক প্রণয় থেকে 'বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা'র স্বদেশীর জগতে কবির উত্তরণ সমাজ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও সমানুপাত হয়েছে।

---

২৩১। পৃঃ ৩৯

Dhaka University Institutional Repository



# মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান যশোর জেলায় ১৯৩৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. ডিগ্রি নিয়ে এখানেই শিক্ষকতা শুরু করেন এবং পি-এইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৬৯ সালে। কিছুকাল /১৯৫৭-৫৮/ তিনি ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক মিল্লাতের সাহিত্য সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন।

বিভিন্ন সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত আছেন। তিনি ঢাকার বাংলা একাডেমি, ইতিহাস সমিতি, ইতিহাস পরিষদ, বাংলাদেশের এশিয়াটিক সোসাইটি, লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি-র সদস্য এবং কেমব্রিজের ইন্টারন্যাশনাল একাডেমী অব পোয়েটস-এর প্রতিষ্ঠাতা ফেলো।[২০২]

ছাত্রজীবন থেকেই কবিতা রচনায় তাঁর ঝোঁক ও প্রতিভা প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে 'দুর্লভ দিন' /১৯৬১/, 'শঙ্কিত আলোক' /১৯৬৮/, 'বিপন্ন বিষাদ' /১৯৬৮/, 'প্রতনু প্রত্যাশা' /১৩৮০/, 'ইছামতী' /১৯৭৬, ছড়া ও কিশোর কবিতা/ নামক কবিতাগ্রন্থসমূহ'। তাছাড়া রয়েছে অনুবাদ কবিতাবলী 'এমিলি ডিকিনসনের কবিতা' /১৯৭৪/, 'বর্ণাঢ্য আলোক' /১৯৭৬/। তাঁর কাব্য সংগ্রহ প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালের নভেম্বর মাসে। কবিতা ব্যতীত সাহিত্যের অন্য কোনো-কোনো শাখায়ও তাঁর পারদর্শিতা নজরে পড়ে। তিনি একজন স্বনামপ্রতিষ্ঠ গীতিকার ও গবেষক। সম্পাদক, ছান্দসিক, সমালোচক ও গীতিনাট্য রচয়িতা হিসাবেও তাঁর খ্যাতি রয়েছে। সাহিত্য-পুরস্কার ও অন্যান্য সম্মান পেয়েছেন দুবার : ১৯৬১ সালে লণ্ডনের ইন্টারন্যাশনাল হু'জ হু ইন পোয়েট্রি থেকে কবিতায় বিশিষ্ট অবদানের জন্য 'সার্টিফিকেট অব মেরিট', এবং ১৯৭২ সালে কবিতার জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার।

---

২০২। 'পরিশিষ্ট ২', মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান কাব্য সংগ্রহ, /ঢাকা : রূপম প্রকাশনী, ১৯৭৬/, পৃঃ ৪২৬-৪২৯

Dhaka University Institutional Repository



কবিতা সম্পর্কে তাঁর ধারণার সূত্রগুলি নিম্নরূপ :

> সমকালীন কবিতা অতি নিকট আত্মচিন্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বর্তমানের কবি একাধারেই বুদ্ধিজীবী ও বিশ্বনাগরিক। তিনি কেবল আভিধানিক নন, তিনি হলেন শব্দের সুষ্ঠু ব্যবহারকারী। তিনি হবেন যুগসচেতন ও সভ্যতাসচেতন, যুগসচেতন হয়েই কবি যুগোত্তীর্ণ কবিতা রচনা করেন। তিনি আরো বলেন, সমকালীন কবিকে দেশ, কাল, ভাষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার নিকট সৎ হতে হবে। অন্যথায় তাঁর সৃষ্টি বেঁচে থাকবে না।[২০৩]

দুর্লভ দিন-এর কবিতাগুলি ১৯৫৫–৬০, শঙ্কিত আলোক-এর কবিতাগুলি ১৯৫৫–৬৪, (একটি ১৯৫৪-র ফেব্রুয়ারীতে) এবং বিপন্ন বিষাদ-এর কবিতাসমূহ ১৯৬৫–৬৮ সালের মধ্যে রচিত। প্রথম দুটিতে কবিতাগুলি কালানুক্রমে সংকলিত হয়নি। সেজন্য তিনটি কালকে পর-পর আলোচনা না-করে সামগ্রিকভাবে ধরাই অধিকতর সংগত হবে। 'প্রথম প্রত্যাশা' বাংলাদেশ আমলে প্রকাশিত হলেও কিছু-কিছু কবিতা (খুব অল্পের সংখ্যায়, সমস্ত উত্তম দীর্ঘ কবিতাগুচ্ছ) রচিত হয়েছে পাকিস্তান-কালে। সেগুলিও আলোচনায় আসবে।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান পরিশীলিত রোমান্টিক মনের অধিকারী। তাঁর 'ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবানুভূতি রোমান্টিক আবেগধর্মিতার সংস্পর্শে নবীন'।[২০৪] প্রেম তাঁর কবিতার অন্যতম প্রধান সুর, যদিও দেহজ কামনা বাসনা প্রকাশে তাঁর আগ্রহ অনেকের তুলনায় কম। এরই অনুশীলনে প্রকৃতি, সৌন্দর্য, মহত্ত্ব, দেশাত্মবোধ তাঁর কাব্যের এক বৃহৎ অংশ জুড়ে আছে। ফলে 'সভ্যতার অবৈধ বিক্ষোভ' নিয়ে কবিতা রচনা করলেও এর কার্যকারণ-সম্পর্ক কিংবা সম্ভাব্য পরিণতির মত জটিল প্রশ্ন নিয়ে আলোচনায় তিনি আমল পাননি।

---

২০৩। 'সমকালীন কবিতা সম্পর্কে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ, 'শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি', মাসিক মাহেনও, সেপ্টেম্বর ১৯৭০। পৃ: ৭০

২০৪। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, সমকালীন সাহিত্যের ধারা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৫

Dhaka University Institutional Repository



বরং প্রকৃতি ও প্রকৃতির প্রসন্ন প্রসাদে নিজেকে সমর্পণ করে চারপাশের বৈরী পরিবেশের প্রতি নির্বাক নীরব থেকেই তিনি নিবৃত্ত থেকেছেন ।

জেনে কি লাভ ? আমার অনবদ্য প্রত্যাশেতে
ঘর সবেনা, এই ডাল এই ঘাসের শয়ন পেতে
ছড়িয়ে আছি ।
হাস্যমুখে মধু এঁকে সদা
ধারাস্নানে কি সুখ বল সখী প্রিয়ম্বদা ?[২৩২]

আধুনিক জীবন ভাবনা ও সমাজচেতনা তাঁর কবিতায় এসেছে তিনভাবে ঃ এক, আধুনিক যুগমানসের যন্ত্রণা কথা তিনি বলেছেন, দুই, পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি ও সভ্যতায় বিদেশী সভ্যতার আগ্রাসনে কি-কি অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে তা-ও তাঁর কবিতায় উপজীব্য হয়েছে, তিন, আন্তর্জাতিক সমস্যা-সচেতনতাও তাঁর কোনো-কোনো কবিতায় নজরে পড়ে । প্রথম প্রসঙ্গটি সাম্প্রতিক কবিতার সর্বপ্রধান লক্ষণ । সমকালীন জীবনের নিষ্করুণ দিক সম্পর্কে তিনি লিখেছেন ঃ

হায়রে অবোধ শিশু ! স্নেহ নেই শীতোষ্ণ প্রভাতে
নরকের যাত্রী যৌবনে নেকড়েদের প্রহরীর মূল্য,
নিপুণ মৃত্তিকা কলি অকালের ভাগ্যে দ্যাখে স্বপ্ন,
হাওয়ায় দুর্দৈবে হাসে স্বর্ণলতা পূর্বপাখি খোঁজা ।[২৩৩]

প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ অবলুপ্ত এই নিষ্ঠুর পরিবেশ কবির কাছে গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হয়, যেখানে অসংখ্য আঁধি তাঁর স্নায়ুর উপর অবিশ্রান্ত আক্রমণ করে চলেছে এবং তিনি নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করে যাচ্ছেন সবার নিভৃতে ঃ

কী বিশাল যন্ত্রণায় দিন আর রাত্রি বারোমাস
একা আমি পার হই উদ্ধত সৈনিকের সাথে

---

২৩২। 'আত্মগোপন', শঙ্কিত আলোক, কাব্য সংগ্রহ, পৃঃ ৬১

২৩৩। 'ইচ্ছাশিশু', বিপন্ন বিষাদ, কাব্য সংগ্রহ, পৃঃ ১১৭

Dhaka University Institutional Repository



হৃদয়ে ক্রোধের মতো অগ্নিকণা জ্বালে অবিরত
বিন্দু বিন্দু অমোঘ গরল; আলো নেই, নেই;
এই চতুর্দিকে শুধু অন্ধকার স্নায়ুর দমন
উদ্যত, নিবৃত অভিশাপে, হৃদে বাজে সারাক্ষণ
কী ভীষণ; আমি একা, আমি একা দুরন্ত সময়ে ।[২৩৭]

অন্য একটি কবিতায় দেখা যায়, এই অদৃশ্য কারাগার থেকে মুক্তি পাবার কোনো আশা তিনি দেখছেন না । রূপকথার কাহিনীতে দৈত্যের কুহকে মৃত নগরীর যে-চিত্র পাওয়া যায় এবং যেখানে রাজপুত্র বা রাজকন্যা বন্দিনী, চারপাশের পরিবেশও কবির কাছে অনুরূপ মনে হচ্ছে ।

আমি আর মুক্তি নেই । এই গাঢ় অন্ধকার ঘিরে আছে
মৃত্যু চারিদিকে, সব স্তব্ধ মূক, নিদ্রার কবরে
সারি সারি শয্যা পাতা ।
রাত্রি জুড়ে শবাধারে বাতি ।[২৩৮]

অন্যত্র তিনি লিখেছেন, এই বিরূপ দিনে জীবনের আবেগ নিঃশেষিত এবং হৃদয়ও মৃত ।

যন্ত্রণা নিলুপ্ত মনে, বুদ্ধিরা এখন শবালয়ে
আয়ুহীন তিমির কবরে
দেহ ঢাকা, জীবনের গান নেই — বহু যুগ আগে
হৃদয়ের সূর্য নিভে মিশে গেছে ধুলোর গরাসে ।[২৩৯]

এই মনোভাব প্রকাশক আরো অনেক কবিতা তাঁর কাব্যে পাওয়া যায় । এথেকে দেখা যায় আধুনিক মানসের জটিল যন্ত্রণাকে তিনি তীক্ষ্ণভাবে চিহ্নিত ও বাঙ্ময় করতে সক্ষম হয়েছেন ।

দ্বিতীয় যুগের সামাজিক চেতনা প্রকাশ পেয়েছে পূর্ব বাংলার সংস্কৃতির উপর বিদেশী সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার আলেখ্য নির্মাণে । ১৯৬০–৭০ দশকে এদেশের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন

---

২৩৭। 'আমার আত্মীয়', দুর্লভ দিন, কাব্য সংগ্রহ, পৃঃ ৫৫

২৩৮। 'মৃত্যুপুর', দুর্লভ দিন, কাব্য সংগ্রহ, পৃঃ ৯

২৩৯। 'নিঃসঙ্গ', শঙ্কিত আলোক, কাব্য সংগ্রহ, পৃঃ ৬৭

Dhaka University Institutional Repository



শিল্পোন্নত দেশের, প্রধানত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ফলে সেদেশের জীবনাচরণে স্থূল ও বস্তুগত দিকটা বন্যার মত এদেশে প্রচলিত হয়ে দেশের যুবমানসকে মোহজালে আচ্ছন্ন করে ফেলে। পরিণতিতে সমাজে এক বিরাট বৈপরীত্যের সৃষ্টি হয়। পূর্ব বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ জন্মলাভ করেছে প্রধানত নিম্নবিত্ত কৃষক সমাজ থেকে কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার বিচিত্র প্রভাবে মনোবিকশিত এই সমাজ তার উৎসের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলে। শিক্ষিত তরুণরা যখন এলেসপি, বাখরখানি সেবন করে ঢাকা শহরকে নিউইয়র্ক ও প্যারিস ভেবে খোয়াব দেখতে থাকে, তখন তাদের পিতামাতা গ্রামের ডোবানালা ও পানাপুকুরের পাড়ে কচুঘেচু ও পান্তাভাত খেয়ে পৈতৃক প্রাণটি কোনোমতে রক্ষা করার আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়ে যায়। পূর্ব বাংলার সমাজের এই অসংগতি ও বিকৃতি, তরুণ সমাজের উদ্দেশ্যহীনতা ও উন্মার্গগামিতা, অন্তঃসারশূন্যতা ও কৃত্রিমতা 'নিমনু বিলাস'-এর কোনো-কোনো কবিতায় বিধৃত হয়েছে। এ-সম্পর্কে অন্য অধ্যায়ে কিছু আলোচনা হয়েছে এখানেও প্রসঙ্গক্রমে সামান্য আলোচনা হল।

কী যে যাদু আছে এলেসপিতে
হয়ত বা এই পূর্বাংশ বাঙালীদের
সেবনায় ঢাকার গলিপিচে
লাগে তাক্ নিউইয়র্কী দিনের,
মুঠোর মধ্যে হাপিয়ে আত্মাকে
দেখ কেমন ঢাকার গলিমুখে
মন চলে পাশ্চাত্য মনপ্রাণকে
চিনে নেবার পরম প্রিয় সুখে

মরে তখন মাকড়জাল বাঁটা
জোনাপোকা ছুঁচোর ছোটাছুটি
দুঃস্থ মাতা বৌয়ের পানের বাটা
পুত্র কন্যা চেনা দাদার ঘুটি।[240]

---

২৪০। 'সাম্প্রতিক' নিমনু বিলাস, কাব্য সপ্তক, পৃঃ ১১১

Dhaka University Institutional Repository



পূর্ব বাংলায় পুরাতন ঐতিহ্য, ধর্মান্ধ ও প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত এই তরুণেরা সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনে প্রবেশ করেও অনেক উৎপাত ও সমস্যাসৃষ্টি করেছে। তাদের কটাক্ষ করে তিনি হালকা ছাঁদে কয়েকটি কবিতা রচনা করেছেন।

ক. মাঝে মাঝে শুধু সংস্কৃতির তবলা
অর্থনা পরনে সোনার উত্তরীয়
মাল্য-মালো-চন্দন চর্চিত পিপাসায়
পূর্ব পুরুষ ঘনঘন মাথা নাড়ে।[২৪১]

খ. হায়রে নৌতিশিক্ষা
যাদের নব্য হবার হচ্ছে বাড়া চেটেই ঘোরা
নিজের ছায়া দেখছে নাচের ছোকরা কবির চোখে
সঙ্গ আমার বৃদ্ধ সাজে সেক পীরের বুক।[২৪২]

সে সময়ের আরো একটি দুর্লক্ষণ ছিল বিদেশী শক্তিদের দ্বারা সুদেশের শিক্ষাসাধনের চেষ্টা। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের নানা সমস্যা সমাধানের জন্য এদেশের তরুণেরা অনুরূপা খুঁজে বেড়াত কখনো প্রাচ্য, কখনো প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের চিন্তাচেতনার মধ্যে। কবি মনে করেছেন সমাজ থেকে উত্থিত না-হওয়ায় সে-ধরনের আন্দোলনের অপমৃত্যু তাই স্বাভাবিক।

পুঁজি খড়ে বিলেত শিখিং
অ্যাসিংটন কি মজা
চোখ ফেরাতেই রক্ত খাবা
পেয়ে গেছুন অক্কা।[২৪৩]

---

২৪১। 'প্রজাপতির প্রতিদ্বন্দ্বী', ঐ, ঐ, পৃঃ ১২৯

২৪২। 'রাণীপর্ব', শহিদ আলোর, কাব্য সংগ্রহ, পৃঃ ৯৮

২৪৩। 'ইন্দ্রপ্রস্থে', বিন্দু বিসর্গ', কাব্য সংগ্রহ, পৃঃ ১৩৫

'মাটির মানোষ'-এর শেষাংশে মুদ্রাক্ষর চিত্রের আকারে যে-কবিতাটি রচিত হয়েছে তার পঙ্‌ক্তিগুলি এই অদ্ভুত আকারবিন্যাসে। কবিতাটিতে কবির মনের এক বিরাট প্রশ্ন উচ্চারিত হয়েছে যে, এই উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনুশাসনশূন্যতার পরিণতি কোথায়, এই আত্মঘাতী প্রবণতার সমাধান কি ?

আমাদিগকে

কোথায়

যাই

আজে

নতুন

কত

দেখাই

পুরোনাবাদ

নতুন দিন

দু

খে

লা

ই

দু

র

গা

ছে

গীত

উপকণ্ঠ

সুরগীত

আগুন আগুন প্রজ্বালিত।[144]

১৪৪। 'নির্বাচিত কবিতাসংগ্রহ ২০০০', ঢাকাসংস্করণ, পৃ ৯৯

Dhaka University Institutional Repository



আন্তর্জাতিক সমস্যা-সম্পর্কে অবহিত হয়েও তিনি কিছু-কিছু কবিতা রচনা করেছেন। 'নিষণ্ণ বিষাদ' কাব্যের 'উৎপ্রান্তিক' কবিতাটির কথা এখানে বিবেচনা করা যেতে পারে। কবিতাটিতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশংকা পৃথিবীর চিন্তাশীল মানুষদের বিমর্ষ করে রেখেছে। যে-কোনো মুহূর্তে এই যুদ্ধ বাঁধতে পারে এবং তখন কয়েক মুহূর্তের মধ্যে হাজার-হাজার বছরের গড়া এই সভ্যতা লোপ পেয়ে যাবে। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বলেছেন, বিশ্বযুদ্ধের উপক্রমণিকা শুরু হয়ে গেছে। পৃথিবীর মহা-শক্তির রাষ্ট্রগুলি অন্যান্য দেশে যুদ্ধ বাঁধাতে চায় এবং অনুন্নত দেশে পুঁজি রপ্তানী করে যুদ্ধের পটভূমি নির্মাণ করে যাচ্ছে। যুদ্ধের পটভূমি দীর্ঘদিন ধরে তৈরী হলেও যুদ্ধ চলবে মাত্র ক্ষণিককাল, কারণ দু-একটা বোতাম টিপলেই মহামারণাস্ত্র বিদ্যুৎগতিতে আক্রান্ত দেশে গিয়ে তাকে ধূলি স্যাৎ করে দেবে। সে-যুদ্ধে কোনো রণ-দামামা বাজবেনা, আক্রান্তদেশের প্রস্তুতির বা উপলব্ধির অবকাশ থাকবেনা। সুতরাং আগামী বিশ্বযুদ্ধের আদি ও অন্ত আছে কিন্তু মধ্য নেই।

উপসংহার
বাজলো না কোন দামামা কাড়া
হাঁকলো না কোন তূর্য
কেবল দীপ্ত হুংকার দেবে
দিতে এল শিশু সূর্য
তখন বাঁধার যন্ত্রণা শুধু
কাংখার একা শিশুর
সীমা অসীমের বধু ভুল
যদি আদমের শিশু।[২৮৫]

কবির আন্তর্জাতিক মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে এই কাব্যের 'দৌহিত্রের চোখে', ও 'উদবাস্ত খোদা', এবং 'প্রত্যু প্রত্যাশা'য় 'নবতর্ক ১৯৭০' ও 'পায়ের তরুণ কবি' কবিতাগুলিতে।

---

২৮৫। 'উৎপ্রান্তিক', কাব্য সমগ্র, পৃ ৮৬

Dhaka University Institutional Repository



১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি–মার্চে রচিত হয়েছে 'প্রতনু প্রত্যাশা'–র 'সপ্তমী উদ্বেগ' শীর্ষক কবিতাগুচ্ছের কয়েকটি কবিতা। মার্চ মাসের ২৩, ২৪ ও ২৫ তারিখে লিখিত কবিতাত্রয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতির কথা, পাকিস্তানীদের প্রতিরোধের আহ্বান ও সংগ্রামে সাফল্যের সম্ভাবনা ভাষা পেয়েছে।

বাংলার বুকে উদ্যত বেয়োনেট
ঘরে ঘরে তাই প্রস্তুত প্রতিরোধ
চির দুর্বার সাতকোটি বেরিয়েছে
রক্তের ঋণ রক্তেই হবে শোধ।[২৪৬]

প্রথম কাব্য সংকলনে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান প্রধানত রোমান্টিক। এখানে মনের সুকুমার আবেগগুলি স্নিগ্ধ প্রকৃতির অনুষঙ্গে সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে উৎসারিত। যুদ্ধোদ্ভূত দীর্ঘশ্বাসের প্রসঙ্গও এ কাব্যে আছে কিন্তু সে–কবিতাগুলির শৈল্পিক উৎকর্ষ তেমন নয়। দ্বিতীয় সংকলনে রোমান্টিকতা প্রায়–অপসৃত হয়ে যুগভাবনা মুখ্য স্থান অধিকার করেছে। এখানে স্বৈরশাসনের যন্ত্রণা চিত্র যেমন রয়েছে, তেমন রয়েছে দেশীয় সংস্কৃতির উপর বিদ্বেষ, বিদেশাগত মার্কিনী, সংস্কৃতির আগ্রাসনের চিত্র। এগুলি বর্ণনায় তাঁর ভঙ্গি ব্যঙ্গাত্মক, কিন্তু বাক্যের

---

২৪৬। 'দর্শন ২ : চব্বিশে মার্চ ১৯৭১', কাব্য সংগ্রহ, পৃঃ ১৬৫

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চাতে কবির সংবেদনশীল মন সহজেই লক্ষণীয়। তৃতীয় কাব্যে যুগচেতনার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে আন্তর্জাতিকতাবোধ। তার দৃষ্টি এখানে তীক্ষ্ণ ও তীব্র। চতুর্থ কাব্যের প্রথমাংশে তিনি আন্তর্জাতিকতাবাদী, কিন্তু দ্বিতীয়াংশে স্বদেশের প্রকৃতিতে জাতীয়তাবাদী।

কবিতার আঙ্গিক নির্মাণে তিনি যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষত কবিতা-শরীরের ব্যাপারে তিনি বিশেষভাবে মাধুর্য এবং গাঢ়বদ্ধতা, শব্দ-ছন্দের সুষ্ঠু বিন্যাস ও অলংকারের প্রয়োজনীয় প্রয়োগ দিয়ে তাঁর কবিতাকে পূর্ব বাংলার কবিতার ঢিলেঢালা রূপের মধ্যে সুন্দর করে তুলেছে। শব্দ ব্যবহারে তাঁর ঝোঁক কোমল ও শীতল শব্দের দিকে। জীবনের যন্ত্রণাময় চিত্রগুলিকে প্রকাশের জন্য কুৎসিত ও কঠোর শব্দ ব্যবহারে তিনি কুণ্ঠিত। In his poetic endeavours he is cool, composed and fully aware of the intimacy and sanctity of poets' relationship to the Charm and enchantment of life, nature and the world that makes poet of a man.247

---

247. Mizanur Rahman Shelly, 'Focus on Poetry : Two poets', Bengali Academy Journal, Vol. I, No. 1, April 1970, p. 120

Dhaka University Institutional Repository



# আল মাহমুদ

কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমায় ১৯৩৬ সালে আল মাহমুদের জন্ম হয়। লেখাপড়া করেছিলেন স্থানীয় হাইস্কুলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত। ১৯৫৪ সালে কর্মজীবন শুরু করেন দৈনিক মিল্লাতে প্রুফ রীডার হিসাবে। পরবর্তী কালে সাপ্তাহিক 'কাফেলা', দৈনিক 'ইত্তেফাক', মাসিক 'সওগাত', সাপ্তাহিক 'পূর্ব বাংলা', দৈনিক 'গণকণ্ঠ' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রুফ রীডার, সহকারী সম্পাদক ও সম্পাদক হিসাবে প্রায় বিশবছর কাজ করেন। গণকণ্ঠের সম্পাদক হিসাবে ১৯৭৪ সালে কারাবরণ করেন। কারামুক্ত হয়ে ঢাকাস্থ শিল্পকলা একাডেমী তে সহকারী পরিচালক হিসাবে যোগ দেন। অদ্যাবধি সেখানেই কর্মরত আছেন। ১৯৫৫ সালে কিছুদিনের জন্য আগরতলায় মুকুল শীলের ছেলের 'হালেপুরে' প্রুফ রীডার হিসাবেও কাজ করেন।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা 'জেগরোয়া' নামের একটি গল্প। এটি কলকাতার 'সত্যযুগ' পত্রিকা তাঁর ছাত্রাবস্থায় প্রকাশিত হয়। এর পরে তিনি কিছু-কিছু গল্প রচনা করলেও মুখ্যত কবি হিসাবেই তিনি বিশেষ খ্যাতিমান হয়েছেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে লোক-লোকান্তর (১৯৬৪), কালের কলস (১৩৭৩), সোনালি কাবিন (      ), মায়াবী পর্দা দুলে উঠো (১৯৭৬) এবং গল্পগ্রন্থ হচ্ছে পানকৌড়ির রক্ত (১৯৭৫)। এগুলির জন্য তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৮), পশ্চিম বাংলার 'ভবন পাবলিশার্স প্রাইজ' (১৯৭২), 'জীবনানন্দ দাশ পুরস্কার' (১৯৭৩), বাংলাদেশ লেখক শিবিরের 'হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার' (১৯৭৪) এবং বাংলা সাহিত্য পরিষদের 'সুফী মোতাহার হোসেন সাহিত্য পুরস্কার' (১৯৭৬) লাভ করেছেন।[২৪৮]

আল মাহমুদ উচ্চশিক্ষা লাভ না-করলেও স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তির প্রভাবে দুর্বলতাকে পুরোপুরি আবৃত করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর রচনা থেকে পাণ্ডিত্যের গন্ধ ভুরভুর করে

---

২৪৮। জহীরুল কালাম, 'কবি আল মাহমুদ', স্মরণিকা, সুফী মোতাহার হোসেন সাহিত্য পুরস্কার ১৯৭৬, বাংলা সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ২১-২৩

Dhaka University Institutional Repository



বেরিয়ে আসেনা; সমগ্র বাংলাদেশের লোকজ ঐতিহ্য, গ্রামবাংলার পরিচিত বিষয়বস্তুর ব্যবহার তাঁর কবিতাকে একটি ঈর্ষণীয় স্বাতন্ত্র্য ও সহজবোধ্যতা দিয়েছে। ফলে আধুনিক যুগমানস ও আবহমান কালের বাংলার ঐতিহ্যকে মেলাতে পেরে তিনি একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পেরেছেন।

লোক লোকান্তর-এ[২৪৯] সংকলিত হয়েছে ১৯৫৫-৬৪ সালে রচিত কবিতাগুলি। আধুনিক যুগের যন্ত্রণাকে তিনি এখানে ভালভাবেই ধরতে পেরেছেন। সমকালীন শহুরে পরিবেশ তাঁর কাছে ধরা পড়েছে রুক্ষ ধূসর মরুভূমির উপমা, যেখানে সারাদিন ঘুরেও পিপাসার শান্তি পাওয়া যায়না।

ক. তবুও, এখানে কারো মুখে নেই, দেহ নেই, সব কিছুই
নিষ্কলা মাদুরে বিলীন। ১৯৬২টি উষ্ণ বার
শূন্য পিঠ বিবর্ণ মাদুরে
বৃষ্টির মৃত্যুর পর একে একে মানুষ নিয়েছে।[২৫০]

খ. ত্রিবিক্রমবিবর্ণ দেহে চোখ মেলে দাঁড়াবো যে যাব
কাকের মূর্ছা নিয়ে ফিরেছি তো এখানে ওখানে
খুঁজেছি রসের কণা খর খর ধুলোর ফুকানে
এখন বুঝেছি যাকে — এও এক নাগরিক সভ্যতা।[২৫১]

এই পরিবেশে সাহিত্য-সংস্কৃতির সাধনা, প্রেম-ভালবাসার পরিচর্যা কবির কাছে অর্থহীন মনে হয়। 'কবিতা তোমাকে এই বাংলায় দেখি যায়' বলে কবি আক্ষেপ করেছেন 'মনুষ্যের নগরীকরণ' কবিতায়, আর শিশুকন্যার লাশ নিয়ে কবরস্থানের দিকে রওয়ানা দিয়েছেন 'চার মণের প্রেম' কবিতায়। একদা তিনি জীবনকে ভেবেছিলেন সোনার গাছ বলে, যাতে

---

২৪৯। ঢাকা : কপোতাক্ষ, ১৩৭০। রচনাকাল ১৩৬১-১৩৭০
২৫০। 'নক্সী কাঁথা', পৃ ৫১
২৫১। 'কৃষ্ণর ওপারে', পৃ ১৪

Dhaka University Institutional Repository



হীনতায় ভুল ও মৃত্যুর জন্য এনেছে কিন্তু জীবনভর সাধনা করে বুঝলেন নিষ্ফলা মায়ামৃগের পেছনে বারিসিঞ্চন বৃথাই গেছে ।

তখন জেনেছি তোমার গান
একদিন দেখে হীরের ফুল
একা মরুর হাওয়ার দাঁত
দোলাতে এগোচ্ছে মুক্তো জল,
তার চেয়ে দেখি ফিরিয়ে মুখ
আমার বুকে জেনেছি জল ।[২২]

এখানি অভিজ্ঞতায় কবির অনুভূতির প্রকাশক থাকা সত্ত্বেও, রচনা সবই দুঃখের ও বিতৃষ্ণার প্রতীকে পরিণত হয় ।

বন্যার উচ্ছ্বসিত কর্দম টাকাদের মতো
মনে হয় আমার, ক্ষমা ।
নিষ্প্রাণ পাথরের মতো, প্রশ্ন ।
নিস্তব্ধ দোলকের মতো আমার, সময় ।
নির্জন রাস্তার মতো, শান্তি । আর
কী জিজ্ঞাসা প্রশ্নের মতো আমার অনুভূতি,
আমার প্রার্থনা ।[২৩]

হতাশা নৈরাশ্য বা অন্ধকারই সবকিছু নয় । গভীর অন্ধকারেও আশার আলোক জ্বলে ওঠে । তখন মনে হয় গভীর অন্ধকার কেটে গিয়ে নতুন প্রভাত প্রকাশিত হবে, প্রেম-আনন্দ ও কবিতা পুনর্বার দখল করে নেবে তাদের স্থান ।

লোক থেকে লোকান্তরে আমি যেন স্তব্ধ হয়ে শুনি
আহত কবির গান । কবিতার আসন্ন বিজয় ।[২৪]

---

২২। 'মায়াবৃক্ষ', পৃঃ ২৯
২৩। 'পিপাসার মুখ', পৃঃ ৪৩
২৪। 'লোক লোকান্তর', পৃঃ ৩৫

Dhaka University Institutional Repository



শেষ পর্যন্ত কবির উপলব্ধি হয়, নিজের মধ্যেই রয়েছে সকল রহস্যের চাবিকাঠি। শরণ নিতে হবে নিজের আত্মার গভীরে। সেখানে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে রহস্যের চাবি।

মানবের কথা আত্মাই সব
ঘুরে ফিরে কোনো গতি নেই,
একদিন ফিরে যেতে হয়
অবশেষে নিজের দিকেই।[২৫]

এখানে কবি উত্তরাধিকারী হয়েছেন লোকায়ত বাংলার সাধনার ঐতিহ্যের। বাউল সাধক সহজিয়া বৈষ্ণবরা যেমন বিশ্বাস করেছেন 'আত্মানং বিদ্ধি', নিজেকে জানো, তবেই বুঝা যাবে সমস্ত বিশ্ব প্রপঞ্চকে।

দ্বিতীয় কাব্য 'কালের কলস'-এ[২৬] মোটামুটিভাবে একই বক্তব্যের অনুসরণ চলেছে। সমকালীন জীবনের যন্ত্রণা, জটিলতা, প্রাণহীনতা এখানেও উপজীব্য বিষয়। 'জল দেখে ভয় লাগে', 'আমার সমস্ত গন্তব্যে', 'কালের কলস', 'অসুখে এখন', 'হে আমার নগরী', 'পদ্মের সর্বনাশ', 'চিতা' ও 'মৃত্যুর দিকে' প্রভৃতি কবিতার মূল বক্তব্য সমকালীন সময়ের শ্বাসরোধকারী পরিবেশ ও অনুভূতিপুঞ্জ কবিচিত্তে এর প্রতিক্রিয়া।

কৃপাহীন দীর্ঘশ্বাস আদিগন্ত শূন্যতা অবিরাম
করে যাচ্ছে চিরকাল, আয়ুষ্কাল গ্রাস করে যাচ্ছে
একটি অমোঘ মৃত্যু, যেন তার অবাধ্য আবেগ
ছুঁড়েছে মৃত্যুর দিকে এক মাত্র আমার শরীর।[২৭]

তবে এ-কাব্যে তিনি একটি বিরাট পটভূমিকে ধারণ করেছেন। প্রথম কাব্যে তিনি নিজের ব্যক্তিগত বিষয়েই প্রধানত নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন এবং নিজের ব্যক্তিসত্তার গভীরে ডুব দিতে চেয়েছিলেন। 'কালের কলস'-এর পটভূমি বৃহত্তর। বৃহৎ জনভূমি এখানে কবি মানসের

---

২৫। 'নিজের দিকে', পৃঃ ৪৭
২৬। সমীক্ষণ : কবিবর, পৌষ ১৩৭৮
২৭। 'মৃত্যুর দিকে', পৃঃ ১

Dhaka University Institutional Repository



পটভূমি । কিন্তু সেখানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেও কবি কোনো আনন্দময় পরিবেশ পাননি । সমকালকে তিনি দেখেছেন দুঃখে বেদনায় ও আশাহতায় ভর্তি ।

এ কেমন কঙ্কার স্বদেশ উদার মুক্তির
বৈশাখের মনমে যেন জ্বলে আর পাখিও বসে না
নদীগুলো দুঃখময়, নির্জলা মাটিতে রক্তের
কেবল ঘাসের ছাপ, অন্য কোন শ্যামলতা নেই ।[২৫৮]

কবিমানস এই অসহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি খুঁজেছে । তিনি মনে করেন, মানুষ ও প্রকৃতির অন্তরঙ্গ সম্পর্কের পল্লী সমাজে পুনরাবর্তন হলে সভ্যতার অসুখের হাত এড়ানো যাবে । কবির পূর্বপুরুষেরা সে-পল্লী সমাজে সুখ-শান্তি ও মুক্তি পেয়েছিলেন ।

ক. মানুষের বাসস্থান, মাটি মাচা, ধানাবুনি নিয়ে
আমরা থাকতে চাই,[২৫৯]

খ. ফিরে চলো গ্রাম আসে, যেন ফিরে যাওয়ার পিপাসা
মাথায় সবুজ স্মৃতি, মায়ের আঁচল ধরে টেনে
সোনার দুয়ের নদী, ওইতো হাটের বাঁও বাতো
দখিনা বাতাসে পাল তুলে যাচ্ছে সবুজ সোয়ারী,[২৬০]

এই ধারণাকে প্রসারিত করে তিনি পৌঁছেছেন চর্যাপদের কালে । সেকালের কৌম সমাজের আদিম জীবন ও বিশ্বাসের উত্তরাধিকারী তিনি ।

সুদেষ্ণাভূমি, তুমি, তোমার নাম
সুবেদিতার নামে চেনে না কি
কাটিয়ে দিয়ে শত শত যুগ
আমরা কতি পুত্র কানু পা ছ ।

২৫৮। 'মুক্তিপ্রভাত', পৃঃ ৪৩
২৫৯। 'পুনরাবর্তন', পৃঃ ২৭
২৬০। 'ফেরার পিপাসা', পৃঃ ৭

Dhaka University Institutional Repository



নগরী পা'র চোখের মত আমার
পল্লীর মাঝে রাখতে দাও না
আমার নাম, আমার পরিচয়
ছিন্ন করে দিয়েছে শহর ।২৬১

তৎকালীন সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল উদাস ও স্বাপ্নিক ভাবনালোক । যেহেতু অবলম্বন করে তারা দেহাতীতের সাধনা করেছে কিংবা দেহের মধ্যেই খোঁজ খুঁজেছে । কিন্তু আদর্শলোকের কাছে তখনো সেই সম্মিলিত জীবনবোধ পরাস্ত হয়নি । আজ মানুষের অনিশ্চিত সেই জীবন ।

যে আমি স্রষ্টার পুতুলের দিকে,
ভেবেছি কতো মায়া, নারী এসে এক
আলো, দাঁড়াও মা-শ্রী, এই সব দিকে
নির্জন আদর্শ দিয়ে নিজের বিবেক
ঘুচিয়ে কি লাভ বলো ;
... ... ...
আমার সৌন্দর্যে এসো । ...
সাহসে আমাতে স্পর্শে তোমার রূপ
শেষ করো । আমি আছি পরিতৃপ্তার ।২৬২

পরবর্তী কাব্য 'সোনালি কাবিন'-এ এই জীবনদৃষ্টি একটি নির্দিষ্ট পরিণতি লাভ করেছে । কবি নিজের ঐতিহ্য, বিশ্বাস, আদর্শ সূত্র ও সংস্কারকে উন্মোচিত করে তার মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন এক নবীন মানবকে — যার সূত্র প্রেমময় শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা করা । এই কাব্যটি সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে । সর্বশেষ কাব্য 'মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো' পাকিস্তান-উত্তর কালে রচিত এবং সেহেতু আমাদের বিবেচনার বাইরে ।

---

২৬১। 'পল্লীর ছেলে যায়', পৃঃ ১৭

২৬২। 'সাহসে আমাকে স্পর্শে', পৃঃ ২৯

Dhaka University Institutional Repository



প্রথমাবধি আল মাহমুদের কাব্যভাবনায় দুটি চিন্তাসূত্র লক্ষ করা যায় ঃ একদিকে আধুনিক জীবনের তুচ্ছতা, আবেগহীনতা ও জটিলতায় তিনি উত্তরাধিকারী, অপরদিকে ফেলে-আসা গ্রামজীবনের প্রশান্তি ও আনন্দের স্মৃতি তাঁর কাছে পরম আবেগের উৎস ।[২৬৩] এই দ্বিমুখী স্রোত তাঁর কবিতায় অব্যাহত থাকলেও শেষেরটিই ক্রমে-ক্রমে ব্যাপক ও গভীর হয়ে উঠেছে । সমকালীন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে জাতিগত আত্ম-আবিষ্কারের যে-প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল, সে-প্রভাবে বা তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, তিনিও ঐতিহ্যের আশ্রয় হয়েছেন এবং তাকে খুঁজে পেয়েছেন লোকায়ত জীবনের হাজার-হাজার বছরের ইতিহাসের ধারায় প্রবাহিত যথার্থ জীবনযাত্রার বলিষ্ঠ জীবনাবেগ, সমতটের জৈব চেতনা ও প্রাণপ্রাচুর্যের মধ্যে । তাদের কাল-এ এই অনুসন্ধানের শুরু এবং সোনালি কাবিন-এ তার পূর্ণতা ।

এই সময়ে কাব্যনির্মাণ কৌশলের ক্ষেত্রে তাঁর কোনো অগ্রগতি ঘটে না-ঘটলেও শব্দ-চিত্র-অলংকার ব্যবহারে তাঁর বিশিষ্টতা সবার সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ।[২৬৪] লোকজ জীবনাশ্রয়ী নানা শব্দ, চিত্র, প্রতীক ও অলংকার, লাউ, মাচা, খড়ের গাদা, মুড়কি, ধান, সাপ, নদী, জল, কাশ, উঠোন, ধানক্ষেত, পাখি, গতর, উদোম, ইত্যাদিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে তাঁর কবিভাষা । তাঁর ব্যবহৃত চিত্রাবলী ইন্দ্রিয়বেদী ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য । পঞ্চেন্দ্রিয়কে সজাগ রেখে তিনি ছবি সংগ্রহ করেছেন এবং তার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যে পৌঁছুতে চেষ্টা করেছেন । 'বাংলাদেশের আর কোন কবি সাম্প্রতিক পুঞ্জ-জীবনদৃষ্টি হয়েও আল মাহমুদের মতো এমন ঐশ্বর্যময় জলে অবগাহন করতে পারেননি' ।[২৬৫]

---

২৬৩। রণীশ আল কারুকী, 'শিকড়ের অজ্ঞাত যাত্রা', আল মাহমুদের কবিতার আলোচনা, মাসিক উত্তরাধিকার, মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৫, পৃঃ ১৪৩

২৬৪। সৈয়দ আলী আহসান, আধুনিক বাংলা কবিতা ঃ শব্দের অনুষঙ্গে, পৃঃ ১৯৯; রফিকুল ইসলাম, আধুনিক কবিতা, পৃঃ ৮৫

২৬৫। শিপ্রদাস বড়ুয়া, কবিতায় বাঙালিত্ব, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৫

Dhaka University Institutional Repository



## ফজল শাহাবুদ্দীন

ফজল শাহাবুদ্দীন ১৯৩৭ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পেশায় সাংবাদিক। তাঁর প্রকাশিত কবিতা-সংকলন হচ্ছে দুটি : 'তৃষ্ণার অগ্নিতে একা' /১৯৬৫/ এবং 'আকাংখিত অসুন্দর' /১৩৭৬/। তাছাড়া রয়েছে অনুবাদগ্রন্থ 'সংকেতময় নির্বাচিত কবিতা' /১৯৬৮/ এবং কাব্যগ্রন্থ 'দিকচিহ্নহীন' /১৯৬৮/। কবিতার জন্য ১৯৭৩ সালে তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেছেন।

'তৃষ্ণার অগ্নিতে একা'[২৬৬] কাব্যে ফজল শাহাবুদ্দীন প্রধানত সমাজের শহরে ও মফস্বলের চিত্রকে অবলোকন করেছেন। অনিশ্চয়তার চিত্র প্রকট হয়ে তাঁর চারদিকে অন্ধকারের পর্দা টেনে দিয়েছে। এই অন্ধকার তাঁর কাছে নেতিবাচক বলে সর্বদা মনে হয়নি। আলোকোজ্জ্বল পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বেও সর্বব্যাপী অন্ধকার বিরাজ করত। সুতরাং অন্ধকার কখনো-কখনো সৃষ্টির পূর্বাবস্থা বলেও বিবেচিত হতে পারে। কবি যখন রমণী দেহের সুস্বাদ অন্ধকার, রাত্রির অন্ধকার, প্রাণের অন্ধকার শব্দগুলি ব্যবহার করে তখন তার ইতিবাচক তাৎপর্যের দিকেই তিনি ইঙ্গিত করেন। তিনি তাঁর একটি কবিতায় বর্তমানের অবক্ষয়কারী পরিবেশের অবসান কামনায় আদিম অন্ধকারের বিকাশ চাচ্ছেন।

> কেননা এই বিশাল শতাব্দীর সূতীব্র আলোকে
> আমরা আজ নিরাশ্রু দিশেহারা
> এক নির্দয় আলোর আঘাতে আমরা আজ অন্ধ
> আমাদের প্রতি অণুপরমাণুতে এই অন্ধতার
> বৈদেহী চীৎকার
> এই যান্ত্রিক উজ্জ্বল নিবিড় শত অন্ধতার চাবুকে
> আমরা আজ ছিন্ন ভিন্ন
> আমরা শঙ্কিত বিজ্ঞানের নিষ্ঠুর নিঃসঙ্গতায়
> আমাদের চিত্ত আজ ঘৃণায় বিষণ্ণ ক্লান্ত উদ্ভাসিত
> আমাদের আকাঙ্ক্ষায় শুধু লোভের দহন প্রজ্জ্বলিত

---

২৬৬। ঢাকা : বাংলা ফ্রামার্স, ১৯৬৫

Dhaka University Institutional Repository



আমাদের অন্তরে বিকৃত কামের সমবেত চিৎকার
আমাদের অমূল্য ধনরত্নের প্রচুরতায় অস্থির
আমাদের ভালোবাসা রিরংসার উন্মাদনায় মাতাল
আমরা শঙ্কিত
নিজেদের জন্মের ইচ্ছার প্রেমের এবং পিপাসার
আলোকোজ্জ্বল কুৎসিত নগ্নতায়
সুগঠিত এক সভ্যতার অন্তরীণ গুহায়
আমরা আজ বিবস্ত্র

হে আমার অস্তিত্ব তাই আমাদের আজ অন্ধকার দাও
আলো অন্ধকার
অন্ধকারের প্রাচীন গুহার পুঞ্জ পুঞ্জ নগ্নতায়
বিলোপ করো আমাদের ।[২৬৭]

দৈনন্দিন জীবনে পথ–চলতে গেলে কোনো সুন্দর ও মন হরণকারী ছবি কবির চোখে পড়েনা । সমাজের বিকৃত গলিত চেহারাই বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয় তার চোখের সামনে । ভিক্ষারত কুষ্ঠরোগী, বেশ্যাপল্লী, মরা সাপ, মৃত ইঁদুর, আবর্জনাভরা ঠেলাগাড়ি ইত্যাদিই মনে হয় নিত্যদিনের ছবি ।

রাস্তায় চলতে গিয়ে কখনো বা দ্যাখে ফুটপাতে
সঙ্গে আছে ভিক্ষারত কুষ্ঠরোগী মাছির আড্ডায়
শিশুদের পুণ্যশ্লোক কণ্ঠে তার বেশ্যা পল্লী পাশে
ক্ষুধার্ত কুকুর যেথা আবর্জিত শরীরে শরীরে
কর্মের ধর্মের এই গ্রীষ্মকালে উত্তপ্ত প্রলাপে ।
দ্যাখে রিক্সা ঠেলাগাড়ি বিকল ট্রাক যন্ত্রের জঞ্জাল
রক্ত পিপাসিত,
মানুষেরা উর্ধ্বশ্বাস নিরন্তর
জীবন আমার, কেননা সুতায় তার মেধাপুঞ্জ,[২৬৮]

---

২৬৭। 'আলোকোজ্জ্বল কুৎসিত নগ্নতায়', পৃঃ ৬২–৬৩
২৬৮। 'দুপুরের কথা', পৃঃ ২২

Dhaka University Institutional Repository



'কৃষ্ণর অস্থিতে একা'র অন্যান্য কবিতায় একই সুর অনেকবার এসেছে। সেজন্য এই কাব্যের সমালোচনা করতে গিয়ে একজন মন্তব্য করেছিলেন — 'গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতায় যেন একই অনুভব নানা ভাবে বাঁধতে চাচ্ছে, যেন একটা কবিতাই বারবার লেখা হচ্ছে, নানাভাবে — একটা ছবিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখা — আবার দেখা — এবং আবার দেখা, যেন সবগুলো কবিতা মিলে একটাই কবিতা'।[269]

'আকাঙ্ক্ষিত অসুন্দর'[270] সংকলিত হয়েছে ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে রচিত কবিতাবলী। অধিকাংশ কবিতায় কবি অন্তর্মুখীন। চারপাশের জীবনে হর্ষ ও উল্লাসের কোনো উপকরণ না-পেয়ে তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন নিজের মধ্যে। যে-জীবনের ভয়ে তিনি পলাতক, তার কয়েকটি প্রত্যক্ষ ছবি পাওয়া যায় কয়েকটি কবিতায়।

এই সব মৃত মানুষের কোলাহল থেকে আমি
মুক্তি চাই — আমার চৌদিকে
পৃথিবীর উদার শরীরে
শকুনের পাখে, গুদোমে ধূসর ইঁদুরের উৎসবে
মুমূর্ষু কুৎসিৎ আকাঙ্ক্ষার গহ্বরে
মিথ্যার ঘৃণার আতঙ্কে আক্রোশে এবং হিংসার
যে কোলাহল ইন্দ্রিয় পরায়ণ মানুষের
নিথর শরীরে
শব্দের সংঘাতে ধনু, বিকৃতির দৈত্যের উচ্চকিত[271]

এর প্রভাব পড়েছে কবির উপর। চেতনার অপমৃত্যু, বিশ্বাসের অবক্ষয় ও যন্ত্রণার একাধিপত্য পরিবেশকে যান্ত্রিক করে তুলেছে। স্বভাবতই চারপাশের জীবনের আনন্দহীনতা আত্মিক বিকাশের অনুকূল নয়। পরিবেশের চাপে তার আত্মার মৃত্যু ঘটেছে — পৃথিবীর

---

২৬৯। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'কৃষ্ণর অস্থিতে একা', /পুস্তক সমালোচনা/, মাসিক বই, সেপ্টেম্বর ১৯৬৬, পৃঃ ৩৩৬

২৭০। ঢাকা : খান ব্রাদার্স, ১৩৭৬

২৭১। '[illegible]', পৃঃ ৭৭

কোনো ঘটনা, সংবাদ তাঁকে আর আন্দোলিত করতে পারেনা ।

কোনো কিছুই আর আমাকে এখন বিস্মিত করেনা
আমি এক মৃত শরীরের মতো পড়ে আছি
অবনুকালের তিন রাত্রি আশা আকাঙ্খা উত্থানতত্ত্ব
লোভ ছিলো কাম আর ভালোবাসায়
ছিন্নভিন্ন দরোজায় –
আমাকে কেউ আর স্পর্শ করেনা
আমার সকল বন্ধুদের মৃত্যু হয়েছে ।[২৭২]

১৯৬৮, ১৯৬৯-এর দিকে বাঙালী জাতীয়তাবাদের জাগরণ ঘটতে থাকে । বাংলা ভাষা, বাংলাদেশ প্রভৃতি শব্দ নতুন তাৎপর্য নিয়ে দেখা দেয় । [illegible] শাহাবুদ্দীনও [illegible] কবিতা লিখেছেন । একটি কবিতায় আমার পঙক্তিতে তিনি বাংলাদেশের প্রাণ-প্রবাহকে আবিষ্কার করেছেন ।

আমার বাংলার এই নদী মাঠ পাহাড় প্রান্তর
জানিনা কেমন করে মিশে আছে রক্ত কণিকায়
আমার পঙক্তিতে তুমি কল্লোলিত সকাল সন্ধ্যায়
পদ্মার বিশাল ব্যাপ্তি দুরন্ত সে সমুদ্রের গান[২৭৩]

অন্য একটি কবিতায় পূর্ব বাংলার সেকালের অবস্থা উপস্থিত করেছেন । লোকশ্রুতি অনুসারে একদা এদেশে সম্পদ ও সোনার অন্ত ছিলনা; অথচ বাংলাদেশ এখন রিক্ত হাহাকারে বিদীর্ণ । কবি প্রশ্ন করেছেন বর্ষে-বর্ষে মিছিলে-হরতালে কত প্রাণ আহুতি দিল কিন্তু কেন যে এদেশের রাত কাটেনা ।

মিছিলে মিছিলে দেখি কতো মুখ কতো যে হাত
অধির রুধির পথে কঠিন শহরে গ্রামে
বুকের রুধির দিয়েছে ঢেলে দেশের নামে
তবুও কেন যে বাংলা দেশের কাটেনা রাত ।[২৭৪]

---

২৭২। 'আমার মৃত্যু হয়েছে', পৃঃ ২০
২৭৩। 'আমার বাংলা', পৃঃ ৭০
২৭৪। 'বাংলা আমার, সপ্ন আমার', পৃঃ ২৯-৩০

Dhaka University Institutional Repository



'উনিশশো বাহাত্তরের একটি দিন', 'বাংলা ভাষা, মা আমার' কবিতাদ্বয়েও অনুরূপ মনোভঙ্গি বিদ্যমান।

১৯৭৩ সালে লিখিত একটি প্রবন্ধে ফজল শাহাবুদ্দীন লক্ষ করেছিলেন যে, 'ইদানিং আমার মনে হচ্ছে সব কিছুই এক অদ্ভুত অন্ধকারের দিকে ধাবিত'।[২৭৫] তাঁর কবিতা আলোচনা করে দেখা গেছে যে, ১৯৭৩ সালে নয়, অন্ততঃ আরো দশ বছর পূর্ব থেকেই তিনি এই অন্ধকারকে প্রত্যক্ষ করে আসছেন। শুধু তিনি কেন, সেসময়ে যারাই কবিতা লিখেছেন তাঁদের অনেকের রচনায় অদ্ভুত অন্ধকারের উপস্থিতি অনিবার্যভাবে লক্ষ করা যায়। তবে ফজল শাহাবুদ্দীনের মত কেউই এই বোধকে কবিতায় অত বেশি লালন করেননি; যদিও তাঁর সাফল্য অনেকের তুলনায় কম। তাঁর ব্যর্থতার পেছনে বাধা মুখ্যত তিনটি: প্রথমত, তিনি সংযমী নন। একজন সফল কবি জানেন কবিতায় কতটুকু বলতে হবে, আর কতটুকু পাঠকের জন্য রেখে দিতে হবে। ফজল শাহাবুদ্দীন তা মানেন না। তিনি অনর্গল বলে যান। দ্বিতীয়ত, একই প্রসঙ্গ ও একই শব্দ বারংবার প্রয়োগ করে তিনি কাব্যিক মাধুর্য নষ্ট করেন। 'আকাঙ্ক্ষিত অসুন্দর' কাব্যের ২৬ পংক্তির 'একাল সেকালে' কবিতাটিতে সেকালে শব্দটি ৬ বার ও অন্ধকার শব্দটি ১২ বার ব্যবহৃত হয়েছে একই ভঙ্গিমা নিয়ে। দ্বিতীয় বইটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এই প্রবণতাকে তাঁর 'ব্যাধি' বলে অভিহিত করেছেন এবং দুটি কাব্যেই যে তা দর্শনীয়, তারও উল্লেখ করেছেন।[২৭৬] তৃতীয়ত, একই বিষয়বস্তু নিয়ে কবিতা লিখেছেন তিনি, কিন্তু নিজের কাব্যিক স্বাতন্ত্র্য দেখাতে পারেননি এ-ব্যাপারে।

---

২৭৫। 'সুন্দর সংলাপ', দৈনিক বাংলা, জুন ৮, ১৯৭৩, পৃঃ ৫

২৭৬। জাহিদ হায়দার, 'আকাঙ্ক্ষিত অসুন্দর', /পুস্তক সমালোচনা/, মাসিক উত্তরাধিকার, কার্তিক ১৩৮০, পৃঃ ৮৮

Dhaka University Institutional Repository



তবে বলা যায়, কবিদৃষ্টি কেবল শাহাবুদ্দীনের আছে। আবেগের নিকট তিনি সৎ। এবং দেখা গেছে যেখানেই তিনি ভাবালুতা, আতিশয্য ও শব্দের কৌতূহলিক প্রলোভন থেকে বিরত থাকতে পেরেছেন সেখানেই তিনি সাফল্য অর্জন করেছেন। দ্বিতীয় বইটিতেই 'পারলো না', 'ভালো আমার সত্য আমার', 'পুরানো দিনের গল্প', 'কুটিলতের ঝাঁকা', 'অকস্মাৎ কোনো ছোট স্টেশনে' প্রভৃতির মতো উজ্জ্বল কবিতা তিনি উপহার দিতে পেরেছেন পাঠকসমাজকে।

Dhaka University Institutional Repository



## শহীদ কাদরী

১৯৪২ সালের ১৪ই আগস্ট কলকাতায় শহীদ কাদরীর জন্ম হয়। তাঁর পিতামহের বাড়ি ছিল পাবনায় সিরাজগঞ্জে। ১৯৫৮ সালে সিনিয়র কেমব্রিজ পাশ করার পর শহীদ কাদরী আর লেখাপড়া করেননি। চাকুরী করেছেন পাকিস্তান টেলিভিশন কর্পোরেশনে, ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত। তারপর সাত বছর /১৯৬৮–১৯৭৫/ সংবাদসংস্থা এ.পি.এন–এ কাজ করে বেকার হয়ে যান। এখনো বেকারত্ব ঘুচেনি।[২৭৭]

পাকিস্তান আমলে, 'উত্তরাধিকার' /১৯৬৯/ নামক তাঁর একটি মাত্র কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭৪ সালের মার্চে প্রকাশিত হয় 'তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা'। তাঁর একটি অনুবাদ নাটক /অমৃতের সন্তান, ইউজীন ও'নীলের নাটক/ ও উপন্যাস রয়েছে। কবিতায় বিশিষ্ট অবদানের জন্য ১৯৭৩ সালে তাঁকে 'বাংলা একাডেমী পুরস্কারে' সম্মানিত করা হয়।

নির্লিপ্তি ও নিঃসঙ্গতা কাদরীর জীবনের ও সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি কোনো–দিনও কোনো সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। তিনি আবাল্য নগরজীবনের অধিবাসী এবং সেজন্য স্বতোৎসারিত নগরচেতনা তাঁর কবিতায় খুব স্বাভাবিকতায় প্রকাশিত। এতদ্ব্যতীত আন্তর্জাতিক স্বীকারোক্তি, বোহেমিয়ানা, প্রকৃতিবিমুখতা, নগরপ্রিয়তা প্রভৃতি তাঁর কবিতায় খুব সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। এই সব কিছু 'উত্তরাধিকার'–এ বিধৃত হয়ে তাঁর কবি ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। একটি মাত্র কবিতার বই-ই তাঁকে পরিচিত করেছে 'শহুরে ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ রূপকার' হিসেবে।[২৭৮]

---

২৭৭। সাপ্তাহিক সাক্ষাৎকার। বৈশাখ ২০, ১৩৮৫

২৭৮। আধুনিক কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯১

Dhaka University Institutional Repository



শহর-জীবনকে অনুপুঙ্খভাবে জানেন ও তাকে চিত্রের বিধিলিপি শিল্পায়নে ধারেন শহীদ কাদরী। তিনি হয়েছেন শহুরেসাধক ও শহর-সভ্যতার উত্তরাধিকারী। এই উত্তরাধিকার মহৎ মূল্যবোধের নয়; এমনকি তা বর্জনের অনুকূল পরিবেশও সমগ্রীসহ তাঁকে দিতে পারেনি। বরং তিনি পেয়েছেন স্বপ্ন ও চেতনা হননকারী পীড়াদায়ক পরিবেশ।

> বয়েস ইঁদুরে গেছি আজরবায়ণ থেকে তখন
> সোনালি পিচ্ছিল পেট আমাকে উল্টে দিলো যেন
> দীপহীন ল্যাম্পপোস্টের নীচে, সন্ত্রস্ত শহরে
> নিমজ্জিত সব কিছু মূক চক্ষু সেই ব্ল্যাক-আউট আঁধারে।
> ... ... ...
> সঙ্গীতে, আর্তনাদে, হঠাৎ হত্যায় স্বচ্ছ কৈশোর কাল
> যেখানে মায়াময় — আমার প্রথম পাঠ কি করে যে ভুলি
> গোলাপ-বাগান জুড়ে সবুজ বাতাসে পড়েছিলো একটি লাশ সে
> কখানা ছেঁড়া দুটি মানুষের ক্যামেরো মেতেছিলো মনে।[১৭৯]

জীবনের বয়স ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে কাব্য পরিচয়ই দৃঢ়তর হয়েছে। শয়তানের উপস্থিতি তিনি লক্ষ করেছেন সর্বত্র — স্বৈরবিকার অনুচরের পশ্চাতে, সমাজনেতাদের দেশের সমৃদ্ধির সংবাদ পরিবেশনে, বন্ধুদের স্তুতিতে, এমনকি সাধু-সন্তের জীবনাচরণে।

> সূর্য সূর্যাস্ত থেকে ভোর সন্ধ্যাকার সূর্যাস্ত
> পর্যন্ত হেঁটেছি। আর ক্ষীণ ধৈর্যভরে হেঁটে
> সেই পথ, পিচ্ছিল অন্ধকারে সভয়ে দেখেছি
> শয়তানের সুন্দর মুখ ...
> আততায়ী লুকায়ে রয়েছে স্বৈরবিকার অনুচরে
> বন্ধুদের মূল্যবোধে, আমাদের উদার মনকে
>
> দুর্গতির অবেলায় আর দুর্ভিক্ষের হঠাৎ
> শিহরণে, অজস্র সমৃদ্ধির সকল খবরে[১৮০]

১৭৯। 'উত্তরাধিকার', উত্তরাধিকার, /সৌম্যব ঃ নতুন/, পৃঃ ১২

১৮০। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা', পৃঃ ২১

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের সর্বত্র চোরাবালির উপস্থিতির অনুভব তাঁকে সন্দেহাচ্ছন্ন ও অবিশ্বাসী করে দিয়েছে। বিরূপ কবি হয়েছেন নিরাশ্রয় ও নিঃসঙ্গ। তাই, কোনো আনুগত্য ঘরে তাঁর ডাক পড়েনা। ধীরে-ধীরে শহরের স্মৃতি মরে যায় স্তব্ধ হয়, রেস্তোরাঁর বাতি নিভে আসে সুন্দর বিদায় জানায়। কবির সম্মুখে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ে থাকে নির্জন দীর্ঘ জ্যোৎস্নাহত অলিগলি-রাজপথ। সে সময় তাঁকে 'অলৌকিক আনন্দের' আহ্বানে ডেকে নেয় 'আলোকিত গণিকালয়ের' সম্ভ্রান্তা।

যখন স্তব্ধ হয় সব রাস্তা, রেস্তোরাঁ, সুন্দরের আর
শিখর রাশিরে ওঠে একমাত্র কেবল – তোমাদেরই উজ্জ্বল অনুরাগ
অদ্ভুত আহ্বান যেন অস্তির অলৌকিক আভাস
... ... ...
কাকাল সে সকল স্বর্গলোকের আদি নক্ষত্রের রাজা
কানাকড়ির মূল্যে যা দিলে ঈশ্বরের ত্রিকূলে তা নেই
অচির মুহূর্তের ঘরে তোমরাই তো উজ্জ্বল ধরণী
ভ্রাম্যমাণদের ফিরিয়ে দিলে অন্তরের আঘ্রাণ
তোমাদের বুকে সে সকল দ্যুলোক যেন ম্লান ![২১]

কবির ছিন্নমূল ও অসহায় অবস্থার কথা আরো অনেক কবিতায় পাওয়া যায়, তবে 'তৃপ্তি, তৃপ্তি' নামক কবিতাতে তা অনন্য রূপ লাভ করেছে। শহরের দুঃখ ও লক্ষ্মীছাড়া রূপ, কবির নৈঃসঙ্গ আত্মমগ্নতা এ-কবিতার প্রধান বিষয়।

রাস্তায়, রাস্তায় শুধু যায় রাতে, রাজপথে-পথে
বাউণ্ডুলে আর লক্ষ্মীছাড়াদের, উন্মুখ, উদ্বাস্তু
বালকের, আশ্রয়হীন ভিক্ষুকের, চোর আর অর্থ – উন্মাদের
তৃপ্তিতে রাস্তায় যায়। ...

---

২১। 'আলোকিত গণিকালয়', পৃঃ ৬

Dhaka University Institutional Repository



এই জন্যে ধাঁধায় শহরে পুড়ে, সর্পায়, নিদ্রাতে
মধুপারে হেঁটো পাৎদুনে একাকী ...
কোন শহরের দিকে ...
জলের খাজনাতে পাখি একা ভেসে যাবো ;[৯২]

শামীম আজাদ একটি কবিতা সংকলন প্রকাশ করেই খ্যাতিলাভ করেছেন। বিভিন্ন কবিতায় তাঁর আবেগের আন্তরিকতা সহজ ও স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু শুধু আবেগের আন্তরিকতাই ভাল কবিতার জন্ম দেয় না। কবিতার গঠনকৌশলেরও ভূমিকা সেখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরাধিকার-এর বিভিন্ন কবিতায় তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। প্রথমত, শব্দ ব্যবহারে তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। তাঁর ব্যবহৃত শব্দাবলী আবেগকে ভাষা দিতে পেরেছে, আভিধানিক তাৎপর্যকে অতিক্রম করে নতুন তাৎপর্যে সমন্বিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ঘটনা ও দৃশ্যকে তিনি চিত্রকল্পময় করে তুলতে পেরেছেন। তৃতীয়ত, তাঁর কবিতায় নাটকীয়তা ও গতিশীলতা দুই-ই বর্তমান। তিনি দৃষ্টিমুখর শহর, জনতার কোলাহল, মূল্যবোধের বিপর্যস্ত ধারা সবাই জানে না, কেননা সে-দৃষ্টি দ্রুতগতিতে এগিয়ে যায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে। এই কবিতা খঞ্জীলায় শোক থেকে শোকার্তিতে, শান্ত থেকে মৃত্যু সঞ্চরণ করে। একাধারে আবেগ ও আঙ্গিক মিলে তাঁর কবিতায় সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়েছে — একটি সফল কবিতার যা অনিবার্য উপাদান।

---

৯২। 'বৃষ্টি, বৃষ্টি', পৃঃ ২-৩

Dhaka University Institutional Repository



## ব্যঙ্গ কবিতা

পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিকাশের প্রক্রিয়ায় উদারনীতির ইতিবাচক গুণগুলি যেমন আত্মস্থ করেছে অনেক বিকৃতিও তেমনভাবে তার চিন্তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। এগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে দুর্নীতি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শুধু নয়, রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বিকৃতি বিস্তৃত হয়ে সুস্থ সমাজ গঠনের পক্ষে প্রবল প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করেছে। এদিকটাকে আক্রমণ ও ব্যঙ্গ করে অনেক কবিতা রচিত হয়েছে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কবিতাগুলি নিয়ে নীচে আলোচনা করা হল।

### ১ সাত নরীর হার

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর 'সাত নরীর হার'[২৬৩] ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয়। এটি ছোট-ছোট কবিতার সমষ্টি। কোনো-কোনো কবিতায় ব্যঙ্গের স্পর্শ আছে। 'সবিনয় নিবেদন' এ-ধরনের একটি কবিতা। গ্রাম সমাজের পটভূমিতে জমিদার ও গরীব চাষীর জীবনের ভিত্তিতে এটি রচিত। রহমান মণ্ডল জমিদার হুজুরের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে কারণ জমিদারী কায়দায় তিনি তার ভিটে-জমি নিয়েছেন, এমন কি তার বউয়ের উপর বেকসুর নিয়েছেন। কিন্তু বউ এই অনুগ্রহকে বুঝলনা, সে গলায় ফাঁস লাগাল। মণ্ডল হুজুরে সবিনয় বিনীত নিবেদন করছে বউয়ের লাশের দাফন-কাফনের সাহায্য করতে। ধর্ম ও জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে মণ্ডলের অসহায় ক্ষোভ ও জ্বালা এখানে তীর্যক ব্যঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে।

বড়লোক — ছোটলোক খোদারি এ মরজি
হুজুর গরিবপার সাইতো অর্জি।
ভিটে-জমি জরানা জমিদারি কায়দা
ভাগ্যিস বৌটাও মুবারকের পয়দা,

---

২৬৩। ঢাকা : নিউজিয়া প্রকাশনী, অক্টোবর ১৯৫৫

Dhaka University Institutional Repository



মধ্যম হ'লো বেক-ঝাড়ের গড়ন
আমি করি লোক্‌লাবা, বেশী চলাতে মন ।
শোভাযুক্তি — হক্কাণী নটকাদলা বাঁধেতে
শেলমভাষার — দাম নাই দিন পাচ্ছেতে ।
হুজুর, এ বান্দীদের সবিনয় নিবেদন
ইতি, মদনেন, রহমান মণ্ডল ।[২৪]

আখ্যানের অনুভূতিতে ও কল্পনায় পাওয়া যায় কুঁচবরণ কন্যাদের কাহিনী । তাদের মেঘের মত কালোচুল ভূমিস্পর্শী, কর্ণে দোলে হীরার দুল, গলে শোভমান হয় মুক্তার মালা । এই কল্পনাগুলি রচিত হয়েছিল সমাজের সমৃদ্ধির ও প্রাচুর্যের যুগে কিন্তু বর্তমানে সমাজ যখন শ্রীহীন, মানুষগুলি নিরন্ন, নির্বস্ত্র, নিঃস্ব ও হাড্ডিসার, তখন সে-কল্পনার কী মর্মান্তিক পরিবর্তন হবে, একটি কবিতায় তার উত্তর পাওয়া যায় ।

এক

কুঁচ বরণ কন্যা তোমার
মেঘবরণ চুল
চুলগুলো সব কবেই গেল
খুঁজছো কোথা দুল !

দুই

একটা ছেঁড়া গামছা ছিল
তাই সে দিলে ফাঁস
মরেও মেয়ে লাজ ঠেকালে
ঢাকলো কী সে লাস ।।

তিন

তোমায় দেব ভেবেছিলাম
সাত নরীর হার,
গলায় দড়ি তার চেয়ে কি
সব অলংকার ;[২৫]

---

২৪। 'সবিনয় নিবেদন', পৃঃ ২৪   ২৫। 'কুঁচবরণ কন্যা', পৃঃ ৮-৯

Dhaka University Institutional Repository



## ২ আজাজিল-নামা

আজিজুল হাকিমের 'আজাজিল-নামা'[৯৬] প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। আজিজুল হাকিম রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হয়ে তিনি দীর্ঘদিন রাজনীতি থেকে দূরে থাকেন।[৯৭] ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতা লাভ করার পরবর্তী পর্যায়ে রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন দুর্নীতির ফলে যে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল সে-পটভূমিতে আজাজিল-নামার কবিতাগুলি রচিত। যুক্তফ্রন্টের নেতা হিসাবে স্বভাবতই শেরে বাংলা ফজলুল হকের উপরই আক্রমণ হয়েছে বেশির ভাগ। অধিকাংশ কবিতা রচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নজরুল ইসলামের সুপরিচিত কবিতাগুলির অনুকরণে। নাম কবিতায় এই সংকলন করতে গিয়ে কবি একটি 'কৈফিয়ৎ' দিয়েছেন। তা নানা কারণে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে —

> আজাজিল-নামার কোন সাহিত্যিক মূল্য হবে কিনা জানিনা। আমি জানি মজলুম জনগণের দুঃখদুর্গতির মূলে যারা—শুধু সেই বুর্জোয়াদের। এই দেশের সাধারণ মানুষ আজ আর কাঁদে না। ক্ষুধা নিপীড়ন-জর্জরিত জীবন নিয়ে বজ্রমুষ্টিকে পিছনে ঠেলে দাঁড়ায়ে তারা আজ সব কিছুকেই কেবল লক্ষ্য করে। একটা বিরাট জাতির এই সর্বব্যাপী অধঃপতন শুধু রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলতা, লুণ্ঠন এবং ভীরুতা ও হতাশা নিয়ে ভরা, আর তারই এক জ্বালা-করুণ স্বাক্ষর এই আজাজিল-নামা।

প্রথম কবিতা 'একালে' রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা' কাব্যের 'সেকাল' কবিতার প্যারডি। কবি বলছেন, তিনি ন্যাড়া মাথায় আসনে হলে আলীর সাহায্যে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভায় স্থান পেতেন এবং পারমিট, লাইসেন্স যোগাড় করে, ফুর্তি আমোদ করে, বাংলা

---

৯৬। ঢাকা : ইস্টার্ণ বুক সেন্টার, আষাঢ় ১৩৬৩

৯৭। 'কৈফিয়ৎ'/ভূমিকা/

Dhaka University Institutional Repository



একাডেমীর প্রতিষ্ঠা ও সাহিত্যসম্মেলনের আতিথ্য তারা অনায়াসে বিসদৃশতাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন।

আমি যদি জন্ম নিতাম ব্যাপারী মামার ঘরে
তেমন হতাম ভাগিনা তার ভক্তি আমীর সনে,
একটি চালে বর্ণ তরে বুড়ো মামার স্কন্ধ ধরে
যেতাম নিয়ে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী সভার মাঝ,
থাকত নাড়ী লবণাক্তে মোর, মোটর সকাল সাঁঝ।
চিন্তা দিতাম জলাঞ্জলি থাকত না ক ভুল
চাইলে চিনি সিমেন্ট লক্ষের পারমিট যেত খোলা।
ফিটা মাসে ব্ল্যাক করে আসত টাকা উড়ে উড়ে
বাড়ির পিছে, মেঝের নীচে দিতাম গর্ত খাড়ি
টাকা এবং প্লটটিতে পড়ত কাড়াকাড়ি।
   . . .          . . .          . . .
গড়তাম আমি একাডেমী বাংলা ভাষার তরে'
তাতে মজা সব কবিরে নিতাম আপন করে।
সাহিত্যের সম্মেলনে ডাক দিতাম যে কবিগণে
পাঠা মহিষের কাটলেট খেয়ে কত সবাই লেখা
দৈনিকেতে সের হত মোর তাদের দেওয়া লেখা।[২৮]

ফজলুল হক মন্ত্রীসভার একজন সদস্য ছিলেন তাঁর মামু। তিনি ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলনের একজন অতিথিও ছিলেন। কবিতাটিতে তাঁর প্রতি ইঙ্গিত থাকতে পারে। মামা-ভাগিনার কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে আরো একটি কবিতা— রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতার অনুকরণে।

ব্ল্যাক করে মাল লয়ে কে আসে পারে ;
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।

---

২৮। পৃঃ ৫

Dhaka University Institutional Repository



বীর দিয়ে যায় যায়     কোন দিকে নাহি চায়
সাথী-পুঁথি সব যায়,     হায় রে দুরাশায়;
আমার আশিষা আছি চিনিয়া তারে ![৯৯]

যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ বিজয়ে পূর্ব বাংলায় অধিকার অর্জনের যে-সুযোগ হয়েছিল, মুসলিম লীগ নেতাদের ষড়যন্ত্র ও যুক্তফ্রন্টের নেতাদের অদূরদর্শিতা, ক্ষমতার লোভ ও দলাদলির ফলে তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। এই মনোবৃত্তি অভিব্যক্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'দুরন্ত আশা' কবিতার একটি প্যারডি রূপে —

হোটেলে উঠে সাধু হয়ে মস্ত ক্যাটির
কোণে কোণে কথা শুধি সঙ্গে নেতাজীর।
পূর্ব বাংলার হাল অবস্থা শুধি ক্ষুটা সত্যা সত্যা
লাগি তরি স্রোতে করি মন এবং বাণীর।
পূর্ব বঙ্গের নেতা মোরা গর্বে ভরা বুক
তীব্র অপমানে হাসি, তৃপ্তির নাই তীর।
...     ...     ...
গোপন মনে ইচ্ছা জাগে নিকট উল্লাসে
সকল ছুটে যাইতে ছুটে গদীর ও-পাশে।
'পাওয়ার সাথে থাকতে প্রাণ সদাই করে আনচান
পেয়েও তারে হারিয়ে ফেলি কিসের উচ্ছ্বাসে।[১০০]

ফজলুল হক চৌধুরীর মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী থাকার সময়ে পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়। এটি প্রণয়নের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে তিনি প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছিলেন। শাসনতন্ত্রে পূর্ব বাংলার অনেক ন্যায্য দাবি স্বীকৃত হয়। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্তে স্বীকৃতিতা, জাতীয় পরিষদে প্রতিনিধিত্বের

৯৯। 'যা দিবার দিয়ে চল মরিয়া পড়ি', পৃঃ ২৪
১০০। 'দুরন্ত নেতা', পৃঃ ৮

Dhaka University Institutional Repository



ব্যাপারে পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে পরিত্যাগ করা, প্রভৃতি এর উদাহরণ । দেশের শাসনের এই ভূমিকা আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে কয়েকটি কবিতায় ।

ক.        হায় কি হলো দেশের দশা পশ্চিমার জোরে
পূর্ব পশ্চিম সমান হলো – ভাবতে মুণ্ডু ঘুরে ।
আসল কথা বুঝল কোথা, কেউ বা দেখা খোঁজে
কথার লড়াই, কথার বড়াই, হাওয়ার সঙ্গে যোঝে ।[২৯১]

খ.        হোক বা না হোক বাংলা ভাষা রাষ্ট্র ভাষা আর
মন্ত্রী আমি থাকলেই ঠিক – এ মোর অহংকার ।
এমনি নেচেছে মুণ্ড মিছা
মরলো যারা না বুঝিয়া
তাদের মুণ্ডু মুণ্ডুই ঠিক – আমার শ্রীঅঙ্গে
গদি কেবল চির সত্য থাক অভাবে ।

সবাই যখন একুশেতে করছে কসুর
আমি দূর করাচীতে করছি গদীর সুর ।
দূরে আরব সাগর তীরে
পঞ্চনদের আদুরে নীড়ে
আপনাতে থাকবে তাদের বাংলা রাষ্ট্র ভাষা,
দেখবে তুমি লহর পড়ে শূন্য তাদের আশা ।[২৯২]

যুক্তফ্রন্টের নেতা, মন্ত্রী এবং তোষামোদকারীদের লক্ষ্য করে মজলুমের কবিতায় অনুরূপ দুটি প্যারোডি রচিত হয়েছে ।

ক.        আমরা শান্তি, আমরা দল
আমরা তোষামোদকারী দল ।

---

২৯১। 'হায় কি হলো', পৃঃ ৬

২৯২। 'এ মোর অহংকার', পৃঃ ১১

Dhaka University Institutional Repository



মোদের পায়ের জোর বুটেই জনতা
উর্ধে দেশের মন্ত্রীদল
আমরা চোরাকারবারী দল ।[২৯৩]

খ. চল চল চল
উর্ধ্বে সেনদ্বীপ অবিচল
নিম্নে জনতা পায়ের তল
অগ্র মুরব্বির নেতৃদল
চলরে চলরে চল
চল চল চল ।[২৯৪]

তারুণ

দেশবিভাগের পর ঢাকাকেন্দ্রিক যে-নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠে, তাদের জীবনের নানা অসংগতিকে অবলম্বন করে বিভিন্ন কবি অনেক কবিতা রচনা করেছিলেন । সেগুলিতে নতুন সমাজের প্রতিষ্ঠাকামী শিক্ষা, উচ্চশিক্ষিতা তরুণী, শহরবাসী, আমলা, প্রভৃতির স্থূল জীবনচর্চা, সুস্থ মূল্যবোধহীনতা উপজীব্য হয়েছে । এ-ধরনের 'হাস্য কৌতুক ও হাসির কবিতার সংকলন' তারুণ[২৯৫] । তিরিশজন কবির কবিতার এই সংকলনটি সম্পাদনা করেছেন আ.ক.ম. সিরাজ উদ-দৌলা ।

---

২৯৩। 'চোরাকারবারীর গান', পৃঃ ৯
২৯৪। 'চল চল চল', পৃঃ ১৬
২৯৫। ঢাকা : তারুণ প্রকাশনী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫

Dhaka University Institutional Repository



একটি কবিতায় কন্যার জন্মোৎসবে আগত অতিথিদের কাছে পিতা অনুরোধ করছেন মেয়ে যেন বড় হয়ে যথার্থ হতে পারে সে-দোয়া করার জন্য । তাহলে মেয়ের গুণে বাপের গৌরব বাড়বে সমাজে, মনোহরচিত্তহারী হয়ে সে নিজের জীবনের ষোলকলা পূর্ণ করে পরিণামে এক ধনাঢ্য যুবকের পত্নী হয়ে পিতারও দুর্দশা-মোচন করতে পারবে ।

অতঃপর সে তার পত্নী হোক অথবা না হোক
সে ভাবনা আমার নয় ।
অন্তত একটি বার সে যেন এখন থেকে
তার ঘরে যেতে পারে ...
প্রেমের গুটিকোষে বদ্ধ মূর্খ সেই যুবকের
বিকারে সামান্য কিছু ভরসা রেখে,
অথবা কাঁদিয়ে
বধূ বধূ খেলায় খেয়ালে ।[১১৬]

নিয়ামত হোসেনের 'নারীর উক্তি' কবিতায়ও এ-ধরনের এক যথার্থ নায়িকার কথা আছে — যে দিনের নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট জনের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে । এই খেলা সে চালাবে যতদিন না

যদি কোনো দিন থেমে যায় খেলা, এভাবে না চলে আর
কাউকেই যদি ধরা দিতে হয়, হতে হয় পরিণীতা
বলবো তাকেই, 'এসো না দু জনে গড়ে তুলি সংসার
তুমিই আমার পুরুষ পুঙ্গব, আমি তো তোমার সীতা' ।[১১৭]

আ.ক.ম. সিরাজ-উদ্ দৌলা চৌধুরীর 'মধুমিতা সেন'ও এ-ধরনের নায়িকা । অনিবার্যভাবে এ-বিকৃতি তরুণদের মধ্যেও বিস্তৃতি লাভ করেছে । আলতাফ হোসেনের 'এলা তুমি এসো' কবিতায় একজন যুবকের কথা আছে যে নীতি-নীতি-নেহাবা-নবীনা-

---

১১৬। আক্কাস হাকীম, 'সবিনয় নিবেদন', পৃঃ ৫

১১৭। পৃঃ ৪২

Dhaka University Institutional Repository



শাম্পা-বিনু প্রভৃতির সঙ্গে প্রেমের পালা সাঙ্গ করে এলা-র কাছে এসে বলছে :

ওদের সান্নিধ্য ভালো – পারিনি যে ! – তোমাকে চেয়েছি,
এতো ভোরে তাইতো এসেছি ।
এলা, তুমি এসো কাল সকালেই, কথা আছে ।[২৯৮]

বন্ধুর, সভ্যতা প্রভৃতি মহৎ আদর্শ লোপ পেয়ে গিয়েছিল অর্থ-লোলুপদের কাছে । একটি কবিতায় বললেন হাসি কান্নাতে পরিণত হয়েছে, স্বামী খুন হওয়ায় মেয়ে এবং সে ঘোষণা করেছে বিয়ের পূর্বে এ-সংবাদ তার কর্ণগোচর হলে এ-বিয়েতে সে কিছুতেই মত দিত না ।

ওগো ও অন্যমনা ! শুনেছি না 'সত্যি কিনা –
তুমি নাকি দেওয়া কিছুই নাইবা নিবা ?
জানতাম যদি স্বভাব তোমার এমন ভোলা মন
বাঁচা মেয়ের তাড়িয়ে দিতাম এ বিয়ের লগ্ন ।[২৯৯]

দিলওয়ার হোসেনের 'প্রেম' কবিতাটিও এখানে আলোচনাযোগ্য । একদিন রাজপথে এক মাঝবয়েসী পুরুষ স্যারের কেরানী এক তরুণীকে প্রেম নিবেদন করল । রুষ্টা তরুণী যখন শুনলো, পুরুষটি যথেষ্ট বিত্তশালী তখন তার ক্রোধ সম্মতিতে পরিণত হল ।

'আচ্ছা আপনার পেশা কি ?'
'আমি সদাগরী, মাসিক আয়
তিনহাজার তিনশ আশি' –
মেয়েটি বললো, 'তাহলে আমিও
তোমাকে ভালোবাসি ।[৩০০]

---

২৯৮। পৃঃ ২৯
২৯৯। মমতাজ উদ্দীন আহমদ, 'তরঙ্গ', পৃঃ ৭১
৩০০। পৃঃ ৫১

Dhaka University Institutional Repository



ধন-গৌরবের ইতরতা আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়েছে আহসো কয়েকটি কবিতায়। শিক্ষার্থীর কুকুরের জন্য যে-খাদ্য বরাদ্দ হয়, তাদের সাহেব কুকুরছানার জন্মদিনে যে-মহোৎসব হয়, শিক্ষাহীন জীবনে তা অকল্পিত। ফলে কুকুর হয়ে জন্মানোটাই অনেকের কাছে কাম্য বলে মনে হয়।

সাহেব পাড়ার কুকুর
খাচ্ছে চুকুর চুকুর
দুধের ছানা খীরের পায়েস
সকাল বিকাল দুপুর।
তাই না সে দীন
মনে করে এক সেদিন,
'কুকুর কেন হলাম না হায়
পয়দা হলাম যেদিন।'[৩০১]

সাহিত্য-শিল্পীদের দুরবস্থার কথাও ব্যঙ্গচ্ছলে বর্ণিত হয়েছে। এক লেখক সারাজীবন গল্প-নাটক-সমালোচনা প্রচুর লিখেছেন, যার ওজন হলে পুরো দেড়মন। লেখা পড়ে মহল্লা বাহবা দিয়েছে, খ্যাতিমান সম্পাদক লেখা প্রার্থনা করে অজস্র চিঠি দিয়েছে, বিভিন্ন অনেক পাঠিকা লেখায় রোমান্টিকতার আবেগ অনুভব করতে পেরেছে, অথচ এদিকে কবির ঘর অন্নহীনা।

সাহিত্যে খুব সেবি! একবার ভিতরে চেয়ে দেখ —
ছিন্ন শাড়ী গৃহলক্ষ্মী মেয়ে আসে সম্মার্জনী হাতে:
খোকার ঔষধ নাই — কয়লা নাই — চুলাতে না চুলো।
দুই মাস ভাড়া বাকী! বাড়ীওয়ালা আসবে শুনতেই!
তাড়াতাড়ি খিড়কী খুলে ভাঙা হাঁড়ি নিয়ে এই বেলা
যদি ভালো চাস ওরে পচা পুকুরেতে দিয়ে ডোব!
সেখানে নর্দমা জলে আছে ঘুমিয়ে অজস্র
মশকের ঐক্যসূত্রে কুটীর কাব্যের গজল!![৩০২]

---

৩০১। গোলাম সামদানী কোরায়শী, 'লেজী', পৃঃ ৩৭
৩০২। আশরাফ সিদ্দিকী, 'বিষের পুতি', পৃঃ ২৬

Dhaka University Institutional Repository



এই সংকলন-গ্রন্থে রাজনীতি-বিষয়ক সরস কবিতা লিখেছেন মতুর্জা মুন্সি। একেবারে যে নেই এমন নয়—এবং না-থাকাটাই অস্বাভাবিক। শামসুর রাহমানের ' দেশদ্রোহ ' কবিতাটির কথা পূর্বেই উল্লেখ করতে হয়। আইউব খানের শাসনামলে স্বাধীন চিন্তাকে উৎসাহিত করা হতনা, বরং সরকারী আদেশ ও নির্দেশকে সর্বদা মাথা নত করার জোর হুকুম দেওয়া হত। মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন শিল্পী সাহিত্যিকগণ এই অবস্থাকে মেনে নিতে না-পেরে চুপ করে গিয়েছিলেন এবং সে সুযোগে সুযোগসন্ধানী স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীরা আসর দখল করে নিয়েছিল। এ-শ্রেণীর সাহিত্যিকরা সরকারী নীতি তোষামোদের সাহিত্যচর্চা করত। ফলত, সারা দেশে দরবারী শিল্পীদের রাজত্ব কায়েম হয়েছিল। এই পরিবেশকে ব্যঙ্গ করেছেন কবি।

দেশরে দেশ তুই আজব দেশ,
মনে চিন্তার নেইকো শেষ।
ভাবে সবে বুঝিস ভাবে
লাভে সবে লাভে।
হাতে ভাতে পৌঁছে যাবি
সোজা মোক্ষ লাভে।
... ... ...
যাদের কথায় জগৎ আলো
বোকা থাকবে তারা
মুখে ফুলঝুড়ি ছোটে তাদের
আকাট মূর্খ যারা।[৩০৩]

আলাউদ্দিন আল আজাদের ' ইকড়ি মিকড়ি ' নামক একটি কবিতা সংকলনে রয়েছে। দেশের প্রজাদের দুঃখে বিগলিত হয়ে জাঁদরেল সাহেব একদিন খাদ্যের গুদাম তাদের জন্য খুলে দিলেন; কিন্তু তার আগে যোগসাজসে মজুতদার দুদিনেই সমস্ত মাল সরিয়ে নিল।

---

৩০৩। পৃঃ ১৯—২০

Dhaka University Institutional Repository



সাধারণ লোকেরা কিছু পেলনা । কবি ধন্যবাদ দিচ্ছেন উজির সাহেবকে, কেননা খালি হাঁড়ি নিয়ে লোকেই আরাম এবং উজির সাহেব সেই আরামের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ।

লোকের হাতের হাঁড়ি খালি
খালি হাঁড়িতেই পায় আরাম ঃ
আরাম দিলেন উজির সাহেব
বেঁচে থাকুক তাঁহার নাম ।।[৩০৪]

## ৪ কখনো রং কখনো সুর

১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয় আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর 'কখনো রং কখনো সুর' ।[৩০৫] ছড়াকারে অনেকগুলি কবিতা এখানে রয়েছে । কোনো-কোনোটিতে আকাঙ্ক্ষা-ইঙ্গিতে-রূপকে-কটাক্ষে সমাজের লাঞ্ছনা, যন্ত্রণার কথা আছে । লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিতরা সরাসরি তাদের দুঃখের কথা বলতে পারে না । তারা ইঙ্গিতে তা বুঝায়, এবং মনের ক্ষোভ ছড়ার আকারে প্রকাশ করে । সেধরনের কয়েকটি কবিতা এখানে দিচ্ছি ।

আধুনিক যুগের ব্যাখ্যা সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশা ভিত্তিক হতে পারে । আমাদের গ্রামসমাজে এখনো অনেক মজুর এবং মুটে রয়েছে, যারা দরিদ্রের পাকা ধান কেটে ঘরে ও পিঠিতে চলে । সমাজে এদের আধিপত্য অস্বীকার মতোই অজ্ঞ ও অশিক্ষিত কিছু মানুষ সত্য ।

ঝিঙে গো ঝিঙে বললো কি যে
হঠাৎ দেখি দুপুর রাতে
জুলফিকার খানের হাতে
জোছনা করে পূর্ণিমাতে ।

---

৩০৪। পৃঃ ৩২

৩০৫। ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository



তাই না শুনে, ঝুমকো দিতে
রসিক ঘুঘু পায় দোলাতে
চাঁদের আলোয় দোলন দোলাতে
চলো এসে আমার ভিটে ;

ভিটেয় ঘুঘু ডিম পেড়েছে
ধান খেয়েছে ঝুনঝুনিতে ।[৩০৬]

এদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা কালবোশেখী, তুফান ও বন্যা । এদের প্রকোপে সাধারণ মানুষের জীবন অনেক বিপর্যস্ত হয় । আসলে ধনী মানুষদের তেমন ক্ষতি হয় না । ঝড়-তুফান-বন্যায় গেরস্থের ঘর ভাসে, ফসল নষ্ট হয় ও মানুষ হারিয়ে যায় । পুরাকালের নদীর মতই এদের সর্বনাশের মত ; তাই,এদেশের মা তাঁর শিশুকে ঘুম পাড়াতে নদীর সাথে ঝড় বন্যার কথা বলেন ।

নদীরা তো আর থামে না
ঘুমের ঘুমের উপায় কি ;
বন্যা এসে ধান ডুবালো
তবু তো ঘর ছাড়োয় নি ।

ভাঙা আলো তুফান এলো
নইলে পড়ে ঝুমঝুমি
ধান না পেয়ে চালচুলোতে
হাত বাড়াতো নিশচুই ;

এমনি সকল শিশুটি
পাড়ুলাতে ঘুম পাড়াতে
খুকু মায়ের আপনটি ।[৩০৭]

---

৩০৬। ৬ নং কবিতা, রূপনগর, পৃষ্ঠা সংখ্যা নেই

৩০৭। ৭ নং কবিতা, মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়, পৃষ্ঠা সংখ্যা নেই

Dhaka University Institutional Repository



# অষ্টম অধ্যায়

# বাঙালী জাতীয়তাবাদমূলক কবিতা

Dhaka University Institutional Repository



আলোচ্য সময়ের বাংলা কবিতার এক উল্লেখযোগ্য অংশ পূর্ববাংলার মুসলমান ঐতিহ্য, লোকজ সংস্কৃতি, শহীদ দিবস, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক ও ব্যক্তিত্ব এবং পূর্ব বাংলার স্বাধিকার প্রভৃতিকে অবলম্বন করে রচিত। এসব বিষয়সমূহকে ভিত্তি করে কেউ সম্পূর্ণ কাব্য রচনা করেননি, কিন্তু প্রায় সবাই কোনো-না-কোনো প্রসঙ্গে ও সময়ে এবিষয়ে কবিতা লিখেছেন। ১৯৪৭ সালের পর থেকেই পাকিস্তান সরকার পূর্ব বাংলার জনগণের স্বাতন্ত্র্যকামী সকল প্রয়াসকে রুদ্ধ করে দেবার অপপ্রয়াসে সুপরিকল্পিতভাবে লিপ্ত হয় — সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে সংখ্যাসাম্যে পরিণত করা, বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা থেকে বিচ্যুত করা, বাঙালী জাতিসত্তাকে হেয় বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা, সে-চেষ্টারই এক-একটি নিদর্শন। বাইরের এই আঘাতে এ-এলাকার জনগণের স্বাতন্ত্র্যকামী চেতনা সংস্কৃতিকে ঘিরে ক্রমশঃ সংহত ও অন্তর্মুখী হয়ে পরিশেষে প্রবল জাতীয়তাবাদী শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করে।

> পাকিস্তানের মোহভঙ্গে পূর্ব বাংলার মানুষও তার নূতনতর লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে ১৯৪৭ সালের পরবর্তী কাল থেকেই স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজনীয় স্বাতন্ত্র্যবোধকে নিজের আচার-আচরণ, বিশ্বাসে ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছে। আর তাই যে-গান পশ্চিম বাংলায় যে মর্যাদা লাভ করেনি, সেই 'সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' পূর্ববাংলার মানুষের স্বপ্নের, সাধের এবং চোখে অশ্রু-উদ্রেককারী সংগ্রামী সঙ্গীতে পরিণত হয়েছে। মোহভঙ্গের মিছিলে নয়, রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্তের কাছে সংগ্রামী চ্যালেঞ্জ হিসাবে উপস্থিত হয় আর সে চ্যালেঞ্জকে সে প্রতিক্রিয়ার পাকিস্তানী শাসকচক্রের রোষচক্ষুর সামনে ক্রমাধিক বিপদ ও সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করতে থাকে।[1]

ক্রমউদ্ভিদ্যমান এই চেতনা স্পর্শ করেছে সমাজজীবনের প্রতিটি স্তরকে। সংস্কৃতি-চর্চায়ও এর প্রভাব স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। বাংলা সাহিত্যের সাধারণ ঐতিহ্যকে পূর্ব বাংলার

---

১। সরদার ফজলুল করিম, বাঙালী সংস্কৃতি চিন্তা, মনসুর মুসা সম্পাদিত বাংলাদেশ, /বাংলা বিভাগ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৪/, পৃঃ ২২৯-৩০

Dhaka University Institutional Repository



সাহিত্যিক-ঐতিহ্য বলে স্বীকার করে নেওয়া, বাঙালীর আত্ম-আবিষ্কারের চেষ্টায় লোক-ঐতিহ্য, আঞ্চলিক শব্দ, উপভাষা নিয়ে গবেষণা, রবীন্দ্রসঙ্গীতের অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা, বাংলা চলচ্চিত্রের ক্রমিক প্রসার, যাত্রাগানের শহুরে জীবনে অনুপ্রবেশ এবং লোক শিল্পের নবমর্যাদা প্রভৃতি এর উদাহরণ। সংস্কৃতি চর্চার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসাবে বাংলা সাহিত্যে, বিশেষত বাংলা কবিতায়, স্বভাবতই এই বোধের উত্তরোত্তর প্রকাশ আমরা লক্ষ করে থাকি। সাতচল্লিশ থেকে সত্তরের দিকে সময় যতই এগিয়েছে, এ-ধরনের কবিতা গুণে ও গণনায় ততই বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু গ্রন্থাকারে সবগুলি প্রকাশিত না-হওয়ায় পূর্ণাঙ্গ আলোচনার বিস্তর অসুবিধা রয়েছে। আমাদের এ-আলোচনাকে বিস্তৃত আলোচনার রূপরেখা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। মোটামুটি পাঁচটি প্রধান শাখায় এই কবিতাগুলিকে আমরা পর্যালোচনা করেছি : ১. একুশে ফেব্রুয়ারী বিষয়ক কবিতা, ২. বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত কবিতা ৩. পূর্ব বাংলা বিষয়ক কবিতা ৪. পাকিস্তান-বিরোধী সাম কবিতা এবং ৫. পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সম্পর্কিত কবিতা।

## ১ একুশে ফেব্রুয়ারী বিষয়ক কবিতা

বাহান্নোর একুশে ফেব্রুয়ারী আন্দোলনের তাৎপর্য সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলা সহজ নয়, প্রয়োজনও পড়েনা। এক কথায় বলা যায়, এই আন্দোলনের মধ্যে পরবর্তী কালের সকল আন্দোলনের বীজ প্রচ্ছন্নাকারে নিহিত ছিল এবং কালে-কালে তা বর্ধিত ও পুষ্ট হয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে অনিবার্য করে তোলে। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দাবির মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে অনেকগুলি ধারণা পাওয়া যায় — প্রথমত, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় স্বীকৃতি দিতে হবে — এতে ছিল রাষ্ট্রের সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রয়োগের বাসনা, দ্বিতীয়ত, কোনো জাতির মাতৃভাষাকে বাদ দেয়া যাবেনা — এই ধারণায় পাওয়া যায় জাতি সমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বা স্বায়ত্তশাসনের দাবি,

Dhaka University Institutional Repository



তৃতীয়ত, ইসলামী সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী ভাষা বলে পাকিস্তানী শাসকবর্গ কর্তৃক প্রচারিত উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে অস্বীকার করার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল রাষ্ট্রিক চিন্তাভাবনা থেকে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে পরিহার করার সূচনা অর্থাৎ সামন্তবাদী চিন্তা-ভাবনার মূল অতিক্রম করার প্রয়াস। এভাবে বিশ্লেষণে দেখা যায়, একুশে ফেব্রুয়ারী আন্দো-লনে মূর্ত ছিল গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষাসমূহ। ফলত, এই আন্দোলনের সফলতার মাধ্যমে ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তানের রাজনৈতিক দর্শনের অর্থহীনতা নিঃশেষভাবে প্রকাশিত হয়ে নতুন রাষ্ট্রের সম্ভাবনা জাগ্রত হয়। কিন্তু পাকিস্তানের রাজনীতি কখনো সুস্থ ও স্বাভাবিক-খাতে প্রবাহিত হয়নি এবং সেই অস্থিরতা ও অন্ধকারের দিনগুলিতে ক্রমবর্ধমান সাড়ম্বরে ও উচ্চকণ্ঠে শহীদ দিবস পালনের মাধ্যমে প্রগতিশীল বাঙালী বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, শ্রমিক, রাজনীতিবিদ তথা জনসাধারণ নিজেদের ক্ষোভ, উত্তেজনা ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছে। শেষ পর্যন্ত দিনটি এক বিশেষ প্রতীকী তাৎপর্য লাভ করে। কারো কাছে একুশের তাৎপর্য ছিল সব বাঙালী জাতীয়তাবাদের সংগ্রামে, কারো কাছে পাকিস্তানের 'প্রতিক্রিয়াশীল শাসক-গোষ্ঠীর গণতন্ত্রবিরোধী, জাতিসমূহের স্বায়ত্তশাসন বিরোধী নীতিসমূহের বিরুদ্ধেই জাতীয় রাজনৈতিক সংগ্রামে'[2], আবার অনেকে মনে করেছেন —

> সব রকমের সাম্প্রদায়িকতা ও উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বাহান্নোর একুশে আমাদের শিখিয়েছে প্রকৃত দেশপ্রেম — যে দেশপ্রেমের অর্থ হোল এদেশের শোষিত ও নিপীড়িত জনতার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা আর সব শ্রেণীর স্বদেশী ও বিদেশী শোষকের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ঘৃণা আর ক্রোধ।[3]

ফলত, বিভিন্ন গোষ্ঠী — রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক — নিজেদের অভিপ্রায় হিসেবে শহীদ দিবসকে গ্রহণ করেছে, নিজেদের স্বস্ব আদর্শের প্রতীক হিসেবে এই আন্দোলনকে ব্যাখ্যা করেছে। এভাবে একুশে ফেব্রুয়ারী এদেশের মুক্তিকামী জনতার একটি নির্ভরশীল আশ্বাসে

---

২।

৩। সম্পাদকীয়, ইস্পাত /একুশের সংকলন/, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, ১৯৭০।

Dhaka University Institutional Repository



পরিণত রূপ ঃ

বাংলার মাটি যখন বন্যার দাপটে চৌচির ফেটে
অই-দুঃখের সম্ভাবনায় অঙ্কুর করে আর্তনাদ
একুশে তখন প্রথম সর্বদের আশ্বাসে প্লাবনের মেঘ
মৃত্যুর অঙ্কুরের প্রস্ফুটিত সূর্যমুখী চোখে
যে চোখে বাংলার কোটি মানুষ
স্বপ্ন আঁকে নতুন পৃথিবীতে সূর্যোদয়
এবং একুশে তারই গান গেয়ে সূর্যকে আহ্বান
জানায় বাংলায় ।[৪]

শহীদ দিবসকে উপলক্ষ করে সহস্রাধিক কবিতা রচিত হয়েছে । এদেশের সকল তরুণ ও প্রবীণ কবি এ-বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন; যার অধিকাংশই বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সংকলনে ছড়িয়ে রয়েছে । একুশের প্রতীকী ব্যঞ্জনা সর্বাধিক স্ফূর্তি পেয়েছে তরুণ কবিদের সোচ্চার, সরল ও স্পষ্ট বক্তব্যে কিন্তু এর অধিকাংশই অগ্রন্থিত থাকায় আলোচনার বহির্ভূত থেকে গেছে । আমাদের মূল অবলম্বন হচ্ছে কাব্যে বিধৃত কবিতাগুলি । অবশ্য ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে কোনো-কোনো একুশের সংকলনকে আমরা আলোচনায় টেনে এনেছি ।

১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয় হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় একুশের প্রথম সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারী' ।[৫] এতে শামসুর রাহমান/জ. ১৯২৯/, হাসান হাফিজুর রহমান /জ. ১৯৩২/, আলাউদ্দিন আল আজাদ/জ. ১৯৩২/, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ /জ. ১৯৩৪/, আতাউর রহমান /জ. ১৯২৫ /, আনিস চৌধুরী /জ. ১৯২৯ /, আবদুল গনি হাজারী/জ. ১৯২৫ ১৯৭৬/, জামালুদ্দিন /জ. ১৯৩১ /, ফজলে লোহানী /জ. ১৯ /, বোরহানউদ্দিন খান

---

৪। সাঈদ আখতার, একুশে ঃ একটি আশ্বাস, শপথ/একুশের সংকলন/, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল শাখা, ১৯৬৯ ।

৫। ঢাকা ঃ পুঁথিপত্র প্রকাশনী, ১৯৫৩ । সংকলিত কবিতাগুলির কোনো নাম নেই ।

Dhaka University Institutional Repository



[illegible] (জ. ১৯০৮) ও সৈয়দ শামসুল হক (জ. ১৯৩৫) — এই ধরনের একাধিক কবিতা রয়েছে। এদের অনেকের কাছে দিনটিকে মনে হয়েছে ভিন্ন তাৎপর্যের, নতুন সম্ভাবনার, বিদ্রোহী অনুপ্রেরণার ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী। বৈশাখের প্রচণ্ড তাণ্ডবের পর যেমন আসে আষাঢ়ের নবীন মেঘ — ধরণীকে সমগ্র সজলে ভরে দেবার জন্য।

ক. অনুপ্রাস হাহুতাশ পাতাঝরা বিদীর্ণ বৈশাখীর জ্বালাকরা দিনের দিগন্তে
আষাঢ়ের পুঞ্জীভূত কালো মেঘ আসবেই ঠিক,[৬]

খ. বাতায়ন খুলে দেখি আমি
আকাশের কোণে কোণে
এখনও লেগে আছে মেঘ।
আমার-ও মনে হয়
এই মেঘে আসবে বর্ষণ
এই মেঘে সনে আসে
অসংখ্য জীবন।[৭]

গ. আর চুপ নয়, এবার শুধু
শহীদের গান। বিজয়ের গান।।
শহরে যাদের মৃত্যু হয়েছে
ফিরে আসছে, ফিরে আসছে
হাজারে হাজারে মিছিল করে।।[৮]

আতাউর রহমানের কাছেও এই দিনের তাৎপর্য বিরাট। নতুন জীবনবোধে স্নাত হয়েছেন তিনি এদিন। কৃত্রিম আক্ষেপ ও সস্তা রোমান্টিকতা তাঁর কাছে মিথ্যা মনে হল, সত্য

---

৬। সৈয়দ শামসুল হক, পৃঃ ৪৫
৭। আবদুল গনি হাজারী, পৃঃ ৯
৮। [illegible] জোহানী, পৃঃ ৩২

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে দেখা দিল সংগ্রামী জীবন — যা জন্ম দেয় নবজাগরণের শুকতারার ।

এখানে রুদ্র রোষে জনতার দুর্বার পরিখা,
লক্ষ লক্ষ জীবন স্বচ্ছন্দ এক অভিযানে
মৃত্যুর নির্মম ছায়া রচে থাকে উদ্দীপ্ত দীপশিখা,
আত্মিকে আমার রক্তে প্রাণমুক্তির শুকতারা হাসে ।[৯]

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীতে মেডিকেল কলেজের সামনে যেখানে গুলিবর্ষণ হয়েছিল, সেখানে ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটি শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ তুলেছিল । শহীদ শফিউর রহমানের পিতা এর উদ্বোধন করেছিলেন । চব্বিশ তারিখে মিলিটারী এসে স্মৃতিস্তম্ভটি ভেঙে দেয় । এই ঘটনাকে সামনে রেখে আলাউদ্দিন আল আজাদ রচনা করেন একটি কবিতা । তিনি লিখেছেন ইটের মিনার ভাঙা যেতে পারে কিন্তু সকল প্রকার প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে সংগ্রামী জনতার চারকোটি পরিবারের যে সুদৃঢ় মিনার গড়ে উঠেছে, তা কোনোদিনও ভেঙে পড়বেনা ঃ

স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার ; ভয় কি বন্ধু আমরা এখনো
চারকোটি পরিবার
খাড়া রয়েছি তো । যে-ভিত কখনো কোন রাজন্য
পারেনি ভাঙতে
হীরার মুকুট নীল পরোয়ানা খোলা তলোয়ার
খুরের ঝটিকা ধুলায় চূর্ণ যে পদপ্রান্তে
যারা বুনি ধান
গুণ টানি, আর তুলি হাতিয়ার হাপর চালাই
সরল নায়ক আমরা জনতা সেই অনন্য ।[১০]

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর কবিতাটির ব্যঞ্জনা ও আবেদন অসাধারণ । মায়ের ভাষাকে যারা কেড়ে নিতে চায় তাদের তাড়িয়ে দিয়ে খোকা বাড়ি আসছে বলে চিঠি দিয়েছে মা অপেক্ষা করছেন আমের সত্তা সাজিয়ে । অবশেষে খোকা বাড়ি এল—লাশ হয়ে । মা

৯। পৃঃ ৪৪
১০। পৃঃ ৬৬

Dhaka University Institutional Repository



ঝাপসা চোখে দেখলেন ছেলের লাশের ব্যবচ্ছেদ। এখন আমার ঘরের দাওয়ায় প্রসন্ন রোদ লুটিয়ে পড়েছে, মা বসেছেন ধান ভানতে ও বিন্নি ধানের খই ভাজতে। খোকা তার আসবে নিশ্চয়ই ভেবে।

তার পর
দাওয়ায় বসে
মা আবার ধান ভানে,
বিন্নি ধানের খই ভাজে,
খোকা তার
কখন আসে ! কখন আসে !
এখন,
মার চোখে শিশির ভোর
স্নেহের রোদে
ভিটে ভরেছে।[১১]

একুশের শহীদেরা আমাদিগকে গভীর দেশপ্রেম শিখিয়েছে ; আমাদের চেতনাকে এমন দিগন্ত-প্রসারিত করেছে যার ফলে আমরা অনায়াসে দেশের দুই প্রান্তকে ধারণ করতে পারি। এবং তাঁদের চিরনবীন স্মৃতি অভীষ্ট লক্ষ্য হাসিল না-হওয়া পর্যন্ত কাউকে নিশ্চিন্ত হতে দেবেনা।

আর এবার আমরা হারিয়েছি এমন স্বজনকে
যারা কোনদিন মন থেকে মুছবেনা,
কোনদিন কাউকে শান্ত হতে দেবে না;
যাঁদের হারানোয় তাঁরা আমাদেরকে বিস্তৃত করে দিয়ে গেল
দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে, কণা কণা করে ছড়িয়ে দিয়ে গেল
দেশের প্রাণের দীপ্তির ভেতর মৃত্যুর অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতে।

আবুল বরকত, সালাম, রফিকউদ্দিন, জব্বার
কি আশ্চর্য, কি বিষণ্ণ নাম ! একসার জ্বলন্ত নাম।[১২]

---

১১। পৃঃ ৪১
১২। হাসান হাফিজুর রহমান, পৃঃ ৪৭

Dhaka University Institutional Repository



শামসুর রাহমানের কবিতায় শহীদ দিবসের শোকাবহ ঘটনার প্রতিক্রিয়া তাঁর মনে কিভাবে পড়েছে তার উল্লেখ আছে। সেদিনের ঘটনায় তিনি এতই বিক্ষুব্ধ, ক্ষুব্ধ ও বেদনাবিধুর হয়েছেন যে, তিনি তাঁর চক্ষু, হৃৎপিণ্ড ও আত্মাকে উপড়ে ফেলতে চান যাতে এ-ধরনের ঘটনা আর কোনোদিন দেখতে বা অনুভব করতে না হয়। শহীদদের আত্মদানকে তিনি তুলনীয় ভেবেছেন জগতখ্যাত মহাপুরুষদের আত্মদানের সঙ্গে।

আগুনতাতা সাঁড়াশি দিয়ে তোমরা উপড়ে ফেলো আমার দুটি চোখ
সেই দুটি চোখ, যাদের প্রাজ্ঞ দীপ্তির মৃত্যুহীন বিদ্রোহী জ্বালায়
দেখেছি নির্মম আকাশের নিচে মানবিক মৃত্যুর তুহিন শূন্যতা
দেখেছি সাসুহারা কুমারীর চোখের শান্তকানার মতো কুয়াশা-ঢাকা দিন
দেখেছি মোহাম্মদ, যীশু আর বুদ্ধের বিদীর্ণ হৃদয়, তাঁদের রক্ত
ঝরে ঝরে পড়ছে সাদা সাদা অসংখ্য দাঁতের কুটিল হিংস্রতায়।[১৩]

১৯৬৫ সালে প্রকাশিত এই সংকলনটির দ্বিতীয় সংস্করণে সিকানদার আবু জাফর /১৯১৭–১৯৭৫/, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান /জ. ১৯৩৬/, আল মাহমুদ /জ. ১৯৩৬/ ও মাহবুব তালুকদারের /জ. ১৯৪০/ চারটি কবিতা সন্নিবেশিত হয়। প্রধান-প্রধান কবিতাগুলি সম্পর্কে নিম্নে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হয়েছে।

আজিজুল হাকিম /১৯০৮–৬২/ তাঁর একটি কবিতায় ভাষা আন্দোলনকে কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে না-দেখে সার্বিক সামাজিক-আন্দোলনের অংশ হিসাবে বিবেচনা করেছেন। 'সাম্রাজ্যবাদের অভিভাবক' 'কায়েমী স্বার্থ' 'রক্তশোষী' জনশত্রুরা দেশের মানুষের অন্ন-বস্ত্র-স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কেড়ে নিয়ে শোষণের আসনকে চিরস্থায়ী করার জন্য ভাষার উপর হাত প্রসারিত করেছিল কিন্তু সর্বহারা মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে এর বিরোধিতা করেছে এবং চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়ে শোষকের শিবিরের দিকে ক্রোধান্বিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে:

মুষ্টিমেয় ধনী স্বার্থের শিবির গড়েছে
দেশের মোড়ে মোড়ে।

---

১৩। পৃঃ ২০

Dhaka University Institutional Repository



ঘাটিতে ঘাটিতে চলেছে সুচতুর শাসকের আনাগোনা ।
ক্ষুধা, মৃত্যু, অর্ডিন্যান্স দিয়ে ভরে তুলেছে তারা দেশ;
নিশ্চিত শাসকের অনাবাঞ্ছিত ব্যাঘাত তাদের অসহ্য ।

... ... ...

শতাব্দীর কালিমাভরা মনের চক্রান্ত নিয়ে
ষড়যন্ত্র করে তারা কেড়ে নিতে আসে মানুষের ভাষা
এই দেশের কোটি কোটি মানুষের মাতৃভাষা ।

... ... ...

সর্বহারা দেশ প্রতিজ্ঞা নেয় ঃ
ফ্যাসিস্ট-বিরোধী প্রতিজ্ঞা ।

... ... ...

জাগ্রত জনতার দৃষ্টি যায়
শত্রুর অগ্নিদগ্ধ নিশানচিহ্ন গ্রাস শিবিরে শিবিরে ।
জাতির জন্য ক্রোধ যায়
অপশক্তির প্রান্তরে প্রান্তরে কুচকাওয়াজ করে ।[১৪]

ভাষা আন্দোলনের শহীদেরা গভীর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ছিলেন । তাঁরা ভালোবেসে ছিলেন দেশের মানুষকে ও প্রকৃতিকে, তাঁরা চেয়েছিলেন দেশের মানুষের মুখে হাসি ও গান চির-স্থায়ী হোক । নিজবাসভূমে পরবাসী হিসেবে তাঁরা বাঁচতে চাননি । সেই অধিকার অর্জনের জন্য তাঁদের আত্মাহুতি দিতে হয়েছে এবং পরিণামে তাঁরা দেশের সমগ্র মানুষের অন্তরে ঠাঁই করে নিয়েছেন — একথাগুলি বলেছেন মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান 'কৃষ্ণচূড়ার মেঘ' নামক কবিতায় ।

শহীদের গান শোনো
সে গানে তাদের হাসি
কি আশ্চর্য ফুল হয়ে ঝরে !
তোমরা যে কথা বলো সেই সুরে
তাদের প্রতিজ্ঞা মিশে আছে ।

---

১৪। ভাষার মৃত্যুর শোধ করে, বিদগ্ধ দিনের প্রান্তর / ঢাকা ঃ ইস্টার্ন বুক সেন্টার, ১৯৫৪/, পৃঃ ১৩-১৪

Dhaka University Institutional Repository



তোমাদের প্রতিটি নিশ্বাসে
তোমাদের পদক্ষেপে প্রত্যেক বিশ্বাসে
তোমাদের স্নেহে প্রেমে আশাতে আশ্বিনে
ভাই-বোন মায়েদের স্মরণীয় দিনে
বসিচ্ছিনু তাদের জয়।
তারা তো তোমার কথা
তারা তো আমার কথা
তোমাদের আমাদের সকলের হাসি
চেয়েছিল। এদেশে প্রবাসী
নয় – তারা হতে চেয়েছিল
এ দেশেরই প্রাণের শিশির।[৯৪]

১৯৫৮ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর পূর্ব বাংলার রাজনীতির স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হল। সামরিক শাসকেরা কথিত সামন্তবাদী ও সাম্প্রদায়িক চেতনাকে রাজনীতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। এর প্রভাব পড়ে সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও। স্বভাবতই নতুন শাসকেরা একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের চেতনাকে সুনজরে দেখেনি এবং নানা কূট-কৌশলে একে বিনষ্ট করতে উদযোগী হয়। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শৈক্ষিক দিকে সমাজের হতাশাগ্রস্ত রূপ সে-সময়ের কবিতায় লক্ষ করা যায়। সিকানদার আবু জাফর ১৯৬৩ সালে রচিত একটি কবিতায় সে-মনোভাব প্রকাশ করেছেন। এই আন্দোলনের মাধ্যমে একটি মহান সংকল্পে মত-পার্থক্য ভুলে এদেশের হাজার-হাজার মানুষ একতাবদ্ধ হয়েছিল, এ-দিনটিতে হয়েছিল অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঘৃণার ও ক্রোধের [illegible], ভয়াল বিস্ফোরণ; কিন্তু কালপরিক্রমায় অদৃশ্য হাতের নানা 'ভেলকি'তে সে-ঐক্য নষ্ট হল এবং একুশে ফেব্রুয়ারি পর্যবসিত হল অন্তঃসারশূন্য সংকল্প প্রহসনের 'শবদেহে'।

---

৯৪। পতিত আলোক / ঢাকা : আকাদিন, ১৯৬৮, পৃঃ ১২-১৩। কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সালে — দ্রষ্টব্য মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান কাব্যসংগ্রহ / ঢাকা : নবযুগ প্রকাশনী, ১৯৭৮, পৃঃ ৪২৩, গ্রন্থপরিচয় : পতিত আলোক।

Dhaka University Institutional Repository



এখানে গর্ব ও গৌরবের ঐতিহ্য পরিণত হল 'নিস্প্রভ ইতিহাসে'।

একুশে ফেব্রুয়ারী
অতীতের কোনো নির্ভীক এক্যের
দেশের লোকের গর্ব — গৌরবের
বন্ধু এবং সন্তানের
ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া দৌর্বল্য
শিথিল জীর্ণ নিস্প্রভ ইতিহাস।[১৬]

বাংলাদেশের লোকায়ত ঐতিহ্য ভিত্তিক তথা মৃত্তিকাস্পর্শী সমাজ গড়ার একটি সম্ভাবনা এই আন্দোলনে সুপ্ত ছিল। কিন্তু সে-প্রয়াস বিপর্যস্ত হল এবং এই সুযোগে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অবাধ অনুপ্রবেশ উচ্চ মধ্যবিত্তকে দেশের বৃহত্তর জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। জাতীয় ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের ব্যাপারেও সংশয় ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা হল। বুদ্ধিজীবীরাও এই পটভূমিতে তাদের যোগ্য ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হলেন। আবদুল গনি হাজারী ১৯৬৩ ও ১৯৬৪ সালের জাতীয় মানসকে এরূপ বিভ্রান্ত, বিভক্ত, বিপর্যস্ত ও হতাশাগ্রস্ত রূপেই দেখেছেন।

মৃত্যু মন্দিরের সম্মুখে বিনাশিতের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠ
চকমকির আলোয় আমলাতন্ত্রীদের অশ্রুজল চোখ
রৌদ্রের সিঁড়ি বেয়ে আমাদের পা
না স্বর্গ না নরক[১৭]

এবং

ছত্রভঙ্গ মিছিল
দুমড়ানো রাস্তা
দেয়ালের গায়ে বিবর্ণ পোস্টার
মায়েদের কান্নার ছায়ায় বিলুপ্ত
এবং রাত্রির শূন্য কোলে
আত্মহননের সারি
সম্বিৎ পরিত্যক্ত সভ্যের পদচারণসূত্র[১৮]

---

১৬। একুশে ফেব্রুয়ারী, [illegible] /ঢাকাঃ সমকাল প্রকাশনী, ১৯৬৫/, পৃঃ ৫৭
রচনা বৈশাখ ৪, ১৩৭০।
১৭। নির্বাসিত, সূর্যের সিঁড়ি/ঢাকাঃ সপ্তর্ষি প্রকাশ, ১৯৬৫/, পৃঃ ৬০, রচনা ফেব্রুয়ারী ২১, ১৯৬৫
১৮। গত রাত্রির দুঃস্বপ্ন, পূর্বোক্ত রাত্রি, ঐ, পৃঃ ২৯, রচনা ফেব্রুয়ারী ২১, ১৯৬৪।

Dhaka University Institutional Repository



এই হতাশাগ্রস্ত চেতনা অবশ্য ধীরে-ধীরে কাটতে থাকে। একুশে ফেব্রুয়ারীতে পুনর্বার নতুন আন্দোলনের পদধ্বনি শ্রুত হয়। আল মাহমুদ লিখেছেন, জনতার মিছিল তার সম্মিলিত হতাশাকে ভুলিয়ে দিয়ে মনে শক্তিশালী আবেগের জন্ম দেয় — সে আবেগ সড়কের শহীদের মত রক্তাক্ত, হঠকার।

আমিও অনুরূপ হয়ে যাই হঠাৎ তখন
জনতার সমুদ্রের সাথে
সাপের হাতের মত সমস্ত শপথ
সোহাগের গাঢ় ইচ্ছা নিয়ে
নেমে আসে মনের ওপর।

নির্মম আদর পেয়ে আমিও রক্তাক্ত হলো
সড়কের শহীদের মত।[১৯]

তাঁর 'নিদ্রিতা মায়ের নাম'[১৯ক] কবিতাটি সুর সাদৃশ্যও অনন্য।

একুশের চেতনাকে শ্রমজীবী মানুষের মাধ্যমে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার আহ্বান জানিয়েছেন আবরার সিদ্দিকী তাঁর কবিতায়। কাস্তে হাতুড়ি ও লাঙলের ফলার মাধ্যমে কিষাণ কিষাণী মুটে ও তাঁতীর জীবনে এই আহ্বান সার্থক হোক — এও তাঁর কামনা।

সেই ধান দোলা দিক দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে
ফসলের খেতে আর ঘাটে গোঠে
রাখালী বাঁশিতে — জারী আর ভাটিয়ালী
ভাওয়াইয়া — সারি — গীতের আসরে —
পূর্ব বাংলার নীল আকাশে আকাশে
কপোতের ঠোঁটে ঠোঁটে — কাকাতুয়া — কোয়েলের সুরে
মাঠের শ্যামল আর সোনালী শিশিরে
মুক্তার ঝিলিকে ঝিলিকে।[২০]

---

১৯। একুশে ফেব্রুয়ারী, ক্র সংকলন/ঢাকা : পুঁথিঘর প্রকাশনী, ১৯৫৩, পৃঃ ৫৯
১৯ক। কালের কলস, চট্টগ্রাম : বইঘর, ১৩৭৩, পৃঃ ৪৭
২০। একুশের ভোরে, একুশের সংকলন/ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮, পৃঃ ১২

Dhaka University Institutional Repository



তরুণ কবি নওশের খান মাহমুদ একুশের চেতনায় বিদ্রোহের সম্ভাবনা লক্ষ করেছেন। এদিনের স্মৃতিকে বিস্মৃত হওয়া সহজ নয়। জীবনের আর সব ঘটনা, অন্য সব কাহিনী পেছনে পড়তে থাকে কিন্তু একুশের রক্তাক্ত স্মৃতি হৃদয়ে সৃষ্টি করে রক্তিম চেতনার — যা থেকে ক্রমে ক্রমে জন্ম নেয় বিদ্রোহের অঙ্কুর।

আজ বিশ্বাস
একুশে আমার রক্তে রাগায় অস্থিরতার সুর
বিদ্রোহ আনি মহাবহ্নি রহে, একুশেতো অঙ্কুর।[21]

১৯৬৬–৬৯ এর অভ্যুত্থান পূর্ব বাংলার গণমানসকে নাড়া দেয় প্রচণ্ডভাবে। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনীতিক ক্ষেত্রে অনেকগুলি মৌলিক প্রশ্ন তীব্রভাবে উচ্চারিত হয় এবং সমাধানের রাস্তাও আলোক-উজ্জ্বল হয়ে প্রতিভাত হয়। এই পরিবেশে ১৯৬৯ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী নতুন তাৎপর্য-মণ্ডিত হয়ে ওঠে। বর্ণোজ্জ্বল এই চেতনা পরবর্তী কালে আরো প্রসার লাভ করে। ফলে ৬৯, ৭০, ৭১-এর শহীদ দিবস বিষয়ক কবিতাতে পরিলক্ষিত হয় বিক্ষোভ বিদ্রোহ ও মুক্তির সোচ্চার ঘোষণা।

জনগণের অভ্যুত্থান যখন বাধাতে ও প্রত্যাঘাতে, বিক্ষোভে ও অনুঘাতে বিশৃঙ্খল, জীবনকে ও সমাজকে আবিষ্কার ও উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষায় সবাই যখন উন্মুখ ও উচ্ছৃঙ্খল, তখন আন্দোলনকে নির্দিষ্ট গতি ও পরিণতি দেবার জন্য সমস্ত সাধারণ মানুষ পুনরপি ঢাকার রাজপথে নেমে আসে — শামসুর রাহমানের একটি কবিতার মর্মকথা তাই।

আমি আর আমার মতোই বহুলোক
রাত্রিদিন ভূলুণ্ঠিত ঘাতকের আস্তানায়, কেউমরা, আধমরা কেউ
কেউবা ভীষণ জেদী, দারুণ বিপ্লবে ফেটে পড়া চতুর্দিকে
মানবিক বাগান, কমলবন হচ্ছে তছনছ।

---

২১। একুশে : আমার চেতনা, রফিকুল কাসেম,/ঢাকা : কল্লোল প্রকাশনী, ১৯৬৭/, পৃঃ ৭

Dhaka University Institutional Repository



সূর্য তাই উঁকিঝোঁকে উৎসুকেও
আমার সালাম নামে ফাল্গুনে, পূবে তোলে মুখ
বরকত বুক পাতে ঘাতকের থাবার সম্মুখে ।
সালামের বুকে আজ উন্মথিত মেঘনা
সালামের চোখ আজ আলোকিত ঢাকা
সালামের মুখ আজ তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলা ।[22]

মযহারুল ইসলাম (জ. ১৯২৮) তাঁর কবিতায়ও শহীদ দিবসের নতুন তাৎপর্যের কথা উল্লেখ করেছেন । এদিনে কোটি-কোটি মানুষ সকল ভীরুতা ও দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বাঁচার আশায় ঐক্যবদ্ধ হয় এবং এভাবে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আগমনকে অনিবার্য করে তোলে ।

সারা বছর আমরা মরেছি ।
বেঁচে উঠেছি শুধু এই একটি দিনে
বজ্রকঠোর প্রত্যয়ের স্পর্শে
আমাদের তিমির ভুইন দিনগুলো
গড়িয়ে গড়িয়ে এসে থমকে দাঁড়ায়
এই একটি দিনের প্রান্তে
যেখানে প্রজ্বলিত অগ্নিবলয়
জন্ম দেয় সূর্যের অরুণোদয় ।
যেখানে আলোর বন্যায় উদ্দীপিত
কোটি মানুষের জন্যে মুক্ত হয়
রৌদ্র রাঙা শপথের স্বাক্ষর
: আমরা বাঁচতে চাই
: আমরা বাঁচতে চাই ।[23]

২২। ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯, বিন্যাসভবে ১ম সং/ঢাকা : আইডিয়াল লাইব্রেরী, প্রথম ১৯৭০/ পৃঃ ১৩-১৪ ।
২৩। অগ্নিবলয়ের প্রান্তে, সিরাজুল মুক্তাদির /ঢাকাঃ পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ১৯৭৮, পৃঃ ৩২ ।

Dhaka University Institutional Repository



প্রবীণ কবি জসীমউদ্দীনও (১৯০৪ – ৭৬) সত্তরের শহীদ দিবসে নতুন সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে, আঁধার পর্দা কেটে দিয়ে রক্ত কুসুমের মত উজ্জ্বলতাসহ নতুন প্রভাত আসন্ন হয়ে উঠেছে — এখন ভয়ে ভীত হওয়া নিরর্থক।

রক্ত কুসুমের দ্যুতি মনোরম
রাখিছে প্রভাত উজ্জ্বলতম
চরণে দলিত মহা–নির্মম আঁধার
লভিছে ক্ষয়
ভয় নাই, নাহি ভয়।[২৪]

তরুণ কবিরা কথা বলেছেন স্পষ্ট করে, শোষণ বিরোধী চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে। গণমানব জেগে উঠেছে, তারা তাদের বাঁচার দাবি আদায় করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাই চারদিকে বিদ্রোহের ও প্রতিবাদের পদধ্বনি। বাকি যারা আছে তাদেরও এতে শামিল হতে হবে।

জনতার রব জনতাই বাংলা দেশে আজ
বিদ্রোহ তাই চারদিকে বিদ্রোহ সাজ।
থামো বাকী যারা প্রস্তুতি নাও,
লাখো কণ্ঠে শোষণের হিসাব চাও।[২৫]

উদ্ধৃত কবিতাংশটি শিল্পমূল্যে দুর্বল হলেও, এমনকি কোনো–কোনো চরণ সুকান্তর কবিতার সাক্ষাৎ অনুকৃতি হলেও, কবির মনোভাব প্রণিধানযোগ্য।

একুশে ফেব্রুয়ারীকে উপলক্ষ করে রচিত কবিতাসমূহে তিনটি পর্যায় লক্ষ করা যায়। প্রথম সামরিক শাসন জারির পূর্ব পর্যন্ত রচিত কবিতায় বিশেষ কোনো বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, এগুলিতে পাওয়া যায় একটি অনির্দেশ্য আহ্বান ও আত্মোৎসর্গের কথা, এবং একটি বেদনাকরুণ সান্ত্বনা। ব্যতিক্রম হিসাবে উল্লেখযোগ্য আজিজুল হাকিমের কবিতাটি, যেটি আমার শিল্পবিচারে তত উৎকৃষ্ট নয়। সামরিক শাসন জারি হলে প্রদেশে প্রতিক্রিয়াশীলতার শক্তি

২৪। একুশের গান, একুশের সংকলন (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮), পৃঃ ১৭৩
২৫। শাহ আলম দুলাল, প্রতিরোধের মন্ত্র, স্পন্দন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫

Dhaka University Institutional Repository



বৃদ্ধি পায় এবং নানাভাবে চেষ্টা চলে ভাষা আন্দোলনের লক্ষ্যকে বানচাল ও বিপথগামী করার । এই নৈরাশ্যজনক অবস্থা ছায়া ফেলেছে সে সময়ের কবিতায় । ঐ কালের ভাষা আন্দোলন বিষয়ক কবিতায় লক্ষ করা যাবে অসহায়তা ও আশাভঙ্গের চিত্র, কিন্তু সেগুলিতেও বলা হয়েছে একুশের অপরাজেয় ঐতিহ্যের কথা । তারপর থেকে এই ভাব ক্রমশঃ কেটে গিয়ে শেষ পর্যায়ের কবিতায় প্রধান হতে থাকে প্রবল প্রতিবাদী সংকল্প, সে-সংকল্প সেকালের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর বিরুদ্ধে ।

## ২ বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি-বিষয়ক কবিতা

পাকিস্তান আমলে পুরো তেইশ বছর ধরে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উপর অনবরত আক্রমণ চলেছে । বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা না-দেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে ১৯৪৮ সাল থেকে আন্দোলন শুরু হয় । ১৯৫২ সালের আন্দোলন ও ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের সাফল্যের পর ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে এই আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের সাফল্যজনক সমাপ্তি ঘটে । এর পরের হামলা হয়েছে পরোক্ষভাবে । বাংলা ভাষাকে সংস্কার করা, হরফ বর্জন ও বানানের সরলীকরণ, আরবী হরফ ও রোমান হরফে বাংলা লেখা, উর্দু ও বাংলার সমন্বয়ে পাকিস্তানী ভাষা তৈরী করার বিভিন্ন চেষ্টা সেই প্রয়াসেরই এক-একটি দিক । একই সঙ্গে সংস্কৃতির উপরও হামলা চলতে থাকে । রবীন্দ্র সঙ্গীত বর্জন করা, নজরুল ইসলামের রচনাবলীর পাকিস্তানী সংস্করণ প্রকাশ করা, পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানকে হিন্দুয়ানী বলে চিহ্নিত করা, বাঙালীর জাতিসত্তাকে কালিমালিপ্ত করা এবং পূর্ব বাংলার নাম বদলে পূর্ব পাকিস্তান করা — সেই আক্রমণেরই কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অংশ ।

Dhaka University Institutional Repository



কিন্তু এই ষড়যন্ত্র সার্থক হয়নি। মুষ্টিমেয় কিছু বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবী ব্যতীত বাকি সবাই এর বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ করেছে ও বিভিন্ন সংগঠন তৈরী করে প্রতিরোধ আন্দোলনে নেমেছে। কবিগণ ছিলেন এই আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য কর্মী। অনেক সংগ্রামী কবিতা রচনা করে তাঁরা এ-সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এমনদের কিছু-কিছু কবিতা নিয়ে এখানে আলোচনা করা হল।

বাঙালী শব্দটির উচ্চারণ করা ও নিজেকে বাঙালী বলে পরিচয় দেওয়া যে এক সময় বিপজ্জনক ছিল সেকথা শেখ মোছলেম আহমদ উল্লেখ করেছেন তাঁর একটি কবিতায়।

প্রাণভরে তাই দিতে চাই গালি
তোমরা হতভাগা কেন বাঙালী
এমনি করে যুগে যুগে থাকিয়াছো কালি।
আরো পুনরায় :
বাঙালী বলা ঠিক নয় তোমাদের,
কি গ্লানি কিসের গন্ধ আছে মিশে ওই নামে,
রাজনীতির কারণে,
কাজ কি আমার ঝামেলা এনে টেনে।
তার চাইতে বলি :
তোমরা মুসলমান।[২৬]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে পূর্ব বাংলা রাজনীতি হয়েছে। সামরিক শাসন কায়েম হবার পর ধীরে ধীরে সরকারী পর্যায়ে রবীন্দ্র বিরোধিতা শুরু হয়। স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তক

---

২৬। 'পূর্ব-পাকিস্তানী', সিপাহী / ঢাকা : আহমদ বক্স, ১৩৭০, পৃঃ ৭৪।
১৯৫৪ সালে ঢাকার পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সম্মেলনে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর অভিভাষণে বলেছিলেন — 'এমন কি বাঙালী নামটি পর্যন্ত যেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে কেউ কেউ মনে করতে লাগলেন'। এই অভিসন্দর্ভের ৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository



থেকে তাঁর রচনা বাদ দেওয়ার চেষ্টা হয়, ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়, ১৯৬৭ সালে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী রেডিও পাকিস্তান থেকে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রচার বন্ধ করার চেষ্টা করেন। এই পটভূমিতে সংস্কৃতিসেবীরা এই আগ্রাসনকে প্রতিহত করতে ঐক্যবদ্ধ হন। রবীন্দ্র সাহিত্যের আলোচনা জোরে-শোরে শুরু হয়, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের চর্চার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়, রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ করে কবিতা রচনাও শুরু হয়ে যায়। এসব কবিতায় কবিগণ কবির নিকট তাঁদের ঋণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন এবং নিজেদের চেতনায় ও মননে তাঁর সর্বব্যাপী প্রভাবের কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। সৈয়দ আলী আহসান তাঁকে আকাশের সঙ্গে তুলনা করেছেন, কেননা তিনি বাংলা শব্দের সম্ভাবনাকে অনেকদূর প্রসারিত করে নতুন-নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন — যার ফলে নবীন আগন্তুকরা অনায়াসে এখানে পদচারণা করতে পারে।

একদিন আশ্চর্য উজ্জ্বলতায়
শব্দের ঐশ্বর্য পেয়েছি
অতি পরিচিত শব্দ হঠাৎ সমুদ্র হয়েছে
এবং আমার সমস্ত আগ্রহ
চিলের মতো ডানা মেলেছে
এসব সত্য ইতিমধ্যেই ইতিহাস
এখন আবার আমাদের শব্দে
নতুন স্বাদ আসছে —
নতুন নৃত্য, বিচার, পদচারণ এবং বিশ্বাস
তুমি আবৃত্তির সাধনায় এসব সম্ভাবনাকে প্রদীপ করেছ
তাই তুমি আমার আকাশ
এবং শব্দের পরিসরে কয়েক নীলাম্বর।[২৭]

শামসুর রাহমানের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সূর্যের সঙ্গে উপমিত, কারণ তাঁর সাহিত্যের আলো থেকে কেউ বঞ্চিত হয়না। নিজের জীবনে রবীন্দ্র-প্রভাবের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, জীবনের শুরুতে শুরুতে নিজের সত্তায় যে আশ্চর্য আয়োজনপ্রবণতা তিনি অনুভব

২৭। রবীন্দ্রনাথকে, সমকাল ঃ রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা /বৈশাখ ১৩৬৮/, পৃঃ ৭১৭–১৮ ।

Dhaka University Institutional Repository



করেন, ক্লান্তি ও হতাশায় নিসর্গের কাছে গিয়ে নতুন শক্তি আহরণের যে-ক্ষমতা তিনি ধারণ করেন তা রবীন্দ্রনাথেরই দান।

এবং উদার সূর্য উপমা তোমার।
প্রকৃতির টোলে আমি কখনো নিইনি পাঠ, তবু
ঋতুতে ঋতুতে
আমার সত্তার সুরস্রোতে
কেমনি ধ্বনিত হয়, অবিরাম প্রহরে প্রহরে
এখনো যে ক্লান্ত হলে নিসর্গের কাছে
আশ্চর্যের প্রাণ হাতে যাই,
অনন্ত চেতনার গোধূলিতে শুনি
সান্ত্বনার ভাষার, এখনো রবীন্দ্রনাথ
সে তোমারি দান।[২০]

মিয়া হায়দার বলেছেন আরো উদারস্বরে। নিজের জীবনে রবি ঠাকুরের প্রভাবকে অতিক্রম করে আত্মাকৃতিতে বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত হবার যে-কামনা তিনি করেন, তা সারল্যের ব্যর্থ হয় কেননা তাঁর অস্তিত্বে রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরের মতো বিরাজিত। এই ব্যর্থতা অন্য কবিকে আনন্দই দেয়।

তোমার স্মৃতিকে আমি এতোকাল
প্রতিযোগিতার খেলায় হেরে যাওয়া
ক্ষুব্ধ জেদাড়া কিশোরের মতো
ডুবিয়ে দিতে চেয়েছি নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে,
অবশেষে অক্ষম সন্তানের মতো
নিজেই কেঁদেছি নিজস্ব পরাজয়ে।
যেহেতু জেনেছি
আমার অস্তিত্বে তুমি ঈশ্বরের মতো।[২১]

---

২০। সূর্যাবর্ত, ঐ, পৃঃ ১২৩

২১। রবীন্দ্রনাথ, ঐ, পৃঃ ১২৭–২৮

Dhaka University Institutional Repository



মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান কবি স্বভাবে স্বতন্ত্র হয়েও, রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যকে প্রেরণার উৎস বলে স্বীকার করেন এবং স্বয়ং পূর্বসূরীর কবিকৃতিকে মূল্যায়ণ করেন উপমা রূপকে।

এবং তুমিই জানি ঐকান্তিক চিত্ততলে একা
অপূর্ব উচ্ছ্বাসে কাঁপো, মুক্ত হও বিশাল প্রসারে,
নীলে নীলে, সমুদ্রে, নির্ঝরে, নীড়ে, নিবিড় আশ্লেষে,
পূর্ণ হও, পূর্ণ করো, জ্বলে ওঠো অনন্ত সৌরভে
একটি ফুলের বুকে সৌন্দর্যের আশ্চর্য পূর্ণিমা,
একটি প্রেমের হাতে যৌবনের চিরন্তন সুধা,
একটি গানের সুরে সমুদ্রের নিকম্পিত ঢেউ।
... ... ...
এও তো তোমারি গর্ব গর্বে আমি ভুলেছি যে নিজে।[৩০]

আরো অনেকের রচনায়ও বিভিন্ন ভঙ্গিতে ও বিভিন্ন মেজাজে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

ক. আমাকে বেষ্টন করে আছো
অবিশ্বাস্য অদৃষ্টের মতো;
প্রতি মুহূর্তে সর্বনের প্রয়াসে ধিকৃত
অনিবার্য অভ্যাসের মতো।।[৩১]

খ. যতক্ষণ তোমার পাশায়
খোলা ছিলেম
শরীর উষ্ণ ছিল
তারপর
বাড়িতে পা দিতেই
আগুন আগুন।[৩২]

---

৩০। সূত্রঃ শতবার্ষিকী, দুর্লভদিন /ঢাকা : সমকাল প্রকাশনী, ১৯৬৮, পৃঃ ৫০
৩১। সিকান্দার আবু জাফর, রবীন্দ্রনাথ, বৈরী বৃষ্টিতে, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬২
৩২। আবু বকর সিদ্দিক, রবীন্দ্রনাথের মাঝে, মধ্য দুপুরের সুলতান, /ঢাকা : সাহিত্য বিপণ, ১৯৯৯, পৃঃ ৭২

Dhaka University Institutional Repository


রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে একটি অনবদ্য সনেট রচনা করেছেন আল মাহমুদ। সংস্কৃতি-প্রসঙ্গে পূর্ব বাংলার নৈরাশ্যজনক অবস্থার সুন্দর ছবি এতে পাওয়া যায়। এদেশ তখন সৃষ্টিহীনা, অন্ধকারাচ্ছন্ন ও বিজন মরুভূমির সঙ্গে তুলনীয়।

তুমিনা রবীন্দ্রনাথ কি ভেবে যে বাংলাদেশে ফের
মূক হয়ে জন্মানোর অসম্ভব বাসনা রাখতেন
গাছ নেই নদী নেই অপুষ্পক সময় বইছে
পুনর্জন্ম নেই আর, জন্মের বিরুদ্ধে সবাই।[৩৩]

বাংলা ভাষা সংস্কারের জন্য ১৯৬৮ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে-উদযোগ শুরু করে, সে পটভূমিতে কিছু-কিছু কবিতা রচিত হয়েছিল। শামসুর রাহমান লিখেন 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা'। বাংলা বর্ণমালা তথা ভাষা কিভাবে সর্বকালের চিন্তা-চেতনা-কর্ম ও অবসর মুহূর্তকে ঘিরে নিরবচ্ছিন্ন নির্ভরশীলতা ও স্বপ্নের বাহন হয়ে আছে, তিনি তার দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন। বর্ণমালার বর্তমানে তাঁর অসহায় অবস্থাকে তিনি কল্পনা করেছেন এভাবে।

তোমাকে উপড়ে নিলে, বলো তবে, কী থাকে আমার ;
উনিশ শো' বাহান্নোর দারুণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি
বুকে নিয়ে আছো সগৌরবে মহীয়সী।
সে-ফুলের একটি পাপড়িও ছিন্ন হলে আমার সত্তার দিকে
কতো নোংরা হাতের হিংস্রতা ধেয়ে আসে।
এখন তোমাকে নিয়ে খেঙরার নোংরামি,
এখন তোমাকে ঘিরে খিস্তি খেউড়ের পৌষমাস
তোমার মুখের দিকে আজ আর যায়না তাকানো,
বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা।[৩৪]

---

৩৩। রবীন্দ্রনাথ, কালের কলস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৬
৩৪। বর্ণমালা, দুঃখিনী বর্ণমালা, নিজ বাসভূমে, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮

Dhaka University Institutional Repository



কবি শাহাবুদ্দিন বলেছেন তাঁর জীবনে বাংলা ভাষার বিস্ময়কর প্রভাবের কথা। নিজের উদাহরণ টেনে তিনি বলেছেন, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে যে অভিজ্ঞতা–উপলব্ধি–যন্ত্রণা ও উদ্বুদ্ধতার কথা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, এ–ভাষা না–থাকলে তার প্রকাশ কখনো সম্ভব হত না। তাই, বাংলার প্রতি তিনি চির কৃতজ্ঞ।

আমি একদিন শুনলাম অনেক অনেক মানুষের কন্ঠ
শত শত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি
জল কল্লোলের মতো ঝড়ের শব্দের মতো সমুদ্র গর্জনের মতো
এশিয়ার ক্ষুধার্ত মাটিতে আফ্রিকার লুন্ঠিত সবুজছায়ায়
ল্যাটিন আমেরিকার শোষিত প্রান্তরে প্রান্তরে
ভিয়েতনাম এঙ্গোলায় মোজাম্বিকে
দক্ষিণ আফ্রিকার হীরকখনির ছিন্ন অন্ধকারে
আর বাংলাদেশের গ্রামে শহরে নদীতে পাহাড়ে
শুনলাম হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের কন্ঠ
ধ্বনির মহিমায় দীপ্ত উদ্দীপিত এক বিপুল প্রত্যয়
মানুষের চিরদিনের সকল অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে
মেতে উঠেছে
হে বাংলা ভাষা আমার, আমি চিরকাল তোমার কাছে
কৃতজ্ঞ থাকবো
তুমি না হলে মানুষের এই উদ্দীপিত অভ্যুত্থানের কথা
আমি কোনোদিন উচ্চারণ করতে পারতাম না।[৩৫]

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ একটি কবিতায় দুঃখ ও হতাশার দারুণ দুর্দিনে বাংলা ভাষা তাঁকে কিভাবে নতুনভাবে সংগ্রামী প্রেরণা দান করে তার উল্লেখ করেছেন, তার একটি কবিতায়

---

৩৫। বাংলা ভাষা, মা আমার, আকাশবিত্ত কবীর /ঢাকা : বাঙলা প্রকাশ, ১৯৯১/, পৃ ৩৮–৩৯।

Dhaka University Institutional Repository



তিনি বলেছেন রাজপথে বাংলা ভাষার শব্দসমূহ নতুন প্রাণ পায়।

প্রেমের সংলাপে আর মৃত্যুঞ্জয়ী গানে
সংগ্রামী আন্দোলনে মিছিলে স্লোগানে
তোমার প্রতিটি শব্দ দেখি রাজপথে
অনির্বাণ হয়ে জ্বলে উজ্জ্বল শপথে।[৩৬]

সংস্কৃতিকে ঘিরে লিখিত কবিতাগুলি রচিত হয়েছে ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে। তখন দেশের সংস্কৃতির উপর এক-একটি ভুমিক আঘাত আসতে শুরু করলে, অন্যান্যদের মত কবিরাও, সচেতন হয়ে উঠলেন এবং দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের নিবিড় সম্পর্ক, জীবনে-চৈতন্যে-মননে তার বিস্তৃত প্রভাব অনুভব করলেন আনন্দ-বেদনার সঙ্গে। সে প্রভাবের কথা কেউ বলেছেন মৃদুভাবে, কেউ উচ্চকন্ঠে, কারো কবিতা প্রতিবাদের, কারো বীরত্ব উপলব্ধির। তবে সবাই প্রতিবিম্বিত করেছেন সমাজের বৃহৎ অংশের আবেগের ও অনুভূতির

৩ পূর্ব বাংলা বিষয়ক কবিতা

এদেশের কবিতায় পূর্ব বাংলার উপস্থিতি বিচিত্র ও প্রাণস্পর্শ। এর নিসর্গ, প্রবহমান লোকজ ঐতিহ্য ও জনজীবনের দুর্গতি প্রভৃতি কবিচিত্তে প্রবাহিত ও অনুশীলিত হয়ে তাঁদের চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ঋতুচক্রের বিবিধ বিন্যাস ও রূপ নিয়ে কবিতা রচনা করা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনাপর্ব থেকেই শুরু হয়। এধরনের কবিতা জনপ্রিয়ও

৩৬। বাংলা ভাষার প্রতি, রফিক কায় /ঢাকাঃ ১৯৭০/, পৃঃ ৩০

Dhaka University Institutional Repository



সচেষ্ট। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা' ও জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা' ইতিমধ্যেই মিথে পরিণত হয়ে লোকের মুখে-মুখে ফিরে। সুতরাং দেশকে নিয়ে কবিতা রচনা করা বাংলা সাহিত্যে নতুন ঘটনা নয়, যদিও পাকিস্তান আমলের কবিতায় এগুলিতে ভিন্ন তাৎপর্য অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

ষাটের দশকের শুরুতে আমাদের কবিরা পূর্ব বাংলার দিকে নতুন করে তাকালেন। শিকড়ের অনুসন্ধান কালে সানাউল হকের মনে বাংলাদেশের প্রকৃতির যে-একটি সুস্নিগ্ধ মায়াময় রূপ জেগে উঠেছিল তা তিনি ষাটটি সনেটে, কখনো সরাসরি কখনো প্রতীকভাবে, উপস্থিত করেছেন। 'তিতাস' নদীর জনপদগুলিতে কবির বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে। প্রবাসী মনে সেই পুরানো স্মৃতি এক বিশেষ রূপ ও রস নিয়ে কবির মানস পটে হাজির হয়। কবি-মানসী ও গ্রাম-প্রকৃতি পরস্পর সমানুরাগে প্রবাহিত হয়ে কবি-প্রকৃতিকে প্রকাশ করেছে। কবির চোখে সে-প্রকৃতি এভাবে ধরা দিয়েছে:

কাঁঠালিচাঁপার গন্ধ, কাঁঠালের রস
এখানে শেয়ালকাঁটা, চোরকাঁটা ঠাসা
অইখানে ঝোঁপঝাড় পাতা ঝকঝক —
কুত্তোষি মেয়েদের মেঠো পাড়াপাড়ি হাসা।
ডাকাডাকা রূপবান এঁকে শিস-চিত্র
তিতাসের ডাক কেনে খোঁজে কোথা চিলা —
টিয়ে পাখি মাছরাঙা রূপসী রঙিলা
উড়ে যায় দূরে আলে কিচির মিচির।[৩৭]

পরবর্তী কালে 'সূর্য অন্যত্র'—তে এই মনোগঠনের আরো প্রসারতা লক্ষ্য করা যায়। 'তিতাস' নামক দীর্ঘ কবিতায় একের-পর-এক শব্দচিত্রের সৃষ্টি করে 'নিভৃত মনের নদী'

---

৩৭। /কবিতার নাম নেই/, সম্ভবা অনন্যা /ঢাকা : পূর্বাশা, ১৯৬২, পৃঃ ৩১

Dhaka University Institutional Repository



চিত্রকল্পের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার প্রাণপুরুষকে আবিষ্কার এবং বিশ্বের সমগ্র অস্তিত্বে তার প্রভাব নির্ণয়ের চেষ্টা আছে ।

শীতলপাটির মতো নীল আমাদের প্রিয়া নদী
রূপালি কেশের গুচ্ছ সুচিক্কন ঢেউ-ঢেউ যায় —
তন্বঙ্গী — কতো গ্রাম উদ্ভাসিত তীরে-তীরে তার ।
ডুব দাও গহীন জলের স্বাদ পেতে চাও যদি ।
মাঠে-মাঠে ভুঁই-লুকোচুরি, কুপাতা লুকায় উঁকিঝুঁকি ঃ
স্ফুটিত ফুলের আভা একাকার সৃষ্টি জ্যোতিলোক ।
লাজে কী আভা স্ফটিক মুখে, কী মানুষী চোখ —
আকর্ষণে দীপ উদয় সন্ধ্যাতারা, চাঁদ সোনামুখী ।[৩৬]

মোটামুটি একই সময়ে রচিত হয় সৈয়দ আলী আহসানের তিন পর্যায়ে বিন্যস্ত সুখ্যাত 'আমার পূর্ব বাংলা'। কবির মনের গভীরে দেশ সম্পর্কে তাঁর আত্মদর্শনের ধারণা, দেশের প্রকৃতি ও মানুষকে দেখার অভিজ্ঞতা, দেশবাসী যেভাবে প্রকৃতি ও জন্মভূমিকে ভোগ করে ও ভালবাসে তার উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে এই কবিতায় । সঙ্গে-সঙ্গে প্রকৃতি ও মানুষের মিশ্রিত জীবন-সংগ্রাম ও ঐতিহ্যলালিত চিরাচরিত ঘটনাবলী, রসগ্রাহিতা ও আত্ম-উন্মোচনের বৈশিষ্ট্য এক সচ্ছলপ্রবাহে কবিতাত্রয়ে উৎসারিত হয়েছে ।

ক.　এখানে নদীর মতো এক দেশ
শান্ত, স্ফীত, কল্লোলময়ী
বিচিত্ররূপিনী অনেক বর্ণের রেখাঙ্কন
এ-আমার পূর্ব বাংলা
যার উপমা একটি শান্ত শীতল নদী ।।[৩৭]

---

৩৬। সূর্য অন্যতর, ঢাকা ঃ সমকাল প্রকাশনী, ১৯৬২, পৃঃ ৩

৩৭। আমার পূর্ব বাংলা ঃ এক, একক সন্ধ্যায় বসন্ত, ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬২, পৃঃ ৫১

Dhaka University Institutional Repository



খ. কাকের চোখের মতো কালো চুল
এলিয়ে
পানিতে পা ডুবিয়ে — রাঙা উৎপল
যার উপমা
হৃদয় ছুঁয়ে — যাওয়া সিক্ত নীলাম্বরীতে
দেহ ঘিরে
যে দেহের উপমা স্নিগ্ধ তাল —
তুমি আমার পূর্ব বাংলা
পুলকিত সচ্ছলতায় প্রগাঢ় নিকুঞ্জ[৩৯ক]

গ. এবং সমস্ত শব্দের একাগ্রতায়
আমার পূর্ব বাংলা
একাকী একটি বৃষ্টি — রাত্রের শব্দের মতো
আমার পূর্ব বাংলা অনেক রাত্রে
গাছের পাতায় বৃষ্টির শব্দের মতো ।।[৩৯খ]

১৯৬৫ সালের যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় এই চেতনা আরো পুষ্টি ও গভীরতা অর্জন করে । [illegible] সাময়িক স্বদেশ প্রেমে উদ্দীপিত হয়ে অনেকে স্বদেশ বিষয়ক কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেন । তরুণ কবিরা বিশেষভাবে যত্নবান ছিলেন নিজেদের চারপাশের প্রকৃতি-ঐতিহ্য ও মানুষকে বিষয় করে সাহিত্য-সৃষ্টিতে । তাঁরা অপার বিস্ময়ে ও আবেগে অনুভব করেছেন নিজেদের শিরা-ধমনী-স্নায়ু-রক্তপ্রবাহে স্বদেশের ও স্বজাতির প্রতি নিবিড় মমতা ও দুর্বলতা । চিরদিনের সুপ্ত দেশপ্রীতি এই সংকটে সহসা উচ্ছ্বসিত বেগে নির্গত হয় ।

আমার হৃৎপিণ্ডের মত
আমার সত্তার মত
আমার অজানা স্নায়ুতন্ত্রীর মত
সর্বক্ষণ সত্য আমার দেশ
আমার দেহের পাঁজর কান্নায় তোমাতেই আমি সমর্পিত ।[৪০]

---

৩৯ক। আমার পূর্ব বাংলা : দুই, ঐ, পৃঃ ৫৩-৫৪
৩৯খ। আমার পূর্ব বাংলা : তিন, ঐ, পৃঃ ৫৭
৪০। হাসান হাফিজুর রহমান, অনবরত স্বদেশ, আর্ত শব্দাবলী, (ঢাকা: পুঁথিপত্র, ১৯৬৮), পৃঃ ২৫

Dhaka University Institutional Repository



অবলা

পাহাড়ের মত এই চিরশ্যাম তরুণ হরিণী
শিশু তোতা ও নারী বন্যা উদাস কূজনে মেতে ওঠা
সলিলে উন্মুক্ত অশ্রু বিষাদ বিধুর
প্রাণের গানধারা, উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত
উন্মুখিত প্রত্যাশার তীব্র স্রোতমুখ।
আমার চৈতন্য সাজে রাত্রিদিন তার ধ্বনি —[41]

'আমার দেশ ও স্বদেশ' এই শীর্ষক সাতটি কবিতার মাধ্যমে আ.ন.ম. সফিউর রশীদ (জ. ১৯৩৮) মাতৃভূমির প্রতি নিজের প্রগাঢ় ভালবাসা ও নিজের জীবনে তার প্রভাবের কথা ব্যক্ত করেছেন। মধ্যে-মধ্যে পাকিস্তানের প্রশ্ন যদিও অনুপস্থিত হয়না, পূর্ব বাংলার প্রসঙ্গেই কবি অধিকতর স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সবুজে-শ্যামলে-পল্লীপ্রাণ এদেশ কবির চৈতন্যকে যেভাবে স্পর্শ করেছে ও ঋতুতে-ঋতুতে প্রভাব বিস্তার করে মনের প্রতিচ্ছবি নির্মাণ করেছে তার অনুপম বর্ণনা দিয়েছেন কবি।

কত যে প্রসন্ন তুমি পরিচ্ছন্ন জানি মা আমার
অতন্দ্র তোমার নিষ্ঠা, নিরুদ্বেগ মায়া সারল্যের
অন্তর বসি দেহে, অশান্ত যে স্মৃতি চেতনায়
মধুর শৈশব-স্বপ্ন। কৈশোরের প্রখর সন্ধ্যায়
আমাকে নিয়েছো কোলে মার বুক থেকে — তারপর
কত না স্বর্ণ-দিনে সবুজের অনুরাগে প্রভাতে সুন্দর
কেটেছে প্রহর যতো। বিস্মিত দুচোখে প্রতিদিন
দিয়েছো অবাধ তৃপ্তি, পুষ্টি প্রাণ আবেগে নবীন
ক্রমশ তোমার সাথে পরিচয়, উত্তাপে সূর্যের প্রীতি।
...  ... । মা আমার, কৈশোরের দিন
ক্রমশ অনুরাগে পল্লবিতে হয়েছে রঙিন।[42]

---

৪১। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, শিশুতোতা, বিপন্ন বিষাদ, ঢাকাঃ আলকজি, ১৯৬৬, পৃঃ ৬
৪২। ১নং কবিতা, শীতে-বসন্তে, ঢাকা ঃ ১৯৬৭, পৃঃ ৫৭

Dhaka University Institutional Repository



স্বদেশকে উপলব্ধি করার এই আন্তরিক প্রয়াস দুরাশায় প্রসারিত হয়। একটি ধারায় অঙ্কিত হয় সমকালীন জীবনের দুর্দশাগ্রস্ত রূপ। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিভিন্ন দিকের নৈরাজ্য, হতাশা, অবক্ষয় ও অসঙ্গতি ছিল কবিদের মনে স্বদেশ-সম্পর্কে যে সামগ্রিক চিত্র তৈরী হয়েছিল তা-ই অন্তর্লীন বেদনাবোধে প্লাবিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে অনেক কবিতায়। কখনো তাঁদের বক্তব্য স্পষ্ট, কখনো তির্যক। কারো-কারো কবিতায় এদেশ অচেনা-অজানা রূপে উপস্থাপিত, কারো কাছে কারাগার, বিধ্বস্ত পোড়ো বাড়ি, আবার কারো কাছে বিরান শ্মশান বা মরুভূমির চিত্রকল্পে দেদীপ্যমান।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান লিখেছেন :

> অথচ এখনই যেমন
> চিনিনা-চিনিনা-ভাবছে
> মন ঘুমকেনা,
> ছিন্নমূল,[৪৩]

হায়াৎ মামুদের /স্ব. ১৯৭১/ কবিতায় পাই :

> ঘোড় পেরুলেই দেখি
> চেনাঘর, চেনামাঠ নিমেষে নিশ্চিহ্ন
> হয়ে গেছে। ...
> এখানে ছায়াও নেই, বাবলার কাঁটা
> কখনো বেঁধে না পায়ে[৪৪]

মযহারুল ইসলামের কবিতায় আছে :

> আমি আমার পূর্ব বাংলাকে দেখেছি
> দেখেছি সে এক শ্মশানের ভস্মে
> মুখ থুবড়ে যেন পড়ে আছে
> পড়ে আছে আর কাল প্রবাহে চলেছে এগিয়ে —[৪৫]

---

৪৩। চেতনায় যে ধ্বনি, নিনু নিজাম, পৃঃ ১৬
৪৪। স্বদেশের ছবি, ~~[illegible]~~, ১৯৭১, ~~মুক্তাক্ত~~ আত্মচিত্র উদ্ধৃত, পৃ: ৮৪
৪৫। একটি দশকেই, নির্বাচিত প্রতিলিপি, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬২

Dhaka University Institutional Repository



ফজল শাহাবুদ্দিন লিখেছেন ঃ

এখন ফসল নেই বাংলাদেশে । হাওয়ায় ওড়েনা
ধূলো রাশি রাশি তুলোর শিখার মতো
সূর্যের শস্যকণা আর
আকাশেতে নেই নেই আকাংখার সম্পন্ন শরীর
এবং ঈশানী
ক্ষুধার পতাকা এক উড়ছে শুধুই
বিরাট আকাশ জুড়ে আশ্বিনের সুনীল ললাটে,[৪৬]

তরুণ কবি হুমায়ুন কবির / ১৯৪৭ – ১৯৭২/ বাংলাকে দেখেছেন কারবালার প্রতীকে ঃ

কারবালা হয়ে যায় সমস্ত বাংলাদেশ, হায়
কারবালা হয়ে যায় ।
নিষ্পত্র সমস্ত বৃক্ষ, তৃণহীন প্রান্তর হা হা করে
জল নেই, জল নেই, কান্না কাটা শিশুদের গ্রীবা
চতুর্দিকে ঝলকায় কৃতান্ত সীমার ... ... ।[৪৭]

দ্বিতীয় ধারাটি প্রাচীন ইতিহাসের সরণি বেয়ে এবং লোকজ বিশ্বাস, সংস্কার ও দেশজ উত্তরাধিকারকে আশ্রয় করে শক্তি সঞ্চয় করে । চর্যাপদ, মঙ্গলকাব্য, লোককাহিনী ও লোক গাঁথার অনেক বিষয় কবিতার বিশ্বচিত্র অবলম্বন হল এবং নতুন-নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে আধুনিক জীবনভাবনার প্রকাশে সংযুক্ত হল । চর্যাগীতিকার হরিণী, শবরী, মনসামঙ্গলের চাঁদ-সদাগর, বেহুলা লখিন্দর, লোক কাহিনীর রূপভান, সোনাভান, মহুয়া মলুয়া, পদাবলীর রাধা-কৃষ্ণ প্রভৃতির কথা উল্লেখযোগ্য । বিশেষ করে মনসামঙ্গলের কাহিনী আমাদের কবিরা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলেন । চাঁদ সদাগরের অনমনীয় পৌরুষ ও দেবতার বিরুদ্ধে ক্লান্তিহীন

---

৪৬। ললাট ঃ ১৩৭৬, আবদুল হাফিজ সম্পাদিত রক্তাক্ত মানচিত্র/ গ্রন্থের ৮৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ।

৪৭। বাংলার কারবালা, রক্তাক্ত মানচিত্র, ৯২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ।

Dhaka University Institutional Repository



লড়াই, মৃত পতির লাশ নিয়ে বেহুলার কলার মান্দাসে চড়ে শাপুরের পথে স্বর্গলোকে যাত্রা প্রভৃতি সংগ্রামী বাঙালী চরিত্রের নির্ভরশীল প্রতীকে পরিণত হন। অনেকে এই উপকরণগুলির সযত্ন পরিচর্যা করেছেন। জিয়া হায়দার (জ. ১৯৩৬) 'কোটারে ইচ্ছেগুলো'তে প্রাচীন জীবনের অনেক উপকরণ ব্যবহার করেছেন, এমনকি তিনি লখিন্দর, বেহুলা, সনকা, চাঁদসদাগর ও মনসা নামক পঞ্চ কবিতাও রচনা করেছেন। এগুলিতে দেবতাকে অগ্রাহ্য করার সঙ্গে-সঙ্গে কবির প্রবল জীবনোৎকণ্ঠা ও আদর্শানুভূতিও ব্যক্ত হয়েছে।

> আলস্যের ব্যভিচারে নিষ্কাম হে দেবতা, শোনো
> জীবনের সংগ্রামে গর্বিতা এই রমণীর জীবন প্রার্থনা
> আমাকে ফিরিয়ে দাও লখিন্দর — জীবনের প্রেম।[৪৮]

এবং

> মানুষের প্রতিনিধি যদি আমি, এই চক্ষু মেলে
> সত্যের দেবতা ছাড়া অন্য কোনো দেবতা মানিনে।
> তাই কি আমার মধ্যে বাসনার পাপ এনে হায়
> কুচক্রী দেবতা যতো পেতে চায় নৈবেদ্য আমার।
> কিন্তু হায়, একান্ত বিশ্বাসে আমি জেনেছি কেবল
> মানবীয় পৌরুষের পরাজয় নেই।
>
> অতএব ফিরে যা মনসা কালি পুনরায় যদি
> আমার শক্তির দেব, পরম আরাধ্য তিনি — আমি
> সুন্দর কল্যাণ আর সত্যের মহৎ প্রার্থনায়
> এ সন্ধ্যার সন্নিধানে উৎসর্গিত প্রাণ।।[৪৯]

এই পর্যায়ের উৎকৃষ্ট কবিতা আল মাহমুদের 'সোনালী কাবিন'। উভয় পুরুষের জবানীতে রচিত এই দীর্ঘ কবিতাটি চৌদ্দটি স্তবকে বিন্যস্ত। কবি তাঁর প্রণয়িনীকে তাঁর সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন এবং এই প্রসঙ্গে নিজের ঐতিহ্য, বিশ্বাস, আদর্শ,

---

৪৮। বেহুলা, কোটারে ইচ্ছেগুলো (ঢাকা: লাইসিং বুক এজেন্সী, ১৯৬৮), পৃঃ ৩৪

৪৯। চাঁদ সদাগর, ঐ, পৃঃ ৩৮–৩৯।

Dhaka University Institutional Repository



স্বপ্ন ও সংকল্পের কথা একের-পর-এক উন্মোচিত করে কাহিনিনামা প্রস্তুত করেছেন। এর মাধ্যমে যথার্থ কোন সমাজের সন্নিষ্ঠ শ্রীসম্পদ, সমগ্র পৌরুষ, তীব্র স্বাধীনতাস্পৃহা, নিঃসংকোচ দেশানুভূতি, সাম্যের ঐতিহ্য ও প্রগাঢ় প্রেমকৃতির সমন্বয়ে চর্যাপদ – মুকুন্দরাম–আলাওল–সিদ্ধ একসাথের লোকায়ত বাংলার প্রাণপদ্মের মত উদ্ভিন্ন হয়েছে এক নবীন নায়কের, যাঁর স্বপ্ন প্রেমময় শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা করা।

শ্রমিক সাম্যের মন্ত্রে কিরাতেরা উঠিয়েছে হাত
হিয়েনসাঙের দেশে শান্তি নামে দেখো প্রিয়তমা,
এশিয়ায় যারা আনে কর্মজীবী সাম্যের দাওয়াত
তাদের পোশাকে এসো এঁটে দেই বীরের তকমা।
আমাদের ধর্ম হোক ফসলের সুষম বণ্টন
পরম স্বস্তির মন্ত্রে গেয়ে ওঠো শ্রেণীর উচ্ছেদ,
এমন প্রেমের বাক্য সাহসিনী করো উচ্চারণ
যেন না ঢুকতে পারে লোকধর্মে আর ভেদাভেদ।[৫০]

পূর্ব বাংলা বিষয়ক কবিতাসমূহ প্রবহমান ধারার মধ্যে বিশেষ তাৎপর্যের, এই দাবী করে আমরা এই অংশের আলোচনা শুরু করেছি। নান্দনিক বিচারে এগুলি সফলতার দাবিদার; আবেগ ও আঙ্গিকের সহযোগী মিলনে কবিতাগুলি শিল্পোত্তীর্ণ হয়েছে। সেটা সম্ভব হওয়ার কারণ এটা হতে পারে যে, সেকালের পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত মানসে সৃষ্টি হচ্ছিল যে নতুন জাতীয়তাবাদের প্রেরণা, তাকে অন্তরঙ্গ ও আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন কবিরা। একারণে কবিতায় জনগণের একটি উদার পরিমণ্ডল লাভ করায় তাদের প্রতিভার সহজ বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। কবিতাগুলির আবেদনও, তাই, শুধু সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা প্রসারিত হয়েছে রাজনীতি পর্যন্ত।

---

৫০। সোনালি কাবিন। কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছে সমকাল পত্রিকায় (১২শ বর্ষ, ১৩৭৫, চৈত্র-কার্তিক/অগ্রহায়ণ-চৈত্র সংখ্যা)। পরে ১৯৭০ সালে আরো কয়েকটি কবিতাসহ একই নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ঢাকার সন্ধানী প্রকাশনী থেকে। পৃ: ৪১

Dhaka University Institutional Repository



## ৪ পাকিস্তান-বিরোধী ব্যঙ্গ কবিতা

একদিকে পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের মনে বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশ লাভ করছিল, অপরদিকে দ্রুত হ্রাস পাচ্ছিল পাকিস্তানবাদের আবেদন। আইউব খানের শাসনামলে পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব বাংলার অসংলগ্নতা বিশেষভাবে প্রকট হতে শুরু করে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মসূচি এ প্রদেশবাসীর কাছে প্রতিকূল ও তাৎপর্যহীন বলে বিবেচিত হয়। দশকের দ্বিতীয়দিকে ব্যাপ্তি লাভ করে নৈরাশ্য, দুঃশাসন, হতাশা ও বিপর্যয়। পূর্ব বাংলার প্রতিনিধি হিসাবে আইউব খান যাঁদের মনোনীত করেছিলেন তাঁরাও ছিলেন অনুন্নত চরিত্রের, দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি উদাসীন ও একান্তভাবে তাঁর বশংবদ। এই অপরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক অবস্থা, মূল্যবোধের বিপর্যয়, অসৎ নেতৃত্বকে ব্যঙ্গ করে রচিত হয়েছিল কিছু-কিছু কবিতা। এধরনের কবিতার প্রথম সংকলন হচ্ছে মযহারুল ইসলামের 'আর্তনাদে বিদর্প'।[৫১]

মযহারুল ইসলাম একজন প্রবল আবেগপ্রবণ কবি-ব্যক্তিত্ব। পূর্ব বাংলার আলোচ্য দশকের অস্বস্তিকর দিনগুলিতে তিনি নীরব থাকতে পারেননি। তাঁর ক্ষোভ ও ক্রোধ প্রবল লাভাস্রোতের মত ঝলকে-ঝলকে নির্গত হয়েছে। যাদের তিনি ব্যঙ্গ করেছেন তারা ছিল স্থূল জীবনচর্যার ও মূল্যবোধের অধিকারী; ফলে তাঁকেও ব্যবহার করতে হয়েছে প্রাকৃত প্রকাশভঙ্গী ও সরল আবেগ লক্ষণীয়, তিনি কদাচ সুরুচিকে লঙ্ঘন করেননি। গ্রন্থের 'পূর্বকথা'য় তিনি যা বলেছেন, তাও এখানে স্মরণ করা যেতে পারে:

> আর্তনাদে বিদর্প গ্রন্থের কবিতাগুলো বিগত দশকের রাজনৈতিক পটভূমিকায় রচিত। ... পূর্ব বাংলায় বিগত দশকের শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কথা বলা দুরূহ ছিল। আমাকে তাই ব্যঙ্গ কবিতার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল।

ফজলুল কাদের চৌধুরী ও আবদুস সবুর খান ছিলেন আইউব খানের দুই প্রধান বাঙালী

---

৫১। ঢাকা: পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ১৩৭৭

Dhaka University Institutional Repository



পার্শ্বচর। এই কাব্যে তাঁরা ফজলু চাচা ও সবুরু খান নামে অভিহিত হয়েছেন। মযহারুল ইসলাম তাঁদের নানা 'কীর্তির' বর্ণনা পরিহাসচ্ছলে দিয়েছেন।

ক. চট্টগ্রামের ফজলু চাচাই
খান সাহেবের দালাল
বলেন তিনি কুমীর কাছিম
সব রেফ্যুজ হালাল।[৫২]

খ. পিঁপড়ে পুকুরে ভেঙে সব দাঁত
সবুরু খান, তাঁর খুলেছে বরাত।
বাঘের দেশের সেই খান সবুরু
সত্যি তো বাংলার বড় গৌরব।[৫৩]

ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব নিয়ে এঁদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। পরস্পরের উপর টেক্কা দিয়ে আইউব খানের কাছে অধিকতর প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্য উভয়েই চেষ্টা করতেন। ফজলুল কাদের প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে খেতাব পেলে সবুর খানও নানাভাবে সেটা সংগ্রহ করেন। এই ঘটনাটি একটি কবিতার বিষয়বস্তু হয়েছে।

চট্টগ্রামের দন্তবিহীন বলদ সেবার
যেই না পেল খেতাব
খুলনা জেলার বাঘা কুকুর ভাবলো মনে
সইব কিসে এতাপ।[৫৪]

প্রদেশপাল মোনায়েম খান ছিলেন এই অঞ্চলে আইউব খানের সবচেয়ে বিশ্বস্ত প্রতিনিধি। কাব্যে তিনি 'ছোট খান' নামে অভিহিত হয়েছেন। প্রেসিডেন্ট ছিলেন ছোট খানের

৫২। চট্টগ্রামের ফজলু চাচা, ঐ, পৃঃ ৬৫
৫৩। দাঁত ভাঙা খান, ঐ, পৃঃ ৬৬
৫৪। খেতাব, ঐ, পৃঃ ৩

Dhaka University Institutional Repository



একমাত্র ভরসা এবং বাবাসাহেব তিনি সেকথা প্রচার করতে দ্বিধা করতেন না। আইউব খান যতদিন ক্ষমতায় থাকবেন ততদিন তাঁকে কেউ প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা থেকে সরাতে পারবে না — তা-ও তিনি গৌরব ভরে প্রকাশ করতেন। উনসত্তরের অভ্যুত্থানের সময় তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়; এমন কি তাঁকে গোপনে সপরিবারে পূর্ব বাংলা ছেড়েও চলে যেতে হয়। এতে তিনি মনে মনে দুঃখ পান, তা বিষয়বস্তু হয়েছে একটি কবিতায়।

ছোট খান ভাবে তাই হাত রেখে বক্ষে
চরণের নীচে নেই পৃথিবীর চিহ্ন
কোথা গেলে বড় খান, কে করিবে রক্ষে
দেশ থেকে চিরতরে মূল আজ ছিন্ন।[55]

কাব্যের নায়ক আইউব খান। কয়েকটি কবিতা তাঁকে নিয়ে লেখা, অন্য কয়েকটিতে তিনি প্রসঙ্গক্রমে এসেছেন। তাঁর উপাধি বড় খান। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার দুর্বলতার কথা বললে তিনি জবাব দিতেন যে, ভারত পূর্ব বাংলা আক্রমণ করলে পশ্চিম পাকিস্তানের ফৌজ দিল্লি পর্যন্ত ধাওয়া করবে ভারতীয় বাহিনী একথা জানে, সুতরাং তারা পূর্ব বাংলা আক্রমণ করবে না। একটি কবিতায় এ-কথাগুলি আছে।

গোঁফ পাকিয়ে হাত ঘুরিয়ে
        বলেন হুজুর মুচকি হেসে
'ভয় কি তোমায় পাগলে আমুম
        তোমায় দেব জোরসে কেশে,
কাশের জোরে এ-অঞ্চলের
        আমুন যদি না-ই সে পাবে
তোমায় দেব ছিটিয়ে ভরর
        পানির ধারা ডাইনে বামে।'

---

৫৫। ছোট খান সংবাদ, ঐ, পৃঃ ৪১

Dhaka University Institutional Repository



'সাবাস হুজুর'! চেঁচিয়ে ওঠে
ভক্ত দলে চক্ষু বুঁজে
'এমন মহৎ অভয় বাণী
বিশ্ব জুড়ে পাইনি খুঁজে'।[৫৬]

এই নোংরা নেতৃত্বের অশুভ প্রভাব সামগ্রিকভাবে দেশের সমস্ত দিককে স্পর্শ করেছিল। সবচে মারাত্মক প্রভাব পড়েছিল রাজনীতিতে। কোনো সুস্থ আদর্শ ও নীতির অনুসরণ এখানে ছিলনা; কর্তাভজাই উন্নতির একমাত্র মাপকাঠি বলে বিবেচিত হত। একটি কবিতাতে কবি এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। এক শিষ্য তার গুরুর কাছে রাজনীতিতে অবতীর্ণ হবার অনুমতি ও প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রার্থনা করছে। গুরুর পরামর্শ নিম্নরূপ:

প্রথমে তুমি দিবস রাত্রি কোশেশ করে ডিগবাজি
শিক্ষা কর বছর খানেক প্রভুর কিছির কারসাজি,
দ্বিতীয়তঃ খাঁটি না হয় ভেজাল খাঁটা মণ চালিশ
তৈল কিনে রপ্ত কর চরণ কিম্বা শির মালিশ,
ডিগবাজি আর তৈল মাখায়ে যখন হবে ওস্তাদি
লাফিয়ে পড় রাজনীতিতে মাভৈ বলে বুক কাঁদি।[৫৭]

বিচার বিভাগও তার সুমহান আদর্শ বিচ্যুত হয়ে ক্ষমতাসীন নেতাদের মন যুগিয়ে চলত। 'কোন এক খান সাহেবের দেশে'র বিচার-প্রণালী বর্ণিত আছে একটি কবিতায়। বিচারক পর-পর চারটি 'ন্যায়বিচার' করেছেন। প্রথম মামলায় রস্তু খাঁকে হাত তুলে সম্ভাষণ না-করায় পনের জন আসামীর হস্ত কর্তন করা হয়, দ্বিতীয় মামলায় খালি পায়ে খাঁ সাহেবের দরবারে উপস্থিত হওয়ার অপরাধে অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করে পদকর্তন করা হয়; তৃতীয় মামলায় ঘুমের ঘোরে খাঁ সাহেবের নামে কুকথা বলায় আসামীর জিভ ছিঁড়ে ফেলা হয় এবং সর্বশেষ বিচারে আসামীদের চক্ষু উপড়ে ফেলা হয় খাঁ সাহেবকে কুর্ণিশ না-করার

---

৫৬। হুজুরের সমীপে, ঐ, পৃঃ ১০—১১
৫৭। গুরু শিষ্য, ঐ, পৃঃ ৯

Dhaka University Institutional Repository



অপরাধে । এই ন্যায়বিচারে খাঁ সাহেব খুবই প্রীত হলেন এবং বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতি বানিয়ে পারিতোষিক দিলেন ।

খবরে প্রকাশ, চারটি বিচারে খুশী হয়ে খাঁ সাহেব
বিচারপতিরে বাঁধলেন এনে শ্রেষ্ঠ পুরস্কারে
দেশের শীর্ষে চাকুরি দিলেন, তিনি তাঁর মোসাহেব
আনন্দগানে ভেসে গেল দেশ, উৎসব চারিধারে ।[৫৮]

কাব্যের প্রথম কবিতা 'আর্তনাদে বিবর্ণ' । দেশের পশ্চিমাঞ্চলে খবর রটে গেল, পূর্ব বাংলায় প্রচুর শিকার পাওয়া যায় । শিকারের আশায় অনেকে বুলেটের শক্তি পরীক্ষা করতে এখানে এলেন, এমনকি শেষ পর্যন্ত সপারিষদ খাঁ সাহেবও তশরীফ আনলেন । এদের অত্যাচারে পাখীর রাজ্যে হাহাকার পড়ে গেল । আইউব খানের লৌহ শাসনে পূর্ব বাংলার ছাত্র-বুদ্ধিজীবী-জনতার উপর যে নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতন হয়েছিল, রূপকের আড়ালে তারই কথা বলা হয়েছে এ-কবিতাটিতে ।

বাংলা দেশ শিকারের দেশ
পশ্চিমে রটে জনতার এই সংবাদ
বুলেট চালাতে আসেন অনেকে
চিত্তে যাদের আছে রক্তের রং—সাধ
এমন কি শেষে পারিষদ সহ
খান সাহেবের আগমন ঘটে বাংলায়,
আর্তনাদের হাহাকার জাগে
চট্টগ্রাম ঢাকা সিলেট পাবনা চালনায় ।[৫৯]

---

৫৮। বিচার, ঐ, পৃঃ ৯

৫৯। পৃঃ ২

Dhaka University Institutional Repository



সিকানদার আবু জাফরের 'বৃশ্চিকলগ্ন'[৬০] এ-ধরনের আরো একটি ব্যঙ্গ কবিতার সংকলন। কোনো ব্যক্তি বিশেষ নয়, বরং পাকিস্তানের বিচিত্র সমাজব্যবস্থা ও ক্ষমতাসীন শ্রেণীর অন্তঃসার শূন্যতাই তাঁর আক্রমণের ও ব্যঙ্গের বিষয়বস্তু হয়েছে। পাকিস্তান তাঁর কাছে একটি 'অবাক দেশ' হিসাবে প্রতীয়মান হয়েছে, কেননা এদেশের রীতি-নীতি সব কিছুই অবাক করার মতো। দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত নিয়মকানুন এদেশে ব্যর্থ হয়ে গেছে। 'অবাক দেশের জাতীয় সঙ্গীত', 'অবাক দেশের নাম সঙ্গীত', 'অবাক দেশের বিলাপ সঙ্গীত', 'অবাক দেশের প্রেম সঙ্গীত' ও 'অবাক দেশের সাধন সঙ্গীত' এই পাঁচটি কবিতাতে সে-দেশের পরিচয় পাওয়া যায়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর-পরই গোলাম মোস্তফা একটি কবিতায় লিখেছিলেন, যে পাকিস্তানে কোনো কিছুর অভাব নেই। সিকানদার আবু জাফরও বলেছেন, এই অবাক দেশে সব কিছু — লাজলজ্জা, গলায় হুক্কাহুয়া সুর, মুরগীর আণ্ডা, ভাতের ডাণ্ডা, গাভীর বাছুর, বালিশ-কাঁথা-মাদুর, হাল-ডাক-হাঁক, ঢাকঢোল-ঢোল, মাথা ভরা টাক, বিশাল পেটের ঢাক, ইমানদারীর বর্ম, ঠাট ঠমক, অন্তরে বাট, চোর-ডাকাত-শ্মশান-গোর, কাল-যম-শূল-শাল — আছে, কিন্তু মাথার খুলিতে এক ছটাকও ঘৃত নেই। সেই অবাক দেশটি তবু স্বাধীন বলে গর্ব করে।

মূল গায়েন। এমন স্বাধীন কে আর আছে।
সকলে। এমন স্বাধীন কে আর আছে

সব আছে তাই সব আছে
গরুর মত গলায় গলায়
হুক্কাহুয়া সুর আছে ।।[৬১]

আইয়ুব খানের শাসনের শেষ দিকে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড প্রচুর হয়েছে। আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনে অনেক ছাত্র-শ্রমিক-সাধারণ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। যারা ক্ষমতাসীন ছিলেন

---

৬০। ঢাকা: সমকাল প্রকাশনী, জানুয়ারী ১৯৭১

৬১। অবাক দেশের জাতীয় সঙ্গীত, ঐ, পৃঃ ৪

Dhaka University Institutional Repository



তাঁরা জনসেবক না-হয়ে নরঘাতক রূপেই পরিচিতি লাভ করেছিলেন। এই আলোকে অনুসরণ করে রচিত হয়েছে 'অবাক দেশের নাম সঙ্গীত'।

এখানে তোমার ভয়ে ভরা
এই শতকের বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক
বুদ্ধি বিবশ করা,
ছিঁচকে চোরে পূর্ণ সে দেশ
দস্যুদলে ভরা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি
পুণ্যভূমি হক বা না হক
সে যে বধ্যভূমি
সে যে তোমার বধ্যভূমি
সে যে আমার বধ্যভূমি।[৬২]

অন্য একটি কবিতায় কবি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন পাকিস্তানের অত্যাচারী শাসকদের পতনের। পাকিস্তানের শাসকেরা নানাভাবে একুশে ফেব্রুয়ারীর আদর্শকে ধূলিমলিন করতে চেষ্টা করত — কখনো সরাসরি, কখনো ছদ্মবেশে। কিন্তু কবি বলছেন যারা সেদিন প্রাণদান করেছিলেন, তাঁদের আত্মদানে অনেক রূপ রঙ দিয়েছে, এবং তাঁরা দিগন্তে কালবৈশাখীর ইঙ্গিত নিয়ে আসছেন। এই মত 'মহারাজ দেখ আমরা তোমাকে ধুলায় নামিয়ে আনবো'। এই কবিতাটি ব্যঙ্গ কবিতার আদলে রচিত হলেও এতে গাম্ভীর্য এসে গেছে অনেক।

জানলে মহারাজ
সেই একুশের ছেলেরা যারা
পুড়িয়ে ফেলে ব্যর্থ প্রাণের লাজ

---

৬২। 'অবাক দেশের নাম সঙ্গীত', ঐ, পৃঃ ১৯ ।

Dhaka University Institutional Repository



বুক দিয়েছে রক্তজবা কৃষ্ণচূড়ার ঠোঁটে
আজও যাদের নামের আজান
আকাশ আলো ঢেলে
কালবোশেখীর ঝঞ্ঝা হয়ে ওঠে
লাখো তাদের ভাইবোনেরা
পথে পথে মুখোশ দিচ্ছে ছিঁড়ে;
মুখ লুকোতে
জায়গা কোথায়
এত চোখের তীরে
ইতিহাসের সর্বনাশা নীলাম ডাকে আজ
ধুলোর দামে বিকিয়ে যাচ্ছে
বঙ্গ সোনার তাজ।[৬১]

'আর্তনাদে বিবর্ণ' ও 'সূর্যচিক মধু' সংকলনদ্বয়ে পাকিস্তানের সমাজব্যবস্থার বিবিধ অসংগতি ও বৈপরীত্যের দিকগুলি তাৎপর্যেই ব্যঙ্গের লক্ষ্য হয়েছে। পূর্বটিতে সাধারণভাবে প্রবৃত্তিরই প্রাধান্য পেয়েছে; কবিতাগুলি লিখিত হয়েছে বিশেষ গোষ্ঠী বা ব্যক্তিকে নিকট-সামনে রেখে। কবির নিরাসক্তি এখানে সর্বত্র রক্ষিত হয়নি। তবে কবির পক্ষে বলা যেতে পারে যে, এক উত্তেজনামুখর সময়ে এগুলি রচিত হয়েছিল। তাঁর লক্ষ্য ছিল সেকালের চাহিদা-পূরণ, কালোত্তীর্ণ হওয়া নয়। একটি বিশেষ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাকে তখনকার কাজে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। ফলে তাঁর পক্ষে নৈর্ব্যক্তিকতা রক্ষা করা আদৌ সম্ভবপর ছিল কিনা, তা-ও বিচার্য। এর তুলনায় দ্বিতীয়টি ভিন্ন স্বাদের ও উন্নততর শিল্প-মেজাজের। এতে বিষয়ীভূত হয়েছে সামগ্রিক পরিবেশের অসংগতি, বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নয়। পাকিস্তানের মত অবাক করা দেশের কাণ্ড-কারখানায় কবির সহজ কৌতুক-প্রিয়তা উছলে উঠেছে — যার ফসল এর কবিতাসমূহ।

---

৬৩। ইতিহাসের নীলাম, ঐ, পৃঃ ৩১ ।

Dhaka University Institutional Repository



## ৫ বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিষয়ক কবিতা

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে বিষয়ীভূত করে রচিত কবিতা বেশি সংখ্যায় লিখিত হয়নি। তুলনামূলকভাবে অধিকতর চেতনাসম্পন্ন হিসাবে কবিদের পক্ষে সম্ভব ছিল জনগণের মূল আকাঙ্ক্ষাকে কবিতায় ভাষা দেয়া, কিন্তু তা হয়নি। তবে পরোক্ষে এ-ধরনের ইঙ্গিত একেবারে দুর্লক্ষ্য নয়। বেহাল আদিলের একটি কবিতায় বলা হয়েছে যে, শ্যামলী পূর্ব বাংলার মেহনতী মানুষের মিছিল 'দিগন্তে সুস্পষ্ট আলোর আভাস' দেয় এবং 'নোতুন দিনের সংবাদ আনে' যে, 'বুক তার / কত মুক্ত হবে'।[৬৪] শামসুর রাহমানের 'টেলেমেকাস' কবিতাটিতেও অনুরূপ দ্যোতনা বিদ্যমান।[৬৪ক]

১৯৬৯ সালের অভ্যুত্থানের সময় স্বাধীনতার চিন্তা তরুণ রাজনৈতিক কর্মীদের মনে স্থান করে নেয়। এই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাঙালী জাতীয়তাবাদী শক্তি পুরুষ শক্তি অর্জন করে। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হন এবং অনেকে ছয় দফার স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে স্বাধিকার তথা স্বাধীনতার আন্দোলন হিসাবে বিবেচনা করতে চেষ্টা করেন। যে-সব কবি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের রচনা এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। এ-ধরনের কিছু-কিছু কবিতায় স্বাধীনতার প্রসঙ্গ এসেছে। এ-পটভূমিতে রচিত মযহারুল ইসলামের কয়েকটি কবিতার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। একটি কবিতায় তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যিনি এদেশের রাজনীতিতে প্রখর উজ্জ্বল আলো বিকীর্ণ করে অন্ধকারকে দূর করেছেন এবং দেশবাসীর

---

৬৪। শ্যামলী দেশের মত প্রান্তর, শ্যামলী দেশের মত প্রান্তর,/ঢাকা : ১৯৬৮,পৃঃ ১।
(সংকলনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে ; পৃঃ ৪৩৪- ৪৩৭)

৬৪ক। নিরালোকে দিব্যরথ /ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স,ফাল্গুন ১৩৭৫/, পৃঃ ১৩-১৪ ।

মনে আস্থা ও সাহস এনে দিয়েছেন ।

একটি সূর্যের অসংখ্য প্রোজ্জ্বল আলোর সত্তা
আমাদের অন্ধকারকে নির্মূল করে দিল ।
... ... ...
অতঃপর আমরা সূর্যের আলোয় অবগাহন করে
অন্য শ্যামল আমাদের মাটিতে
দাঁড়ালাম প্রত্যয় ও বিশ্বাসে
আত্মদানের হাত প্রসারিত করার দিগন্তে ।[৬৫]

অন্য একটি কবিতায় তিনি পূর্ব বাংলার বাইশ বছরের /১৯৪৭—৬৯/ ইতিহাসকে ছয়জন যাত্রীর একটি কামরার রূপকে উপস্থিত করেছেন । এই কামরাটি বাইশ বছর ধরে অবিশ্রাম ছুটে চলছে গন্তব্যের দিক এবং এর পেছনে-পেছনে সর্বদা ছায়ার মত অনুসরণ করছে একটি কালো হাত — যা কখনো বজ্রমুঠে, কখনো গলা চেপে ধরার অপপ্রয়াসে উদ্যত হয়ে আছে । যাত্রীরা পর্যায়ক্রমে এই ভয়ংকর হাতের নিষ্ঠুরতার কথা বর্ণনা করছে এবং শেষে সমবেত কণ্ঠে আওয়াজ তুলছে 'আমরা মুক্তি চাই' । এই কবিতাটিকে আওয়ামী লীগের ছয়দফার আলোকে ব্যাখ্যা করা যায় ।

ষষ্ঠ যাত্রী ঃ

মাঝে মাঝেই আমার মনে হয়
বাইশটি বছর যেন
আমি যেন একটি কবরীতে বসে আছি
আমার সন্তানগণ যেন পরাধীন দেশের নাগরিক
আমার ভবিষ্যত বংশধর সম্ভাবনাহীন অনিশ্চয়তায় নিমগ্ন
চারদিক থেকে আমার অস্তিত্বের গলা টিপে ধরে আছে
এই হাত
কলঙ্কিত দাসলিপি স্বাক্ষরিত ।

---

৬৫। একটি সূর্যের হাত ধরে, /বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে/, বিচিত্র প্রতিলিপি /ঢাকা ঃ পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ১৯৭৮, পৃঃ ৬/ ।

Dhaka University Institutional Repository



জনতার কণ্ঠস্বর :

আমরা মুক্তি চাই
আমরা মুক্তি চাই
আমরা মুক্তি চাই ।।[৬৬]

অন্য একটি কবিতায় তিনি পূর্ব বাংলার স্বার্থে সংঘবদ্ধ হওয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ।

এসো আমরা একটি আবেগে মিলিত হই
একটি সড়কেই হাতে হাত মেলাই :
আমার পূর্ব বাংলা
আমার অস্তিত্ব, আমার সার্বিক সত্তা ।[৬৭]

আসলে, মযহারুল ইসলাম উনসত্তরের অভ্যুত্থানকে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন হিসাবেই বিবেচনা করে ছিলেন । যত্র-তত্র তিনি শ্লোকের আড়ালে কথা বলেছেন কিন্তু সে-শ্লোক অতি স্পষ্ট ও সুপ্রকাশিত । একটি কবিতায় শ্যামল পূর্ব বাংলা একটি অশ্বের রূপকে বর্ণিত হয়েছে । সে-অশ্ব বাইশ বছর ধরে তার অত্যাচারী আরোহীর কশাঘাতে জর্জরিত হয়ে এখন ক্ষিপ্ত ও উদ্দাম হয়ে উঠেছে । সে এবার তার আরোহীকে ফেলে দিয়ে মুক্ত ও স্বাধীনভাবে দাঁড়াতে চায় ।

শ্যামল অশ্ব, আহা সে অশ্ব পিঠ বাঁকা করে ছুটেছে পথে
ক্রোধ কষায়িত আরোহীর হাতে শাণিত চাবুক
এক দুই করে, দশ বিশ করে ছুটেছে বাইশ বছর হতে
শ্যামল অশ্ব, ক্লান্ত, শ্রান্ত, দুরু দুরু বুক ।
... ... ...
শ্যামল অশ্ব পিঠ হতে তার বাঁকাতেই আজ অশ্বারোহীকে
ফেলবেই তাকে পায়ের দাপটে খুরের আঘাতে
সকল বাঁধন ছুটে তারপর কলুষ শিকল আপনি ছিঁড়ে
মুক্ত স্বাধীন অশ্ব দাঁড়াবে স্নিগ্ধ ছায়ে ।[৬৮]

---

৬৬। একটি হাত : জয় বাংলা : জনতার কণ্ঠস্বর, ঐ, পৃঃ ৬৮-৬৯
৬৭। একটি সড়কেই, ঐ, পৃঃ ৬৩
৬৮। একটি অশ্বের পিঠে; ১৯৬৯, ঐ, পৃঃ ৯৬

Dhaka University Institutional Repository



সিকান্দার আবু জাফরের একটি মুদ্রিত অথচ অপ্রকাশিত কাব্য সম্পর্কে এ-প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। 'বাংলা ছাড়ো' নামক এ-কাব্যের সর্বশেষ কবিতাটি রচিত হয়েছে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে। কবিতাগুলির রচনা শুরু হয় উনসত্তরের অভ্যুত্থানের সময় থেকে।[৬৯]

একটি কবিতায় কবি বলেছেন, যখন থেকে তাঁর মাতৃভূমিতে অত্যাচার ও নির্যাতনের চিহ্ন প্রকট হয়ে দেখা দিতে শুরু করল, তখন থেকে তিনিও স্বদেশ প্রেমে জাগরিত হলেন।

দাবানলে তোমার অরণ্যের দগ্ধ প্রশান্তি
শুকনো বিচারীর কবরে তোমার
সবুজার্দ্র ঘাসের লাশ দেখে
তোমার মাঠে জ্বালানো আমার
আকুল স্নেহের পায়রা
বীতাশ্রু অশ্বত্থামা-অসহায় যখন :
হে দেশ, তোমার জন্যে সংকোচের শর্তহীন
তখন থেকে আমার ভালবাসা।[৬৯ক]

অত্যাচার, পীড়ন ও সকল প্রকার মানবিক মূল্যবোধের বিপর্যয় কবিকে অন্ধ করে দিয়েছে, নিজের শক্তি ও সামর্থ্যের উপর এসেছে তাঁর প্রবল অবিশ্বাস। এ-অন্ধতাকে কাটিয়ে উঠার জন্য তিনি মৃত্যুহীন জননী মাতৃভূমির কাছে আকুল আশ্বাস ও নির্ভরতা প্রার্থনা করেছেন।

অন্ধ হয়ে গেছি আমি।
বিশ্বাসের অনুভূতিহীন শিশু
তাই বুঝি পেতে চাই জননীর অভয় নির্ভর,
হাত ধরো হে জননী, মৃত্যুহীন হে আমার ধাত্রী জন্মভূমি
আমাকে নির্ভয় করো।[৭০]

---

৬৯ক আবদুল হাফিজ পূর্বোক্ত প্রবন্ধে গ্রন্থটির প্রকাশ কাল বলেছেন এপ্রিল, ১৯৭১। কিন্তু এটি প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

৬৯ক। হে আমার দেশ, পৃঃ ৮

৭০। আমাকে নির্ভয় জয় করো, পৃঃ ২২

Dhaka University Institutional Repository



বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ইতিহাসচারিণী বাংলার বন্দনা করেছেন তিনি একটি কবিতায়। 'কুণ্ঠিত কৃষকের', 'লুণ্ঠিত মজুরের', 'লাঞ্ছিত দুঃখিকের' ও 'জরাজীর্ণ' 'জেলে' 'বাগদি' 'তাঁতী' 'শোষিত' পতিত' 'নিপীড়িত' 'ভিখারী' 'ভুখারী' ও অনাথের' বাংলাকে ইতিহাস ও শিল্পের পটে স্থাপন করে তিনি এর জয় ঘোষণা করে-ছেন এই কবিতায়। 'জয় বাংলা' স্লোগানের চিন্তাধারা এখানে লক্ষ করার মত।

চির যুগমানবের কল্যাণ — মানসের
ইতিহাস চারিণী বাংলা,
জয় জয় জননী বাংলা ।।
নবারুণ — বর্ণিনী
রামধনু — দর্পিনী
দামিনী —সীমন্তিনী বাংলা,
পর্বত —অদ্রিণী
সমুদ্র —অঙ্গিনী
শিল্প —নন্দিনী বাংলা ঃ
জয় জয় জননী বাংলা ।।[৭১]

অনুরূপ ভাবে 'যুগচেতনার ভিত্তিভূমি' নিত্যভূমি বাংলাকে তিনি বন্দনা করেছেন 'গরবিনী মা-জননী' কবিতায়। বাংলার বিদ্রোহী তরুণেরা মা-জননীর গর্বের অন্যতম হেতু।

সেই মা কে যার হাজার হাজার
মা-নাম-ডাকা পাগল ছেলে
মায়ের নামে ঝাঁপিয়ে পড়ে
ভয়ংকরের দুর্বিপাকে ।[৭২]

---

৭১। ইতিহাসচারিণী বাংলা, পৃঃ ৩২
৭২। পৃঃ ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশ হিসাবে গণ্য করে শাসন ও শোষণ করছে এই চেতনা বাঙালীদের মনে সঞ্চারিত হলে এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য নতুন প্রত্যয়ে তাঁরা উদ্বোধিত হয়ে নিজেদের আত্মোৎসর্গের জন্য প্রস্তুতি নিল ।

এবং নূতন মুদ্রামূল্যে মানুষ,
কোনো কোনো মানুষ
কর্জ নেয় নিজের কাছ থেকে নিজেকে,

উপনিবেশিক মানচিত্রে তখন
সুস্পষ্ট নিরেট প্রাচীর ।[৭৩]

পাকিস্তানের সঙ্গে বাঙালীদের একাত্মতার স্বপ্ন যখন মিলিয়ে গেল, প্রীতির বিনিময়ে বাঙালীরা যখন পেল প্রতারণা, খরা ও হতাশা যখন স্থায়ী হতে শুরু করল, তখন শেষ রাতের মত এদেশের মানুষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে ডাক দিয়ে বলল — তোমরা বাংলা ছেড়ে যাও ।

কাল কি দ্বিধায় বিষণ্ণতায়
বন্দী রেখেছ ঘৃণার অগ্নিগিরি ।
আমার বুকেই ফিরিয়ে নেবো
শিশু বাগের শাখা,
তুমি আমার জনপদের
মাদুর থেকে নামো,
তুমি বাংলা ছাড়ো ।[৭৪]

---

৭৩। কাদাতুর সেতু, পৃঃ ৫২
৭৪। বাংলা ছাড়ো, পৃঃ ৫৫

Dhaka University Institutional Repository



এর ফলে এদেশের কাব্যে দ্রুত বদল হতে চলল। নিশাচর বাদুড়, পেঁচা, শকুন ও শেয়ালের অমঙ্গল ধ্বনি মিলাতে লাগল, আর স্পষ্ট হয়ে উঠল নতুন প্রভাতের ইশারা।

ঘুমিয়ে থাকা দেশের মানুষ গুলো
হঠাৎ যখন বন্ধ চোখের জানলা দুয়ার খুলে
অনুভূতির আলোয় খোঁজে
অচেতনার ধুলো
আঁধার ভেঙে এগিয়ে আসে
নতুন ভোরের চাকা
রাত্রি পড়ে ঢাকা।[৭৫]

এই কবিতাগুলির গুরুত্ব শৈল্পিক কারণে নয়। শিল্পবিচারে এগুলি তত উৎকৃষ্ট নয়। এর অন্যতম কারণ সম্ভবত এই যে, অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তনশীল একটি উত্তেজনামুখর পরিবেশই এদের সৃষ্টি করেছিল। কবিরা আবেগের মুহূর্তে এগুলি রচনা করেছেন, আবেগকে সংহত করার সুযোগ তাঁরা পাননি। কিন্তু কবিতাগুলির গুরুত্ব ঐতিহাসিক। পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতির বিকাশের বিশেষ পর্যায়ে, যখন দেশের সমস্ত আবেগ-অনুভূতি একটিমাত্র লক্ষ্যে স্থির হয়েছিল, তখন কবিরাও তাতে যথাসাধ্য সাড়া দিয়েছিলেন। তার সাক্ষ্য বহন করছে এই কবিতাবলী।

---

৭৫। তখন রাত্রি শেষ, পৃঃ ৫৬

Dhaka University Institutional Repository



# নবম অধ্যায়

## বিদ্রোহ বিপ্লব ও গণজাগরণমূলক কবিতা

Dhaka University Institutional Repository



জনসাধারণের দারিদ্র্য ও সামাজিক বৈষম্য প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণভাবে পূর্ব বাংলার প্রায়-সকল কবিই সচেতন ছিলেন। সাধারণ মানুষের অভাব, বঞ্চিতবোধ ও অসহায়ত্ব দেখে তাঁরা আবেগতাড়িত হয়েছেন এবং সে অবস্থার পরিবর্তন করে সুখী-সুন্দর জীবন সৃষ্টির কথা নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা সমস্যার আরো গভীরে প্রবেশ করেছেন, তাঁরা শুধু দুঃখদৈন্যকে রূপায়িত করেই শান্ত থাকেননি, তার কারণ নির্ণয়েরও চেষ্টা করেছেন। কেউ কেউ সুস্থ সমাজ গড়ার জন্য ব্যক্তিমানুষের চরিত্রশুদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, আবার কেউ কেউ সমাজ কাঠামোকে বদলে নতুন সমাজ সৃষ্টির আহ্বান জানিয়েছেন; তবে সবার লেখাতেই একটি চাপা উত্তেজনা ও আবেগোচ্ছল বিদ্রোহের স্পর্শ রয়েছে। প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় সুস্থভাবে জীবনধারণ যে অসম্ভব হয়ে উঠছে এ বিষয়ে অবশ্য তাঁরা একমত।

এই পর্যায়ে যে যে কবিকে আমরা পাচ্ছি তার মধ্যে কয়েকটি ধারা লক্ষ করা সম্ভব।

প্রথম ধারার কবিরা বিশেষ কোনো আদর্শের অনুসারী নন। শুধু সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা তাঁদের ব্যথিত করেছে এবং মানবদরদীর দৃষ্টি নিয়ে তাঁরা মানুষের সমস্যা সমাধানের কথা ভেবেছেন। ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করে, বৃহত্তর স্বার্থে ব্যক্তি বিশেষের লোভ ও রিপুকে সংযত করে সমাজে কল্যাণ আনতেই তাঁরা আগ্রহী।

দ্বিতীয় ধারার কবিরা মূলতঃ কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। ইসলামকে পুঁজি করে যারা সমাজে শাসন ও শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে সে সব লোকদের বিরুদ্ধেই এঁদের কবিতা উচ্চারিত। ইসলামী সমাজব্যবস্থা কায়েম হলে সমাজের মঙ্গল হতে পারে বলে তাঁদের ধারণা।

তৃতীয় ধারার কবিরা সমাজতান্ত্রিক আদর্শের অনুসারী হিসাবে কাব্যচর্চা করেছেন। সমাজ-বিকাশের মার্কসবাদী ব্যাখ্যায় তাঁরা বিশ্বাসী। সাহিত্যকে তাঁরা সমাজসংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করেন এবং সেজন্য বক্তব্য তুলে ধরেন সরাসরিভাবে। কবিতার রূপ ও রসের চেয়ে বক্তব্যের প্রতিই তাঁদের ঝোঁক অধিকতর। উপলব্ধির আন্তরিকতা ও বক্তব্যের স্পষ্টতাই এই শ্রেণীর কবিতার বৈশিষ্ট্য। এঁদের আদর্শ সুকান্ত ভট্টাচার্য।

চতুর্থ ধারার কবিরা পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে পূর্ব বাংলার অবস্থান, পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব বাংলাকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে শোষণ ও জাতিগত নিপীড়ন প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে কবিতা রচনা করেছেন। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন সময়ে পূর্ব বাংলায় যে-সমস্ত আন্দোলন হয়েছিল, সেগুলিও তাঁদের কবিতায় বিধৃত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাতাসে-ইংগিতে তাঁরা পূর্ব বাংলার স্বাধীনতাকামী জাতীয়তাবাদী চেতনার কথা উল্লেখ করেছেন ।

আঙ্গিক ও প্রসাধনকলার দিক দিয়ে এই কবিতাগুলি সর্বাংশে সফলতা অর্জন করতে পারেনি । বক্তব্যের প্রয়োজনীয়তার কাছে এগুলির কাব্যশ্রী ম্লান হয়ে গেছে । বক্তব্যের একঘেঁয়েমী ও বক্তৃতার ঢং অনেক কবিতার রসোত্তীর্ণ হওয়ার পথে প্রবল বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ।

এখানে প্রধানত প্রথম তিন শ্রেণীর কবিতাই আলোচিত হয়েছে।

এক

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার ফলে এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনে কোনো শুভ পরিবর্তন আসেনি । নতুন ক্ষমতাসীনদের অবস্থা অবশ্য রাতারাতি বদলে গিয়েছিল । এদের অনুগ্রহভাজন একদল লোকও সৌভাগ্যবানদের কাতারে শামিল হতে পেরেছিল; অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে এসেছিল অত্যাচার নির্যাতন ও সীমাহীন দারিদ্র্য । বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন আত্ম-নিবিষ্ট । সেই অসহনীয় অবস্থার পরিবর্তন করে সুখ ও স্বপ্নে ভরা নতুন পৃথিবীর কথা ভাবত দরিদ্র নিরন্ন জনগণ । 'মুক্তিকামার' এবং 'নতুন পৃথিবীর জন্য'[1] কাব্যে সে-কথাই বলা হয়েছে বক্তৃতার ঢংয়ে লেখা কবিতায় । প্রচলিত অবস্থার বিরুদ্ধে সক্ষোভে প্রতিবাদ করেছেন কবি কিন্তু নতুন পৃথিবীর রূপরেখা সম্পর্কে আভাস দেননি কোনো কবিতায় ।

'স্বাধীনতা ঃ ১৯৫১' কবিতায় তিনি স্পষ্টভাবে তথাকথিত স্বাধীনতার মূল চিত্রকে তুলে ধরেছেন ঃ

আমাদের জীবনে আজো স্বাধীনতা আসে নাই !
আমাদের জীবনে আজো কোকিল ডাকে নাই !
স্বাধীনতা আসে নাই অগণিত মানুষের জীবনে
স্বাধীনতা আ'জাদি বেকার ঘুরে যাই জনতা জীবন ভীড়ে ।
...
স্বাধীনতা এসেছে আজ নবাবীর কোকিল-কণ্ঠ ভরা রঙীন মাঠে
সুখ মহলার হাস্য-ভরা সুরা-সীধু জীবনে ঃ
স্বাধীনতার জোছনায় এসেছে তাদের জীবনে

---

১। ১ম সং, আশ্বিন ১৩৫৮, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository



যারা সিনেমাহলে আর হোটেলগুলোতে ক্লাস-রুম নারী-পাত্রী
আর শাড়ীর রোদ্দুরে আমাদের চক্ষুকে ধাঁধায়
আর এ অনাকাঙ্খিত জীবনে গলা-ধাক্কায় হতাশ করে হটিয়ে দেয় ঃ[2]

অথচ এর বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলতে গেলেই বলা হয় —

এ শুধু অনধিকার চর্চা
এ শুধু পঞ্চম বাহিনীর
এ শুধু শিশু রাষ্ট্রের শত্রুর ।[3]

কিন্তু এ-অবস্থা দীর্ঘদিন চলতে পারেনা । জনতা-সাগরে যখন ঊর্মি জাগবে তখন চোরাবালির উপর অবস্থিত সোনারকেল্লা হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে । সেদিনেরও খুব বেশি দেরি নেই। লড়াইও শুরু হয়ে গেছে এবং শপথও অনিবার্য হয়ে উঠেছে ঃ

ক. আমাদের লড়াই আজ এজিদের সাথে
আমাদের শত্রু হে শাদ্দাদেরা !
আমাদের শত্রু হে শ্বাপদেরা !
তোমরা সাবধান হও ঃ হুঁশিয়ার হও ঃ
আমাদের এ রক্তহীন জীবনে
আমাদের এই মৃত্যু-মগ্ন জীবনে
আর এক শক্তি-বন্যার রক্ত স্নানে
তোমাদের খতমের বার্তা মিলাও ঃ[4]

খ. সেদিন
বেশী দূরে নয়
আসবে এক নতুন ভূমিকম্প
তোমাদের থাকবেনা দম্ভ-দম্ভ ।
'রাজার মুকুট'
আর
'কৃষকের কোদাল'
এক বৃন্তে এক সঙ্গে এক সমুদ্রে
যৌবন-জল-তরঙ্গে হয়ে যাবে টাল-মাটাল ।[5]

২। পৃঃ ৩০ ৩। ঐ
৪। কোনো উৎসবের দিনে, পৃঃ ৫৩-৫৪
৫। হে স্বপ্ন হে আকাশ, পৃঃ ৩৩

Dhaka University Institutional Repository



এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, যারা দেশের ও জনসাধারণের প্রকৃত অবস্থা চাপা দিয়ে অবাস্তব সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের কথা বর্ণনা করে, তাদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা, বিদ্রূপ ও ধিক্কার তিনি জানিয়েছেন একটি কবিতায় :

এদেশের মানবতা যখন আষ্টে-পিষ্টে নাজেহাল
নরকের আগুনে যখন আনচান প্রাণ
শাসকের সমস্ত শক্তিতে সাম্রাজ্যবাদ
হাহাকারে সংঘাত আর সংগ্রামে পর্যুদস্ত
তখন
তোমরা লিখছ
হুর-পরী সাকীর নাচে
বেহেশ্তি মেওয়ার লোলুপ রসে
শরাবান তহুরার রঙীন জৌলুসে
এদেশের আকাশ বাতাস মাটি মানুষ একদম তেলেস্মাত :[৬]

সমকালের অবক্ষয়ী এসব শিল্পীর সঙ্গে শাসনপিতাদের মূলত কোনো পার্থক্য নেই বলে কবির ধারণা :

ওরা সাম্রাজ্যের শাসনপিতা
আর
তোমরা সাহিত্যের সাম্রাজ্যে শাসনপিতা
উভয়ই
পয়সার জন্য
প্রাধান্যের জন্য
বিলাসিতার জন্য
সভ্যতার গালিচে নিজেকে গণ্য করছ :[৭]

তাই কবির মনে প্রশ্ন, এরা কি দেশের মানুষ ও মাটির সন্তান, না কি 'কোনো বৈদেশিক চতুর শক্তির পুতুল'।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের তাণ্ডবে সারা পৃথিবী পর্যুদস্ত। পৃথিবীর সর্বত্র অশান্তির আগুন জ্বেলে এরা পৃথিবীকে নিজেদের কুক্ষিগত করতে চায়। এদের বিরুদ্ধে ও এদের দেশীয় সহযোগীদের বিরুদ্ধে

৬। সময়ের উচ্চারণ, পৃঃ ২২
৭। ঐ, পৃঃ ২১ – ২২

Dhaka University Institutional Repository



জনগণ সংগ্রাম করে চলেছে কোরিয়া থেকে পারস্য, রাশিয়া থেকে চীন ও ইউরোপ থেকে এশিয়া পর্যন্ত। কবিও সেই সংগ্রামীদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করছেন এবং শান্তির জন্য দেশ-বিদেশের গণদুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন :

আমি এক শান্তির সৈনিক
আমার সংগ্রাম আজ যুদ্ধবাজদের সঙ্গে
আমার লড়াই আজ সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রী ফ্যাসিস্ট দালাল-চক্রের বিরুদ্ধে
আমার যুদ্ধ আজ মার্শাল জাপান আর ইরানের জনতার দুশমনের সাথে
আমার অস্ত্র আজ চকমক করছে ট্রুমান এটলি আর চিয়াংয়ের চক্রান্তের
প্রতিরোধের জন্যে
আমার পতাকা পতপত করছে দেশে দেশে জনতার শান্তির সংগ্রামে[৮]

বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল [illegible] পম্পাই নগরীর অধিবাসীরা। শেষে ক্রুদ্ধ ভিসুভিয়াসের নির্মম লাভায় তলিয়ে গেল সে নগরী। তার অস্তিত্ব আজ শুধু মানুষের মনে আর ইতিহাসের পাতায়। আধুনিক কালেও আমার পৃথিবীতে অনেক পম্পাই নগরীর পত্তন হয়েছে। লন্ডন প্যারী নিউইয়র্ক দিল্লী কলকাতা করাচী আজ পৃথিবীর পম্পাই। সাম্রাজ্যবাদীরা সমস্ত পৃথিবীর সাধারণ মানুষের রক্তশোষণ করে এই নগরগুলিকে অপরূপ সাজে সাজিয়েছে এবং নিজেরা বিলাস-ব্যসনে মত্ত হয়েছে। কবি এদের বিরুদ্ধে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন এবং এদের পতন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন —

হে নতুন পম্পাই নগরীর বিলাসীরা !
হে আত্ম-বিস্মৃত বুর্জোয়া ধনতন্ত্রীরা !
হে মাতাল-মত্ত বউ-বিবী আর রাজা-মহারাজারা ;
তোমরা সাবধান হও : হুঁশিয়ার হও :
তোমাদের ধবল-লীলার দুর্দিনের কথা ভবিষ্যতের জন্যে স্মরণ করো :
মানুষের মরা-লাশের উপর নৃত্য থামাও :
... ... ...
শোনো
আর সেদিন বেশী দূরে নয়
যত ভিসুভিয়াসের আগুন আর লাভায় আসবে এক নতুন ধবল বন্যা
আর এক নতুন ভূমিকম্পের আলোড়ন
তোমাদের বিলাসী জীবনে আনবে আতঙ্কের শিহরণ : মৃত্যুর স্বপন।[৯]

---

৮। শান্তির জন্য, পৃঃ ৫৭

৯। একটি ঐতিহাসিক ঘোষণা, পৃঃ ৬০

Dhaka University Institutional Repository



দুই

জুলকারনায়েন-এর 'মরণ বিচিত্র'[১০]-এ পরিবেশের প্রতি তীব্র ও স্পষ্ট একজন মানবপ্রেমিক সমাজসচেতনের আক্ষেপ ও বিদ্রোহ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কবি কোথাও পাকিস্তানের নামোল্লেখ করেননি, কিন্তু কবিতাপাঠে সন্দেহ থাকেনা যে, পাকিস্তানের ইসলামী সমাজে যে দুর্নীতি চলছে তারই বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ ভাষা পেয়েছে এখানে। ধনের অসাম্য, রাজনীতির লীলাখেলা, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের নৈরাজ্য এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির উদ্দেশ্যহীনতা মিলে সমাজজীবনকে অসহনীয় করে তুলেছে। ইসলামী উপকথায় শয়তান নামক যে-দুষ্ট আত্মার সাক্ষাত পাওয়া যায়, কবি মনে করছেন, আমাদের একালের দুনিয়াতেও সে-শয়তানেরই রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহৎ আদর্শের কথা এখানে অবান্তর — সর্বত্র টাকার রাজত্ব আর ধনপতির দাপট। মানবসমাজের এক বৃহৎ অংশ যেখানে অনাহারে অর্ধাহারে ও অচিকিৎসায় ধুঁকে ধুঁকে মরছে, সেখানে মুষ্টিমেয় কিছু লোক বেশুমার খরচ করেও তৃপ্তি পাচ্ছেনা। এসব দেখে-শুনে কবি বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন। তিনি খোদাকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছেন, হয় তুমি এসবের সমাধান কর নতুবা আমরা সবাই শয়তানের আনুগত্য মেনে নেব।

সমাজের সর্বত্র কিভাবে সত্যের পরিবর্তে দুর্নীতি ও মিথ্যার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে-সম্পর্কে কবি বলছেন :

সস্তা সুন্দরী ফুলঝুরী আর জোচ্চুরি মুনাফাখোরী
সারা দুনিয়ায় নির্লজ্জ নীতি নবীন সৌধরাজী।
হালাল মজুরীতে রোজা রাখা সোজা ইফতারী জোটা দায়
এ সন্ধ্যা দূরে মিলবেনা কিছু জীবনের সন্ধ্যায়।
যে দিকেই ফিরে চাই
সত্যের জাত নাই দুনিয়ায় মিথ্যার বাদশাহ
মিথ্যা ধর্ম মিথ্যা কর্ম নিখিল মিথ্যাময়
সত্য নিত্য পদতলে দলে মিথ্যার হয় জয়।[১১]

সাধারণ মানুষকে ভুলিয়ে নিজেদের শোষণ অব্যাহত রাখার জন্যে কিভাবে ইসলামকে হাতিয়ার

১০। ১ম সং, অন্বেষা, ১৯৬৭, ঢাকা, রচনা 'পনের বছর পূর্বে'।

১১। পৃঃ ১২

Dhaka University Institutional Repository



কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে সে-সম্পর্কেও কবি সচেতন ঃ

কোথা সে ইসলাম ;

যত অভাজন হল মহাজন শিকাইয়া তার নাম ।
যেখানেই চাই দেখবারে পাই ইসলামী সাইন বোর্ড
ইসলামী সুদ, ইসলামী মদ, ইসলামপুর রোড ।
জোয়ারতি খাতে খাটাইয়া এই অমূল্য মূলধন
হল রাতারাতি কেউ দলপতি কেউ সাধু সজ্জন ।
তবু তোমার নিঃস্ব জনতা বাদের ফেরেবে পড়ে
যার যাহা ছিল দিয়েছে সবাই সকলি উজাড় করে ।
 ... ... ...
নামী পূরে হাসি নবী হবে কোন কাজে ইবলিস পাস
দেখে ভাবি কোন ফেরেশতা হবে মিলে দেখি খান্নাস ।[12]

গণতন্ত্র, নির্বাচন, রাজনীতি প্রভৃতির মাধ্যমেও যে অন্যায় ও ফেরেববাজী প্রশ্রয় পায় তার উল্লেখও এখানে রয়েছে ঃ

ক. গণতন্ত্রের নামে চলে যায় দলতন্ত্রের খেলা
দলায় দলায় দলাদলি হয় ভোটের [illegible] ভাষা ভোলা ।
দলের সবার সাত খুন মাফ বেদলের হলে দর
দলের টিকেটে পার পেয়ে যায় যেখানে যে চোরা শঠ ।[13]

খ. তার সত্ত কথা রাখার আজ চিত্ত আশাহীন
ভোট দিয়ে দিয়ে ভোটের ওপরে ধরেছে চরম ঘিন ।
যাকে দেই ভোট সে দিয়ে লংকা সাজায় ডংকা তার
পিঠে সুদি মূনে ভিটে ছাড়া হই পেটে বাজে হাহাকার ।[14]

---

১২। পৃঃ ২৩

১৩। পৃঃ ৩৫

১৪। পৃঃ ৪৩

Dhaka University Institutional Repository



এমনো খোদাতন্ত্রে সাধারা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে । তারা এর প্রতিকার চায় :

ক.　মাটির মানুষ যদি আদমেরা খুলেছে এবার মুখ
উন্মাদ করে তুলেছে তাদের অসহ মর্মের দুঃখ ।
খোদা গো ! তোমার খোদায়ী টিকানো দায় ।
ফেরেশতাকুল সম্মুখে তাইলোনাবাসী উতলায় ;[১৫]

খ.　আরস কুর্সী লওহ কলম কাঁপে তাই শংকায় ;
এবার বুঝিবে খোদার ধরায় খোদার টেকাই দায় ।[১৬]

তিন

আজিজুল হাকিমের /১৯০৮ – ৬২/ কবিতা-গ্রন্থ মোট ছয়টি — ভোরের সানাই /১৩৩৯/, মরুসেনা /১৩৪০/, পথহারা /১৩৪৩/, মরুহারা /১৩৪৪/, বিদগ্ধ দিনের প্রান্তর /১৩৬১/ ও আজাজিল নামা /১৩৬১/ ।[১৭] শেষ দুটি কাব্য পাকিস্তান-আমলে প্রকাশিত হয়েছে । এই সময়ে কবি ক্রমশঃ সাম্যবাদী রাজনীতির দিকে ঝুঁকছিলেন এবং তা প্রভাব ফেলেছিল তাঁর কবিতা রচনায় । তিনি বিশ্বাস করতেন যে, 'সময় ও মানুষের রুচি বিচার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন সময়ের জন্য নতুন চেতনা দেশের শিল্পে ও জীবনে দরকার' ।[১৮] কবির রচনা-প্রবাহে এই মনোভাবের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাবে । 'তাঁর প্রথম রচনা ভোরের সানাই কাব্য গ্রন্থে তিনি যে রোমান্টিক মনোভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ মরুসেনায় এসে সে-সুর অধিকতর সমাজসচেতন হয়ে উঠেছে, কিন্তু বিদগ্ধ দিনের প্রান্তরে দেখা গেছে রোমান্টিক ও সমাজ সচেতন মনোভঙ্গীর বদলে এক নৈরাশ্যজনক মনোভঙ্গীতে পর্যবসিত হয়েছে ।'[১৯] এবং 'বিদগ্ধ দিনের প্রান্তর-এর সর্বত্র কিন্তু নৈরাশ্যজনক মনোভঙ্গী প্রাধান্য লাভ করেনি, বরং এর মূল সুর আশ্বাসের ও আশাবাদের ।

---

১৫। পৃঃ ১　　　　১৬। পৃঃ ৪৪

১৭। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, আজিজুল হাকিম, মাসিক পূবালী ফাল্গুন ১৩৬৮, পৃঃ ৪৭১–৭২

১৮। আবদুস সাত্তার, কবি আজিজুল হাকিম, মাহে নও, মার্চ ১৯৬২, পৃঃ ১৬৪

১৯। ঐ

Dhaka University Institutional Repository



'বিদগ্ধ দিনের প্রান্তর'[২০] রচনার পটভূমি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কবি নিম্নরূপ 'কৈফিয়ৎ' দিয়েছেন —

> অনেক দিনের কথা, কাব্যের স্বপ্ন-লোক ছেড়ে রাজনীতির সঙ্কুল পথের যাত্রী হয়েছি। পূর্ব বাংলার বিগত সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মত-বিরোধ হওয়ায় আমার প্রতিষ্ঠিত 'পাকিস্তান কৃষক মজদুর লীগ' নির্বাচনে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে প্রচুর সময় হাতে আসে। সেই অবসরে আবার কাব্য-সাধনায় প্রবৃত্ত হই।

এই রাজনীতির প্রভাবে তাঁর কবিতায় দুটি লক্ষণীয় পরিবর্তন এসেছে এবং যার প্রমাণ রয়েছে আলোচ্য কাব্যে, তা হল কবিতা হয়েছে রূপের দিক থেকে বক্তৃতার মত আর রসের দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা মণ্ডিত।

'বুর্জোয়া নির্বাচন' কবিতায় প্রচলিত নির্বাচন-প্রহসনের কথা সবিস্তারে উল্লিখিত হয়েছে। বুর্জোয়াদের শঠতায় ও প্রতারণায় কৃষক, মজদুর প্রভৃতি সাধারণ লোকেরা বিভ্রান্ত হয় এবং ভোটের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় দলবদ্ধভাবে ও প্রবল উৎসাহের সঙ্গে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। এতে তাদের কোনো উন্নতি হয়না কিন্তু ধনতন্ত্রের ভিত্তি আরো মজবুত হয়।

বিপন্ন দেশের এক নয়া নির্বাচন ঃ
বিক্ষুব্ধ জনতা মুহুর্মুহু তাকে 'ভোট ভোট' করি
আবেগ চঞ্চল।
অভুক্ত কৃষক আর দিনের মজদুর
উদ্যত প্রাণের বেগে দীপ্ত চোখে চায়
কুচক্রীর শাসনের চায় অবসান
চায় নয়া গণতন্ত্র।
... ... ...
যুগ যুগান্ত ধরি যারা ছিল থাকে তারাই
যুগ – বুর্জোয়ার ছায়।
নির্বিবাদে শাসন শোষণ তারাই চালায়ে যায়।
অবশ্য সাধুতায় বুর্জোয়া নির্বাচন
মহাসমারোহে বড়ো আসে ও যায় দেশে
নিয়ে তারিখ, সন।[২১]

---

২০। ১ম সং, ঢাকা আষাঢ় ১৩৬১।
২১। পৃঃ ২২ – ২৩

Dhaka University Institutional Repository



মানব-সভ্যতার সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে সাধারণ মানুষের স্বপ্ন ও আশা বার-বার গুঁড়িয়ে গেছে শক্তিশালী নিষ্ঠুর হাতের পেষণে । বর্তমান যুগেও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলিকে শাসন ও শোষণ করে চলছে একই পদ্ধতিতে । কিন্তু তবু, প্রাচীনকাল থেকে টাইগ্রীস-ইউফ্রেটিসের পাড়ে-পাড়ে, হোয়াংহো-ইয়াংসিকিয়াং এর তটে-তটে, টেথিস সমুদ্রের কোল থেকে ওঠা প্রান্তরে-প্রান্তরে সুমেরীয় মানুষেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সংগ্রাম করছে সুখ-শান্তিতে ভরা সোনালী দিনের আশায় । তাঁদের সংগ্রাম বার-বার ব্যর্থ হয়েছে এবং সেই ব্যর্থতার উপর দাঁড়িয়ে আছে বর্তমানের এই সভ্যতা ঃ

মৃত মানুষের কঙ্কালের স্তূপ ফুঁড়ে ঠেলে উঠেছে
বর্তমান সভ্যতা ।
রক্তলোভী বণিক, দিগ্বিজয়ী সাম্রাজ্যবাদী
ব্যবসা-বাণিজ্য লুন্ঠন, শোষণ চালিয়েছে তাদের উপর —
যারা সত্যিকার মানুষ, মেহনতি মানুষ, সাধারণ মানুষ ।[২২]

তবু মানুষের আশা নষ্ট হয়নি । তাঁরা এখনো স্বপ্ন দেখে শোষণমুক্ত, সমাজতান্ত্রিক পৃথিবী সৃষ্টির — যেখানে মানুষের মর্যাদা, স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্ব রক্ষিত হবে, দূর হবে শ্রেণীবৈষম্য, দাসত্ব ও ব্যক্তিগত মালিকানা । এই লক্ষ্য অর্জনের লড়াই চলছে দেশে-দেশে ।

তবু মানুষের দৈনন্দিন পারিবারিক জীবনের নৈরাশ্যের তলে
বিদগ্ধ দিনের প্রান্তর ছুঁয়ে
মানুষের মর্যাদা, স্বাতন্ত্র্য, স্বার্থ ও স্বাধীনতা ।
জন্ম দিতে চায় সে
এক শোষণ-মুক্ত সমাজ ।
বর্তমান সমাজের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস হতে
সে মুছে ফেলতে চায় —
শ্রেণী বৈষম্য, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, নির্যাতন ও দাসত্ব ।
... ... ...
সে নতুন করে দেখতে চায়
নতুন সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার বুনিয়াদের নতুন গড়ন ।[২৩]

বর্তমান পূর্ব বাংলায় সাম্রাজ্যবাদী শোষণ কিভাবে চলছে তার উল্লেখ স্পষ্টতও কবি ভোলেন নি। এদেশের সাধারণ মানুষ হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে পাট, চামড়া ও চা উৎপন্ন করে কিন্তু সেগু

২২। বিদগ্ধ দিনের প্রান্তর, পৃঃ ৭০
২৩। ঐ, পৃঃ ৭০ – ৭১

Dhaka University Institutional Repository



দিয়ে বিত্ত অর্জন করে বিলাত, আমেরিকার ব্যবসায়ীরা। এই রহস্য সাধারণ মানুষ জানে না, তারা শুধু খেটে মরে।

জল না লুকাতে চোখে, আমাদের দেশে, এয়ারো-প্লেনে
জল নিয়ে মেঘ কেটে উড়ে আসে
ইংলন্ডের এরোপ্লেন,
আমেরিকার 'সুপার মাস্টার'।
বিদেশী মানবতার সংকেতের পিছে
আমাদের ক্ষেতে মাঠে হয়রান যত সোনা ফলে
অসামরিক সংকেতের টানে
সেই সব দল বেঁধে চলে দেশ ছাড়ি।
পাট-চামড়া, লুন্ঠিত সোনা
প্রশান্ত মহাসাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে চলে জাহাজে জাহাজে
সুদূর আনে ইংলণ্ড, আমেরিকার আকাশের গায়
রহস্য কোথায় তার জানে না জনতা।[২৪]

আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদীদের দেশীয় সহযোগীদের শোষণের কথাও প্রসঙ্গক্রমে আসে। এদের অত্যাচারে এদেশের হাজার-হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে — যাদের অতৃপ্ত আত্মা গভীর রাতে ঘুরে বেড়ায় শীতলক্ষ্যার বুকে।

চিত্তরঞ্জন আদমজী, ঢাকেশ্বরী, লক্ষী নারায়ণের অযুত মজদুর
দারিদ্র্যের অকটোপাশে ধুঁকে ধুঁকে তিলে তিলে
যারা মরে গেছে;
তাহাদের কঙ্কালেরা স্বপনের তরী বেয়ে যায়
নিশি রাতে শীতলক্ষ্যায়।[২৫]

কিন্তু এরও অবসান হবে। অত্যাচারিত মানুষেরা জেগে উঠেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে তারা সংঘবদ্ধ হয়েছে। তারা ভেঙে ফেলতে চায় যুদ্ধের শৃঙ্খল। তাদের সম্মিলিত দৃঢ়

---

২৪। অচল অব্য রাজনীতি, পৃঃ ২৮

২৫। স্বপনের তরী, পৃঃ ৬২

Dhaka University Institutional Repository



পদধ্বনি কবি শুনতে পাচ্ছেন। সে-আওয়াজ ক্রমে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

তন্দ্রা স্বপ্নের ঘোরে অন্ধকারের ওপারে শোরগোল ধ্বনি।
কারা যেন শিকল ভাঙে
কারা যেন পথ হাঁটে
কারা যেন কবর থেকে উঠে আসে।
অবিরাম আওয়াজ ধ্বনি।
ধ্বনি সর্বহারা মানুষের স্পন্দিত প্রাণের কলকল্লোল।[২৬]

কবিও আহ্বান জানাচ্ছেন মাটির মালিক সর্বহারাদের এগিয়ে আসতে। স্বপ্ন দেখা ত্যাগ করে সবাই সমবেত শক্তি নিয়ে এগিয়ে আসুক, আঘাতে-আঘাতে পর্যুদস্ত করুক শোষকশ্রেণীকে এবং এভাবে নিজেদের মুক্তিকে পুনরুদ্ধার করুক — এটাই কবি প্রত্যাশা করেন।

যে শক্তি তোমাকে করেছে আজ গৃহছাড়া
উচ্ছল প্রাণ, শঙ্কাহারা ঘোর উন্মাদ
সমবেত শক্তি নিয়ে
শেষ আঘাত হানো তারে।
তোমার মনের সাহসে সাহসে আগুন জ্বালো।
কোটি সূর্যের জ্বালা নিয়ে
পদদলিত প্রাণের তোমার জয় আলো।[২৭]

চার

কঙ্গোবাসীদের বিরামহীন বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ফলে বেলজিয়াম তার উপনিবেশ কঙ্গোকে ১৯৬০ সালের ৩০-এ জুন স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়। এ-সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্যাট্রিস লুমুম্বা (১৯২৫ – ১৯৬১)। কিন্তু ১লা জুলাই থেকে বেলজিয়ামের সমর্থনে ও উস্কানীতে সেখানে উপজাতীয় কোন্দল শুরু হয় এবং বেলজিয়াম সেখানে অনুপ্রবেশ করে। লুমুম্বা জাতিসংঘের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে জাতিসংঘ প্রথমে অনুকূল সাড়া দেয় কিন্তু কিছুদিন পরে সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তিগুলির চাপে জাতিসংঘের মনোভাব দ্রুত পরিবর্তিত হয় এবং 'এ-বিবাদ আভ্যন্তরীণ'

---

২৬। দুঃখ শান্তি, পৃঃ ৩৬
২৭। মাটির মানুষ, পৃঃ ৬০

Dhaka University Institutional Repository



এই অজুহাত দেখিয়ে নিরপেক্ষ থাকার ভাণ করে। বেলজিয়াম এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে এবং তার এজেন্ট কাসাভুবু-মবুতু-শোম্বে চক্রের সাহায্যে লুমুম্বাকে বন্দী করিয়ে হত্যা করায়। লুমুম্বা-পত্নী পলিন লুমুম্বা জাতিসংঘের দরবারে স্বামীর প্রাণ প্রার্থনা করেও বিফল মনোরথ হন।[২৮]

এই ঘটনায় সারা পৃথিবীর বিবেকবান মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। পাকিস্তানে, বিশেষত পূর্ব বাংলায়, দারুণ বিক্ষোভ দেখা দেয়। পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর একাংশের একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাব বরাবরই ছিল। এই ঘটনায় সে-মনোভাব স্পষ্ট-ভাবে প্রকাশ পায়। বিশেষত, আইউব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে যে-অসন্তোষ ভেতরে ভেতরে ক্রমশঃ পুঞ্জীভূত হয়েছিল তা এই সুযোগে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার ছদ্মাবরণে বেরিয়ে আসে। সব কিছু মিলিয়ে পূর্ব বাংলায় প্রতিক্রিয়া ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, আন্তরিক, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও আফ্রিকার নিপীড়িত জনগণের সঙ্গে একাত্মতাকামী। তখন অনেক সভা ও মিছিল আয়োজিত এবং প্রবন্ধ-কবিতা রচিত হয়। 'আফ্রিকার জন্যে সূর্যোদয়'[২৯] গ্রন্থে এ-প্রতিক্রিয়ার রূপ ধরা পড়েছে।

'আফ্রিকার জন্যে সূর্যোদয়' লুমুম্বার একটি কবিতার রণেশ দাশগুপ্তকৃত বাংলা অনুবাদের নাম। এর নামানুসারেই সংকলনটির নামকরণ করা হয়েছে। এই কবিতাটি ব্যতীত সংকলনে আরো চোদ্দটি কবিতা, কয়েকটি প্রবন্ধ, কয়েকজন ছাত্রনেতা ও দেশি-বিদেশী রাষ্ট্রনেতাদের বিবৃতি স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলিতে কঙ্গো সম্পর্কে বিবিধ তথ্য এবং আফ্রি-কার বিভিন্ন অঞ্চলে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। কবিতাগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে কবিদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব ও অত্যাচারিত মানুষের প্রতি সহমর্মিতা।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী তার কবিতায় বলেছেন লুমুম্বার মৃত্যুতে আফ্রিকায় বিদ্রোহ ও বিপ্লবের শিখা আরো উজ্জ্বল হবে এবং তাতে ধ্বংস হবে সভ্যতার শত্রু ও মানবতার বিরোধীরা। তাঁর আকাঙ্ক্ষা এদেশের মানুষকেও তাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করুক, কবি এটাও

২৮। কঙ্গোর ঘটনা পরিক্রমা, আফ্রিকার জন্যে সূর্যোদয়, পৃঃ ৮৭ – ১০০

২৯। সংকলন গ্রন্থ, সম্পাদনায় আজাদ সুলতান, ১ম প্রকাশ, ঢাকা, মার্চ ১৯৬১

Dhaka University Institutional Repository



কামনা করেছেন —

এশিয়া, শোকাশ্রু মোছো, আফ্রিকা, তোমার খুনে লাল
উদয়ের পথে পথে রক্তসূর্য জ্বালুক মশাল ।
মৃত্যু নেই লুমুম্বার আকাশের প্রতি তারা বলে
কোটি কোটি মানুষের রক্তে আর প্রাণে আজ জ্বলে –
লুমুম্বার মহাপ্রাণ ! হে আফ্রিকা, বলো ক্ষমা নাই,
মৃত্যুকে ডেকেছো তুমি জীবনের সিংহদ্বারে তাই ।
সভ্যতার শত্রু জয়ী ! ঘাতকের ছুরি পাবে ক্ষমা ?
মিথ্যা কথা, লুমুম্বার রক্তে হবে ছিন্ন এই দুর্বিষহ অমা ।
লুমুম্বার আত্মদানে গরিয়সী হে কংগো আমার,
আমাদেরো প্রাণে তুমি জ্বালো সূর্য প্রাণ–চেতনার ।।[৩০]

সালাউদ্দিনচৌধুরীও অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছেন তাঁর কবিতায় । মৃত্যুর মাধ্যমে লুমুম্বা অর্জন করেছেন অমরত্ব । তিনি বিপ্লবী চেতনার একটি প্রতীকে পরিণত হয়েছেন — যে চেতনা এশিয়া আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিকামী মানুষকে মাথা তুলে দাঁড়াবার অনুপ্রেরণা যুগিয়ে যাবে ।

কিন্তু কতোদিন আর,
কতোদিন রক্তমাখা হাত দিয়ে ওরা বাগান সাজাবে,
কতোবার ওরা মাটির মানুষ মেরে আক্রোশ মেটাবে ?
আফ্রিকার কালো অন্ধকার পার হয়ে,
পূবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে,
সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে কোটি কোটি লুমুম্বা হয়ে
কালো মুখ আকাশে তুলে অনন্ত হয়ে আছে ।[৩১]

ক্ষোভে – রোষে উদ্দীপ্ত আফজল প্রমাণিকও একই কথা বলেছেন স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ উচ্চারণে ঃ

লুমুম্বা, তুমি অগ্নিশিখা
স্বাধীনতার জ্বলন্ত–জয়–টীকা ।
আফ্রিকার অমর ছেলে
শপথ ছিল যে তোমার
সাম্রাজ্যবাদের বিষদাঁত ভাঙ্গা
নতুন পৃথিবী গড়ার ।[৩২]

---

৩০। মৃত্যু নেই লুমুম্বার, পৃঃ ২৩
৩১। একটি নাম–একটি শবদ–একটি চেতনা, পৃঃ ৭৩
৩২। লুমুম্বা ঃ প্রথম শপথ আফ্রিকা, পৃ ঃ ৭৫ – ৭৬

Dhaka University Institutional Repository

'স্বাধীর দাম প্রাণী পদিন লুমুম্বাকে' কবিতাটিতে সিকানদার আবু জাফর আফ্রিকার কৃষ্ণকায় মানুষদের শোষণের সম্ভাবনার কথা বলেছেন। আফ্রিকার 'সবচেয়ে প্রিয়-সন্তানের' এই নার-কীয় হত্যাতে সে-মহাদেশের অত্যাচারিত মানুষেরা অকস্মাৎ মাথা-চাড়া দিয়ে উঠেছে। সমগ্র আফ্রিকা পরিণত হয়েছে বারুদের স্তূপে – যেখানে বিস্ফোরণ হতে পারে যে-কোনো মুহূর্তে। লুমুম্বা এখন বিদ্রোহী আফ্রিকার প্রতীক।

তবু এই ঘৃণ্যতম নরহত্যা শুধু ঘাতকের
অভাবিত নয় কিছু শক্তিলোভী সভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাসে।
ব্যভিচার – শিরশিরে অহরহ ধর্ষণের ভোগে
নিষ্পেষিত আফ্রিকা যাদের ঃ
তাদেরই লোভের ছুরি তৃষ্ণা মিটিয়েছে
আফ্রিকার সবচেয়ে প্রিয়-সন্তানের
ছিন্ন ভিন্ন হৃদয়-শোণিতে।
... ... ...
লুমুম্বার মৃতদেহ বিস্ফোরণ-প্রতীক্ষায়
প্রজ্বলিত বারুদ এখন ঃ
লুমুম্বার মৃতদেহ এখন আফ্রিকা।[৩৩]

একটি বিশেষ কারণে এই সংকলনটির প্রকাশনা গুরুত্বপূর্ণ। এদেশের প্রগতিশীল কবিদের মনের স্বৈরাচার ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার এবং জাতীয় মুক্তি অর্জনের অদম্য আবেগ লুমুম্বার হত্যা-কাণ্ডকে উপলক্ষ করে দুর্দমনীয় বেগে প্রকাশিত হয়। সমকালীন সংস্কৃতি-অঙ্গনের নৈরাশ্য এই ঘটনায় কাটতে শুরু করে। তখন থেকে সৃষ্টি হয় একটি নতুন কাব্যধারা, যাতে প্রবল রাজনৈতিক সচেতনতা লক্ষণীয়। শান্তির, সমাজ-পরিবর্তনের, স্বৈরাচার ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার পক্ষে তরুণ কবিরা কবিতা লিখতে শুরু করেন তখন থেকে।

---

৩৩। পৃঃ ৫৩ – ৫৫

Dhaka University Institutional Repository



পাঁচ

এই পর্যায়ের কাব্যসমূহের মধ্যে আলাউদ্দিন-আল-আজাদের সন ১৯৬১ মানচিত্র[৩৪] সর্বশ্রেষ্ঠ। আজাদ নিজের মতাদর্শের প্রচার করতে গিয়ে সাহিত্যের শিল্প দিককে অগ্রাহ্য করেননি; ফলে মানচিত্রে নির্দিষ্ট জীবনবোধের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে কাব্যকলাকৌশলগত শ্রী। সমাজের শোষক শ্রেণীর সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে যাঁরা পর্যুদস্ত হয়েছে কিন্তু আশা, বিশ্বাস, স্বপ্ন ও সম্ভাবনাকে হারায়নি এবং যাঁরা জীবনের অর্থ খুঁজেছে সংগ্রামে, আন্দোলনে, মিছিলে ও শ্লোগানে এই কাব্যে তাঁদের কথাই বলা হয়েছে বার-বার।

উত্তরাধিকার সূত্রে শূন্য উদর নিয়ে মজুর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে কবির নায়ক বুঝতে পেরেছে যে, জয়ী হয়ে পৃথিবীকে দখল করতে হলে এখানে বিনয়ের চেয়ে দস্যুতা অধিক দরকারী —

নিজ হাতে কিছু নিলে নাক, তাই
বিনয়ের দিই নির্বাসনেই
দস্যুর দলে লিখাই আমার নাম
জয় করে নেব তোমাদের এনাম
হয়েছি দুরন্ত ঘোড়-সওয়ার
পথের পরেই কাটবে সকল যাম ॥[৩৫]

অন্য একটি কবিতায়ও এ বক্তব্যের ধারণা প্রকাশ পেয়েছে। ফুটো চালের মধ্য দিয়ে বৃষ্টি পড়ে যখন মেঝে বয়ে যমুনা প্রবাহিত হতে থাকে তখন ভক্তি, আজান এবং নামাজই পৃথিবীকে স্বর্গ বানাতে পারেনা, সে সময়ে বরং দুঃসাহসী সৈনিকই পারে সমাজটাকে বদলে দিতে —

তাহলে শুধু ছোটাও রক্ত সাদা ঘোড়ে হাঁকো কড়া চাবুক
শত্রুসেনারা মরে পড়ে যাক, হাতে শুধু থাক তীর-ধনুক
দিক দিগন্তে সীমান্ত-জোড়া বাসনায় পদ্মগুলো কাঁপুক ॥[৩৬]

প্রাণান্ত ও প্রতাপান্বিত পরিবেশে কবি প্রেমের সাক্ষাৎ পাননি। তাঁর প্রেয়সীকে সাধারণ গৃহাঙ্গনে প্রথম দেখে তাঁর মধ্যে কোনোরূপ চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়নি কিন্তু পরে, আলো একদিন

---

৩৪। ১ম সং, ঢাকা, শ্রাবণ ১৩৬৮

৩৫। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১

৩৬। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫১

Dhaka University Institutional Repository



যখন তাকে দেখলেন উত্তাল মিছিলে পৃথিবীর উদ্যত সড়কের সামনে, তখন কবি অবাক হলেন এবং তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করলেন জীবনের অপরিসীম প্রাচুর্য ও অশেষ সম্ভাবনাকে —

আমি চেয়ে দেখলাম
সেখানে এক পৃথিবীর প্রাচুর্য ।[৩৭]

অন্য একটি কবিতায় নয়া সড়কের ওপারে নতুন সূর্যোদয়ে প্রেয়সীর সঙ্গে মিলনের কথা আছে —

আমার প্রেয়সী নয়া সড়কের ওপারে থাকে
হাতে বাঁধা নেই, খোলা ধানশীষ, আকুল সিঁথি
চৈত্রের রক্তে হারিয়েছি যেই সান্নিধ্যটা
তারি খড়কুটো বুঝি দু'পারে দিকশূন্য ।
দেখা হবে আমি, রাত্রিশেষের সকালে খুব
মিছিলের মাঝে নতুন সূর্যোদয়ের পথে ।[৩৮]

কবির মনের মধ্যে কয়েকটি শব্দ — সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, শান্তি ও ভালবাসা — অগ্নিগিরির লাভার মত নিরন্তর ঘূর্ণিত হচ্ছে । তিনি এগুলিকে কলমের মুখে প্রকাশ করার যথেষ্ট সাহস পাচ্ছেননা, কারণ তাহলে মুহূর্তেই ওলট পালট হয়ে যেতে পারে পরিচিত পৃথিবীতে । অথচ এদের গতি অপ্রতিরোধ্য, তাই কবি সর্বদা ভয়ে ও অস্থিরতায় দিন কাটাচ্ছেন —

ভয় পাই ম        আমি ভয় পাই
এই যে শব্দের ঝাঁক জ্বালামুখী পর্বতের মূলে
আগ্নেয় লাভার স্রোতের অসোয়াস্তি যেন
আমার মর্মের মাঝে
কাঁপনার সুরে সুরে
মনসুরের হৃৎপিণ্ডের মতো সারাক্ষণ শিহরিত
কলমের মুখে তাকে ছেড়ে দিতে, হায়, ভয় পাই আমি
ভয় পাই ।[৩৯]

'মিউজিয়ামের সিঁড়ি' কবিতায় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন আছে । সপ্রেয়সী কবি যাদুঘরে গিয়েছেন । দেখলেন প্রাগৈতিহাসিক জীবজন্তু থেকে মানুষের উদ্বর্তনের ইতিহাস এবং পাথর কেটে মানুষের গড়া অপরূপ ভাস্কর্যসমূহ । মানুষের অপরিসীম সম্ভাবনা সম্পর্কে কবির মনে নতুন উপল

---

৩৭। হাসি, পৃঃ ৫৪
৩৮। জনান্তিক, পৃঃ ৬২
৩৯। ভয় পাই, পৃঃ ৮৩

Dhaka University Institutional Repository



জাগ্রত হল এবং তিনি ভাবলেন এই মানুষই পারবে বর্তমানের জরাজীর্ণ সমাজের বুকে নতুন মহৎ সমাজের সৃষ্টি করতে ঃ

আমরা নতুন যুগের সূর্য-সম্ভব জনতা
উজ্জ্বল এক সমন্বয় দিনের সংগমে
এমন মহৎ কিছু, এমন বিরাট কিছু, এমন সুন্দর কিছু
পশ্চাতে রেখে যাব
যা দেখে আগামী কালের নাগরিকেরা যেন
গভীর বিস্ময়ে সিঁড়ির পাশেই হতবাক হয়ে থাকে ।।[৪০]

'কৃষকের গান' কবিতায় প্রতিজ্ঞা-দৃপ্ত কৃষকদের কথা আছে । তাঁরা বুঝতে পেরেছেন জমির মালিক তারাই এবং তাঁদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করার অধিকার কারো নেই ঃ

ধান 'ভাঙ্গ' না, গান শেষ হোক
রোদে বৃষ্টিতে
রক্ত ঝরেছি মাঠে
তবুও খাজনা দেবোনা দেবোনা
অনেক দুঃখে জেনেছি কেননা
জমির মালিক আমরাই কোটিজনা ।[৪১]

এই কাব্যের শেষ কবিতা 'শান্তি গাথা' ছয় স্তবকে রচিত । প্রথম স্তবকে কবি নিজেকে 'শান্তি শিবিরে যোদ্ধসেনানী' বলে জানিয়েছেন এবং পৃথিবীব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন । পরবর্তী স্তবকগুলিতে শান্তির অন্বেষায় মানুষের দীর্ঘ পথপরিক্রমা, শয়তান কর্তৃক বার বার তার শানচাল, পর্যায়ক্রমিক প্রতিরোধ, পরাজয়, শক্তি-সঞ্চয় ও অভ্যুত্থানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । শেষের স্তবকে কবি সমগ্র পৃথিবী জুড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবার কামনা জানিয়ে কবিতাটি সমাপ্ত করেছেন ।

শান্তি, শান্তি, শুধুঃ শান্তির গাই গান
শান্তির সুরে মত্ত হোক মনপ্রাণঃ
শান্তি নামুক আমাদের আমাদের কুঞ্জকুঞ্জ
শান্তি নামুক অন্ধকারখানা ভরপুর

---

৪০। পৃঃ ৫৯

৪১। পৃঃ ৭০

Dhaka University Institutional Repository



শান্তি নামুক গৃহ অঙ্গনে, শিল্পীর
মনে তুলিতে শান্তি নামুক সৃষ্টির ।
জননীর কোলে শান্তি নামুক, নির্ভয়
শিশুদের চোখে শান্তি নামুক চুমচুম ।[৪২]

## ছয়

হোসনে আরার (জন্ম ১৯১৮) 'মিছিল'[৪৩] প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে । এর অধিকাংশ কবিতা ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে লেখা । এই কাব্যে তিনি সরল ও নির্ভয় ভাষাতে প্রগতিশীল চেতনার পরিচয় দিয়েছেন, এমনকি নামকরণেও এর প্রমাণ বর্তমান । এযুগে রাজনীতি তথা শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য জনতার বা সুসংবদ্ধ স্লোগানমুখর ধ্বনি মিছিল । মিছিলের মাধ্যমে শ্রেণীচরিত্র নির্ণীত হয়, আন্দোলন বিকাশ লাভ করে ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে চলে

এই কাব্যের মর্মবাণী হচ্ছে যে, পৃথিবীব্যাপী লাঞ্ছিত ও নিঃস্ব মানুষেরা নিজেদের মুক্তি অর্জনের জন্যে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে চলছে । তাদের সেই অভিযানের সম্মুখে গণদুশমনেরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং তাদের পতন অনিবার্য হয়ে পড়েছে ।

সমাজে দুই শ্রেণী — ধনী ও গরিব । গরিবেরা ভিন্ন সম্প্রদায়ের হলেও একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, আর ধনী ও গরিব একই সম্প্রদায়ের হলেও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর । পরস্পরের সুখ ও দুঃখের দিনে শ্রেণী বিচারেই একে অন্যের সহযোগিতায় ও সমস্যায় এগিয়ে আসে, ধর্ম বিচারে নয় ।

আব্দু মিয়া শ্যাম সাধানী কালীর বৌ আর সুলতানা
ভিন্ন জাতি হলেও এদের ব্যথা বেদন ভিন্ন না ।
টুপিওয়ালা সাবু মিয়া আব্দু মিয়ার ব্যামোর দিনে
দেয়না বড় পথ্য কিনে ।
কালীর বৌয়ের পুত্রশোকে দেশের ধনী রাজেন সাহা
একটুও ত বলেনা 'আহা' ।

---

৪২। পৃঃ ৯০

৪৩। ১ম সং, ঢাকা ।

Dhaka University Institutional Repository



সংগ্রামী মানুষ যারা
তাদের মধ্যে নেইকো বিভেদ
মানুষ তারা এক মিছিলের তাহার লাগি নাই কোন খেদ।[৪৪]

এই কবিতায় তিনি বলেছেন অনাগতের নতুন দিনে এরাই নতুন পথে মিছিল নিয়ে এগিয়ে যাবে :

নূতন দিনের উঠেছে সূর্য নূতন আলোয় ভরবে ধরা
নূতন পথে মিছিল করে যাত্রা শুরু করবে ওরা।
ওদের হাতে জয় পতাকা নূতন আশা দিচ্ছে আনি
অনাগতের হাতছানি।[৪৫]

এই সংগ্রামী জনতার কথা বলা হয়েছে আরো কয়েকটি কবিতায়। পৃথিবীর দেশে দেশে নির্যাতিত জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করছে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে। তারা শত্রুকে চিনেছে এবং তাকে মরণ আঘাত হানার কৌশলও আয়ত্ত করেছে। তাই তাদের অভিযান হয়ে উঠেছে দুর্বার ও অপ্রতিরোধ্য। এই সংগ্রামে পুঁজিপতিদের পরাজয়ের মাধ্যমে মুক্তির লাল সূর্য উদিত হবে :

ক. মহা বিপ্লবের ভীম কোলাহলে পুড়িবে তারা
আঘাতে আঘাতে পুঁজিপতি হবে সর্বহারা।
তাদের মৃত্যু-তিথিতে করো মহা-উৎসব
রক্ত-বিপ্লব উত্তাপ আগুনকে করুণা সব।[৪৬]

খ. জনতার হবে জয়
সুপ্তি ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠেছে নির্যাতিত দুর্জয়।
মাটির মানুষে দিকে দিকে যারা করিয়াছে চিরহীন,
নূতন উষার সাথে সাথে আসে তাহাদের শেষ দিন।
তাহাদের দেনা কণ্ঠ ছাপিয়া উঠিছে আজিকে ভাই,
সে দেনা তাদের শোধ দিতে হবে, আর কোন পথ নাই।
সর্বহারারা সব ফিরে পাবে নাহি আর কোন ভুল,
এক কূল আজ ভাঙ্গিছে জোয়ারে, গড়ে ওঠে আর কূল।[৪৭]

---

৪৪। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত একুশে ফেব্রুয়ারী / মিছিল পৃঃ ২
৪৫। ঐ
৪৬। যে দিবস, পৃঃ ৩৪
৪৭। নূতন ইশতাহার, পৃঃ ২৮

Dhaka University Institutional Repository



ঘ. বিশ্বের লাল দিন ঘনাইয়া আসে
বৃক্ষের অভিমান শূন্য হয়ে যায়,
শূন্য হয় ঘোরতর সবুজ-সংঘাত
সাধ্য যার অসাধ্যের সাথে,[৪৮]

## সাত

পশ্চিম পাকিস্তানের কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতার একটি বাংলা-অনুবাদ সহ পূর্ব বাংলার আটাশ জন তরুণ ও প্রবীণ কবির কবিতা নিয়ে ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয় 'শান্তির সপক্ষে আমাদের কবিরা'[৪৯] শীর্ষক সংকলনটি। কি মনোভাবে চালিত হয়ে এই গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন সে-কথা সবিস্তারে সম্পাদকদ্বয় ভূমিকায় বিবৃত করেছেন। এর প্রয়োজনীয় অংশটি নিম্নরূপ —

> শান্তির সপক্ষে আমাদের কবিদের এ সংকলন এ সত্যকে স্পষ্ট করে হৃদয়ের দর্পণে তুলে ধরতে চায় যে আমাদের পাকিস্তানের বিরাট ঐতিহ্যশালী সংস্কৃতিবান কবিরা আজও ভুলে যাননি নদনদী ঘেরা সবুজ শ্যামল পূর্ব পাকিস্তানের জলবায়ু মাটির সহজ সুন্দর মাটির টান। তাঁরা ভুলে যাননি শান্তির শপথ, সৃষ্টির শপথ। এঁরা সব সময়ই মানুষের সপক্ষে, সৃষ্টির সপক্ষে, শান্তির সপক্ষে। জীবনের প্রতি গভীর মমত্ববোধে এঁরা গাইছেন শান্তির গান, সৃষ্টির গান, জীবনের গান। এখানেই সান্ত্বনা, এখানেই সার্থকতা। ...
>
> সংকলন প্রকাশের ক্ষেত্রে এমন এক সময় বেছে নিয়েছে যে সময় পৃথিবীর এদিকে ওদিকে চলছে ধ্বংসের আয়োজন — পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে ধ্বংসের পৃথিবীর বৃহৎ বৃহৎ শক্তিগুলোর দানবী হুংকার। আর তাই পৃথিবীর আকাশে বাতাসে বজ্রনির্ঘোষে আওয়াজ উঠেছে, 'যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই'। এ সংকলন আমাদের কবিদের, আমাদের মানুষের,—সেই আওয়াজেরই প্রতিধ্বনি।

শান্তি প্রতিষ্ঠার এই আকাঙ্ক্ষা কবি সোলায়মান প্রকাশ করেছেন কবিতায়। তিনি শান্তি কামনা

---

৪৮। বিপুল, পৃঃ [illegible]

৪৯। অজয় গুপ্ত ও নিয়ামত হোসেন সম্পাদিত, ১ম সং, সুরমী, ঢাকা ভাদ্র ১৩৬৯

Dhaka University Institutional Repository



করেছেন যাঁরা আধি-ব্যাধি-ক্ষুধা ও অত্যাচার পীড়িত সমস্ত মানুষের জন্য ।

শান্তি চাই – আধি-ব্যাধি বিজড়িত পৃথিবীর,
শান্তি চাই – ক্ষুধিত, নিপীড়িত আর শোষিত জনগণের,
শান্তি চাই – লক্ষ কোটি অশান্ত মানবাত্মার
শান্তি চাই – তোমার, আমার আর সকলের
পরমাণবিক ধ্বংসের মুখে যারা নিতান্ত অসহায় ।
কারণ
মহাযুদ্ধের পদধ্বনি শোনা যায় ।।[৫০]

আসাদুল ইসলাম চৌধুরী শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য শুধু আহ্বান জানিয়েই শান্ত হননি; কিভাবে প্রকৃত শান্তি কায়েম হতে পারে সে-বিষয়েও তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন । সাধারণ মানুষের পৃথিবীকে ক্ষুধামুক্ত করতে পারলেই শান্তি আসবে এবং তার জন্য শ্রমজীবী মানুষকে সংগ্রাম করতে হবে ভুঁড়িওয়ালা লোকদের বিরুদ্ধে । তাঁর মতে সমাজে শান্তি-প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য হল মেহনতী মানুষের জীবনে শান্তি আনয়ন করা ।

শেষ পর্যন্ত আবদুলের মা-ও শান্তি খুঁজেছিলো জীবনের গণ্ডিতে
এবং না পেয়ে আল্লার চোখ আছে কি নেই
এই সন্দেহ নিয়েই চোখ বুজলো শেখসাহেবের মতোন ।
. . .          . . .          . . .
শোনো আবদুল, কাস্তেটাতে শান দাও খুব জোরসে
শ্রমিক তোমার মুঠোটাকে কর মজবুত
ভুঁড়িদাসদের পিঠের শান্তি ভাঙতেই হবে আজকে
তাড়াতেই হবে এ পৃথিবী থেকে শয়তান পশুরাজকে ।[৫১]

অন্য কবিরা এত স্পষ্ট করে বলেননি, তবে নিজেদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তাঁরা ব্যক্ত করেছেন অকুণ্ঠভাবে । পৃথিবী শস্যশ্যামলা হবে এবং সে-ফসলের ভাগ পাবে সবাই এবং তাঁদের প্রতিজ্ঞা হচ্ছে সে-অবস্থাকে বাস্তবায়িত করার জন্য বলিষ্ঠ সংগ্রামের । সে-অবস্থা আনয়ন করা সত্বর

---

৫০। প্যারাডক্স, পৃঃ ১৫

৫১। এপ্রমাণি শান্তির স্বপক্ষে, পৃঃ ১৯ – ২০

Dhaka University Institutional Repository



হলে পৃথিবীতে চিরস্থায়ী শান্তি আসবে, তার পূর্বে নয়।

ক.　এবার জন্মে নিতান্তই অনেক দিয়েছি
পৃথিবী আমরা হৃদয়ে সবুজে ভরালো
স্বর্গ থেকে তারা হৃদয়ের মায়াতে
সারা পৃথিবীতে শান্তির গান ছড়ালো।[52]

খ.　অনেক সয়েছি আমরা আর নয়
　　দলমতজাতে এসো যোগ দিই প্রাণময় সঙ্গীত মিছিলে
আকাশ কাঁপিয়ে আজ আওয়াজ তোলো এসো
　　এ পৃথিবী আমাদের— আমাদের প্রতি দশ্যকা
আমরা এ পৃথিবীতে শান্তি আনবো চিরস্থায়ী শান্তি আনবো।[53]

## আট

নেহাল আদিল /জন্ম আনুমানিক ১৯৪৪ সাল/ ও ফারুক আলমগীরের /জন্ম, চট্টগ্রাম, ১৯৪৩/ ছাপ্পান্নটি কবিতার সংকলন 'শ্যামলী দেশের কত প্রান্তর'[54] প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। কবিতাগুলির শৈল্পিক উৎকর্ষ তেমন নয়; ছন্দের শিথিলতা, ভাষার অতি সারল্য ও অতিকথন কবিতা থেকে সহজেই সনাক্ত করা যায়। কিন্তু নানা কারণে সংকলনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে-সময়ে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তথা সামাজিক জীবনে একটা অস্থিরতা ও বিভ্রান্তি চলছিল। এই বিভ্রান্তিকে কাটিয়ে ওঠার জন্য সচেতন তরুণ কবিরা নানাভাবে চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। 'শ্যামলী দেশের কত প্রান্তর' কাব্যে পথ-অনুসন্ধানের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যান্যভাবে

---

৫২। অজয় গুপ্ত, শান্তি-শপথ; যুদ্ধমুক্ত পৃথিবীর জন্য, পৃঃ ৩৭

৫৩। নিয়ামত হোসেন, কোনো সাথীকে, পৃঃ ২৪

৫৪। এই কাব্যের মলাটবিহীন একটি কপি আমি ফারুক আলমগীরের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি। তিনি জানিয়েছেন, নেহাল আদিলই ঢাকা থেকে প্রকাশিত এই কাব্যের প্রকাশক।

Dhaka University Institutional Repository



হলেও এ-কাব্যের কোনো-কোনো কবিতায় পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার কথা আছে। কবিদ্বয় সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কবিতা রচনা করেছেন, তাঁদের ইতিহাসচেতনা ও আন্তর্জাতিকতা বোধ নির্মিত হয়েছে সে-ভাবাদর্শে।

শ্যামলী পূর্ব বাংলা প্রকৃতির দানে সমৃদ্ধ। এদেশে রয়েছে অজস্র নদী-নালা ও অসংখ্য পরিশ্রমী মানুষ। কিন্তু তবু নানারূপ শোষণের ফলে দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষ ও অনাহার এখানে স্থায়ীভাবে আসন পেতেছে। কবি আশা করেছেন সেই সুস্থ মেহনতী মানুষের সংগ্রামে এদেশ কষ্টমুক্ত হবে এবং সে-ইঙ্গিতও এ-নিবন্ধে পাওয়া যাচ্ছে।

তবু
শ্যামলী দেশের আকাশে উঠা সূর্য
কত নিহত বুক
সুস্থ মানুষের মিছিল
প্রতিশ্রুতি দেয় অনাগত বসন্তের।
নব মেহনতীর চলার পথে
দিগন্তে সুস্পষ্ট আলোর আভাস
নোতুন দিনের সংবাদ আনে।
শ্যামলী দেশের বুকে সূর্য চমকে উঠেছে
বুক তার
কত মুক্ত হবে।[৫৫]

এদেশে শোষণের রূপ কি সে-সম্পর্কে কবি তাঁদের কবিতায় স্পষ্ট করে কিছু বলেননি তবে পরবর্তী একটি কবিতায় বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের কথা বলেছেন। বাংলার নতুন মীরমদন-মোহনলালেরা পলাশীর মাঠে দাঁড়িয়ে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীন আক্রোশে তাকাচ্ছে এবং পলাশীর মাঠ ইঙ্গিত দিচ্ছে নতুন পুষ্পিত ভবিষ্যতের।

মীরমদন মোহনলালের রক্তাপ্লুত পলাশী
আগুনের ফুলের রঙ পেয়ে লাল হয়ে উঠে
রক্তাক্ত পলাশী এদেশের হৃদয়ে তাকায়
বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে
স্বাধীন আক্রোশে।
অতীতের রক্তাক্ত পলাশী হাতছানি দেয়
অনাগত পুষ্পিত ভবিষ্যতের।[৫৬]

---

৫৫। নেহাল আদিল, শ্যামলী দেশের রক্ত প্রান্তর, পৃঃ ১
৫৬। নেহাল আদিল, পলাশী, পৃঃ ৭

Dhaka University Institutional Repository



শোষক শ্রেণী শুধু বাংলায় নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলেও আসন গেড়েছে। তাদের শোষণ চলেছে দীর্ঘদিন ধরে এবং এর বিরুদ্ধে শোষিতরাও যুদ্ধ করে চলছে ক্লান্তিহীন ভাবে। কবি সেই সংগ্রামী মানুষদের সঙ্গে নিজের অভিন্নতা অনুভব করেছেন এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন সবাইকে।

ক. মাগো আগুন জ্বলছে — জ্বলছে
সুদূর ফরাসী বিপ্লবের দিন থেকে
মা
তোমারই মত উপেক্ষিতা মায়েদের করুণ শ্বাস
আগুন হয়ে জ্বলছে — জ্বলছে
শ্রেণী সমাজের বিদ্রূপ আর উপেক্ষার বিরুদ্ধে
মাগো আমি দেখেছি রক্তের বিপ্লব
পৃথিবীর বুকে নতুন ফুল ফোটাবে।[৫৭]

খ. অজস্র দেহের সাথে নিজেকে লাইনে মিশিয়ে
চলো
শকুনি চক্ষু উপড়াই
যারা অন্যের ফসল কেড়ে নেয়
অন্যের বুক নিংড়িয়ে
নগ্ন লাভের ক্ষুধায় দুলে
তাদের আজ হুঁসিয়ারী পাঠাই ঃ
আর নয়
এবার ফসলে নয়
ধনুকের ছিলায় টানটান হয়ে ওঠা
সূর্যের রক্ত শরকে
তোমাদের বুকে ছুঁড়ে দেব।[৫৮]

---

৫৭। নেহাল আদিল, মাগো ঃ মুক্তির সঙ্গীত মাগো, পৃঃ ১১
৫৮। ফারুক আলমগীর, চেতনার দিন, পৃঃ ৩০ – ৩১

Dhaka University Institutional Repository



কবি তাঁর প্রেমিকার সন্ধান পেয়েছেন ফুল পাখি ও চাঁদের পরিবেশে নয়, বরং শ্রমী জনতার ভীড়ের মিছিলে । যখন দুপুরের পীচ-গলা রৌদ্রে কবি তাঁর প্রেয়সীকে ফেস্টুন হাতে মিছিলে দেখলেন, তখন এক অভূতপূর্ব আবেগ তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হল এবং সেদিনই তিনি প্রেমের প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয় পেলেন ।

তোমাকে ভালবাসলাম
তখন
যখন দগদগে ফোস্কা পড়েছিলো তোমার পায়ে
নগ্নপদ জনতার মিছিলে তুমি চলছিলে
রাস্তায় গলন্ত পিচ অগ্রাহ্য করে —
অপরূপ লাগলো তোমাকে তখন
ফেস্টুন হাতে
মিছিলের শরীরে ।[৫৯]

## নয়

সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে কিছু-কিছু তরুণ সাম্যবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কবিতা-রচনায় আত্মনিয়োগ করেন । বুলবুল খান মাহবুব ছিলেন তাদের অন্যতম । ১৯৪২ সালে টাঙ্গাইল জেলায় তাঁর জন্ম হয়, এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে তিনি এম-এ ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৬৭ সালে ।

ছাত্রজীবন থেকে বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন । আইডিয়াল বয়েজ ক্লাব, পূর্বাচল, সংস্কৃতি সংসদ ও ক্রান্তি প্রভৃতি প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত এবং শেষেরটির ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক । তিনি ১৯৫৭ সালে যুবলীগ ও ১৯৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য হন । সামরিক শাসনামলে আইয়ুব বিরোধী বিভিন্ন

---

৫৯ । ফারুক আলমগীর, তোমাকে ভালবাসলাম, পৃঃ ৪৬

Dhaka University Institutional Repository



আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করায় তাঁকে বহু নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে — জেলে গিয়েছেন ১৯৬৪ সালে।[৬০]

ছাত্রজীবনেই তিনি কবিতা রচনা শুরু করেন। তাঁর একমাত্র কাব্য 'রক্তের কারুকাজ'[৬১] প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে। এতে সংকলিত হয়েছে ১৯৬২–৬৬ সালের মধ্যে রচিত কবিতা।

কবি গভীরভাবে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষত বাংলাদেশে, শোষকেরা স্থায়ী আসন পেতেছে। তাদের নির্মম শোষণের ফলে সমাজ থেকে সুখ, শান্তি ও স্বাধীনতা দূরীভূত হয়ে ক্রমশঃ বিস্তৃত হচ্ছে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অনাহার ও রক্ত। এই রক্তচোষাদের তাড়াতে হবে সংগ্রামের মাধ্যমে — যা ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে ভিয়েতনাম, কঙ্গো, কোরিয়া ও বাংলাদেশে। কবি নিজেও একজন সংগ্রামী সৈনিক। তিনি বিশ্বাস করেন আকাঙ্ক্ষিত সুদিন আর বেশি দূরে নয়, — এই প্রবল আত্মবিশ্বাস ও সংগ্রামী আহবান তার কাব্যের সর্বত্র নজরে পড়ে। তাঁর রচনায় কাব্যমূল্য যথেষ্ট নয় বলে একজন নবীন সমালোচকের মনে হয়েছে[৬২] কিন্তু আমরা মনে করি সমকালের কবিতায় প্রচার-ধর্মিতা প্রবল হয়ে উঠলেও, বক্তব্য ও কবিত্বগুণ এখানে যথেষ্ট সংগতি অর্জন করতে পেরেছে।

পূর্ব বাংলায় এসেছে দারুণ দুর্দিন। মাঠের সবুজধান, নদীর স্নিগ্ধ জল ও রাখালের উদাস-করা গান আর নেই; ক্রন্দন, হাহাকার আর মড়কে ভরে গেছে এদেশ:

চোখের জলের বাষ্পে ঢেকেছে রূপসী বাংলার
ম্লানমুখ চন্দ্রলেখা দিন,
রক্তের ভেজা কুয়াশায়
ঢেকে গেছে নতুন ধানের সবুজ দুধালী শীষ
বিশীর্ণ নদীর দুপাশে
এখন বাজেনা আর রাখালের পুরাতন বাঁশী।[৬৩]

কিন্তু তবু এদেশ স্বাধীন বলে ঘোষিত হয়। স্বাধীনতার উনিশ বছরের পরেও মৃত্যু আর দুঃস্বপ্ন ঘিরে থাকে এদেশকে:

রাত্রি আমার দুঃস্বপ্নের ডানা
দিনগুলো সব মৃত্যুর পরোয়ানা

---

৬০। এ তথ্যগুলি লিখিত এক পত্রে কবি আমাকে জানিয়েছেন।
৬১। ১ম সং, ঢাকা, ১৯৬৭
৬২। মনসুর মুসা, পলিমাটি, তৃতীয় সংকলন, ১৯৭৫, পৃঃ ৬৩
৬৩। আমরা, পৃঃ ৩৪

Dhaka University Institutional Repository



কারার দেয়াল প্রাচীরে অন্ধ
দিন পঞ্জিকা বলছে
স্বাধীন দেশের উনিশ বছর চলছে।[৬৪]

এই অবস্থা আরো দুঃসহ হয়েছে ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর থেকে। কবি বলছেন সূর্যালোক ও চাঁদের জ্যোৎস্না নষ্ট হয়ে সমগ্র দেশটা গভীর অন্ধকারে ডুবে গেছে এবং এই অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে চলছে এমন মানুষ —

কয়টি বছর আটাশ থেকে
সূর্য আর আলো দেয়নি; চাঁদ
মৃত জ্যোৎস্নার কফিনে শবী শুধু
জ্বলে জ্বলে পুড়ে আলো দিয়েছিল
কয়টি উলকা শিশু।
অতো আমরা হেঁটেছি।[৬৫]

এই অবস্থার জন্য দায়ী একশ্রেণীর লোক, যাদের উৎখাত করেই সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি আনতে হবে। অবশ্য এদের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি কি, সে সম্বন্ধে কবি নিশ্চুপ থেকেছেন। এদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য তিনি সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে আহবান জানিয়েছেন এবং বলেছেন এই সংগ্রামেই শান্তি ও স্বাধীনতা আসবে —

ক. এই বাংলার সবুজ আকাশে এখনো শকুনী চিল
পাখায় ওড়ে, সাথীরা শুনেছ আগামী দিনের ডাক
নিশান আর অগ্নিশপথে গড়ো মিছিল
মাঠে বন্দরে এক হয়ে গেছি অযুত লাখ।[৬৬]

খ. শত্রুর চোখে মুখে লেলিহান
বেদনার ক্রুর লোভ
জনতার শত লাঞ্ছনা আর
ধূমায়িত বিক্ষোভ
ঘরে ঘরে তাই গড়ে তুলি বিক্ষোভ
জনবন্ধু, নেবোই এবার সব যাতনার শোধ।[৬৭]

---

৬৪। উনিশ বছর, পৃঃ ১৯   ৬৫। কয়টি বছর আটাশ থেকে, পৃঃ ২৪
৬৬। রক্তে কালুকাল, পৃঃ ৫   ৬৭। আজকের কবিতা, পৃঃ ৬

Dhaka University Institutional Repository



এখানে শোষকদের পতনের দ্বারা এক নতুন সমাজের অভ্যুদয় ঘটবে । সে সমাজ হবে সাম্যবাদী এবং সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে শান্তি ও স্বাধীনতা —

আমরা চলেছি যুগের পতাকা নিয়ে
নতুন সমাজ গড়ে ওঠে ঐ পুরানো বস্তি ক্ষয় ।[৬৯]

পূর্ব বাংলায় বিভিন্ন সময়ে অনেক আন্দোলন হয়েছে । ইংরেজের আমলে কৃষকদের তেভাগা আন্দোলন, আইউব খানের আমলে বাজিতপুরের কৃষকদের আন্দোলন, ঢাকার ছাত্রদের ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং সামগ্রিকভাবে এক ঐক্যসূত্রে এই তিনটি আন্দোলন পরস্পর সম্পৃক্ত — সেই ঐক্যসূত্র হচ্ছে সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম । তবে পূর্ব বাংলার শিল্পীদের কাছে এই তিনটি ঘটনা বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ —

ক. প্রসন্ন সূর্যের আলো
আমাদের বন্ধু হবে, তেভাগার ইতিহাস
আসর জমায় ভালো, যতদিন সংগ্রামের পতাকা
হাতে না পাই বন্ধুরা, আমরা থাকবো
তোমাদের কাস্তেগুলো শানিয়ে দেয়ার জন্য ।[৭০]

খ. নতুন শপথ আনো, দীক্ষা দাও নতুন শক্তিতে
সূর্যের স্বাক্ষর পেয়েছ তুমি, হে সতেরো আলো
আমার একটি কথা, আমরা প্রস্তুত ঘরে ঘরে
আগুন জ্বালাও, নতুনের জন্ম হোক সহস্রদলে ।[৭১]

গ. আমার সমস্ত চেতনা উন্মুখ
বাজিতপুরে কি সবার অজান্তে
নতুন তীর্থ হল । আমরা কি সূর্যোদয়ের দিকে
আর এক ধাপ এগিয়েছি ।[৭২]

---

৬৯। আমরা, পৃঃ ৫

৭০। আমরা থাকবো, পৃঃ ৭৬

৭১। ১৭ই সেপ্টেম্বর, পৃঃ ২০

৭২। নতুন উপমা, পৃঃ ৬

Dhaka University Institutional Repository



শিল্পীদের কাছে আলো একটি প্রিয় নাম সুকান্ত। তাঁর বিপ্লবী কবিতাসমূহ সার সার উজ্জীবিত করে সংগ্রামী সৈনিকদের। চাপ চাপ অন্ধকার যখন একত্র হয়ে পথঘাট ঢেকে দেয়, নৈরাশ্যভারাক্রান্ত করে তোলে সকল শিল্পীদের, তখন তাঁর কবিতা মনে এনে দেয় প্রচণ্ড সাহস ও আত্মবিশ্বাস। এজন্য সুকান্তর কাছে কবি ঋণ স্বীকার করেছেন অকুণ্ঠভাবে —

সুকান্ত,
এখনো আমরা বৃত্তিবন্দিত দিনে
মুক্তির স্বপ্ন দেখি, কখনো-ভিয়েৎনামে
রাশিয়া কিম্বা চীনে
সমুদ্র বায়ু শেষ — অন্ধকার নামে
যখন দিনের শেষে তোমার কবিতা
সান্ত্বনার মনে দেয় আশ্বাসের মৃতদেহে
পা রেখে উঠবে সবিতা।[৭৩]

কবি আশা করছেন বর্তমানের এই দুর্বোধ্য সমাজব্যবস্থা ভেঙে এক নতুন সমাজব্যবস্থার উদ্ভব হবে, সেখানে থাকবে শান্তি, সুষমা ও আনন্দ। 'সংগ্রামে পেয়েছি এ শান্তি' নামক মা ও ছেলের কথোপকথনের যে-কবিতাটি তিনি রচনা করেছেন, তার গদ্য ভূমিকাতে সেই সোনালী দিনের এক উজ্জ্বল ছবি তিনি এঁকেছেন —

> আজ থেকে সহস্র বছর পরের পৃথিবী – নতুন সমাজব্যবস্থায় সুখী, সমৃদ্ধিশালী নতুন পৃথিবী। মাঠে মাঠে সোনার ফসল, কিন্তু সে শুধু বন্দী থাকেনা শোষকের কারাগারে। নতুন পৃথিবীর এক সুন্দর সকালে মা ও তার ছেলে হেঁটে যাচ্ছে মাঠের প্রান্ত দিয়ে। একদিকে বয়ে চলেছে নদী – অন্য দিকে দিগন্ত বিস্তৃত শস্যক্ষেত।[৭৪]

অন্য একটি কবিতায়ও[৭৫] সেই আনন্দঘন দিনের চিত্র আছে — যখন সুখী ও পরিতৃপ্ত কৃষকেরা সবচেয়ে জ্যোৎস্নারজনীতে নেচে গেয়ে 'সোনালী ফসল' উৎসব পালন করে।

---

৭৩। সুকান্ত, পৃঃ ২৬

৭৪। পৃঃ ৩০

৭৫। আমাদের ইচ্ছে নিয়ে তিরিশটি কাব্য পরিবার, পৃঃ ৪১

Dhaka University Institutional Repository



দশ

## ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক কবিতা

১৯৬৮ সালের শেষের দিকে পশ্চিম পাকিস্তানে আইউব-বিরোধী যে-আন্দোলনের শুরু হয়, ক্রমে-ক্রমে তা সারা পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৬৯ সালের প্রথম দিকে পূর্ব বাংলায় তা গণঅভ্যুত্থানের রূপ নেয় এবং এর পরিণতিতে আইউব খানকে ক্ষমতা-ত্যাগ করতে হয়। এই আন্দোলন সম্পর্কে পূর্বে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। দেখা গেছে যে, পাকিস্তানী জাতীয়তা, সমাজব্যবস্থা এবং আইউব খানের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে খণ্ড-খণ্ড আকারে যে-সমস্ত অসন্তোষ ও আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল তা-ই ১৯৬৯ সালে সংহত ও একত্র হয়ে বিরাট গণআন্দোলনের রূপ নেয়। ফলে এই অভ্যুত্থানের চারিত্র্য ছিল বহুমুখী এবং এতে জনগণের অংশগ্রহণ ছিল সর্বজনীন। পূর্ব বাংলার কবিরাও এই আন্দোলনে শরীক হয়েছিলেন এবং প্রচুর আবেগদীপ্ত কবিতা রচনা করে আন্দোলনে সহায়তা করেছিলেন। অধিকাংশ কবিতাই বিভিন্ন সংকলনে, সাময়িকীতে ও পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে, সামান্য কিছু মাত্র সংকলিত হয়েছে কোনো-কোনো গ্রন্থে।

২

এই আন্দোলনের তাৎক্ষণিক দিক ছিল আইউব-বিরোধিতা। ১৯৬৮ সালে আইউব খানের ক্ষমতা-দখলের দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে 'উন্নয়ন দশক' পালন শুরু হয়, যার প্রতি জনসাধারণের কোনো সমর্থন ছিলনা। সামাজিক বৈষম্য, রাজনৈতিক নিপীড়ন ও দুঃসহ দারিদ্র্যের চাপে সাধারণ মানুষ যখন বিপন্ন ও হতবুদ্ধি, তখন ঢাক-ঢোল বাজিয়ে 'উন্নয়ন দশক' উদযাপন তাদের কাছে নিষ্ঠুর প্রহসন বলেই প্রতীয়মান হয়েছে। তাই পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীরা সমস্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে নেমে পড়েছে। নিছক পাশবিক্ জোরে একে দমন করতে গিয়ে সরকার সাফল্য অর্জন করতে ত পারেনি, বরং বিদ্রোহ শুধু প্রজ্বলিত করেছে মাত্র। এই বিষয়টি অনেক কবিতার বিষয়বস্তু হয়েছে।

ক. বয়েস শাদা পর্দে চোকে
   জুড়ুর ব্যাপার কি ;
   'প্রগতিশীল দশ বছরের'
   এ কোন বুজরুকি ![৭৬]

---

৭৬। গোলাম সারওয়ার, জয়বাংলা, টিটিং কাব/একুশের সংকলন/, আখতার হোসেন ও আসু সালেহ সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃঃ ৯

Dhaka University Institutional Repository



খ. পূবে ও পশ্চিমে সংবাদ প্রতিশ্রুতি

একই অভিন্ন ঃ

অসমাপ্ত শহীদ মিনারে আর নয়

শোকার্ত স্মরণ

এতো আসাদের মৃত্যু নয় — আমার

রক্তিম বিস্ফোরণ ।[৭৭]

গ. জ্বলছে জ্বলছে জ্বলছে

পিন্ডি-লাহোর-খুলনা-যশোর

দারুণ রোষে জ্বলছে ।

কী নির্বোধ ছুড়ছে জল বুলেট ও গ্যাস ছুঁড়ছে

জ্বালায় জ্বালায় বর্বরতার সকল-জ্বালায় ফুঁড়ছে

জুলুমবাজীর শেষ সীমানায় দেশকে ঠেসে ধরছে

কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্তের হত্যাযজ্ঞ চলছে

ছুঁড়ছে গুলি ছুঁড়ছে

কবি নেতা নির্বিচারে

জেলখানাতে পুরছে

আহাম্মকের

সূর্য যেন

নিজের কবর খুঁড়ছে ।[৭৮]

অনেকে এই আন্দোলনকে গণ্য করেছিলেন সমাজতন্ত্রসম্মত বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার প্রয়াস হিসেবে । সমাজতন্ত্র কায়েম করাই ছিল তাঁদের মূল লক্ষ্য । পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে — এশিয়া আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশে-দেশে — এই উদ্দেশ্যে যে-সংগ্রাম চলছে, তার সঙ্গে তাঁরা তাঁদের এ-সংগ্রামের সাযুজ্য লক্ষ্য করেছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের উচ্ছেদ সাধন করে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি লক্ষ্যে তাঁরা কাজ করে যাবেন । সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের প্রতিভূ পাকিস্তান সরকারকে

---

৭৭। সন্তোষগুপ্ত, রক্তিম বিস্ফোরণ (শহীদ আসাদের উদ্দেশ্যে), স্ফুলিঙ্গ (একুশের সংকলন), পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃঃ ২০

৭৮। শুভ রহমান, সর্বনাশীকে, চিচিং ফাঁক, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭

Dhaka University Institutional Repository



উৎখাত করাও তাদের স্বপ্ন ছিল। আন্দোলনের অন্যতম শহীদ আসাদুজ্জামান ছিলেন এই আদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলের সদস্য।

ক. আমরাও নিপীড়িত পৃথিবীতেও
মুক্তির জ্বালাময়ী গান।
এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা
দেখেছে মুক্তির স্বপ্ন
আমাদের কণ্ঠে আজ সেই গান
তাই সচেতন শোষকের কাহিনী
উদ্যত বেয়নেট বিদ্ধ করতে চায় বুকে
তবু বুলেটের দাগ উত্তাপ লাগে গায়ে।[৭৯]

খ. প্রতীক্ষিত দিন অনাগত দেখে
এবং অজস্র উদগ্র রজনী আশায় আশায় থেকে
অবশেষে আমাদের জীবনে এসেছে সংগ্রাম
মুক্তির, জীবনের, আনন্দের ও আর যা কিছু ভাল তার জন্য
তাই আজ আমরা লড়ছি প্রাণপণে
আমাদের দেশের মানুষের জন্য,
যারা মাটির পিণ্ডের মত অগণন
অথচ হরিণের চেয়েও অসহায় এবং
শত্রুদের কাছে আত্মসমর্পিত।[৮০]

এই অভ্যুত্থান শহরে শুরু হলেও ধীরে-ধীরে এর ঢেউ গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ে। সে-সময়ে গ্রামের পোড়-খাওয়া, অত্যাচারিত, অসহায় মানুষগুলি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। তাঁরা হরতাল করেছে এবং থানা, তহশীলদার অফিস ও ইউনিয়ন কাউন্সিল ঘেরাও করে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করেছে। হুমায়ুন কবিরের / / কবিতায় এর উল্লেখ আছে —

গঞ্জেও
এসেছে হরতাল, নিতাই গরুর সাথ

---

৭৯। মমতাজ বেগম, স্বপ্ন কামনা, রক্ত পলাশ /একুশের সংকলন/, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, রাজশাহী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃঃ ৪

৮০। সেকান্দর বেছা, আমরা লড়ছি, ঐ

Dhaka University Institutional Repository



রশিদ পিওন বসে ছক কাটে কি কি
কথা যাবে । সুস্থ কেউ পাশে বসে
বলে নানা সব, শাস্ত্রীয় ভোটের কথা
দিবে দিও, অবশ্যম্ভাবী বাঙলা বন্ধু চাই
ও, সিন্ধু মুক্তির পথ, চৌকিদারী ট্যাক্সোও দেবনা ।
... ... ...
অনেকেও চলেছে পুঁজি, দুজন মরেছে
এখন অনেক জন ।
কিশোরেরা ঘিরে ধরে অসহযোগে মারছে পুলিশ
সারাবেলা কথা টুপি পরা অফিসার হাত জোড় করে
মাফ চায় ।[৮১]

এই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রচণ্ড শক্তি অর্জন করে । পাকিস্তান ঔপনিবেশিক মনোভাব নিয়ে পূর্বাঞ্চলকে শাসন-শোষণ করছে, এ-ধারণাও সর্বত্র বিস্তৃত হয় । এ-সময় থেকে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনেকে স্বাধীনতার কথা ভাবতে শুরু করেন । এই চিন্তা লক্ষ করা যায় কোনো-কোনো কবির রচনাতেও। আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এ-নিয়ে আলোচনা করেছি ।

আবার অনেকে এই আন্দোলনের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন পরবর্তী কালের বৃহত্তর, দুরূহতর ও কঠোরতর আন্দোলনের পূর্বাভাস । বাঙালীর জাতি চূড়ান্ত আঘাতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে সে-কথা কারো-কারো কবিতায় লক্ষ করা গেছে । এদেশের মানুষকে বিরাট ধ্বংসের মুখোমুখি হতে হবে ও বিরাট আত্মত্যাগ করতে হবে — এবং এর জন্য প্রস্তুতি থাকা দরকার এ মনোভাবও অনেকের লেখায় পাওয়া যায় ।

ক. আজো জানেনা এই বাংলার মানুষ
আরো বেশী আঘাত আর উৎপীড়নের জন্য
প্রচণ্ড প্রতীক্ষায় উন্মুখ —
আর শহীদদের আত্মদানে উদ্দীপ্ত
যতক্ষণ না তারা পেয়েছে মুক্তির স্বাদ ।
পলাশীর মাঠে আর ব্যর্থতা নয়
এবার সময় এসেছে প্রচণ্ড শক্তিতে দাঁড়িয়ে পড়ার ।[৮৭]

---

৮১। এক অসময়ের গান, ক্ষুধিত ইস্পাত, ঢাকা : খান ব্রাদার্স, ১৯৭২ পৃঃ ৬০-৬১ ।

৮৭। শিহাবউদ্দিন আহমদ, রক্তে রাঙা প্রভাত, একুশে, একুশের সংকলন, ১৯৬৯, পৃঃ ৭ ।

Dhaka University Institutional Repository



খ. অচিরেই বাংলাদেশ ভরে যাবে রক্তের দীপ্তিতে
যদি চোখে জল থাকে, তবে তা ফেলার জন্য তৈরী হও;
যদি বেদনাকে ভুলে থাক, তবে জেনো, বিষাদের কারাগৃহ
তোমাদের সামনে। সভ্যগণ, শোনো অগণ্য রক্তের
স্পন্দিত সাক্ষী হতে হবে তোমাদের
এই বিধ্বস্ত স্বদেশে
অচিরেই।
আমরা এক নতুন সিঁড়ির অশান্তিত দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছি।[৮৮]

৩

মিছিল, ধর্মঘট, হরতাল, শ্লোগান, সান্ধ্যআইন, পুলিশ-মিলিটারীর সঙ্গে ছাত্র-শ্রমিক-জনতার খণ্ডযুদ্ধ প্রভৃতি ছিল আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য। প্রতিদিন হাজার-হাজার লোকের মিছিল হয়েছে — যার রূপ কখনো শ্লোগানে-শ্লোগানে মুখর, আবার কখনো শোকে-বিষাদে মলিন ও মৌন। সান্ধ্যআইনের সময় শহর থমথমে রূপ পরিগ্রহ করেছে — জনমানবহীন, ফাঁকা ও ভয়াবহ মৃতদের নিস্তব্ধ — যা কখনো-কখনো ভঙ্গ হচ্ছে সেপাই সান্ত্রীর আনাগোনায়, মিলিটারীর গাড়ির আওয়াজে অথবা শহীদদের লাশ নিয়ে সৈনিকদের নারকীয় উল্লাসে। ধর্মঘট ও হরতালের দিনে শহরের রূপ ছিল ভিন্নতর। প্রাত্যাহিক কাজ-কর্ম বন্ধ, রাজপথে খণ্ড-খণ্ড মিছিলের পর মিছিল। এই চিত্রগুলি অনেক কবিতায় পাওয়া যায়।

ক. এ কেমন শহরে তুমি দাঁড়ালে, সখা
সারারাত সান্ত্রীর আনাগোনা
দূর কাছের শস্যক্ষেত্রে কিষাণের পদপাত নেই
পাখি নেই শিশু নেই, অযুত গোলাপ
সোনার শিকল নিয়ে খেলা করে
এ কেমন শহর।[৮৯]

---

৮৮। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, রক্তের ফেস্টুন /আসাদুজ্জামানের মৃত্যুতে/, হে স্বদেশ /কবিতা সংকলন/, বাংলাদেশ লেখক শিবির, বাংলা একাডেমী, ১ম সং, ফাল্গুন ১৩৭৮, পৃঃ ৯৫

৮৯। এ কেমন শহর, কুসুমিত ইস্পাত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫০

Dhaka University Institutional Repository



ঙ. বন্ধ অফিস, বন্ধ যান
বন্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
নেই হৃদয়ের মুখে হাসি
নেইক কারো চক্ষু-পট
ধর্মঘট ! ধর্মঘট ।[৯০]

চ. প্রতিটি দরজায় কাউন্টার সবই শ্রীহীন আজ। পা মাড়ানো
লাইনে দাঁড়ানো নেই, ঠেলাঠেলিহীন,
... ... ...
রাজপথ নিদাঘের শোকালয়, শূন্যতা সঙিন হয়ে ঘোরে
ঘেঁষে যায়, একটি কি দুটি
লোক ইতস্তত
শুষ্ক বাতাসে ওড়া কাগজের মতো ভাসমান।[৯১]

এই আন্দোলনে প্রাণ দিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-নেতা আসাদুজ্জামান। তাঁর আত্মদানের ফলে আন্দোলন বিরাট গণগত উৎকর্ষতা লাভ করে। আসাদের রক্তমাখা শার্ট নিয়ে যে-শোকমিছিল বেরিয়েছিল, তাতে যোগদান করে সমাজের সর্বশ্রেণীর নরনারী শেষ পর্যায়ে এই শোক মিছিল বিক্ষোভ মিছিলে পরিণত হয় এবং সেদিন ঢাকা শহরে গণঅভ্যুত্থান দেখা দেয়। এই বিষয় অবলম্বন করে শামসুর রাহমান রচনা করেছেন 'আসাদের শার্ট' নামক তাঁর জনপ্রিয় কবিতাটি। তিনি বর্ণনা করেছেন কিভাবে একটি শার্ট ক্রমে ক্রমে জনগণের প্রাণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

ডালিম গাছের মৃদু ছায়া আর রোদ্দুর-শোভিত
মায়ের উঠোন ছেড়ে এখন সে-শার্ট
শহরের প্রধান সড়কে
কারখানার চিমনি-চূড়োয়
গমগমে এভেন্যুর আনাচে কানাচে
উড়ছে, উড়ছে অবিরাম
আমাদের হৃদয়ের রৌদ্র ঝলকিত প্রতিধ্বনিময় মাঠে
চৈতন্যের প্রতিটি মোর্চায়।

---

৯০। মোঃ আঃ মান্নান, ধর্মঘট, চিঠিঃ ডাক, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮

৯১। শামসুর রাহমান, হরতাল, নিজ বাসভূমে, ১ম সং, ঢাকা, ১৯৭০, পৃঃ ১৯-২০ ।

Dhaka University Institutional Repository



আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা কলুষ আর লজ্জা
সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক
আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা ।[৯২]

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আসাদ অর্জন করেছেন অমরত্ব । তিনি স্থান পেয়েছেন মিছিলের শ্লোগানে, সংগ্রামীদের স্বপ্নে ও সাধারণ নর-নারীর চিন্তা-চেতনায়।

ওদের বুকের মধ্যে এখন আসাদ
ওদের সমস্ত সঙ্গীতে এখন আসাদ
ওরা সবাই এখন আসাদ
ওদের শীত রুক্ষতা এখন
ক্রোধের আগুনে জ্বলছে ।[৯৩]

আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশ নিয়েছিলেন শিক্ষকেরাও । রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ শামসুজ্জোহা শাহাদাৎ বরণ করেছিলেন সেনাবাহিনীর লোকদের বুলেট-বেয়নেটের আঘাতে । এ-ধরণের একজন 'সাধনাদীপ্ত ও প্রাণ উৎসর্গীত' তরুণ অধ্যাপকের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে 'সেই এক অধ্যাপক' কবিতাটি । একদিন তিনি তাঁর গুরুগণকে ছাত্রদের সম্মুখে আগুনে ভস্মীভূত করে অধ্যাপনায় ইতি টানার কথা ঘোষণা করলেন, কেননা বর্বর-চালিত, আমলাতন্ত্রের মুনশীয়ানায় শাসিত এবং একনায়কতন্ত্রের নিষ্পেষণে নির্যাতিত সমাজে অধ্যাপকের স্থান নেই । তিনি তখন বেরিয়ে পড়লেন একদল তরুণ বিপ্লবী সৃষ্টির জন্য যারা বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজে নবজাগরণ আনতে প্রাণ উৎসর্গ করবে ।

বললেন তিনি :

'এবার আমার সাধনা হবে অন্যতর এবং ভিন্ন পথে,
আমি গড়ে তুলবো একদল উৎসর্গীত প্রাণ সৈনিক
যারা এই আমলা নিপীড়িত সমাজে জ্বালবে
বিপ্লব আর বিদ্রোহের অগ্নিক্ষেপী অগ্নিশিখা
কেননা আমি বিশ্বাস করি
গ্লানির পঙ্কে নিমজ্জিত একটি সমাজ
বিপ্লবের মাধ্যমেই নবজন্ম লাভ করে ।[৯৪]

৯২। নিজ বাসভূমে, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪
৯৩। নাসিরুল ইসলাম, ওরা সবাই এখন আসাদ,
৯৪। সেই এক অধ্যাপক, বিচিত্র প্রতিলিপি, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬০

Dhaka University Institutional Repository



আন্দোলনে যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন, সেই অমর শহীদরা ছিলেন বাঙালীর গর্বের ও গৌরবের ধন। তাঁদের পবিত্র মরদেহগুলি রাখার জন্য বাঙালীর হৃদয়ই উপযুক্ত স্থান, পাহাড়, মাটি অথবা জল কিছুই এগুলির যোগ্য সমাধি হতে পারেনা — শামসুর রাহমানের একটি কবিতায় এর উল্লেখ আছে।

এ লাশ আমরা রাখবো কোথায় ?
তেমন যোগ্য সমাধি কই ?
মৃত্তিকা বলো, পর্বত বলো
অথবা সুনীল সাগর — জল
সব কিছুই ছেঁদো, তুচ্ছ শুধুই।
তাইতো রাখিনা এ লাশ আজ
মাটিতে পাহাড়ে কিংবা সাগরে
হৃদয়ে হৃদয়ে দিয়েছি ঠাঁই।।[৯৫]

আন্দোলন দমন করার জন্য প্রথমে আইন-প্রয়োগকারী সংস্থাকে ও শেষদিকে সেনারক্ষা বাহিনীকে নিয়োগ করা হয়। পুলিশের প্রতি সরকারের অবিশ্বাসের কারণ ছিল এজন্য যে, তাঁরা আন্দোলনকারীদের উপর যথোচিত নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করতে পারেনি; বরং শ্লোগানে ও দাবিদাওয়াতে নিজেদের অন্তরের আবেগের প্রকাশ দেখে এরা মিছিলকারীদের সঙ্গে অনেকক্ষেত্রে সহমর্মিতা প্রকাশ করেছে। দায়িত্ব-পালনের জন্য অনেককে কোনো-কোনো সময়ে নিষ্ঠুর হতে হলেও এরা তার জন্য পরে নিদারুণ অনুশোচনা ও গ্লানি ভোগ করেছে। 'পুলিশ রিপোর্ট' কবিতায় এ-ধরণের একজন পুলিশের বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সমুদ্রের উত্তাল গর্জনের বিরাটত্ব নিয়ে ঢেউয়ের মত এগিয়ে আসা মিছিলটি দেখে পুলিশটি অভিভূত ও বিহবল হয়ে পড়েছিল। সহসা কোনো-এক তরুণের রক্ত ছিটকে এসে তাঁর হাতে পড়ে। বিহবল পুলিশটি ব্যারাকে এসে ঘন-ঘন হাত ধুঁতে থাকে কিন্তু কিছুতেই

---

৯৫। শামসুর রাহমান, এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়, নিজবাসভূমে, পৃঃ ৬৪।

যেন সে-রক্তের দাগ মোছেনা। পুলিশটির মনে শুধুই ভাসতে থাকে সেই মিছিলের শিরাউঁচু হাত তার ধনুহীন হাওয়ায়।

হাতে নিয়ে পাকা লাঠি দেখলাম ওরা, সংখ্যাহীন
রাজপথে ফোলাবাড় এগোয় কেবল। চতুর্দিকে অনুশিত বাধা
উত্তাল, উদ্দাম
সড়কে দুরন্ত-ছাপানো
লোক, শুধু লোক।
... ... ...
হঠাৎ সে কোন তরুণের বুকের গভীর থেকে
কী যেন ফিনকি দিয়ে ছোটে, পড়ে আমার দু'হাতে।
রক্ত এত লাল আর এমন গরম
কখনো জানিনি আগে। ন্যাপাকে মুছেছি ঘন ঘন
ধুই হাত ঘষে ঘষে
অথচ মোছেনা দাগ কিছুতেই সে তাজা রক্তের।
হোস পাইপের অজস্রতা পারেনা মুছতে দাগ
এ-দাগ ফেললে মুছে এত পানি ধরেনা সমুদ্রে কোনোদিন।
ঘড়িতে গভীর রাত, ব্যারাক নিশ্চুপ, সারাবাড়ি
করি পায়চারী আর হঠাৎ কখনো কানে ভেসে আসে
সমুদ্রের বিপুল গর্জন,
সকল মনের সব সাধ যেন আমার ওপর
পড়েছে ঝাঁপিয়ে ক্ষমাহীন।[৯৬]

৪

এই আন্দোলন-বিষয়ক কবিতাগুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করার মত। কবিতাগুলির অধিকাংশ রচিত হয়েছে তাঁদের দ্বারা, যাঁরা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে শরীক হয়েছিলেন। ফলে তাঁদের আবেগ হয়েছে আন্তরিক ও বক্তব্য দ্বিধাহীন। কবিতাগুলি বক্তব্য প্রধান এবং সে-বক্তব্যের জোয়ারে গৌণ হয়ে পড়েছে কবিতার শিল্প আঙ্গিক। বক্তব্যগুলি মধ্যবিত্তের আশা-আকাঙ্ক্ষার গণ্ডী অতিক্রম করে স্পর্শ করেছে বৃহত্তর জনজীবনের সুখকে এবং এখানে বাংলা কবিতা হাজির হয়েছে গণজীবনের কাছাকাছি।

---

৯৬। শামসুর রাহমান, পুলিশ রিপোর্ট, নিজ বাসভূমে, পৃঃ ১৫-১৬

Dhaka University Institutional Repository



এগার

গগণ আবুর প্রকৃত নাম গোলাম কিবরিয়া। রংপুরের আঞ্চলিক ভাষায় তার নামের অর্থ ভানু বা সূর্য। সাহিত্যাকাশে সূর্যের মত দেদীপ্যমান হবেন, গগণ তার ছদ্মনাম নেওয়ার পশ্চাতে গোলাম কিবরিয়ার মনে হয়ত এই আশা ছিল। তাঁর জন্ম রংপুরের ডোমারে, ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন ১৯৬৩ সালে কিন্তু ১৯৬৪ সালের সমাবর্তন উৎসবে তৎকালীন প্রদেশপাল মোনয়েম খানের আগমনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়। অবশেষে কিছুকাল ঢাকার জগন্নাথ কলেজ ও রংপুরের নীলফামারী কলেজে অধ্যয়ন করে তিনি ১৯৭০ সালে মাস্টার ডিগ্রি লাভ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

বামপন্থী ছাত্র-রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করার জন্য তাঁকে তৎকালীন সরকারের হাতে অনেক নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। তিনি রাজনৈতিক কারণে বন্দী হয়েছেন ছাব্বিশ বার, জেলে গিয়েছেন সাত বার। বর্তমানে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসাবে সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত আছেন।[৯৭]

তাঁর রচিত কাব্য দুটি : হাতিয়ার তুলে নাও /১৯৬৮/ এবং মিছিলের আর্তনাদ /১৯৭০/। মানুষের প্রতি গভীর মমতা, শোষকদের প্রতি তীব্র ঘৃণা, লক্ষ্য হাসিলের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা এবং আন্তর্জাতিকতাবোধ প্রভৃতি মনোভাব কাব্যদ্বয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তবে প্রথম কাব্যের তরল উচ্ছ্বাস ও সরল কাব্যভাষা পরবর্তী কাব্যে সংহত, তীব্র ও কাব্যধর্মী হয়ে উঠেছে।

হাতিয়ার তুলে নাও[৯৮]— এর ভূমিকা 'প্রসঙ্গ' লিখেছেন সমমনোভাবাপন্ন কবি ইন্দু সাহা। তা থেকে কবির জীবনাদর্শের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ :

> তিনি সব ক্ষেত্রে পৃথিবীর নিপীড়িত, অবহেলিত আর অত্যাচারিত'র প্রতি সহানুভূতিতে নম্র। বিশেষ করে কৃষকের দুরবস্থার কথা, শ্রমিকের দুরবস্থার কথা

---

৯৭। এই তথ্যগুলি কবির সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে গৃহীত হয়েছে।

৯৮। ১ম সং, ঢাকা, ফাল্গুন ১৩৭৪।

অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সহজতর ভাষায় বলতে চেয়েছেন। ... আছে নতুন দিনের জন্যে আহ্বান। আছে নতুন সূর্যালোকে স্নাত নতুন উত্তাপের প্রার্থনা। এ আহ্বান, এ প্রার্থনা আন্তর্জাতিকতায় ঋদ্ধ।

এই কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য আন্তর্জাতিকতাবোধ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা। ভিয়েতনাম কঙ্গো এঙ্গোলা রোডেশিয়া মধ্যপ্রাচ্য — জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের যুদ্ধে লিপ্ত সব অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে কবি একাত্মতা অনুভব করেছেন এবং মহান রুশ-চীন বিপ্লবকে সামনে রেখে সংগ্রামে অগ্রসর হতে তাঁদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ঃ

বীর জনতা, হাতিয়ার তোলো কাঁধে
ইতিহাস খোলো সামনে
স্মরণ করো রুশ মহাচীন বিপ্লব
পথ পাবে পথ, সব কিছু সব ঠিক
চেয়ে দেখো ঘরে ঘরে মহান মাও-লেনিন
ঐতো সামনেই সুদিন
হাতিয়ার কাঁধে তোলো সব
হাতিয়ার কাঁধে তোলো ।[৯৯]

ভিয়েতনামের কারাগারে দুর্বল শরীর মানুষগুলির অজেয় মনোবল ও শৌর্য দেখে কবি নিজের মধ্যে গভীর আত্মপ্রত্যয় অনুভব করছেন এবং স্বীয় পূর্ব পুরুষের দৃঢ়তা ও বীরত্বে অভিভূত হয়ে ভারতবর্ষের সর্বত্র সংগ্রামের অগ্নিশিখা জ্বালাতে ব্রত নিয়েছেন ঃ

আমি আজ অঙ্গীকার করি
পূর্ব পুরুষের দৃঢ়তা বীরত্ব
তোমরাই আমাদের স্মরণিকা
তিতুমীর সিরাজ আনাচে কানাচে
যশোরের মাটিতে ঘরে ঘরে
আমি জ্বালবো সংগ্রাম শিখা ।[১০০]

---

৯৯। হাতিয়ার কাঁধে তোলো, পৃষ্ঠা ৮ ।

১০০। অঙ্গীকার করি, পৃষ্ঠা ১৫ ।

Dhaka University Institutional Repository



পূর্ব বাংলা সম্পর্কেও তিনি সমানভাবে উদ্বিগ্ন। এদেশেও শোষকদের বিরুদ্ধে বার-বার বিদ্রোহ হয়েছে। কবি মনে করছেন বায়ান্নোর একুশে ও বাষট্টির সতেরোতে যে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয়েছে ভবিষ্যতে তা আরো ব্যাপকাকার ধারণ করবে:

বায়ান্নর একুশে
বাষট্টির সতেরো
তোমাদের কণ্ঠস্বর
সুরে সুরে মিশবে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই
আমরা জন্ম দেবো
নতুন কণ্ঠস্বরের ইতিহাস,
সে কণ্ঠস্বরে লক্ষ-কোটি কণ্ঠস্বর
তারপর কোটি কোটি কণ্ঠস্বরে
উচ্চকিত হবে সে ধ্বনি
যুক্ত হয়ে তীব্রতা ছড়াবে।[৮১]

এভাবে স্বদেশ ও বিদেশের সংগ্রামকে এক করে দেখে কবি আন্তর্জাতিকতায় উন্নীত হয়েছেন এবং নিজেকে ঘোষণা করেছেন সেই সংগ্রামের মহানায়করূপে:

বিশ্বের সর্বহারাদের দলে নায়ক আমি
মিছিলে শপথ নিয়েছি আমরা সর্বত্যাগী
এখানে রক্ত যেখানে শোণিত মুক্তিকামী
দুনিয়ার শোষিতেরা আজ সংগ্রামী মুক্তির পথে।[৮২]

'মিছিলের আর্তনাদ'[৮৩] কাব্যের প্রথম কবিতা রোডেশিয়া। শ্বেতাঙ্গ শাসন থেকে মুক্তিলাভের জন্য যুদ্ধরত বীর রোডেশীয়দের কবি অভিবাদন জানাতে চান — যারা তাঁর নিজের দেশের স্বাধীনতা হরণ করেছে তাদের নিধন করে:

যুদ্ধ শেষই ওর সাথে রোডেশিয়া
যতদিন হোক, যে কেড়েছে আমার
প্রাণের প্রতীক 'স্বাধীনতা-প্রিয়া'।

---

৮১। নতুন কণ্ঠস্বরের মহড়া, পৃঃ ১৯।

৮২। শোষকের মৃত্যু পরোয়ানা, পৃঃ ২৪।

৮৩। ১ম সং, ঢাকা, ফাল্গুন ১৩৭৬।

Dhaka University Institutional Repository



মুক্তি যোদ্ধা রোডেশিয়া
তোমাকে সালাম জানাই
শত্রু নিধন করিয়া।[১০৪]

'আমার গাঁয়ের কিষাণ' কবিতায় এক কৃষক সোনালী শস্যভরা ক্ষেতের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিজের রক্ত-জল-করা শ্রমের বিনিময়ে উৎপন্ন ফসল মজিদারকে না-দেবার প্রতিজ্ঞা করছে:

খালে খালে ধানের ক্ষেতে ক্ষেতে
কিষাণে যেতে যেতে
ক্রমে ক্রমে বিদ্রোহ বোনে মনে মনে
মনুষ্য চলে বিদেশ সবার সোনা ঘামে
বিদ্রোহ করে কিষাণ —
নিজে নিজেতে নিজের নামে
যে ফসল তার সোনা ঘামের দামে
কিছুতেই সে দেবে না এবারে।[১০৫]

এই লক্ষ্যাভিমুখ কবিতা তাদের অনেক আছে। 'প্রবাস লিখছি'[১০৬] কবিতায় বিপ্লবনন্দু প্রেয়সীর চিঠির জবাব। কবি সুদেশ উদ্যানের জন্য যুদ্ধরত 'গণবাহিনী'র সেনাপতি, সেজন্য সবারের দাবি নিয়েকে তিনি যুদ্ধান্ত পর্যন্ত অঙ্গীকার করতে চান — এটাই কবির জবাব। 'সেই হেতু' কবিতায় গ্রামের কামার কুমার জেলে নাপিত তাঁতি কিষাণ ও শহরের কেরানী মুটে মজুরদের বিদ্রোহী মানসিকতার উল্লেখ আছে, তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে শোষক-প্রভুদের বিরুদ্ধে। 'হুঁশিয়ার হে সুদেশ আমার'[১০৮] কবিতায় আহবান জানানো হয়েছে সবাইকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে, কারণ শত্রুরা এখনো পরাস্ত হয়নি এবং নব-নব সাজে যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হচ্ছে। 'মিছিলের আর্তনাদ'[১০৯] কবিতায় মিছিল-স্লোগানের পরিবর্তে প্রত্যক্ষ যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তার উপর কবি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মিছিল করে ও স্লোগান দিয়ে কিছু-কিছু দাবি যে আদায় হয় না

---

১০৪। পৃঃ ১১
১০৫। পৃঃ ১৪
১০৬। পৃঃ ১২-১৩
১০৭। পৃঃ ৪৮
১০৮। পৃঃ ৫৯
১০৯। পৃঃ ৫২

Dhaka University Institutional Repository



এমন নয়, যেমন চাঁদের বদলে মুক্তি, তবে পুরো অধিকার আদায় করতে হয় জোর জবরদস্তি করে। কাল বৈশাখী এসে এদেশের সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিক — এমন কামনা আছে 'এসো হে মধু বৈশাখ' কবিতায়। এক কালে এদেশে হাসি-গান-কলরব ও সমৃদ্ধি ছিল কিন্তু বর্তমানে এদেশ হতশ্রী-রুক্ষ-শুষ্ক ও ঊষর। এই হতাশাদীর্ণ বর্তমানকে বদল করে নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে দরকার মধু বৈশাখের ঃ

কত শত স্বপ্ন আজ দুরাশা
চাপা পড়ে গেছে কত শত আশা,
অনেক দীঘির জলে লাগে না কাঁপন
এখন তারে ভায়েরে বলে না আপন
আজ লোভীদের ভালো খুনীদের পণ
যাত্রার দিনে গাওয়া ভৈরবী
অবাক অবাক
এসো, এসো হে মধু বৈশাখ।[১০]

'মাও সে তুং এর মৃত্যুর দিনে' একটি কৌতূহলোদ্দীপক কবিতা। মাও সে তুং (১৮৯৩-১৯৭৬) -এর মৃত্যুর দিনে পৃথিবীতে কোথায় কি প্রতিক্রিয়া হবে তার কাল্পনিক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এই কবিতায়। সেদিন নদীর গান, সমুদ্রের স্রোত, সূর্য-রশ্মি, চাঁদের জ্যোৎস্না, সব স্তব্ধ হয়ে প্রকৃতি বেদনা-বিধুর হবে এবং সাদা-কালো-বাদামী সব রঙের বঞ্চিত মানুষের মনে বেদনার নীল পাহাড় জমবে, অন্যদিকে পৃথিবীর সমস্ত অত্যাচারী ও শোষণকারী লোকেরা মহা-উল্লাসে মেতে উঠে সুরা-নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করতে মত্ত হবে। যাঁরা মাও-এর আদর্শানুসারী সেই তরুণ শিল্পীরা তাঁর নির্দেশিত পথে অসমাপ্ত কর্মকে সাফল্য-শিখরে পৌঁছে দিতে নতুন করে সুর সাধবে ঃ

আজ শুধু বেদনার সভা বসবে পৃথিবীর পথে
কান্নার মেলা বসবে জয় জননীর রথে
কেননা কমরেড মাও আজ গেছে —
দূরের পাহাড়ে গেছে—সূর্য আনতে
তাও আমরা কোটি কমরেড ব্যস্ত
ব্যস্ত শত্রুর মুখোমুখী সঙিন শানাতে।[১১]

---

১০। এসো হে মধু বৈশাখ, পৃঃ ৫০।
১১। পৃঃ ৫৩।

Dhaka University Institutional Repository



বার

১৯৪১ সালে পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জে ইসু সাহার জন্ম হয়। তাঁর পিতা ও পিতৃব্য বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই ঐতিহ্য সাহার মানস-গঠনে সহায়ক হয়েছে। তরুণ বয়স থেকে তিনি বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। মার্কসবাদী মাসিক পত্রিকা 'পৃথিবী'র যুগ্ম-সম্পাদক /১৯৬৪-৬৮/ ও অর্ধসাপ্তাহিক 'পাকিস্তান'-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক /১৯৬৮-৭০/ রূপে কাজ করেন, এবং সক্রিয়ভাবে 'পূর্ব পাকিস্তান কমুনিস্ট পার্টি /মার্কসবাদী-লেনিনবাদী/'-তে যোগদান করেন ১৯৬৭ সালে। কারান্তরালে ছিলেন কয়েকমাস — ১৯৬৮ / ১৯৬৯ সালে।

তাঁর রচিত অনেকগুলি উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ও কাব্য রয়েছে। পাকিস্তান-আমলে প্রকাশিত হয়েছে /উপন্যাস/ 'গঙ্গাপারের বেয়া' /১৯৬৮/, 'কিষাণ বৌ' /১৯৬৮/ এবং /নাটক/ 'বেকার নিকেতন' /১৯৬৬/ ও 'বাস্তুত্যাগ' /১৯৬৬/। এই সময়ে তাঁর প্রকাশিত কাব্য হচ্ছে 'ঝড় আসছে'।[১১২]

'ঝড় আসছে' ৮৮ পৃষ্ঠার কাব্য। এতে মোট ৩৩টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। প্রতিটি কবিতায় কবির বিশ্বাস ও আদর্শ স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। কবির মনোভাব জানা যায় কাব্যের ভূমিকা থেকে:

> পৃথিবীর নিরন্ন মানুষ পেট ভরে খেতে পাক — সমস্ত পরাধীনতা দূর হয়ে সমগ্র বিশ্ব মুক্তি পেয়ে প্রাণ খুলে হাসুক, তার ব্যবস্থা শিল্পের লালিত্য দিয়ে চলেনা। প্রয়োজন হাতিয়ারের, প্রয়োজন সূর্যের মতোন দুর্বার স্পর্ধায় মাথা তুলবার মতোন শক্তির।[১১২ক]

এখানে কবি অত্যন্ত চমৎকারভাবে বলেছেন কাব্যের লালিত্যে তাঁর আস্থা কম। এজন্য তিনি কবিতায় প্রশ্রয় দেননি কোনো লালিত্যের কিংবা শিল্পের প্রধান-প্রধান দাবির। তাঁর কবিতা স্পষ্টভাষণে উজ্জ্বল, কঠোর শব্দচয়নে প্রাণবন্ত এবং প্রগলভতায় উচ্চকিত। কবিতা তার কাছে একটি হাতিয়ার, যার সাহায্যে তিনি যুদ্ধ-ঘোষণা করেছেন শ্রেণীশত্রুদের বিরুদ্ধে।

---

১১২। কবির সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে/জুন ৭, ১৯৭৮/তথ্যগুলি গৃহীত হয়েছে।
১১২ক। ঢাকা : ধানসিড়ি প্রকাশনী, ১৩৭৬

Dhaka University Institutional Repository



পৃথিবীর সর্বপ্রান্ত থেকে শান্তি প্রতিষ্ঠার জোরালো আহ্বান জানানো হচ্ছে, কিন্তু জীবনের ন্যূনতম অধিকার যেখানে অস্বীকৃত সেখানে শান্তির শান্তিবাণী পরিহাসের মত শোনায়। শান্তিবাদীদের লক্ষ্য করে কবি এই কথা বলেছেন একটি কবিতায়:

আমার দুহাতে পরিয়ে রেখেছো হাতকড়া
— শিকল দিয়েছো পায়
ক্ষুধিত জঠোর ঘরে হাহাকার
যুবতী বিকোয় ইজ্জৎ তার
শিশুর খাদ্য মা কেড়ে খায়
কাঁদে এ শিশু শোষণের ঘায়
শান্তি শান্তি কোরছো তোমরা
দ্যাখাও শান্তি আজ কোথায় ?[১১৩]

বাংলাদেশেও যে শান্তি নাই বরং অনাহার অর্ধাহার ও দুর্ভিক্ষ মিলে সাধারণ মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে তার উল্লেখ আছে একটি কবিতায়:

শকুনের সারির মতো
পায়ে পায়ে দুর্ভিক্ষ আসে
প্রিয়তম বাংলা দেশে —
দুর্ভিক্ষ আসে কিষাণের শস্যহীন খামারে খামারে
দুর্ভিক্ষ দেখি মজুরের অসামর্থ গৃহে
ভূখিমারে দুর্ভিক্ষের আশির্বাদ সন্ধানে আজ
বস্তির স্যাতসেঁতে সূর্যহীন ভাঙা ঝুপড়ির জননীরা
তাদের শুকনো স্তন বাদুরের মতোন ঝুলিয়ে দেয়
আর উদর অপুষ্ট মরণমুখ শিশুগুলো
প্রাণপনে তাই চাটে ক্ষুধা মেটাবার ব্যর্থ চেষ্টায়।[১১৪]

পূর্ব বাংলার মানুষ এই অসহ্য অবস্থার প্রতিকারকল্পে একবার মরিয়া হয়ে উঠেছিল ১৯৬৯ সালে। আন্দোলন শুরু হয় ১৯৬৮ সালের ৬ই ডিসেম্বর, যেদিন মাওলানা ভাসানী বিরাট মিছিল নিয়ে

---

১১৩। শান্তিবাদীরা শোনো, পৃঃ ৭৯।

১১৪। প্রত্যয়, পৃঃ ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository



লাটভবন ঘেরাও করতে গিয়েছিলেন। এই আন্দোলন ছিল গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এবং প্রাথমিকভাবে পরিচালিত হয়েছিল স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে ঃ

ক্রুদ্ধ জনতা পর্যায় তার
পুরোভাগে ভাসানী
প্রাণে বিদ্রোহে মিছিলের মুখ
নতুন দিনের বাণী।[115]

স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন দ্বারা লক্ষ অর্জিত হয়না। শোষক শ্রেণী সংঘবদ্ধ আছে এবং মিলিতভাবে মোকাবেলা করে যাচ্ছে বিরোধী শক্তির। এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলে, তাই, শোষিতদেরও সংগঠিত হতে হবে, গড়তে হবে বিপ্লবী সমিতি। একটি কবিতায় সমিতি গঠনের জন্য কবি সবার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেনঃ

মুক্তি আসবে — সেই ঈপ্সিত মুক্তির জন্যে
মনে মনে সবাই প্রতিজ্ঞা করো
আজ থেকেই গোপনে গোপনে সমিতি করো।[116]

বাংলাদেশের বিপ্লবীদের একটি অতি প্রিয় নাম সুকান্ত। তিনি সাম্যবাদী আদর্শে আস্থাবান ছিলেন এবং সাহিত্যের মাধ্যমে সে ভাবধারা প্রচার করে গেছেন। ইন্দু সাহা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন একটি কবিতায়। প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন, এদেশের মাঠের ধান ও কারখানার ফসল কেড়ে নেওয়ার জন্য শোষকেরা ষড়যন্ত্র আঁটছে। তাদের ঠেকাতে হবে শক্তির মাধ্যমে এবং ভুখানাঙ্গা মানুষেরা তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে ঃ

আমাদের সব রক্তের স্রোত মাঠের সোনালী ধানে,
আমাদের যত বুকের রক্ত কারখানা খামারেতে,
কাস্তে হাতুড়ে কোদালে কাটতে রক্তের সেই স্রোত
শুষে নেবে শত্রুদলের পেয়েছি খবর আজ।
তাই প্রয়োজন শক্তির আজ, দুহাতে শক্তি চাই
জেনেছে মিছিলে সূর্যের তাপে দৃপ্ত করোটী জ্বলে,
চিনসাম্রাজ্যের অনুচরদের শান্ত কণ্ঠকে
ভুখা—নাঙ্গা জাত রুদ্ধ করবে নিকোতে কাঁপে ধরা।[117]

---

১১৫। ১৯৬৮— ৬ই ডিসেম্বর, পৃঃ ৬৩।
১১৬। তিন নম্বর, পৃঃ ৭০।
১১৭। সুকান্ত — লক্ষ জনতার নাম, পৃঃ ৫৩।

Dhaka University Institutional Repository



পৃথিবীর বিপ্লবীদের কাছে একটি প্রিয় নাম মাও সে তুং। চীনদেশের এই নেতা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বিপ্লবীদের আশা ও ভরসার উৎস। তাঁর অনুসৃত বিপ্লবের রণকৌশল বর্তমানে অনেকে গ্রহণ করেছে এবং সে-কায়দায় যুদ্ধ চলছে ইন্দোচীন, মধ্যপ্রাচ্য, রোডেশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকায়। ইস্ সাহা 'মহান মুক্তিসূর্য মাও' - এর জন্ম কামনা করছেন পূর্ব বাংলায়, কারণ এদেশও চঞ্চল হয়ে উঠেছে শোষকদের হাত থেকে মুক্তি লাভের জন্য।

হে পৃথিবী এসো, মার খাওয়া জনস্রোত আজ
বাহুতে বাহুতে আর প্রাণের সবুজ স্পন্দনে
বুকের অন্তরের লাল স্পন্দনকে একত্রিত করি,
গান গাই শঙ্কাহীন - বিজয়ের গান
গান গাই আমাদের প্রাণে প্রাণে জন্ম নিক
মহান মুক্তি সূর্য মাও —
আমরা এখন পদ্মার ঘূর্ণী ভেঙে উজান চলেছি -
সামনে উপদ্রুত বঙ্গোপসাগর।[১১৮]

কবি অনুভব করছেন বর্তমানের পৃথিবীর সামাজিক কাঠামো অচিরেই বদলে যাবে। দেশে-দেশে নিপীড়িত জনগণ যেভাবে নিজেদের দুরবস্থা ও তার প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে, তাতে বাঞ্ছিত শ্রমিক-রাজ কায়েম হবার আর বেশি দেরি নেই। তার লক্ষণও ইতিমধ্যে স্পষ্ট হতে শুরু করছে :

আর্তনাদ - আর্তনাদ জাগে
পৃথিবী আসন্নপ্রসবা আজ
দিগন্তে মুক্তির লাল ঢেউ লাগে
যে শিশু জন্ম নেবে - নাম তার
মজুর স্বরাজ।[১১৯]

---

১১৮। মাও সে তুং, পৃঃ ৫০।
১১৯। মুক্তির লাল সূর্যকে, পৃঃ ১৭।

Dhaka University Institutional Repository



# দশম অধ্যায়

# অনুবাদ কবিতা

Dhaka University Institutional Repository



বাংলা ভাষায় অন্য ভাষার কবিতার অনুবাদ প্রচুর পরিমাণে হয়নি; অনুবাদের পরিধি ছিল ততোধিক সংকীর্ণ। কখনো ধর্মনৈতিক, কখনো আদর্শিক এবং কখনো নিছক কাব্যানুরাগ — এই ত্রিবিধ কারণেই এদেশের কবিরা অনুবাদ করেছেন। কেউ-কেউ অনুবাদ করেছেন ব্যক্তিগত আগ্রহে, তবে অধিকাংশ অনুবাদই হয়েছে বাংলা একাডেমী, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স ও ফ্রাঙ্কলিন পাবলিকেশন্স প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে। অনুবাদকগণ তিনটি পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছিলেন — কেউ অনুবাদ করেছেন যথাসম্ভব মূলের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করে দেবার জন্য; কেউ করেছেন মূলকে অবলম্বন করে স্বাধীন অনুবাদ আর তৃতীয় দলের অনুবাদে রয়েছে এই দু-ধারাকে সমন্বিত করার প্রয়াস। অনেকে অনুবাদ করেছেন সরাসরি মূল থেকে, আবার অনেকের অবলম্বন ছিল মূল কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ। মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত শীর্ষকে অনুবাদগুলিকে আলোচনা করা যেতে পারে : ১ ইকবালের কবিতা[1], ২ মরমী কবিতা, ৩ রোমান্টিক কবিতা ও ৪ গণমুখী কবিতা।

## ১ ইকবালের কবিতা

মোহাম্মদ ইকবালের (১৮৭৩–১৯৩৮) কবিতার তর্জমাই পূর্ব বাংলায় ব্যাপকভাবে হয়েছে।[2] এর কারণ বহুবিধ। প্রথমত, তাঁর কবিতার শিল্পগুণ যে অনেক অনুবাদককে আকৃষ্ট করেছিল, তা বলাই বাহুল্য। দ্বিতীয়, বাঙালী মুসলমানগণ যখন নিজেদের সম্প্রদায়ের দুঃখদৈন্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে, সৃষ্টিহীন মুহূর্তে আল্লার মঙ্গলময় বিধানেও সন্দিহান হয়ে পড়েছে

---

১। ইকবালের কবিতার অনুবাদের প্রাচুর্য এবং পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর কবিতার বিশেষ অবদানের দরুন এগুলি স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হয়েছে।

২। প্রাক-পাকিস্তান যুগে অনূদিত কবিতার আলোচনা পাওয়া যাবে মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান কৃত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে (চট্টগ্রাম; বইঘর, পৃঃ ৪৩৬–৩৭,) ৩য় সংস্করণ।

Dhaka University Institutional Repository



এবং ইসলামকে জাতীয় জীবনে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করে দুঃখনিবৃত্তি করতে চাচ্ছে তখন ইকবালের কবিতায় তারা তাদের মনোভাবের স্পষ্ট প্রতিফলন দেখতে পেয়েছিল ।[৩] পাকিস্তানোত্তর কালেও এই মনোভাব ক্রিয়াশীল থাকে । শেকোয়া /১৯১১/ ও জওয়াবে শেকোয়া /১৯১১/ মূলত এই কারণেই অনূদিত হয়েছে । তৃতীয়ত, ইকবালের কবিতায় এক গভীর দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায় । আসরারে খুদী /১৯১৫/ ও রমুযে বেখুদী /১৯১৮/ পূর্ণ বিকশিত সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ জাগরণের যে-বাণী রয়েছে, তা-ও অনেককে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছিল ।[৪] চতুর্থত, রাজনৈতিক স্বাধিকার অর্জনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক স্বাধিকার অর্জনের জন্যও একদল বাঙালী মুসলমান সাহিত্যিক বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন । চিরায়ত বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যে লুপ্ত না হয়ে ইসলামী সাহিত্য নামক স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টিতে তারা মনোনিবেশ করেন । ইসলামী বিষয়বস্তু অবলম্বনে শক্তিশালী সাহিত্য রচনা করা সম্ভব, ইকবালের কবিতা তাদের সে-বিশ্বাসকে দৃঢ় করে । ইকবালের কবিতার অনুবাদ তাঁদের আন্দোলনকে শক্তিশালী করবে — এ বিশ্বাসে তাঁরা কীয়ান হয়ে উঠেন । পঞ্চমত, পাকিস্তানী জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করে পাকিস্তানের সংহতি জোরদার করার আকাঙ্ক্ষায় পাকিস্তান সরকার ইকবালের কবিতাকে ব্যবহার করে । পাকিস্তানের জাতীয় কবির রচনার মর্ম আস্বাদনের দ্বারা বাঙালীদের দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ পোক্ত হবে, এটা সরকার ধারণা করত । সেজন্য সরকারী ও সরকারের আনুকূল্যপুষ্ট বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে তাঁর কবিতার তর্জমার ব্যবস্থা হয় ।

এই কারণগুলির মধ্যে প্রবল সাম্প্রদায়িক মনোভাবটি লক্ষ করার মত এবং সেজন্যই ইকবালের কবিতা কখনো সামগ্রিকভাবে বাংলায় ভাষান্তরিত হয়নি । কাব্যজীবনের শুরুতে

---

৩। সৈয়দ আলী আহসান /সম্পাদক/, ইকবালের কবিতা /ঢাকা : প্যারাডাইস লাইব্রেরী, ১৯৫২/, ভূমিকা পৃঃ পাঁচ ।

৪। ঐ

তিনি যেখানে অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ছিলেন, তাঁর সে-পরিচয় তুলে ধরায় বিশেষ উৎসাহ কখনো এদেশে দেখা যায়নি ।[৫]

১৯৫২ সালে সৈয়দ আলী আহসানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'ইকবালের কবিতা'।[৬] এতে সম্পাদক ব্যতীত কবীর আহমদ ও আবুল হোসেনের তরজমাও সংকলিত হয়েছে । প্রধানত 'আসরারে খুদী'র বিভিন্ন অংশের, গৌণত কয়েকটি খণ্ড কবিতার অনুবাদ তাঁরা করেছেন । অনুবাদের জন্য তাঁরা মুখ্যত নির্ভর করেছেন 'নিকলসন' কৃত আসরারে খুদীর ইংরেজি তরজমার উপর ।

আসরারে খুদী দার্শনিক তত্ত্ব সমৃদ্ধ রচনা । এর কাব্যিক ভাষান্তরে আড়ষ্টতা থাকা অস্বাভাবিক নয় । বিশেষত অনুবাদ থেকে অনুবাদ করায় তাঁদের রচনায় মূলের তত্ত্ব অটুট থাকলেও সাবলীলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য আসেনি । যেমন কবীর আহমদের :

আত্ম রক্তের ধারা প্রবাহিত করে দেহে আকাঙ্ক্ষার কণা
বাসনার দীপ্তিতে মৃত্তিকা-তনুতে জাগে আলোর মূর্ছনা,
বাসনার উষ্ণতায় এ জীবন পান-পাত্র পরিপূর্ণ কানায় কানায়;
চঞ্চল জীবনধারা গতির প্রবাহ খোঁজে বাসনার দীপ্ত প্রেরণায়[৭]

---

৫। ১৯০৫ সালে ইউরোপ-গমনের পূর্ব পর্যন্ত ইকবাল একজন খাঁটি জাতীয়তাবাদী ভারতবাসী-রূপে কবিতা লিখেছেন । হিমালা /হিমালয়/, তস্বীর-ই-দর্দ /ব্যথার ছবি/, নয়া শিওয়ালা /নব শিবালয়/, ভারতীয় বালক বালিকাদের জাতীয় সঙ্গীত এবং সর্বোপরি 'তারানা-ই-হিন্দী' /ভারত সঙ্গীত/ কবিতাগুলিতে তাঁর সে পরিচয় আছে ।

সকল দেশের সেরা, আমাদের এই হিন্দুস্তান,
বুলবুল মোরা তারি, আমাদের এদেশে ফুল বাগান । /ভারত সঙ্গীত/

/মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ইকবাল, পরিবর্ধিত ২য় সং /ঢাকাঃ ১৯৫৮/, পৃঃ ৬৮-৬৯ ।

৬। ইকবালের কবিতা /ঢাকা : প্যারাডাইস লাইব্রেরী ১৯৫২/,

৭। আসরার-ই-খুদী থেকে, ঐ, পৃঃ ১৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

কিংবা সৈয়দ আলী আহসানের ঃ

অস্তিত্বের ব্যঞ্জনায় ব্যক্তি-রূপ রয়েছে উজ্জ্বল
প্রত্যক্ষ সকল অংশে আত্মার রূপালেখা রয়েছে চঞ্চল
যখন প্রাণিলো আত্মা উচ্ছল আনন্দরূপে চেতন-প্রবাহে
চিন্তনের ধরণীতে আত্মার আলোক জ্বলে রক্তিম-প্রবাহে ।
প্রত্যেক বাক্যের প্রাণ জেগে থাকে অন্তরে তাহার
ব্যক্তির-স্বীকৃতি আনে আত্ম-হীনে আলোকে আবার ।[৮]

কিন্তু খণ্ড-খণ্ড কবিতার অনুবাদে আবুল হোসেন সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন । তার অনুবাদ স্বচ্ছ ও প্রভুতাময় ।

আর এই নির্জন সন্ধ্যায়
শব্দহীন স্তব্ধতায়
রাত্রীটির বিহ্বল বিভোর
লেগেছে স্বপ্নের যেন ঘোর ।
এখন চেয়োনা কেউ মনের খবর ।[৯]

১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয় সৈয়দ আলী আহসানের ভূমিকা সংবলিত আবুল ফারাহ মুহম্মদ আব্দুল হক কৃত বাংলা 'রুমুয-ই-বেখুদী' ।[১০] এটি 'মূলের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে' মূল ফারসীর গদ্যানুবাদ । এটিই বাংলা ভাষায় এ-কাব্যের প্রথম অনুবাদ । অনুবাদে মূলের অর্থ রক্ষিত আছে কিন্তু অনুবাদে প্রাণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি । তাঁর রচনার আংশিক সফলতার

---

৮। ঐ, পৃঃ ৫১

৯। ঐ, রাত্রীটির, পৃঃ ৮৩

১০। ঢাকা ঃ পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ১৯৫৫ ।

Dhaka University Institutional Repository



নিদর্শন হিসাবে বিদ্যোদ্দীপিত অংশটিকে বিবেচনা করা যেতে পারে।

কণ্ঠে ঐ বুলবুলেরই উল্লসিত পুলক কেলি
নবীন রাগে পুষ্প কোরক জাগছে পুনঃ ঘোমটা মেলি।
নবীন বধূর সলাজ শোভায় সজ্জিত ওই কোরক-বালা
মাটির বুকে দীপ্ত নবর জ্বলছে যেন তারার মেলা।
শিশির শিশির অশ্রু-কণা সবুজ ঘাসের চরণ ধোওয়ায়
স্রোতস্বিনীর কল-কাকলি বধূর কানে নিদ্রা পাড়ায়।[১১]

১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয় গোলাম মোস্তফা কৃত 'কালাম-ই-ইকবাল'।[১২] বাঙ্গ-ই-দারা, জরব-ই-কলীম, রমুয-ই-বেখুদী, জাবিদ নামা, আসরার-ই-খুদী, ও পায়াম-ই-মাশরিক থেকে করাচীর ইকবাল একাডেমী কর্তৃক নির্বাচিত উনিশটি কবিতার অনুবাদ এতে স্থান পেয়েছে। 'ইকবালের এক-একটি কবিতা পড়িয়া 'অনুবাদকের 'মনে যে-ভাব ও প্রেরণা জাগিয়াছে, তাকেই' তিনি 'নিজভাষায় রূপ দিতে' চেষ্টা করেছেন। 'অনুবাদকের আরজ' অংশে তিনি অনুবাদ সম্পর্কে আরো যা বলেছেন তা-ও প্রণিধানযোগ্য ঃ

> বাংলায় ভাষায় ইকবাল কাব্যের অনুবাদের প্রয়োজন আছে। আমাদের তামদ্দুনিক সংগঠনের পক্ষে তাঁর চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, আদর্শ ও অনুপ্রেরণার খুবই প্রয়োজন। কাব্যে যত রূপ রস ও আনন্দই থাকুক, তার পশ্চাদভূমিতে কোন দর্শন না থাকিলে সে-কাব্য মানুষের অন্তরে কোন স্থায়ী রেখাপাত করেনা। প্রত্যেক জাতির কাব্য তার ঐতিহ্য আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেয়। সেই হিসাবে ইকবাল সত্যই পাকিস্তানের জাতীয় কবি। তাঁর চিন্তা,ও ধ্যানের আর্শিতে জাতির মানসলোক প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। কাজেই আত্মদর্শন করিতে হইলে তাঁর কাব্যের সঙ্গে আমাদের সম্যক পরিচয় থাকা নিতান্ত প্রয়োজন।[১৩]

---

১১। 'মুসলিম জাতির অস্তিত্ব ভূখণ্ডবিশেষে সীমাবদ্ধ নহে, কেননা এই মহান জাতির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে ঐশী প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে,' ঐ, পৃঃ ৪৯ ।
১২। করাচী, এপ্রিল ১৯৫৭
১৩। ঐ, পৃঃ ৶ ।

Dhaka University Institutional Repository



একই ভাবে ভাবিত হয়ে 'শেকোয়া ও জওয়াবে শেকোয়া' র তিনি অনুবাদ করেন ১৯৬০ সালে।[১৪] এর ভূমিকা লিখেছেন ইকবালের পুত্র ডঃ জাবিদ ইকবাল। প্রথমাংশের অনুবাদ করা হয়েছে চটুল স্বরবৃত্তে, এর মানবীয়তার জন্য কিন্তু শেষাংশ আল্লার বাণী বিধায় অনূদিত হয়েছে গম্ভীর ছন্দে।[১৫]

গোলাম মোস্তফা অনুবাদে 'Second Creation' করতে চেয়েছেন। মূল কবিতা পড়ে তাঁর মনে যে ভাব জাগ্রত হয়েছে তার ভিত্তিতে তিনি কবিতা রচনা করেছেন। ফলে তাঁর অনুবাদে মূলের স্পর্শ আছে, অনুবাদকর্মে আন্তরিকতার ছাপ আছে, মোটামুটি একটি পরিচিত পরিবেশও তিনি সৃষ্টি করতে পেরেছেন কিন্তু রচনাশৈলীর অতি সারল্য কাব্যোচিত আমেজ ও আবেদন সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করেছে।

ডাল হতে আজ উড়ে গেছে মুচু পাখী কোন সুদূর
শুকনো ফুলের পাপড়ি গুলি পড়ছে ঝরে—করুণ সুর।
কুঞ্জবনের কুঞ্জবীথি — সব অনাদরে শুকিয়ে যায়
নগ্ন শাখা অজ্ঞাতে আজ মরণ—বরণ করতে চায়।
ফুল মৌসুম নাই, তবুও গায় বুলবুল এক মনে
হায়রে যদি শুনত কেহ তার ঐ করুণ কুজনে।[১৬]

একই বছর প্রকাশিত হয় ইকবাল মজলিস সোসাইটির চেয়ারম্যান মীজানুর রহমানের 'ইকবালিকা' ও 'ইকবালের বালে জিবরিল'।[১৭] 'আল্লামার প্রাণোন্মাদক পয়গামের পরশ' বাংলা ভাষীদের প্রাণে লাগুক, ভূমিকায় তিনি সে-কামনা করেছেন। সে বছরের আরো একটি উল্লেখযোগ্য অনুবাদ হচ্ছে মনিরুদ্দিন ইউসুফের 'ইকবালের কাব্যসঞ্চয়ন'।[১৮]

---

১৪। ঢাকা : কর্ডোভা লাইব্রেরী ১৯৬০

১৫। ঐ, পরিচয়, পৃঃ ৮/০ — ।।

১৬। ঐ, পৃঃ ৯

১৭। ঢাকা : ইকবাল মজলিস সোসাইটি।

১৮। ঢাকা : বাংলা একাডেমী, কার্তিক ১৩৬৭।

Dhaka University Institutional Repository



ইকবালের বিভিন্ন উর্দু কাব্যের — বাঙ্গে দারা /১৯২৪/, বালে জিবরিল /১৯৩৫/, জরবে কলীম /১৯৩৬/ ও আরমগানে হিজায /১৯৩৮/ — নির্বাচিত কবিতার তরজমা এতে স্থান পেয়েছে। অনুবাদগুলি হয়েছে মূল উর্দু থেকে 'মূল কবিতার তাল ও ভাব দুয়েরই যথাসাধ্য অনুসরণে'। পরিণতিতে প্রাঞ্জলতা হয়েছে এই অনুবাদের মূল বৈশিষ্ট্য।

মুমিনেরে শোনাও তুমি, প্রাণদ এ বাণীটি আমার
বিপ্রদের বাণী নয়, — বাণী এযে স্রষ্টা-সত্তার
কপট এ পুঁজিপতি করিয়াছে নিঃশেষ তোমাদের
শত শত বর্ষ ধরে ভাগ্য তুমি গণেছ যাহাদের।
তোমারি সম্পদ তুমি এতদিন করিয়া যতন
ধনীদের হাত হতে লভিয়াছ ভিক্ষার মতন।[১৯]

ডাক্তার মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান এল এম এফ কলিম্পং-এর 'শেকোয়া ও জওয়াবে শেকোয়া' প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে।[২০] এর দ্বারা ইকবালের প্রতি কবির অনুরক্তি প্রকাশিত হয়েছে, অনুবাদক হিসাবে দক্ষতা নয়। মাসিক 'মাহে-নও'এর বিভিন্ন সংখ্যায় ইকবালের কবিতার যে-সমস্ত অনুবাদ বেরিয়ে ছিল, সেগুলির সংকলন 'ইকবাল চয়নিকা'[২১] প্রকাশ সে-সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। চয়নিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ইকবালের কবিতার মাধ্যমে ভারতের মুসলমানগণ নিজস্ব সত্তা আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছে এবং এই কবিতা জাতীয় সম্পদ। তাই একে সার্থকরূপে ভাষান্তর করে বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে হাজির করা অত্যন্ত জরুরী।[২২] ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয় আবুল হাসনাত মুহাম্মদ কলিমুল্লাহর /১৯০৯-২৯/ শিকওয়াহ।[২৩] এটি ১৯২৯ সালে 'সাহিত্যিক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং বাংলা ভাষায় এটিই এ-কাব্যের প্রথম তরজমা। 'জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির

---

১৯। পুঁথি ও নূর, পৃঃ ৬
২০। দিনাজপুর: নওরোজ সাহিত্য মজলিশ
২১। ঢাকা : পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ডিসেম্বর ১৯৬৭
২২। ঐ, পূর্বলেখ
২৩। ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর ১৯৬৮

Dhaka University Institutional Repository



পরে এ ধরনের প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে চল্লিশ বছর পরে বাংলা একাডেমী একে পুস্তকাকারে প্রকাশ করে।[২৪] এই অনুবাদে যে স্বাচ্ছন্দ্য আছে, তিন বছরের শ্রমের জন্য তা প্রশংসনীয় বলে স্বীকার করতে হবে। চৌধুরী আশরাফ আলীর 'বাঙ্গা'[২৫] এই ধারার আরো একটি প্রচেষ্টা। এতে ইকবালের কিছু-কিছু কবিতা ও রুমীর কয়েকটি গজলের অনুবাদ স্থান পেয়েছে। অনুবাদ হিসেবে এটি অকিঞ্চিৎকর।

বাংলা ভাষায় ইকবাল-তরজমার ঐতিহ্য দীর্ঘ দিনের। পাকিস্তান-পূর্ব কালে তা শুরু হয়, এবং পাকিস্তান আমলেও অব্যাহত থাকে। প্রথম দিকে অনুবাদ সীমিত ছিল প্রধান-প্রধান দু-একটি কাব্যের মধ্যে, কিন্তু সাতচল্লিশের পর এর ব্যাপকতা অনেক বেড়েছে। অনেকে অনুবাদকর্মে অংশ নিয়েছেন, অনূদিত হয়েছে প্রায় সব কটি কাব্য। কিন্তু লক্ষণীয়, অনুবাদকেরা ইকবালের রচনার তত্ত্ব উপস্থাপনের দিকে যত মনোনিবেশ করেছিলেন, সাহিত্যের দিকে তত নয়। তাদের একটা প্রধান লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানের জাতীয় কবি চিন্তার সঙ্গে বাংলা-ভাষীদের পরিচিত করে তাদের পাকিস্তানীবোধকে পাকা করা। অনুবাদকদের প্রতিভার সীমাবদ্ধতার কথাও অবশ্য স্মর্তব্য। যাহোক, ফলে আল্লামার চিন্তার পরিচয়বাহী অনুবাদ পাওয়া গেছে, কিন্তু উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম বিশেষ মেলেনি।

## ২ মরমী কবিতা

মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকজন মুসলমান মরমী কবির কবিতা ফারসী ভাষার মাধ্যমে দীর্ঘকাল ধরে এদেশের সমাজে প্রচলিত ছিল। ফারসী রাজভাষা থাকার সময়ে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে

২৪। ঐ, প্রথম কথা
২৫। যশোর: পৌষ ১৩৬২

Dhaka University Institutional Repository



তাঁদের কাব্যপাঠে প্রচুর আনন্দ পেত বলে সেকালের সাহিত্যপাঠে আমরা জানতে পারি ।[২৬] বিশ শতকের শুরুতে তাঁদের কবিতা বাংলায় অনূদিত হতে শুরু করে, পাকিস্তান আমলেও তা ব্যাহত হয়নি । এই কবিদের মধ্যে ওমর খৈয়াম /১০৫০–১১৩২ !/, হাফিজ/১৩২০–৮৯/, শেখ সাদী /১১৮৪–১২৯১/ ও জালালুদ্দিন রুমীর /১২০৭–৭৩/ নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ওমর খৈয়াম কোন বিশেষ দার্শনিক মতের অনুসারী ছিলেন তা আজো সঠিকভাবে নির্ণীত হয়নি কিন্তু আল্লার মঙ্গলময় বিধানে আস্থাহীন ও পৃথিবীর নানাবিধ জটিলতায় ক্লান্ত আধুনিক মানুষের কাছে তার কবিতা বিপুলভাবে আদৃত হয়েছে । তাঁর রুবাইয়াতের আবেদন এখনো নিঃশেষিত হয়নি । কান্তিঘোষ, নরেন্দ্রদেব, কাজী নজরুল ইসলাম/১৮৯৯–১৯৭৬/, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ /১৮৮৫–১৯৬৯/ প্রমুখ অনুবাদকগণ প্রাক্‌-পাকিস্তান আমলেই তার কবিতার অনুবাদ করেন । পাকিস্তান-কালে আমরা অনুবাদক পাচ্ছি দুজন — আজিজুল হাকিম[২৭] ও সিকানদার আবু জাফর ।[২৮] অনুবাদ দুটি প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৪৮ ও ১৯৬৬ সালে । আজিজুল হাকিম মূলের আকৃতি ও প্রকৃতি দুই-ই যথাযথভাবে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন । তার অনুবাদ হয়েছে প্রাঞ্জল ও সাবলীল ।

সবে রবে সুরার পাত্র আর গজলের একটি বই
একটু শুধু খাবার, দুটি প্রাণ নাচানোর মতন সই ।
বিজন বনে আমরা দুজন থাকি যদি সেইতো সুখ,
রাজ্য পেলেও সে সুখ ছাড়ি যেতে কোথাও রাজী নই ।[২৯]

সিকানদার আবু জাফর অনুবাদ করেছেন অনেক পরিশ্রমে । ৪২ পৃষ্ঠায় দীর্ঘ ভূমিকায় তিনি ওমরের জীবনী, দর্শন, বিভিন্ন দেশে তার অনুবাদ, অনুবাদের গুণাগুণ প্রভৃতির সমন্ধে

---

২৬। ষোল শতকের কবি জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে আছে ঃ

মসনবি/মস্‌নবি/ আবৃত্তি করে প্রাতে কাননে
মহাপাপী জগাই মাধাই দুইজনে ।।

... ... ...

মস্‌নবি আবৃত্তি করিবে নিরন্তর
ডাকা চুরি বাটি সারিবেক নিরন্তর

ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকের 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' /ঢাকা ঃ পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ২য় সং, ১৯৬৮/, গ্রন্থের ৪৩–৪৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ।

২৭। রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম,/ঢাকা ঃ ইস্টার্ণ বুক সেন্টার/ ।

২৮। রুবাইয়াৎ ওমর খাইয়াম,/ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী/ ।

২৯। ৫৭ নং পদ, পৃঃ ৫৩ ৬৯

Dhaka University Institutional Repository



আলোচনা করেছেন। অনুবাদকে তিনি শুধুই মূলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া মনে করেন না, 'একটি শিল্পবস্তুকে নূতন চেহারায় নূতনভাবে নির্মাণ করা' অনুবাদকের কাজ বলে তার ধারণা।[৩০] সে-প্রচেষ্টা তিনি করেছেন। রুবাইয়ের শিল্পপদ্ধতি প্রায়ই অনুসরণ করলেও মাঝে-মাঝে তিনি আঙ্গিকে পরিবর্তন এনেছেন। যেমন চার পংক্তির রুবাইকে অনুবাদ করেছেন আট পংক্তিতে।

এখানে কোথাও জনবিরল নির্জন তরুতলে
বসে থাকি যদি নিরুদ্বিগ্ন দিন কাটাবার ছলে
সাথে থাকে যদি কিছু আহার্য, মদিরা পাত্রভরা
একটি কাব্যসুরভিসিক্ত ছন্দের শতদলে।

নর্তকী বনের সলাজ মধুর বিস্ময়ে সচকিতা
সাথে থাকো যদি লীলায়িত তনু মধুরী মধুস্মিতা
জুড়াতে মুছায়ে অন্তর পিপাসা আর যদি গাহো তুমি
ফিরদৌসের সমারোহে হবে এ বনানী সুশোভিতা।[৩১]

কবিতা হিসাবে উৎকৃষ্ট হলেও মূলের প্রত্যক্ষ আস্বাদন অনুবাদে রয়েছে কিনা বলা সহজ নয়।

কাজী আকরম হোসেনকৃত হাফিজের কবিতার অনুবাদ 'দীওয়ানে হাফিজ' প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে।[৩২] তিনি মূল ফারসী থেকে অনুবাদ করেছেন, এবং প্রতি অনুবাদের শীর্ষে মূল কবিতার দুই পংক্তি উদ্ধৃত করেছেন। অনুবাদটি কবিতা হিসাবে উৎকৃষ্ট নয়। শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির শেখ সাদীর কবিতার অনুবাদ 'কাব্যানুবাদ করীমা' প্রকাশ করেন ১৯৬৬ সালে।[৩৩] উপদেশমূলক এই কবিতাগুলি পাঠ করে 'বাঙালী পাকিস্তানী' বালক-বালিকারা উপকৃত হবে বলে অনুবাদক আশা প্রকাশ করেছেন। তিনি অনুবাদ করেছেন ফারসী ছন্দে, এই আশায় যে 'বিদায়োন্মুখ ফারসীভাষা এদেশ হইতে চলিয়া গেলেও

---

৩০। পৃঃ ৩৭
৩১। ১১ নং পদ, পৃঃ ৫৩
৩২। ঢাকা ঃ আজাদ প্রকাশনী
৩৩। বরিশাল ঃ শরীফ পাবলিকেশন্স।

Dhaka University Institutional Repository



উহার জয়গুয়াই সুর-কাকলি যেন বিদায় হইতে না পারে'।[৩৪] তাঁর প্রচেষ্টার আন্তরিকতা সত্ত্বেও অনুবাদ সফলতা অর্জন করতে পারেনি।

| | | |
|---|---|---|
| আসে হয় | মানবের | পরম উন্মুখন |
| বিভব ও | প্রমকে | না হয় তেমন। |
| মোম হেন | গলা চাই | অনাদেনুলণে |
| বিদ্যাহীন | কনা | খোদাকে চিনে।[৩৫] |

তিনি মিসরের বিখ্যাত সুফী সাধক ইবনুল ফারিদের / ১১৮১—১২৩৫/ কবিতা 'অনুসরোবর'[৩৬] নামে ভাবানুদিত করে প্রকাশ করেন একই বছরে। অনুবাদের অন্যতম কারণ হিসাবে তিনি উল্লেখ করেছেন:

> পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রাচীন ইসলামী সাহিত্য ও কবিতার দিকে সুধীবৃন্দের আকর্ষণ বাড়িয়া গিয়াছে। ইহা আমাদের সাহিত্য শিল্পের উন্নতির একটি বিশেষ লক্ষণ। আমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়া আগ্রহী সুধী সমাজের আগ্রহের কিঞ্চিৎ মাত্রও যদি মিটাইতে পারি — এই আশায় এই দুঃসাহস।[৩৭]

অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি অনুবাদের পাশাপাশি মূল আরবীও তুলে দিয়েছেন যদি 'আরবী-শিক্ষিত বাঙালী ভাইগণকে' বা 'বাঙালী শিক্ষিত সমাজকে আরবীর সঙ্গে পরিচয়' করিয়ে দিয়ে 'ধর্মীয় এবং জাতীয় জীবনের' কামনা পূরণ করা যায়।[৩৮] তার কামনা পূর্ণ হবে কিনা বলা যায় না, তবে অনুবাদে যে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন, তা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়।

এই ধারার একটি উল্লেখযোগ্য অনুবাদ শামসুর রাহমানের 'খাজা ফরিদের কবিতা'।[৩৯] অনুবাদটি ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয়। মুলতানের এই সাধক-কবি /মৃ. ১৮৪৮/ স্থানীয়

---

৩৪। ঐ, কৈফিয়ৎ

৩৫। বিস্ময়ের মহিমা, পৃঃ ৩৪

৩৬। বরিশাল, শরীফ পাবলিকেশনস

৩৭। কৈফিয়ৎ, পৃঃ ৬—৭

৩৮। ঐ,

৩৯। ঢাকা: পুঁথিপত্র প্রকাশনী

Dhaka University Institutional Repository



সেরাইকী ভাষায় পারমার্থিক এই কবিতাবিচয় রচনা করেছিলেন। মুলতানের কবি মিয়ার আনোয়ারের সহযোগিতায় তিনি ইংরেজি ও উর্দু অনুবাদ মিলিয়ে বাংলায় তরজমা করেছেন। অনুপ্রেরণা হিসাবে তিনি বলেছেন ঃ

> যেখানে মানুষ ভালবাসে, দুঃখ পায়, বিচ্ছেদ কাতর ও মিলনে আনন্দিত হয়, যেখানে মানুষ আধ্যাত্মিক মনুরে পেতে চায় দিব্যতার স্পর্শ — সেখানেই বন্দিত হবে খাজা ফরিদের কবিতা। তাই সেই দুর্গন্টা, সন্ত কবির কবিতাবলী, একগুচ্ছ অবিস্মরণীয়তা, বাঙালী পাঠকদের হাতে সবিনয়ে তুলে দিতে ব্রতী হয়েছি। যে দেশে লালন শাহ এবং মদন বাউলের মতো কবি জন্মগ্রহণ করেছেন সেদেশে খাজা ফরিদের কবিতা আদৃত হবে বলেই আমার বিশ্বাস।[৪০]

শামসুর রাহমানের অনুবাদ কবিতা হিসাবে সুন্দর হয়েছে, তারও প্রকাশিত হয়েছে সুচ্ছন্দ ভাবে।

> সারাটা জীবন কাটিয়েছি তার জন্য
> তার জন্যই দুচোখে ঝরেছে কান্না।
> খুঁজে ফিরি তাকে নেই যার কোনো চিহ্ন।
>
> লোকালয় নেই, ঝোপঝাড় আর শুধু
> আশ্রয়হীন ঘুরে মরি ঘনারণ্যে
> সান্ত্বনা কেউ দেয়না এমন দুঃখে।[৪১]

এ-ধারায় সবশেষে অনূদিত হয়েছে আমেরিকান মহিলা কবি এমিলি ডিকিনসনের /১৮৩০–৮৬/ কবিতা।[৪১ক] অধিকাংশ কবিতাই অনূদিত হয়েছে ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময়,

---

৪০। ঐ, পূর্বলেখ

৪১। সারাটা জীবন, পৃঃ ৩

৪১ক। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, এমিলি ডিকিনসনের কবিতা /ঢাকাঃ কবিতা সংঘ, ১৯৭৪/। এই সংকলনে ২৫টি কবিতার অনুবাদ আছে এবং কবির জীবন ও কাব্য-ভাবনা সম্পর্কে রয়েছে দীর্ঘ ১৯ পৃষ্ঠার ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository



যখন অনুবাদক আত্মগোপন করে বেড়াচ্ছিলেন গ্রামে-গ্রামে। জীবনের সেই 'সংকটকালে' এই কবির মরমী চিন্তা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল এবং অনুবাদকর্ম তাঁকে 'আনন্দ' দিয়েছিল বলে তিনি 'অনুবাদ প্রসঙ্গে' উল্লেখ করেছেন।

'এমিলি ডিকিনসনের মরমী চিন্তা প্রাচ্য-প্রকৃতির সন্নিকট এবং বহুলাংশে সহযাত্রী'। 'জীবন, মৃত্যু, আত্মা-প্রেম, প্রকৃতি প্রভৃতি প্রসঙ্গে তিনি নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও বক্তব্য বলে গেছেন' — তাঁর কবিতায়।[৪১খ]

বাংলা কবিতার আঙ্গিকে রূপান্তরের কালে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান কবির চিন্তা বাক্-বিন্যাস ও মিলবিন্যাসে পরিবর্তনশীলতাকে যথাসম্ভব সংরক্ষণ করার চেষ্টা করেছেন। অনুবাদে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নীচের কবিতাটিকে একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

এইতো আমার পৃথিবীর কাছে চিঠি,
যদিও পৃথিবী লেখেনি কভু আমায়,
প্রকৃতি শোনানো সংবাদ সহজাত
মাধুর্যে মহিমায়।
দেখিনা তো কার হাতে ভার তার
সংবাদ সঙ্কনের
সে বুঝি গোপনতর,
তার প্রীতি প্রেমে, প্রিয় দেশবাসী শোনো
মমতার চোখে আমাকে বিচার করো।[৪১গ]

---

৪১খ। এমিলি ডিকিনসন : তাঁর কবিতা, ঐ, পৃঃ ২৪ ও ৯

৪১গ। কবিতা সংখ্যা ২৮, পৃঃ ১৫৬ ।

Dhaka University Institutional Repository



শামসুর রাহমান যে আশা করেছিলেন, লালন শাহ ও মদন বাউলের দেশে আমরা কবিদের কবিতার অনুবাদ সমাদৃত হবে তা বাস্তবায়িত হয়নি; অন্যান্য মরমী কবিতার অনুবাদ সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। এর কারণ অনুসন্ধানযোগ্য। এই সাধকেরা নিজেদের সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতাকে রসপিপাসুদের মুখের ভাষায় প্রকাশ করেছেন তাদের জীবনের কাছাকাছি থেকে। সেজন্য তাঁদের রচনা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কিন্তু অনুবাদগুলি সাহিত্যগুণে গুণান্বিত হলেও মূলের মেজাজ আনয়ন করতে পারেনি। তদুপরি এই অভিজ্ঞতা ও চিন্তা এদেশের পাঠকশ্রেণীর কাছে মূল্যবান বিবেচিতও হয়নি।

## ৩ রোমান্টিক কবিতা

প্রেম প্রকৃতি সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে রচিত রোমান্টিক কবিতার অনুবাদের একটি প্রবাহ ১৯৫৮ সালে শুরু হয়ে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। সৈয়দ আলী আহসান ও সৈয়দ আলী আশরাফ যুগ্মভাবে ফরাসী প্রতীকী কবি ইভান গল (১৮৯১-১৯৫০) ও তাঁর স্ত্রী ক্লেয়ার গলের কাব্যসংকলন Poems d' Amour (১৯৩০)-এর অনুবাদ করেন। 'প্রেমের কবিতা'[৪২] নামে এটি ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয়। প্রগাঢ় প্রেম ও বিরহানুভূতি এই কবিতাগুলির মৌলিক দশা। সৈয়দ আলী আহসান নিছক আক্ষরিকতায় সন্তুষ্ট না-থেকে ভাবানুবাদে মৌলিক সৃষ্টিতে প্রয়াসী হয়েছেন। এবং এ-ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য স্বীকারযোগ্য। যেমন:

দূর্বাঘাসের মধ্যে স্রোতোধারার মতো
তোমাকে ধরে রাখা যায়না
... ... ...

---

৪২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: বাংলা বিভাগ, বাংলা সাহিত্য সমিতি।

Dhaka University Institutional Repository



তবু তুমি পলায়নে তৎপর

তুমি অথবা

যেন একটি স্রোতোকম্পন একটি মাছ একটি চড়ুই পাখি ।[৪৩]

১৯৬৪ সালে কবীর চৌধুরীর অনূদিত গ্রন্থ 'আধুনিক কোরিয়ার কবিতা' প্রকাশিত হয় ।[৪৪] ১৯৬৩ সালে পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসাবে দক্ষিণ কোরিয়া সফর কালে সে দেশের কবিতাকে বাংলাভাষীর কাছে পরিচয় করিয়ে দেবার আগ্রহ তাঁর মনে জাগ্রত হয় এবং এরই ফলশ্রুতি এই অনুবাদ । পঁয়ত্রিশজন কবির তেতাল্লিশটি কবিতার অনুবাদ এতে স্থান পেয়েছে । কবিদের অধিকাংশই বিশ শতকের এবং কোরিয়ার নিসর্গ ও মানুষের অন্তরঙ্গ পরিচয় ও দেশের দ্বিখণ্ডীকরণজনিত বেদনাবোধ কবিতাগুলিতে স্পষ্ট হয়েছে । মূল কবিতার এই আবেদন অনুবাদেও অনেকটা এসেছে ।

বরিস পাস্তেরনাকের (১৮৯০—১৯৬০) কবিতার অনুবাদও প্রকাশিত হয় একই বছর । জনগণের আদর্শানুসারী রুশ দেশীয় এই কবি-ঔপন্যাসিক রুশ সরকারের বিরাগভাজন হয়ে ধনতান্ত্রিক শিবিরে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন । সৈয়দ আলী আহসানের উৎসাহে সানাউল হক তার নয়টি কাব্য থেকে নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করেন 'বরিস পাস্তেরনাকের কবিতা'[৪৫] নাম দিয়ে । অনুবাদ করেছেন তিনি ইংরেজি অনুবাদ থেকে এবং তাঁর ধারণা 'অনুবাদ হুবহু মূলানুগ না হলেও মোটামুটি বিশ্বস্ত ও ভ্রান্তিভ্রমহীন' । অনুবাদে অনেকক্ষেত্রে তিনি

---

৪৩। দূর্বাঘাসের মধ্যে স্রোতোধারার মতো, কাব্যসমগ্র, (ঢাকা : দাওন প্রকাশনী, ১৯৭৪) । আলী আহসান এই কবিতাটিকে অনুবাদ না নিজস্ব মৌলিক রচনা হিসাবে বিবেচনা করবেন, সে-বিষয়ে দ্বিধান্বিত ছিলেন । এটি 'ইরান দেশের প্রেমের কবিতা' নামক সংকলনে যেমন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তেমনি সামান্য পরিবর্তনসহ অন্য শিরোনামে (তোমাকে বলা যাবে না) 'অনেক আকাশ' (ঢাকা : আর্জ এ্যান্ড বুকস, ১৯৬৬) কাব্যগ্রন্থেও স্থান পেয়েছে । কাব্যসমগ্রের ভূমিকায় এটিকে তিনি নতুন রচনা না-বলে বলেছেন অনুসৃতি ।

৪৪। ঢাকা : কথাকলি

৪৫। ঢাকা : বাংলা একাডেমি, কার্তিক ১৩৭১ ।

Dhaka University Institutional Repository



আড়ষ্টতাকে অতিক্রম করতে পেরেছেন ।

লাইলাক উজ্জ্বলতায় সমাচ্ছন্ন মাঠ
শিরার অন্ধকার গড়িয়ে নামছে
বনের ভেতর –
পৃথিবীতে শুধু খাওয়ার মতো কী আর থাকলো ?
ওদের সবই ছিল – আঙুল ওদের
নরম মোমের মতো ।[46]

সে-সময়ের আরো একটি উল্লেখযোগ্য অনুবাদ আবদুস সাত্তারের 'আরবী কবিতা'।[47] ছয় শতক থেকে বিশ শতক পর্যন্ত তিরিশজন কবির সেরা ত্রিশটি প্রেমের কবিতার মূল আরবী থেকে স্বচ্ছন্দ অনুবাদ গ্রন্থিত হয়েছে এখানে । 'যতদূর সম্ভব মূল ভাবধারা ও কাল্পনিক চিত্রগুলিকে অনুবাদে বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে', তবে অনুবাদ 'অনেক স্থানে কেবলমাত্র ভাবাশ্রিত হয়েছে'।[47ক]

আমেরিকার জাতীয় কবি এবং সেদেশের 'ভাবপুরুষতার রূপকার' হিসাবে পরিচিত হুইটম্যানের /১৮১৯–১৮৯২/ কবিতার সৈয়দ আলী আহসানকৃত অনুবাদ 'হুইটম্যানের কবিতা'[48] প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালে । কবিতাগুলি কবির Leaves of Grass /১৮৫৫/ থেকে নেয়া, যেখানে তিনি প্রধানত বলেছেন শক্তি, চেতনা, ব্যক্তিবাদ ও গণতন্ত্রের কথা ।

---

৪৬। ঐ, বনে, পৃঃ ৯

৪৭। আরবী কবিতা, /ঢাকাঃ কপোতাক্ষের পক্ষে আসাদ চৌধুরী, আষাঢ় ১৩৭২/

৪৭ক। 'পূর্বাভাষ', ঐ, পৃ: ১৪

৪৮। ঢাকা ঃ সাহিত্যিকা, জুন ১৯৬৫ । গ্রন্থের শেষাংশে মূল কবিতা এবং বাংলা অনুবাদের ভূমিকার ইংরেজি অনুবাদ দেওয়া আছে ।

Dhaka University Institutional Repository



অনুবাদে সৈয়দ আলী আহসান যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়েছেন। তাঁর অনুবাদ মূলের অর্থ বহন করেও হয়েছে সাবলীল এবং ছন্দোযুক্ত।

Through the ample open door of the peaceful country barn,
A Sunlit pasture field with cattle and hoḿrses feeding,
And hase and Vista, and the far horizon fading away.[৪৮ক]

এর অনুবাদ করেছেন নিম্নরূপ ঃ

গ্রামের শান্ত প্রাঙ্গনের অবারিত মুক্ত দ্বার দিয়ে
একটি সূর্যোজ্জ্বল চারণভূমি যেখানে
গবাদিপশু এবং অশ্ব তৃণভোজন করছে,
এবং অস্পষ্ট দৃশ্য, ছায়াঘেরা বৃক্ষাদি শোভিত
সংকীর্ণ পথ
এবং দূরের দিগন্তের বিলয়।[৪৮খ]

তবে অনুবাদে কিছু-কিছু অসতর্কতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন, যেমন — এই কবিতার প্রথম পংক্তির Peaceful শব্দটির অনুবাদ বাংলায় নেই।

বিশ শতকের আমেরিকার সবচেয়ে বিখ্যাত কবি হিসেবে পরিচিত ছিলেন রবার্ট ফ্রস্ট (১৮৭৪–১৯৬৩)। 'ফ্রস্ট সচরাচর আধুনিক কবিতায় ব্যবহৃত উপকরণসমূহ সোৎসাহে তাঁর কাব্যে গ্রহণ করেননি, কিংবা প্রগতিবাদীদের মন্ত্রণায় কবিতাকে হাতিয়াররূপে গড়ে তোলেননি' বরং 'আজীবন গোচারণমাঠ, পথ চলতে হঠাৎ দেখা ফুল, ঘোড়া, খড়ের গাদা, তুষার-ঢাকা বনভূমি আর গাছগাছালির পাঁচালি শুনিয়ে সন্তুষ্ট' থেকেছেন।[৪৯] তাঁকে বাংলা কবিতার আসরে পরিচিত করে দিয়েছেন শামসুর রাহমান 'ফ্রস্টের কবিতা'[৫০] ও 'রবার্ট ফ্রস্টের নির্বাচিত কবিতা'[৫১] মাধ্যমে। প্রথম সংকলনে তেইশটি কবিতা অনূদিত হয়েছে, দ্বিতীয় গ্রন্থে এর যুক্ত হয়েছে আরো তেতাল্লিশটি। শামসুর রাহমান মূলকে অতিক্রম

---

৪৮ক। A Farm Picture, p. 75.

৪৮খ। চারণভূমি, পৃঃ ২১

৪৯। ভূমিকা, শামসুর রাহমান, ফ্রস্টের কবিতা, পৃঃ ২–৪

৫০। ঢাকাঃ সাহিত্যিকা, নভেম্বর ১৯৬৫

৫১। ঢাকা ঃ খোশরোজ কিতাব মহল, অক্টোবর, ১৯৬৮ ।

Dhaka University Institutional Repository



করতে চেষ্টা করেননি, তাঁর অনুবাদ মূলানুগ, সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ প্রবাহিত, তবে মূলের ব্যঞ্জনা সর্বত্র প্রকাশিত হয়েছে এমন বলা যাবে না। যেমন ফ্রস্টের বহু-পরিচিত নিম্নোদ্ধৃত অংশটির অনুবাদের কথা আমরা এখানে বলতে পারি:

The woods are lovely, dark and deep
But I have promises to keep
And miles to go before I sleep
And miles to go before I sleep.

অনুবাদে আছে:

কাজল গভীর এ-বন মধুর লাগে
কিন্তু আমার ঢের কাজ বাকী আছে
যেতে হবে দূরে ঘুমিয়ে পড়ার আগে
যেতে হবে দূরে ঘুমিয়ে পড়ার আগে।[৫২]

অনুবাদে মূলের অর্থ নিপুণভাবে প্রতিফলিত হলেও জীবন ও জগতের অপার রহস্য ও গভীরতার দিকে প্রসারিত এবং তাকে জীবনলীলা অবসানের পূর্বেই যতদূর সম্ভব উন্মোচনের যে আকুল আকাঙ্ক্ষা মূলে ব্যঞ্জিত হয়েছে, তার ইঙ্গিত অনুবাদে পাওয়া যায়না।

১৩৭৩ সালে প্রকাশিত হয় আলাউদ্দিন আল আজাদ কৃত 'আধুনিক জার্মান কবিতা'।[৫৩] ক্লাসিক যুগ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত এগারজন কবির তেরটি কবিতার অনুবাদ রয়েছে এই ক্ষুদ্র সংকলনে। 'অনুবাদে মূলের কাঠামো ও সৌন্দর্য যাতে বজায় থাকে, অথচ তা যেন হয় যান্ত্রিকতামুক্ত' অনুবাদক সেদিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন, তবে তার সাফল্য কতদূর এসেছে তা বিচার-সাপেক্ষ।

১৯৬৬ সালে আমেরিকার প্রথম জাতীয় কবি লংফেলোর (১৮০৭–১৮৮০) ত্রিশটি কবিতার অনুবাদ করে শাহাবুদ্দিন প্রকাশ করেন তাঁর 'লংফেলোর কবিতা'[৫৪] গ্রন্থে। এক অর্থে

---

৫২। শীত সন্ধ্যায় বনের কিনারে, ফ্রস্টের কবিতা, পৃঃ ২, অথবা রবার্ট ফ্রস্টের নির্বাচিত কবিতা, পৃঃ ৬৯
৫৩। চট্টগ্রামঃ জার্মান সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, ১৩৭৩
৫৪। ঢাকা ঃ খোশরোজ কিতাব মহল, আগস্ট ১৯৬৬

Dhaka University Institutional Repository



'শত সহস্র মানুষের আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক' কবি লংফেলো 'ধৈর্য, শক্তি ও সহনশীলতার বাণী প্রচার করে গেছেন তার স্বাভাবিক শান্ত কন্ঠে। তার স্থান তাদের মধ্যে নয় যারা স্বর্গরাজ্যকে শক্তিমত্তায় অধিকার করতে চায়'।[৫৫] অনুবাদে কল্লোল শাহাবুদ্দিন খুব একটা কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি; তার অনুবাদ অর্থকে স্থান করে মাত্র, মূলের ব্যঞ্জনাকে নয়। যেমন লংফেলোর বিখ্যাত কবিতা 'A Psalm of Life - এর অনুবাদের কথা বলা যেতে পারে।

Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime
And, departing leave behind us
Footprints on the sands of time.[৫৬]

কল্লোল শাহাবুদ্দিন অনুবাদ করেছেন:

মহাপুরুষদের জীবন আমাদের সব সময়ে স্মরণ করিয়ে দেয়
জীবনকে আমরা মহৎ করে তুলতে পারি
এবং বিদায়ের দিনে, পেছনে সময়ের বালিতে
রেখে যেতে পারি নিজেদের পদচিহ্ন।[৫৭]

গত শতকে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৯০৩) এর অনুবাদ করেছিলেন:

মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়
সেই পথ লক্ষ করে স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরে
আমরাও হব বরণীয়।
সময় সাগরতীরে পদাঙ্ক অঙ্কিত করে
আমরাও হব হে অমর।[৫৮]

---

৫৫। ক্যাপাবিন টাইটান, ভূমিকা, ঐ, পৃঃ ৮—৯

৫৬। A Psalm of Life, Longfellow's Poems, (London : J.M. Dent and Sons, 1909).

৫৭। জীবনের গান, পৃঃ ৪

৫৮। জীবনসঙ্গীত, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী (কলকাতা : বসুমতী সাহিত্য মন্দির, প্রকাশের তারিখ নেই) পৃঃ ৩২।

Dhaka University Institutional Repository



হেমচন্দ্রের অনুবাদ যে সার্থকতর, তা বোধ হয় বলা চলে, এবং সেটা সম্ভব হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে তিনি মূলকে প্রয়োজনমত সঙ্কোচিত ও প্রসারিত করেছেন, ছন্দের উত্থান-পতন অনুসরণ করে মূলের আবহ রক্ষা করেছেন — যা সজন শাহাবুদ্দিন করেননি।

এ-ধারার সর্বশেষ গ্রন্থ আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর 'আতাল মানচিত্র'।[৫৯] 'একজন কাব্য-প্রেমিকের যদৃচ্ছ ভালোবাসার মানচিত্র এই বই। তাই এ মানচিত্র উন্মুক্ত'। বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের — ইংরেজী, ফরাসী, স্পেনীয়, জার্মান, মার্কিন, চীনা ও গ্রীক — পনের জন কবির কবিতার অনুবাদ রয়েছে এ-মানচিত্রে। কোনো-কোনো কবি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও দেয়া আছে। অনুবাদ মূল রচনা থেকে কিনা তা বলা হয়নি। অনুবাদে মূল বিশ্বস্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে কিনা বলা না গেলেও অনুবাদে আবদুল মান্নান সৈয়দ জড়তাবিহীন, তা বলা যায়।

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি হলে বহির্জগতের, বিশেষত আমেরিকার, সঙ্গে পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে। সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পাকিস্তানে আমেরিকার প্রভাব বৃদ্ধি পায় — একথা পূর্বেই বলেছি। যাহোক, ঐসময় থেকে রোমান্টিক কবিতা অনুবাদের ধারাটি শক্তি অর্জন করে। দেখা গেছে, এই ধারার অধিকাংশ অনুবাদই আমেরিকান সাহিত্যের, অথবা আমেরিকার রাজনৈতিক প্রভাবপুষ্ট দেশের সাহিত্যের। এধারার যে-সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় সেগুলির মধ্যে আছে একটি আরবী কবিতার, একটি ফরাসি কবিতার, একটি জার্মানীর /পশ্চিম জার্মানী/ কবিতার, একটি কোরিয়ার /দক্ষিণ কোরিয়া/ কবিতার, একটি রুশ কবিতার ও চারটি আমেরিকান কবিতার অনুবাদ। দক্ষিণ কোরিয়া ও পশ্চিম জার্মানীতে আমেরিকার রাজনৈতিক প্রভাবের কথা সুবিদিত, আর রুশ

---

৫৯। ঢাকা : শিল্পকলা, মে ১৯৭০।

Dhaka University Institutional Repository



কবি পাস্তারনাক বিখ্যাত হয়েছেন প্রশান্ত সমাজতন্ত্রী রুশ সরকারের বিরোধিতার জন্য । আমেরিকান কবিদের পরিচিতিতে বলা হয়েছে, তাঁরা 'পুঁজিবাদীদের মন্ত্রণায় কবিতাকে হাতিয়ার করে তোলেননি' কিংবা 'স্বর্ণরাজ্যকে শক্তিমত্তায়' যারা দখল করতে চায় তাদের দলে ভিড়েননি । তাঁরা প্রচার করে গেছেন শান্তি, সহিষ্ণুতা, গণতন্ত্র ও আধ্যাত্মিকতার কথা ।

এভাবে বিশ্লেষণ করলে এ-ধারার অনেকগুলি অনুবাদকার্যের মধ্যে কাব্যানুরাগের পাশাপাশি একটি রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারাও লক্ষ করা যেতে পারে ।

## ৪ গণমুখী কবিতা

জাতীয় স্বাধীনতা ও শোষণমুক্তির লক্ষে রচিত কবিতার তথা গণমুখী কবিতার অনুবাদের একটি উল্লেখযোগ্য ধারা পাকিস্তান-শাসনের শেষ দিকে শুরু হয় । অধ্যাপক আলি নওয়াজ-এর 'মাওসে তুং-এর কবিতা ও বাণী'[৬০] এ-ধারার প্রথম গ্রন্থ । এখানে মাওসে তুং-এর বিভিন্ন সময়ে লেখা পনেরটি কবিতা অনূদিত হয়েছে । গ্রন্থে আরো রয়েছে ১৯৪২ সালে ইয়েনান সাহিত্য-মজলিশে প্রদত্ত সাহিত্য-শিল্প সম্পর্কে তাঁর একটি প্রবন্ধের অনুবাদ এবং অনেকগুলি উদ্ধৃতির অনুবাদ । গ্রন্থের উপক্রমণিকায় অনুবাদক চীনদেশে মাও-এর কবিতার প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন ।

অনুবাদে যে তিনি মূল কবিতার সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলতে পারেননি, সে-কথা বলাই

---

৬০। ময়মনসিংহ ঃ ২রা শ্রাবণ, ১৩৭৪ ।

Dhaka University Institutional Repository



স্বীকার করে তিনি বলেছেন ঃ 'এ অনুবাদ শুধু মাওৎসে তোং এর কবিতার কংকালই বহন করছে — তাতে রক্ত মাংসের কোন পরিচয় নেই'।[৬১] একথা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্য হলেও কোথাও-কোথাও তিনি বীররসের ব্যঞ্জনা আনতে পেরেছেন, তবে কোন-কোন ক্ষেত্রে মূল অর্থের ব্যত্যয় ঘটেছে। যেমন 'নববর্ষ' কবিতাটি ঃ

নিংহুয়া, ছিংলিউ, কোয়েই হুয়া ।
সরুপথ, ঘনবন, পিচ্ছিল শেওলা ।
আমাদের কোথাও বেঁধে রাখতে পারেনা ।
একটানা সোজা চলো, উয়ী পর্বত-পাদে,
পর্বতে, পর্বত-পাদে
বাতাস উড়াবে মোদের
আমাদের রক্তিম নিশান ।[৬২]

অধ্যাপক আলি আহসান অনুবাদ করেছেন মূল রচনা থেকে, পিকিং থেকে প্রকাশিত সে-রচনার ইংরাজী অনুবাদ হচ্ছে ঃ

Ninghua, Chingliu, Kueihua -
What narrow Paths, deep woods and slippery moss !
Whitter are we bound today
Straight to the foot of Wuyi Mountain.
To the mountain, the foot of the mountain,
Red flags stream in the wind ina blaze of glory.[৬৩]

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান কৃত এর অনুবাদ হচ্ছে ঃ

নিংহুয়া, ছিংলিউ, কুয়েইহুয়া

---

৬১। ঐ, উপক্রমণিকা, পৃঃ ৩
৬২। পৃঃ ৩৩
৬৩। New Years Day, MAO TSETUNG POEMS(Peking: Foreign Language Press,1976)p.7

Dhaka University Institutional Repository



কী সংকীর্ণ পথ, গভীর অরণ্য এবং ঝিকিমিক দেওয়া।
আজ আমাদের গন্তব্য কোথায়?
সোজা উঁচু পাহাড়ের পাদদেশে।
চলো পাহাড়ে, পাহাড়ের পাদদেশে।
লাল পতাকার দল বাতাসে উড়ছে উদ্দাম যৌবনে।[৬৪]

অধ্যাপক আলি নওয়াজ যে-আহ্বান প্ররোচনা দিলেন, তাতে অনতিবিলম্বে শামিল হলেন অনেকে। মাহমুদ আল জামান রচনা করলেন 'পদাতিক গণমুখী কবিতা'। মূল কবিতার আবেদন সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

> পদাতিক কবিতায় আজ যে গণমুখীনতার ধারা বহমান, সাধারণ নিপীড়িত মানবাত্মার কাছে তার যে অনাস্বাদিত আবেদন, পদাতিক মানুষকে আজ যা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে তুলছে, অচেনা আসর থেকে শুরু করে জনতার ভিড়ে যার জয়ধ্বনি ফুঁসে ফুঁসে উঠছে, আমি তাকে উপেক্ষা করতে পারিনি।[৬৬]

প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব বাংলার প্রচলিত কাব্যধারার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তিনি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন এবং তার অনুবাদের প্রভাব এদেশের কবিতায় পড়ুক সে-কামনাও করেছেন।

> পূর্ব পাকিস্তানের কবিতা আজও সত্যিকার অর্থে গণমুখী হতে পারলো না। জীবনবোধের গভীরতা, ক্ষুব্ধচিত্তের সুতীব্র কশাঘাত, যা কিনা পূর্ব পাকিস্তানের কবিতার শিরা-উপশিরাকে উত্তপ্ত করে তুলতে পারতো শোনাতে পারতো সমুদ্রের গান, তার নৈরাশ্যজনক অনুপস্থিতি আজও একে শ্রমজীবী মানুষের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে — ড্রয়িংরুমের সাজানো ফুলের তোড়ায় অতোই এর মূল্যবোধ সীমিত হয়ে রয়েছে। পদাতিক গণমুখী কবিতার ছোঁয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের কাব্যধারা যদি এতটুকু প্রাণরসে সিঞ্চিত হয়ে ওঠে, ঘুচে যায় এর জড়তা, তবে তো আমাদের ... সবার পরিশ্রমই সার্থক হোয়েছে।[৬৭]

---

৬৪। অপ্রকাশিত
৬৫। ঢাকা: মুক্তধারা, কার্তিক ১৩৭৪
৬৬। অনুবাদকের বক্তব্য, পৃষ্ঠা সংখ্যা নেই।
৬৭। ঐ

Dhaka University Institutional Repository



অনুবাদক পশতু ভাষা না জানলেও পশতুভাষী এক কবির সহযোগিতায় মূল কবিতার মর্ম সম্পূর্ণ রেখে সুন্দর অনুবাদ করেছেন। এই সংকলনে আধুনিক পশতু সাহিত্যের গোলাম গাউস, আজমল খটক, আমীর হামজার পুত্র উমিলাম কবির নৈসর্গিক কবিতার অনুবাদ স্থান পেয়েছে। অনুবাদগুলি অত্যন্ত সাবলীল ও প্রাঞ্জল।

যদি আকাশ সমস্ত শক্তি আমাদের
দেখিয়ে ভয়
তবু আমি এর সাথে লড়াই করতে করতে
সামনে এগিয়ে যাবো।
আমরা শান্তির আর মুক্তির আছি
আদের আবে
বিবাদীর পরাজয় আর
জিত আমাদের হয়।৬৭ক

১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তান লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখা কর্তৃক 'আফ্রো-এশীয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।৬৮ এতে আফ্রিকা ও এশিয়ার সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি ধারা সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা, প্রবন্ধপাঠ ও বিভিন্ন কবির কবিতার অনুবাদ পাঠ করা হয়। এ সমস্ত কবিতা পরবর্তীকালে 'লেখক সংঘ' কর্তৃক পুস্তক পুস্তকাকারে বের হয় 'আফ্রো-এশীয় কবিতাগুচ্ছ' নামে। অনুবাদকদের মধ্যে ছিলেন সিকান্দার আবু জাফর, আবদুল গনি হাজারী, আতাউর রহমান, আবদুস সাত্তার, ফজল শাহাবুদ্দিন ও শহীদ কাদরী। তাঁরা অনুবাদ করেছিলেন রাশিয়া /ইয়েভগেনি ইয়েভতুশেংকো/, ঘানা /এর্ম আডিজার উইলিয়াম/, কেনিয়া /আবারনা ই মাচিওচি/, কঙ্গো /পাত্রিস ন্যাজার সোনাম্বু/, মোজাম্বিক /দে-সুসা ডিনিওসো/, মালাগাসো/, তেলিঙ্গা /সিমহান, ই সাক-হোসেন/, লেবানন /খুমা আমদু/, মিশর /লাল কাবুল্লী/, নাইজেরিয়া /ক্রিস্টোফার ওকিগবো/, সিরিয়া /নাজার কাব্বানী/, ইরাক /বুলান্দ আল হায়দারী/, তিউনিসিয়া /আবুল কাসেম শাবী/,

---

৬৭ক। গোলাম গাউস, দুশমনের রক্ত, পৃ ৯
৬৮। এ সম্পর্কে অক্টোবরের প্রকাশনে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য, পৃ ১৬৩-১৬৫ ।

Dhaka University Institutional Repository



চীন (মাও সেতুং) এবং জাপানের (ইশিকাওয়া তাকু বোকু, ইয়োসানো আকিকো, নাকানো শিগেহারু, নাকাহারা চুইয়া, টাকামুরা কোতারো) কবিতা ।

এই অনুবাদগুলি মূল থেকে না ইংরেজী অনুবাদ থেকে করা হয়েছে তা বলা হয়নি । অনেক অনুবাদই অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ, আন্তরিকতাপূর্ণ এবং কোনো-কোনো ক্ষেত্রে মৌলিকতার দাবিদার । যেমন মোজাম্বিকের মালাংগাতানার কবিতায় শামসুর রাহমান কৃত 'কালো মায়ের স্বপ্ন' অনুবাদটি :

কালো মা দোলায়
দোলনায় তার ছোট্ট খোকাকে
যার চুলে থাকে প্রত্যহ তার ভাইয়েরা গড়ছে শহর, নগর,
নিজেরই মৃত্যু করছে শত শহরের ভিত ।

দেখে সে স্বপ্ন সেই অপরূপ সব পৃথিবীর
যেখানে নষ্ট খুকুমনি তার ছুটবে অবাধ খোলা রাস্তায়
সেই রাস্তায় যেখানে মানুষ করে আনাগোনা ।[69]

১৯৬৯ সালে প্রকাশিত রণেশ দাশগুপ্তের 'ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতা'।[70] পশ্চিম পাকিস্তানের এই সাম্যবাদী কবির ১৯২৯—৬৯ থেকে পরবর্তী চল্লিশ বছরের চার পর্যায়ের চারটি কাব্য — নকশে ফরিয়াদী, দস্তে সবা, জিন্দাঁনামা ও দস্তে তহে সঙ্গ — থেকে বাছা-বাছা সাতাশটি কবিতার অনুবাদ এতে স্থান পেয়েছে । ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতার মৌলিক সত্তা সম্পর্কে অনুবাদক যা বলেছেন তার অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হল :

> যখন এই সার্বজনীনভাবে এগিয়ে চলার মূলে কবিকে শক্তি যুগিয়ে চলেছে এই শতাব্দীর মুক্তিসংগ্রামী জনতা । সাম্রাজ্যবাদী শোষক ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতা, সমানাধিকার ও শান্তির জন্য সংগ্রাম চালিয়ে জনগণ যে নতুন নতুন দিগন্তে উন্নীত হয়ে চলেছে সেই জনতা অতন্দ্র অভিযাত্রী ফয়েজ আহমদ ফয়েজের হাতে দিয়েছে প্রতীতির আলোকশিখা ।[71]

---

৬৯। পরিক্রম, নভেম্বর ১৯৬৬, পৃঃ ২৩৭
৭০। ঢাকা : প্রকাশভবন, জুলাই ১৯৬৯
৭১। কবি এবং তার কবিতা সম্বন্ধে, ঐ

Dhaka University Institutional Repository



অনুবাদগুলি করা হয়েছে মূল উর্দু থেকে। 'মূল উর্দু বাকরীতিকে যথাযথ ভাবে' রাখার চেষ্টা হয়েছে অনুবাদে। অনুবাদক ফয়েজ আহমদ ফয়েজের, ঢাকাবাসী কয়েকজন উর্দু কবির এবং কয়েকজন বাঙালী কবির সহযোগিতা নিয়েছেন অনুবাদ প্রস্তুতে। সুতরাং ধারণা করা যায়, ভাষান্তরেও মূলের অর্থ ও তাৎপর্য রক্ষিত হয়েছে, তবে মূলের দ্যোতনা ও মেজাজ রক্ষিত হয়েছে কিনা বলা মুশকিল। গণমুখী কবিতার যে দার্ঢ্য ও উদ্দীপক চারিত্র্য পাঠক প্রত্যাশা করে তা এখানে নেই, যদিও অনুবাদ যথেষ্ট পরিমাণে প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছ।

এই ছেঁড়া ছেঁড়া দাগ দাগ আলো
রাত্রির দাগেখোড়া এই ভোর
সেই ভোর নয় যার আশার
প্রতীক্ষা ছিল আমাদের।
এতো সেই ভোর নয় যার
আকাঙ্ক্ষা বুকে পুষে
যাত্রা শুরু হয়েছিল প্রিয়।[৭২]

অনুবাদে গণমুখী কবিতার যে-সমস্ত গ্রন্থ পাওয়া যাচ্ছে সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে পাকিস্তানের শেষ পাঁচ বছরে। এসময়ে রাজনীতিতেও সমাজতন্ত্রের প্রভাব উল্লেখযোগ্য শক্তি অর্জন করেছিল; কিন্তু অনুবাদগুলি অনুপাতে উল্লেখযোগ্য নয়। এগুলিতে শিল্পোৎকর্ষ কম। তবে অনুবাদকগণ একাজে ব্রতী হয়েছিলেন প্রবল আন্তরিকতা নিয়ে। তাঁরা এদেশের অনুবাদের ধারায় একটি নতুন ধারা সংযোজন করেছিলেন। সেজন্য তাঁরা অবশ্যই সাহিত্যরসিকদের ধন্যবাদের পাত্র হবেন।

---

৭২। স্বাধীনতার প্রভাত /আগস্ট ১৯৪৭/, পৃঃ ৪০

Dhaka University Institutional Repository



## উপসংহার

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে পাকিস্তান-শাসনে পূর্ববাংলার রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে নতুন-নতুন যেসব উদযোগ দেখা গিয়েছিল এবং কবিতায় যে-পালাবদল চলছিল তার প্রবাহকে অনুসরণ করার চেষ্টা হয়েছে । সমাজে বিভিন্ন শক্তির সংঘাত ও সমন্বয় একটি সদাপরিবর্তনশীল স্রোতোধারার মত ; নির্দিষ্ট তারিখ ধরে এর উৎপত্তি ও বিলয় ঘটেনা । ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের বঙ্গবিভাগ থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতাঘোষণা পর্যন্ত এই আলোচনার সময়সীমা, কিন্তু এই সময়ের আরম্ভ কালে বিশেষ আন্দোলনের জন্ম হয়ে সমাপ্তিতে এসে একেবারে থেমে গেছে — সেকথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয় । প্রবাহিত ধারাগুলি আলোচ্য কাল-পরিধিতে কিভাবে মোড় নিয়েছে, কি-কি নতুন ধারা-উপধারা এদের সঙ্গে যুক্ত বা বিযুক্ত হয়েছে, আমাদের কৌতূহল ছিল সেদিকে ।

### এক

১ দেশ বিভাগের কিছুকাল আগ থেকে বাংলার রাজনীতিতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দল বঙ্গীয় মুসলিম লীগে দুটি প্রধান উপদলের সৃষ্টি হয় । মাওলানা আকরাম খাঁ ও খাজা নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বাধীন অংশটি পুরোপুরি সামন্তস্বার্থের প্রতিভূ হিসাবে কাজ করত ও সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারতবিভাগে বিশ্বাসী ছিল । নিখিল ভারত কেন্দ্রীয় লীগ নেতৃত্বের প্রতি এই অংশটি ছিল সম্পূর্ণ আস্থাভাজন । সংস্কৃতিক্ষেত্রে এর সমমতাবলম্বী সংগঠন ছিল কলকাতার 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' /১৯৪২/ ও ঢাকার 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্যসংসদ' /১৯৪৩/ । সংগঠনদুটির কর্মীরা সাহিত্যসৃষ্টি করতে চাইতেন পাকিস্তানবাদের ভিত্তিতে । পাকিস্তানবাদ বলতে এঁরা বুঝতেন হিন্দুদের থেকে পৃথক হয়ে, আরবী-ফারসী-উর্দু বহুল মুসলমানী বাংলায়, ইসলামী বিষয়বস্তু ও মুসলমানদের জীবননির্ভর সাহিত্যরচনা করা । এই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে বিবেচিত হত 'সাত সাগরের মাঝি' /১৯৪৪/ কাব্যটি । দ্বিতীয় উপদলটি ছিল

Dhaka University Institutional Repository



আবুল হাশিমের /১৯০৫–৭৪/ নেতৃত্বে । এতে যুবকর্মীদের প্রাধান্য ছিল । এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মুখ্যত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সমাজতন্ত্রকামী ও ধর্মনিরপেক্ষ । ভাষা-সংস্কৃতির প্রশ্নে এঁরা চাইতেন জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার । ভারতবিভাগে বিশ্বাসী হলেও বঙ্গবিভাগ এঁদের কাম্য ছিলনা ।

সেসময় কম্যুনিস্ট পার্টিও রাজনীতিতে স্থান করে নিচ্ছিল । 'প্রগতি লেখক সংঘ' /১৯৩৯/ নামক এর একটি সহযোগী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছিল ঢাকায় । সংঘের সদস্যরা মার্কসবাদী দৃষ্টিতে সাহিত্যরচনা করতে আগ্রহী ছিলেন — ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, জাতীয় স্বাধীনতা ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা প্রভৃতি ছিল তাঁদের সাহিত্যের উপাদান ।

২ দেশবিভাগের পর আকরাম খাঁ–নাজিমুদ্দীন উপদলটি পূর্ব বাংলায় ক্ষমতালাভ করে কিন্তু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতির দরুণ দলটি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় । সংস্কৃতিক্ষেত্রে সোসাইটি ও সংসদের পাকিস্তানবাদের নীতিকে পৃষ্ঠপোষকতা করতে গিয়েও দলটি জনগণের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয় । ফলত, পূর্ববাংলায় নবজাগ্রত মধ্যবিত্তের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অনুভব করতে এদল ব্যর্থ হয় । এর সুযোগ গ্রহণ করেন আবুল হাশিম উপদলের কর্মীরা । ঢাকাতে এসে মুসলিম লীগে স্থান না-পেয়ে তাঁরা 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' /১৯৪৯/ নামক নতুন সংগঠনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেন । কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যরাও সরকারের অত্যাচারে বিপর্যস্ত হয়ে কেউ-কেউ এই নতুন লীগে অনুপ্রবেশ করে, অন্যরা আলাদা সংগঠন গড়ে তোলে । এভাবে গণতন্ত্রীদল /১৯৫৩/, যুবলীগ /১৯৫১/ প্রভৃতি সংগঠনের জন্ম হয় । এ-প্রক্রিয়ায় পাকিস্তান হওয়ার কিছুকালের মধ্যেই পূর্ব বাংলায় শক্তিগুলি দুটি পরস্পরবিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে ঃ একদিকে মুসলিম লীগ ও সমমনা সংগঠনসমূহ, অপরদিকে সমাজতন্ত্রে ও পূর্ববাংলার রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী দলগুলি । পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার প্রশ্নে এদের দ্বন্দ্ব প্রকটাকার ধারণ করে এবং ১৯৫০ সালে পল্টন ময়দানে শেষোক্ত শিবির থেকে বিকল্প শাসনতন্ত্র হাজির করা হয় । সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের

Dhaka University Institutional Repository



বিকাশ ঘটে বিভিন্ন সংগঠন ও সম্মেলনের মাধ্যমে । প্রথমদিকে ছিল তমদ্দুন মজলিশ /১৯৪৭/ ও ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন /১৯৫২/, দ্বিতীয় দিকে ছিল সংস্কৃতি সংসদ /১৯৫১/ এবং চট্টগ্রাম /১৯৫১/ ও কুমিল্লায় /১৯৫২/ অনুষ্ঠিত সম্মেলনদ্বয় । যদিও প্রথম প্রকাশ্যে শুরু হয় ১৯৪৮–৪৯ সালে ঢাকায় সরকারী উদযোগে আয়োজিত সাহিত্য-সম্মেলনে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নিম্নের উক্তি থেকে :

> আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালী । এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা । মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাঁড়িতে ঢাকবার জোটি নেই ।[১]

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী আন্দোলনের দ্বারা নতুন শক্তিসমূহের প্রাথমিক সাফল্য ঘটে এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়লাভের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সাফল্য অর্জিত হয় । নির্বাচনের পর-পরই অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সাহিত্যসম্মেলনে ঘোষণা করা হয় 'জাতীয় প্রগতি, বিশ্বশান্তি ও দেশমানবের হিতার্থে' 'বাংলা সাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যকে প্রবহমান ধারায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার' এবং 'সকল প্রকার বিকৃতি, কুসংস্কার, কূপমণ্ডুকতার এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে মানবতার আদর্শ'কে জয়যুক্ত করার কথা । এভাবে পাকিস্তানযুগের প্রথম পর্বে সামন্তবাদী ও ঔপনিবেশিকবাদী পাকিস্তানী চিন্তার পরাজয় ঘটে বুর্জোয়া, সাম্যবাদী ও পূর্ববাংলার স্বাতন্ত্র্যকামী চিন্তার কাছে ।

৩ ১৯৫৪ সাল থেকে পাক-মার্কিন সামরিক মৈত্রী চুক্তি, সিয়াটো ও সেন্টো চুক্তির ফলে পাকিস্তানে আমেরিকার প্রভাব প্রবল হয় । (যুক্তফ্রন্ট সরকার এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালালে) ক্ষমতাসীন যুক্তফ্রন্টই ক্ষমতা হারায় । পরে প্রচণ্ড দমননীতি ও কূটকৌশলে যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী লীগকে বিভক্ত করে দেওয়া হয়, নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় কমুনিস্ট পার্টিকে । জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীল মহল হয়ে পড়ে বিভক্ত, বিপর্যস্ত ও হতাশ । সেসুযোগে পাকিস্তানবাদী শক্তিগুলি হৃতশক্তি পুনরুদ্ধার

---

১। এই অভিসন্দর্ভের ৩৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ।

Dhaka University Institutional Repository



করতে চেষ্টা করে । ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের ইসলামী প্রজাতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচিত হয়, পূর্ববাংলার নাম পূর্ব পাকিস্তান হয়, যেহেতু /প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে পূর্ববাংলার সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অস্বীকৃত হয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সমতা আনয়ন করা হয়, উর্দু ও বাংলাকে স্বীকার করা হয় রাষ্ট্রভাষা হিসাবে । রাজনীতিতে পাকিস্তানীবোধ বিস্তৃত হয় আওয়ামী লীগের পশ্চিম পাকিস্তানে শাখা গঠনে, নিখিল পাকিস্তান ভিত্তিক ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি /ন্যাপ/ /১৯৫৭/ সৃষ্টিতে । রাজনীতিতে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা প্রসার লাভ করে ন্যাপ ও তার শাখা অঙ্গ সংগঠনগুলির তৎপরতায় ।

সংস্কৃতি চিন্তায়ও পাকিস্তানবাদীদের তৎপরতা লক্ষণীয় হয় । রকফেলার ফাউনডেশানের অর্থানুকূল্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যের উপর সেমিনার হয় /১৯৫৮/, রেনেসাঁ সোসাইটির পুরানো সদস্যরা ঘরোয়াভাবে 'রওনক' /১৯৫৮/ নামক সাহিত্যসংস্থা স্থাপন করে, তমদ্দুন মজলিশ ও সমমনোভাবাপন্ন সংগঠনগুলির মিলিত উদযোগে পালিত হয় 'সিপাহী বিপ্লব শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান' /১৯৫৭/ । সেবছরই কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের সাফল্য সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের অন্তর্দ্বন্দ্বের দরুণ তা বিশেষ ফলপ্রসূ হতে পারেনি । অবশেষে ১৯৫৮ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত হয় 'পাকিস্তানে ইসলামের জন্মভূমি ইসলামাবাদ বা চাটগাঁয়ে' 'পূর্ব পাকিস্তানের সমুদয় পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী শিল্পী সাহিত্যিকদের' বিরাট সম্মেলন । সম্মেলনের চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় চারটি বক্তব্য থেকে : গোলাম মোস্তফা জানালেন 'বাংলা ভাষা ইন্দোইউরোপীয় নয়, মূলত দ্রাবিড় ও সেমিটিক ভাষা' এবং 'পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের লক্ষ্য হবে পাকিস্তানবাদ', অধ্যক্ষ আজরফ বল্লেন, 'তামদ্দুনীন পুনর্গঠনের জন্য বাংলা ভাষাকে ফার্সীর মত একটি আরবী ভাষায় পরিণত করতে হবে' আর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি আবদুর রহমান ঘোষণা করলেন 'আমি এখন আর বাঙ্গালী নই, আমি পাকিস্তানী'।

এভাবে, দ্বিতীয় পর্বে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক ও বিশ্বসাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাবে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে পাকিস্তানীবোধ এবং সংস্কৃতিচিন্তায় 'পাক বাংলা' মনোভাব উত্তরোত্তর প্রবল হয় ।

Dhaka University Institutional Repository



৪  দেশব্যাপী প্রথম সাধারণ নির্বাচনের কয়েকমাস পূর্বে /১৯৫৮ সালের অক্টোবর/ দেশে সামরিক আইন জারি করে সকল রাজনৈতিক সংগঠন ও কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। গত পর্বের গোড়া থেকে পাকিস্তানে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের যে-প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছিল, এটি তারই স্বাভাবিক পরিণতি। মনোমত নতুন শাসনতন্ত্র /১৯৬২/ ও 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র' প্রবর্তন করে সামরিক শাসক আইয়ুব খান রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলেন। তিনি আংশিক সাফল্য লাভও করলেন। জনসমর্থন না-থাকলেও ১৯৬৫ সালের ২৸ জানুয়ারির প্রেসিডেন্ট-নির্বাচনে তাঁর সাফল্যলাভ ঘটে।

এই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট'/১৯৬৩/-এর মাধ্যমে বিভিন্ন দল মিলে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য আন্দোলন এবং শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের প্রতিবাদে ঢাকার ছাত্রদের শিক্ষা আন্দোলন।

সামগ্রিকভাবে দেশে তখন তিনটি ধারা সৃষ্টি হয়েছিল। বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে আইয়ুব খান চেষ্টা করছিলেন দুই প্রদেশের মধ্যে সংহতি এনে অখণ্ড পাকিস্তানী জাতি সৃষ্টি করতে। এগুলির মর্মে ছিল দুই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক বৈষম্য দূর করা, জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার কার্যক্রম প্রসারিত করা, লেখক সংঘের মাধ্যমে লেখক-শিল্পীদের সেউদ্দেশ্যে কাজে লাগানো এবং একটি পাকিস্তানীভাষা নির্মাণ করা প্রভৃতি। কিন্তু ফল হল বিপরীত। পাকিস্তানের সংহতির কথা যতই বলা হতে লাগল, ফল্গুধারার মত ভেতরে-ভেতরে সৃষ্টি হল বিপরীত ধারার — সেটি বাঙালীর স্বাতন্ত্র্যের, তার জাতীয়-সত্তার বিকাশের। শিক্ষা আন্দোলন 'বিচ্ছিন্নতাবাদীদের' দ্বারা পরিচালিত, আইয়ুব খান সেকথা বলতেন। ১৯৬২ সালে জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত সদস্যরা প্রাথমিক পর্যায়ে দল গঠন করেছিলেন প্রদেশের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী উদযাপনের প্রেরণা শুধুই সাংস্কৃতিক ছিলনা। শহীদ দিবস, পহেলা বৈশাখ, পঁচিশে বৈশাখ, এগারোই জ্যৈষ্ঠ, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব, পালিত হয়ে জাতীয় উৎসবের মর্যাদা পেল। সংস্কৃতিচর্চায় লোক কাহিনীর প্রভাব বিস্তৃত হল, স্থান-রাস্তা-সংগঠন-প্রতিষ্ঠান-শিশুদের নামকরণে বাংলা শব্দ ও বাক্যাংশের প্রচলন দেখা দিল। সেকালে

Dhaka University Institutional Repository



বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রায়-শ্রুত একটি গান ছিল — আবার তোরা মানুষ হ/অনুকরণ খোলস ভেদি কায়মনে বাঙালী হ/আবার তোরা মানুষ হ ।

অথচ আপাতভাবে সারা দেশে বিরাজ করছিল ব্যাপক নৈরাশ্যজনক অবস্থা । ছাত্রদের উপর নির্যাতন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা/১৯৬৪/, রাজনৈতিকদলসমূহের দলাদলি, শেরে বাংলা /১৯৬২/ ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর /১৯৬৩/ মৃত্যু, মাওলানা ভাসানীর ন্যাপ-এর সামরিক সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা, প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীদের বিভ্রান্তি ইত্যাদির সমবায়িক যোগফলে সৃষ্ট পরিবেশে তরুণেরা বিভ্রান্তির মধ্যে পথ-হাতড়ে চলছিল ।

সুতরাং রাজনীতিতে ও সংস্কৃতিতে এই সময়ের মূল প্রেরণারূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে পাকিস্তানীবাদের আগ্রাসনকে প্রতিরোধ করে বাঙালী চেতনার সংরক্ষণ ও আবিষ্কারের স্পৃহাকে ।

৫ ১৯৬৫ সালের সেপটেম্বর যুদ্ধের সময় পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব বাংলার অসংলগ্নতা বিশেষভাবে প্রকটিত হয় । এর ফলে আওয়ামী লীগের ছয় দফা আন্দোলনের /১৯৬৬/ জন্ম হয় । আন্দোলনকে দমন করার জন্য সরকার যে-দণ্ডনীতি গ্রহণ করে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা /১৯৬৮/ যার সর্বশেষ প্রকাশ, তার প্রতিক্রিয়ায় এটি প্রদেশে আরো বেশি জনসমর্থিত হয় । গত পর্বের স্ফুটনোন্মুখ বাঙালী জাতীয়তাবাদ একে অবলম্বন করে প্রবল শক্তি হিসাবে বিকাশ লাভ করে । সরকার কর্তৃক মহাআড়ম্বরে 'উন্নয়ন দশক' পালনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় তা আরো শক্তি সঞ্চয় করে । ঊর্ধ্বমান এই শক্তির প্রভাবে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বাঙালী জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে স্পষ্ট নীতি গ্রহণ করে । পাকিস্তানবাদী দক্ষিণপন্থী দলগুলিও পূর্ব বাংলার অধিকতর স্বায়ত্তশাসনের দাবির স্বীকৃতি দিয়ে 'পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন'-এর /১৯৬৭/ জন্ম দেয় ।

ন্যাপ এসময়ে /১৯৬৮/ দ্বিধাবিভক্ত হয় কিন্তু তবু এর তৎপরতায় রাজনীতিতে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রভাব বৃদ্ধি পায় । দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার, বিশেষত ভিয়েতনামে, আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসনীতির প্রতিক্রিয়ায় এদেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাব প্রবলতর হয় । শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগও মৃদুভাবে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের কথা উচ্চারণ করতে থাকে ।

Dhaka University Institutional Repository



যুদ্ধোদ্ভূত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সরকার সংস্কৃতিচিন্তায় ধর্মীয় আবেগ ও সাম্প্রদায়িকতাকে পৃষ্ঠপোষকতা করার নীতি গ্রহণ করে। রেডিও-টেলিভিশনকে প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারা প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয়, ১৯৬৭ সালে জারি হয় রবীন্দ্রসঙ্গীত বর্জনের নির্দেশ। নজরুল একাডেমী নজরুলকে মুসলমানদের কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালায়, আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্যোগ নেয় বাংলা ভাষা সংস্কারের। সাহিত্যে প্রবর্তিত হয় সেপ্টেম্বর যুদ্ধভিত্তিক ৬ই সেপ্টেম্বর পুরস্কার, আর প্রতিষ্ঠিত হয় National Writers War Front Abd Allah Academy.

এই কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয় সর্বজনীনভাবে। প্রতিবাদের মেজাজ, ভাষা ও ব্যাপ্তি দেখে সরকার পশ্চাদপসরণ করে। শেষদিকে লেখক সংঘও নতুন কার্যক্রম নেয়। 'মহাকবি স্মরণোৎসব' ও 'আফ্রো-এশীয় সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান'এর /১৯৬৮/ মাধ্যমে এই নতুন বোধ প্রকাশিত হয়। সুকান্তর জন্মবার্ষিকী ক্রমিক সাড়ম্বরে পালন করা, গণসঙ্গীত ও গণনাট্য মঞ্চায়নের মাধ্যমে সংস্কৃতিক্ষেত্রে প্লাবিত হয় মার্কসবাদী চিন্তাচেতনা।

জাতীয়তাবাদী ও সমাজতন্ত্রী শক্তিগুলির মিলিত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় ৬৯-এর অভ্যুত্থানের সময়। ছাত্রদের ১১-দফার ভিত্তিতে আন্দোলন আরম্ভ হলেও দ্রুতগতিতে সর্ব শ্রেণীর লোক এতে যোগ দেয় ও সেটি গণজাগরণের আকার পরিগ্রহ করে। আইয়ুব খান ক্ষমতাচ্যুত হন কিন্তু পুনরায় সামরিক আইন জারি করেন ইয়াহিয়া খান। শেষ পর্যন্ত অভ্যুত্থান সফল না-হলেও এর মাধ্যমে দুটি চিন্তা বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়ঃ পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা ও সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন।

৬ ইয়াহিয়া খান নির্বাচনের কর্মসূচী ঘোষণা করলে রাজনীতিতে দ্রুত ভাঙাগড়া শুরু হয়। নুরুল আমিনের নেতৃত্বে গঠিত হয় পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি /১৯৬৯/, আতাউর রহমান খান গঠন করেন জাতীয় প্রগতি লীগ /১৯৬৯/। /পিকিংপন্থী/ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে বেশ কয়েকটি উপদলের সৃষ্টি হয়, অপরদিকে /মস্কোপন্থী/ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও আওয়ামী লীগ সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী নিয়ে সুসংগঠিত দলরূপে বিকাশ লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository



জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদ দুইই এসময়ে প্রবল শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। পূর্ব বাংলার অধিকাংশ দল এদুটিকে গ্রহণ করে নেয়। অনেক ছাত্র-যুব সংগঠন তাদের নামের 'পূর্ব পাকিস্তান' অংশের বদলে 'বাংলা বা বাংলাদেশ' করে, পূর্ব পাকিস্তানের নাম সরকারীভাবে বাংলা করার দাবিও বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক উত্থাপিত হয়। পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন পল্টন ময়দানের জনসভায় পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অনুরূপ তৎপরতা লক্ষিত হয়। পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত 'পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টি'র বিরুদ্ধে সাফল্যজনকভাবে প্রতিবাদ জানানো হয়। জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার কার্যকলাপ সংস্কৃতি কর্মীদের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়, আর বাঙালী জাতীয়তাবাদী ও সাম্যবাদী দৃষ্টিতে প্রণীত বই-পুস্তক বাজেয়াপ্ত করার চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলনের সূচনা করে 'সাংস্কৃতিক স্বাধিকার সংরক্ষণ কমিটি'।

১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িক চিন্তাধারার প্রতি এদেশের মানুষের অকুন্ঠ সমর্থন প্রকাশিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে নির্বাচনের রায় নিয়ে ইয়াহিয়া খানের সরকার টালবাহানা শুরু করলে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়।

## দুই

১ দেশবিভাগের পরেও ইসলাম ও পাকিস্তান বিষয়ক কবিতা-রচনার দিকে কবিদের বিশেষ ঝোঁক ছিল। গোলাম মোস্তফা /১৮৯৫-১৯৬৪/, ফররুখ আহমদ /১৯১৮-১৯৭৪/, মুফাখখারুল ইসলাম /জ. ১৯২১/, রওশন ইজদানী /১৯১৭-১৯৬৭/, সৈয়দ আলী আহসান /জ. ১৯২২/, তালিম হোসেন /জ. ১৯১৮/ প্রমুখ ছিলেন এই ধারার প্রধান কবি-পুরুষ।

Dhaka University Institutional Repository



গানে-কবিতায়-ইকবালের কবিতা তর্জমায়, নতুন সাহিত্যপত্র প্রকাশে তাঁরা চেষ্টা করছিলেন নবযুগকে ধরে রাখতে এবং বাংলা কবিতায় ঐতিহ্যে একটি নতুন ধারা নির্মাণ করতে। কিছু-কিছু কবি যশপ্রার্থীও এই ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। প্রাক্-পাকিস্তান যুগের কবিতা নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশ করা, বিভিন্ন কবির কবিতা নিয়ে সংকলন বের করাও শুরু হয়েছিল। সব কিছু মিলিয়ে বলা যায়, পূর্ব বাংলার কাব্যপ্রবাহে পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসাবেই এসেছিল। কবিতায় যে-সুরটি তখন লক্ষণীয় ছিল, তা হল পাকিস্তানকে নিয়ে একটি গৌরববোধ, এর সম্ভাবনা সম্পর্কে বিপুল আশা ও উচ্ছ্বাস। শাহাদাৎ হোসেনের (১৮৯৩-১৯৫৩) একটি কবিতায় আছে:

ভৈরবে ভেরী গরজে গম্ভীর তূর্যে তুরীয় তান
জল-স্থলকে জাগে রোমাঞ্চ-জিন্দা পাকিস্তান।
সিন্ধী-বেলুচী-বাঙালী-পাঠান
হুর-পাঞ্জাবী জাগে মর্দান
তুর তুফানে আরবী দরিয়া নির্ঘোষে অবিরাম –
জিন্দা পাকিস্তান।[২]

প্রথম পর্বের প্রধান কাব্যগুলি হচ্ছে 'তারানা-ই-পাকিস্তান', 'বুলবুলিস্তান', 'হে পাক ফৌজ', 'মুসাফির', 'এক ফালি চাঁদ', 'সংগ্রাম', 'সিরাজাম মুনীরা', 'কাব্যবীথি', 'পূর্ব বাংলার কবিতা' প্রভৃতি।

কিন্তু এই হর্ষ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কবিদের উৎসাহে ভাটা দ্বিতীয় পর্বেই লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। সৈয়দ আলী আহসান এই প্রসঙ্গ নিয়ে কবিতা-রচনায় ক্ষান্ত দিয়েছেন, মুফাখখারুল ইসলামও আর লিখছেন না, তালিম হোসেনের কাব্যে প্রথম পর্বের পরে রচিত কবিতা পাওয়া যাচ্ছে না। আশাভঙ্গের বেদনা নিয়ে ফররুখ আহমদ তখন ব্যঙ্গের আসরে উপস্থিত। কেবল গোলাম মোস্তফা লিখে চলছেন মৌলিক ও অনুবাদ কবিতা। 'বনি আদম' প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। এতো উল্লেখ্য যে, কবি-প্রতিভার উজ্জ্বল্য স্তিমিতপ্রায়। আরো লক্ষ্যযোগ্য যে, ইকবালের কাব্যের কিছু-কিছু তর্জমা, পাকিস্তান-বিষয়ক কয়েকটি তুচ্ছ কবিতার বই প্রকাশিত হলেও প্রতিশ্রুতিশীল নতুন কবির আগমন দেখা যাচ্ছে না এসময়।

২। জিন্দা পাকিস্তান, (রচনাকাল শ্রাবণ ১৩৫৬), রূপছন্দা (ঢাকা: মখদুমী এ্যাণ্ড আহসানউল্লা লাইব্রেরী, ১৯৫৩), পৃ: ১১

Dhaka University Institutional Repository



তৃতীয় পর্বের কবিতাগুলির গুণগত মান আরো নিম্নপর্যায়ের । 'খাতামুন নবীঈন', 'শাহীন', 'স্বপ্ন যার আনলো যে গড়লো যারা' — এসময়ে প্রকাশিত হয় । প্রথমটি পুথির ঢংয়ে রচিত এবং লৌকিক রুচির উপযোগী, দ্বিতীয়টির কবিতাগুলি প্রাক্‌ ১৯৫৪ যুগের, আর তৃতীয়টি ভাবালুতাপূর্ণ, কাব্যগুণবর্জিত । ইকবালের কবিতার অনুবাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এই পর্বে ।

চতুর্থ পর্বের অনেক কবিতা যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত হয়েছে । তবে তা ছিল সাময়িক । এই সময়ের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'হাতেম তায়ী' ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত হয় । এটি উল্লেখযোগ্য হলেও, 'সাত সাগরের মাঝি'র চেয়ে এর সাফল্য অনেক নিম্নপর্যায়ের । আবদুস সাত্তার চৌধুরীর 'কওমিয়াত (১৯৬৮) এর কথাও উল্লেখ্য ।

পঞ্চম পর্বে এই বিষয়ের কোনো উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নেই ।

২ দেশবিভাগের ফলে বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্তের বিকাশের পথ আপাতত নির্বিঘ্ন হয় । স্বাভাবিক দ্রুত বিকাশের প্রতিক্রিয়ায় আনন্দ ও উল্লাসের লক্ষণ তার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে । সাম্প্রদায়িকতার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ায় ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাবও প্রবল হতে থাকে । এই নতুন শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে তখন কাব্যাঙ্গনে আবির্ভূত হলেন একদল নতুন কবি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে । দেশজ উত্তরাধিকার ও বাংলা সাহিত্যের প্রবহমান ধারায় আস্থা, মৃত্তিকাস্পর্শী মানবিক মূল্যবোধ, ইহলৌকিক মনোভাব প্রভৃতি তথা উদার মানবতাবাদ ছিল এঁদের প্রধান আশ্রয় ।[৩] ১৯৫০ সালে আশরাফ সিদ্দিকী (জ. ১৯২৭) ও আবদুর রশীদ খান (জ. ১৯২৭) এর সম্পাদনায় প্রকাশিত

---

৩। এই কাব্যধারার উদ্ভব সম্পর্কে বলতে গিয়ে একজন সমালোচক লিখেছেন :

'নবজাগরণের প্রভাবে এবং ইয়োরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির অভিঘাতে উনিশ শতকের বাঙালী মধ্যবিত্ত যেমন উদার মানবতাবাদে অভিষিক্ত হয়েছিলো — মধুসূদনের কাব্য যার অনিবার্য পরিণাম — স্বাধীনতার উপলব্ধিতে এবং দেশীয় পুঁজির নিরঙ্কুশ বিকাশের সম্ভাবনায় এই নতুন সমাজ তেমনি উদ্বেল'।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল, 'বাংলাদেশের কবিতা : একটি সামাজিক সমীক্ষা' মাসিক সমকাল, ঊনবিংশ বর্ষ ।। দ্বিতীয় সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৮৩, পৃ: ১১

Dhaka University Institutional Repository



'নতুন কবিতা'র মাধ্যমে এঁরা আত্মপ্রকাশ করেন। একটি কবিতায় এই মোড় পরিবর্তনের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি আছে:

অনেক ঘুরেছি অনেক উড়েছি আর নয় আজ থামো
এবার আমার নরম মাটিতে নামো।[৪]

সংকলনে সম্পাদকদ্বয় ব্যতীত ছিল হাবীবুর রহমান /জ. ১৯২৮/, চৌধুরী ওসমান /জ. ১৯২২/, মুযহারুল ইসলাম /জ. ১৯২৭/ মোহাম্মদ মামুন /জ. ১৯২৭/, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী /জ. ১৯২৮/, শামসুর রাহমান /জ. ১৯২৯/, আলাউদ্দীন আল আজাদ /জ. ১৯৩৮/, হাসান হাফিজুর রহমান /জ. ১৯৩২/, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর /জ. ১৯৩৬/ প্রমুখের কবিতা। এঁদের অনেকে এই পর্বেই প্রথম কবিতা-রচনা শুরু করেন, ফলে এঁদের কাব্য এ-সময়ে প্রকাশিত হয়নি। তবে অধিকতর বয়স্ক কারো-কারো বই বের হয়েছিল। 'তালেব মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা' এবং 'নক্সা মানুষ মন' বই দুটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় পর্বে এঁদের কারো-কারো কবিতা গ্রন্থাকারে প্রকাশ পেয়েছে এবং আরো অনেক কবি এই ধারায় শামিল হয়েছেন। এসময়ে প্রকাশিত হয়েছে 'বিষকন্যা', 'সাত ভাই চম্পা', 'উত্তর আকাশের তারা', 'মাটির ফসল', 'চৈত্রের দুপুর', 'নদী ও মানুষের কবিতা', 'হে মানুষ', 'স্বপ্নকন্যা', 'মন ও জীবন', 'মাটি ও মানুষ', 'আকাশ মাটি ও মানুষ' প্রভৃতি। প্রকৃতি-মাটি-মানুষ এই ত্রিকোণা পৃথিবীই এই পর্বে কবিদের বিশেষ করে আকর্ষণ করেছে। 'মাটির ফসল'-এর ভূমিকায় মুযহারুল ইসলাম স্পষ্ট করেই বলেছেন, 'আকাশ আর মাটি — মাঝে বিচিত্র ফসল। মাটির শ্রেষ্ঠ ফসল মানুষ। একান্তভাবে মাটিতে দাঁড়িয়ে এই মানুষ আর লীলাময় বিশ্বপ্রকৃতিকে আমি দেখতে চেষ্টা করেছি'।[৫]

রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দুর্নীতির যে-হলাহল এই পর্বে উদগীরণ হয়েছিল, তার পরিচয় রয়েছে 'আজাজিল নামা'র ব্যঙ্গ কবিতাবলীতে।

---

৪। এই অভিসন্দর্ভের ৪৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত

৫। এই অভিসন্দর্ভের ৮০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত

Dhaka University Institutional Repository



তৃতীয় পর্বে এই ধারাটি প্রবলতর হয়ে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। একটি গত পর্বেরই সম্প্রসারিত রূপ। সরল রোমান্টিক ভাবোচ্ছ্বাস এর বিশেষ লক্ষণ। 'বুনো মেঘ ক্ষ্যা ঝড়', 'জুলেখার মন', 'এদেশ শ্যামল রং রমণীর সুনাম শুনেছি', 'নীল কুমুদী', 'মন ও মৃত্তিকা', 'বৃষ্টি ঝরা গান', 'অনুরাগ', 'নীলস্বপ্ন', 'প্রেমে পড়েছি কৃষ্ণচূড়ার' প্রভৃতি কাব্য প্রথম শাখার অন্তর্গত। দ্বিতীয় শাখার কবিতাগুলি আন্তর্জাতিকতার ক্রমাভিসারী ও সমকালীন পরিবেশের হতাশ্বাস, বিষণ্ণতা ও অবক্ষয়কে অঙ্গে ধারণ করে বিশিষ্ট। বিশিষ্ট কাব্যগুলি হল 'বিমুখ প্রান্তর', 'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে', 'সামান্য ধন', 'রৌদ্র করোটিতে', 'সারা দুপুর', 'লোক লোকান্তর', 'একদা এক রাজ্যে', 'স্বর্ণের সিঁড়ি', 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত', 'অনেক আকাশ', 'ক্ষুধার বস্তিতে একা', 'বৈরী বৃষ্টিতে' প্রভৃতি।

শেষোক্ত ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, সেকালের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের নৈরাশ্য ও নৈরাজ্যের পটভূমিতে নতুন একদল তরুণ কবির আবির্ভাব ঘটে। THE SAD GENERATION নামক পুস্তিকার মাধ্যমে এদের সরব ঘোষণা প্রথম পাওয়া যায়।

> We don't know what we are doing. We are really undone, really helpless. We are poisoning us consciously. Yet we are helpless and helpless. We are guilty. We are bearing dynamites in our blood. We know it. But we are helpless, simply undone. We have no other alternatives except SELF DESTRUCTION.[6]

এই তরুণদের কোনো কাব্য এপর্বে প্রকাশিত হয়নি, তাঁরা 'কন্ঠস্বর'[7] /১৯৬৫/ নামক মাসিক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন।

এই পর্বে 'আধুনিক কোরিয়ার কবিতা', 'বরিস পাস্তেরনাকের কবিতা', 'হুইটম্যানের কবিতা', 'ফ্রস্টের কবিতা' প্রভৃতি অনূদিত কাব্য প্রকাশিত হয়।

---

৬। THE SAD GENERATION, Vol. 1, 1964, Printed & Published by Rusuf Pasha & Bulbul Khan Mahbub from 34, Salimullah Hall on behalf of the Sad Generation, P. 1

৭। পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রথম সংখ্যায় বলা হয়েছিল, 'যারা সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ প্রেমিক, যারা শিল্পে উন্মোচিত, সরল সৎ, অকাট্য, ডাকাত, অবদতাড়িত, যন্ত্রণাকাতর, যারা উন্মাদ, অপচয়ী, বিকারগ্রস্ত, অসন্তুষ্ট, বিশ্ববাসী, যারা তরুণ, প্রতিভাবান, অপ্রতিষ্ঠিত, প্রজ্ঞাশীল, অনুপ্রাণিত, যারা পঙ্গু, অহংকারী, যৌনতাপুষ্ট 'কন্ঠস্বর' তাদেরই পত্রিকা।

Dhaka University Institutional Repository



চতুর্থ পর্বে উপরোল্লিখিত দ্বিতীয় ধারার কবিতাই পুধানত পুকাশিত হয়েছে। 'উচচারণ', 'বিষণ্ণ নীলিমা', 'নিরালোকে দিব্যরথ', 'বিপন্ন বিষাদ', 'খণ্ডিত আলোক', 'অন্তিম শবের মতো', 'আর্ত শব্দাবলী', 'বিচূর্ণ আর্শিতে', 'কালের কলস', 'উত্তরাধিকার', 'কবিতা ১৩৭২', 'মনোনীত কবিতাগুচছ' পুভৃতি একালের ফসল। কাব্যসমূহের নামই ইঙ্গিত করে কবিরা জীবন ও সমাজের অবক্ষয়কে বিশেষ করে চিত্রিত করেছেন এবং অবক্ষয়-সংশয়ের জগতকে উত্তরণে সচেস্ট হয়েছেন। এই লক্ষণসমূহ সর্বশেষ পর্বের দু-একটি কাব্যেও লক্ষণীয় / 'আকাংখিত অসুন্দর', 'বিরতিহীন উৎসব', ইত্যাদি /। তবে সেপর্বের অধিকাংশ কবিতায় ব্যক্তিবোধের বিষন্নতার পরিবর্তে সমষ্টির পুত্যাশা মুখ্য স্থান লাভ করেছে। উদাসীনতার অবক্ষয়কে অতিক্রম করে কবিরা বৃহত্তর জনজীবনের পটভূমিতে পদচারণা শুরু করেছেন। এই মনোভাব জাতীয়তাবাদীর।

শেষ দুই পর্বে পুকাশিত কাব্যানুবাদ হচেছ 'রবার্ট ফ্রস্টের নির্বাচিত কবিতা', 'ইভানগলের কবিতা', 'লংফেলোর কবিতা', 'মাতাল মানচিত্র', 'আধুনিক জার্মান কবিতা', 'আরবী কবিতা' পুভৃতি।

৩ পূর্ব বাংলার পুবহমান ঐতিহ্য, লোকজ জীবন, ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, শহীদ দিবস ও স্বাধীনতাকাঙ্খা পুভৃতিকে বিষয়ীভূত করে রচিত জাতীয়তাবাদী চেতনামূলক কবিতা-রচনার সূচনা হয় ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীর পর থেকে। ১৯৫৩ সালে হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় পুকাশিত 'একুশের কবিতা' সংকলনটি এধারার পথিকৃৎ। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত এধারায় আর কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নজরে পড়েনা, যদিও পূর্ব বাংলার স্বাতন্ত্র্যবিনাশক পাকিস্তান সরকারের নীতির পুতিক্রিয়ার বাঙালীত্ববোধটি যে ক্রমশঃ সংহত হচেছ তার পরিচয় পাওয়া যায়

---

পুবীণ মোল্লা, নবীন অধ্যাপক, পেশাদার লেখক, পূর্ব সাংবাদিক, 'পবিত্র' সাহিত্যিক এবং গৃহপালিত সমালোচক এই পত্রিকায় অনাহুত।'

সামসুল হক, বাংলা সাময়িক-পত্র, /১৯৪৭-১৯৭১/, ঢাকা : গ্রন্থায়ন, ১৯৭৩, ১৯৮-১৯৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

Dhaka University Institutional Repository



শেখ মোছলেম আহমদ-এর একটি যেখানে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন নিজেকে বাঙালী বলে পরিচয় দেওয়া আর নিরাপদ নয়, বরং মুসলমান বলাটাই সুবিবেচনা প্রসূত । তৃতীয় পর্বে সামরিক শাসনের প্রতিক্রিয়ায় বাঙালী জাতীয়তাবাদের স্ফুরণ ঘটতে শুরু করলে এই ধারার কবিতায় নববিকাশ লক্ষণীয় হয় । এই সময়ে একুশে ফেব্রুয়ারী বিষয়ক কবিতাবলীতে প্রকাশিত হয়েছে অসহায়তা ও আশাভঙ্গের চিত্র । প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও কবিচিত্তে তার অনিবার্য উপস্থিতি নিয়ে পূর্ববাংলা নতুন তাৎপর্যে ধরা দিতে শুরু করেছে সেকালের কবিতায় । 'আমার পূর্ববাংলা', অথবা 'সত্তবা অনন্যা' /১৩৬৯/ ও 'পূর্ব অভ্যন্তর' /১৩৬৯/ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি তখনকারই রচনা । রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিশেষ মনোভাবে চালিত হয়ে কবিতা রচনার রেওয়াজও শুরু হয় তখন ।

চতুর্থ পর্বে এই ধারার বিকাশে আরো বৈচিত্র্য ও গভীরতা এসেছে । শহীদ দিবস উপলক্ষে রচিত কবিতাসমূহে মুখ্য হয়েছে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সামাজিক অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বক্তব্য, বাংলাভাষা সংস্কারের মুখে রচিত হয়েছে আবেগোজ্জ্বল কবিতা, পূর্ব বাংলার জনজীবনের দুর্দশাকে কবিরা কবিতায় এনেছেন বেদনা ও দরদের সঙ্গে, কেউ-কেউ লোকায়ত ঐতিহ্যকে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে উপজীব্য করেছেন বাংলার প্রাণশক্তিকে উপলব্ধি ও আবিষ্কারের আশায় । ১৯৬৯-৭১-এর পর্বের কবিতায় একই বোধ আরো তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতার সঙ্গে হাজির হয়েছে । কোন সমাজোদ্ভূত অনার্য মায়ের 'কাবিননামা' পাওয়া যায় 'সোনালি কাবিন' এ /১৯৭০/, অবাক দেশ পাকিস্তানের বিচিত্র বিধানের উপর রচিত ব্যঙ্গ কবিতা রয়েছে 'আর্তনাদে বিবর্ণ' /১৯৭০/ ও 'বৃশ্চিক লগ্ন' এ /১৯৭১/, পূর্ব বাংলাকে মুক্ত করার বাসনা প্রকাশিত হয়েছে 'বিচ্ছিন্ন প্রতিলিপি' /১৯৭০/, 'বাংলা ছাড়ো' /১৯৭১/ এবং তরুণ কবিদের বিচ্ছিন্ন কবিতায় । 'নিজবাসভূমে' /১৯৭০/, 'বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা' /১৩৭৬/, 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' /১৯৭১/ প্রভৃতিতেও কবিরা হয়ে উঠেছেন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের দ্বারা সম্পৃক্ত বৃহৎ বাঙালী সমাজের আবেগের প্রতিনিধি । ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চে রচিত অধিকাংশ কবিতাই পূর্ব বাংলার স্বাধিকার, স্বাধীনতা ও সংগ্রাম বিষয়ক ।

Dhaka University Institutional Repository



৪ নজরুলের বিদ্রোহী-চেতনা ও সুকান্তর শ্রেণীচেতনার অনুসরণে, কখনো-কখনো সমন্বয়ে বিদ্রোহ-বিপ্লব-গণজাগরণমূলক কিছু-কিছু কবিতা এই সময়ে রচিত হয়েছে। পুরো আমল ধরে রচিত হলেও, ১৯৬০ সালের পর থেকে এধরনের কবিতার সংখ্যাবৃদ্ধি লক্ষ করা যায়। ধারাটি বিশেষ উৎকর্ষ বা বিকাশ লাভ করেনি। অনেকে একটিমাত্র কাব্যের পর এবিষয়ে লেখায় উৎসাহ হারিয়েছেন। যারা আরো লিখেছেন, সেগুলিতেও সযত্ন অনুশীলনের পরিচয় বিশেষ পাওয়া যায় না।

'নতুন পৃথিবীর জন্য' /১৩৫৮/ ও 'মরণ মিছিল' /১৯৫৭, রচনা পতনের বছর পূর্বে/ প্রথম পর্বে প্রকাশিত কাব্য। প্রথমটিতে ভোগবিলাসমুক্ত শোষণহীন সমাজসৃষ্টির আহ্বান আছে, আর দ্বিতীয়টিতে, ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানে অনাচারের প্রাবল্য দেখে কবি আল্লার কাছে এর জবাব দাবি করেছেন। দ্বিতীয় পর্বে পাওয়া যাচ্ছে একটি মাত্র কাব্য — 'বিদগ্ধ দিনের প্রান্তর' /১৩৬৮/। পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কর্তৃক গণমানবের শোষণ, 'বুর্জোয়া' রাজনীতির প্রহসন ও পরিণামে শ্রমজীবী মানুষের চূড়ান্ত বিজয়ের কথা কবি খুব আবেগভরে বর্ণনা করেছেন। তৃতীয় পর্বে পাচ্ছি পাঁচটি সংকলন। পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি কর্তৃক কঙ্গোর মুক্তিকামী জনগণের নেতা প্যাট্রিস লুমুম্বার হত্যাকে উপলক্ষ করে রচিত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিভিন্ন কবিতা ও প্রবন্ধের সংকলন 'আফ্রিকার জন্যে সূর্যোদয়' প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে। পর বছর প্রকাশিত হয় 'মানচিত্র'। এতে বাণী ও বাণীভঙ্গির সুন্দর সমন্বয় লক্ষ করা যায়। ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয় দুটি সংকলন — 'শ্যামলী দেশের কত প্রান্তর' ও 'শান্তির সপক্ষে আমাদের কবিরা'। প্রথমটিতে মেহনতী মানুষের দুঃখকষ্ট, পূর্ব বাংলার সামগ্রিক দুর্দশা এবং তার অবসানের কথা পাওয়া যায়। দ্বিতীয়টিতে কয়েকজন নবীন ও প্রবীণ কবির কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবিতাগুলি যুদ্ধবিরোধী ও শান্তিকামী চেতনায় প্রদীপ্ত। 'মিছিল' /১৯৬৪/ কাব্যগ্রন্থে ধনী ও গরীবের জীবনের ব্যবধান ও সংগ্রামের মাধ্যমে তার অবসান করার কথা আছে।

চতুর্থ পর্বে প্রকাশিত কাব্যগুলি মার্কসবাদী চিন্তার স্বাক্ষর বিশিষ্ট। 'রক্তের কারুকাজ' /১৯৬৭/ ও 'হাতিয়ার তুলে নাও' /১৯৬৮/ এসময়ে প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলি তরুণ কবিদের রচনা। পূর্ব বাংলার সমাজকে বদলে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে নতুন করে গড়ার

Dhaka University Institutional Repository



আহ্বান এগুলিতে রয়েছে, কোনো-কোনো কবিতায় রয়েছে পূর্ব বাংলার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত। এই পর্বে তিনটি অনুবাদ সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে : 'মাওসে তোং-এর কবিতা ও বাণী' /১৩৭৪/, 'পলাতু গণমুখী কবিতা' /১৩৭৪/ এবং 'আফ্রো-এশীয় কবিতাগুচ্ছ' /১৯৬৮/। ১৯৬৯-এর অভ্যুত্থানে বিদ্রোহী ও বিপ্লবী কবিতা-রচনার দিকে কবিদের ঝোঁক পড়ে ও অনেক সুন্দর-সুন্দর কবিতা রচিত হয়। এর প্রভাবে সেকালে প্রকাশিত উদারনৈতিক মানবতাবাদী কবিতাগুলিতে দেখি সমষ্টির ভাবনার প্রকাশ। শেষ পর্বে প্রকাশিত হয়েছে 'মিছিলের আর্তনাদ' /১৯৭০/ ও 'ঝড় আসছে' /১৩৭৬/। এদুটিতে কবিদের বিপ্লবী সাম্যবাদী মনোভাব খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে, যদিও শৈল্পিক উৎকর্ষ উঁচুস্তরের নয়। 'কয়েস আহমদ কয়েসের কবিতা' প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে।

## তিন

পাকিস্তান-আন্দোলনের প্রভাবে ১৯৪৭-এর আগেই, বাংলা সাহিত্যে ইসলামী বিষয় অবলম্বনে কবিতা-রচনার রেওয়াজ শুরু হয়। পাকিস্তানের কালেও সেটি দীর্ঘকাল ধরে অব্যাহত থাকে; কিন্তু ইতিমধ্যে পূর্ব বাংলার তরুণ মনে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আবেদন হ্রাস পেতে থাকলে পাকিস্তানবাদী নতুন ধারাটিও ধীরে-ধীরে শীর্ণ হয়ে আসে। পঞ্চাশের দশকে নতুন মধ্যবিত্তের বিকাশ শুরু হয়, কবিতায়ও একটি নতুন ধারা সৃষ্টি হয় উদার মানবতাবাদের। এটি বেশ শক্তিশালী ধারারূপে বিকাশ লাভ করে। ষাটের দশকে রাজনীতিতে বিভ্রান্তি ও হতাশার দরুণ এই কবিতায় নৈরাশ্য ও বিভ্রান্তির ছায়াপাত ঘটে। একই সময় থেকে বাঙালী জাতীয়তাবাদের স্ফুরণ ঘটতে শুরু করলে সেবিষয় ভিত্তিক কবিতা-লেখারও সূত্রপাত হয়। এই ধারায় অনেক উন্নতমানের বও কবিতা রচিত হয়, কিন্তু সেটি স্থায়ী ও শক্তিশালী ধারা হিসাবে বিকাশ লাভ করেনি।

Dhaka University Institutional Repository



বিদ্রোহ-বিপ্লব-গণজাগরণমূলক কবিতা রচিত হয়েছে প্রথমাবধি। শেষদিকে এতে মার্কসীয় চিন্তার প্রভাব পড়েছে। রাজনীতি ও সংস্কৃতিতেও সেসময় বিস্তৃত হয়েছিল সাম্যবাদের আদর্শ।

সবকিছু মিলিয়ে বলা যায়, রাজনীতি ও সংস্কৃতি-চিন্তার পাশাপাশি কাব্যের ধারাটি বিকাশ লাভ করেছে, নতুন-নতুন ভাব ও রস আহরণ করে সমৃদ্ধ হয়েছে। পূর্ব বাংলার কবিতার বিকাশের ইতিহাস, তাই, সেকালের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

## ১ আলোচিত কাব্যসমূহ

### ক. মৌলিক ও অনুবাদ

আবহাবুল ইসলাম (জ. ১৯৩৩) — ছায়াপথ, (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি পাবলিকেশন্স, ১৯৬৮)

আজিজুল হাকিম (১৯০৮–১৯৬২) — রোবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম, (ঢাকা : ইস্টার্ণ বুক সেন্টার, ১৯৬০)

বিদগ্ধ দিনের প্লানি (ঢাকা : ইস্টার্ণ বুক সেন্টার, ১৩৬৮)

আরাফাত বাবা (ঢাকা : ইস্টার্ণ বুক সেন্টার, ১৩৬৩)

সঞ্চয়ন, (স্বরচিত কবিতার সংকলন) (ঢাকা : ইস্টার্ণ বুক সেন্টার )

আ ন ম বজলুর রশীদ (জ. ১৯১১) — শীতে কবুতর (ঢাকা : ১৩৭৪)

আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী (জ. ১৯২৯) — যেহেতু (ঢাকা : নয়া দুনিয়া পাবলিকেশন্স, ১৯৫৮)

আবদুল গনি হাজারী (১৯২৫–৭৬) — সামান্য ধন (ঢাকা : ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স, ১৯৫৯)

সূর্যের সিঁড়ি (ঢাকা : সপ্তকাশ গ্রুপ, ১৯৬৫)

জাগ্রত প্রদীপে (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭০)

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল মান্নান সৈয়দ /জ. ১৯৪৩/ — মাতাল মানচিত্র /ঢাকা : শিল্পকলা, ১৯৭০/

নজরুল ইসলামের শ্রেষ্ঠ কবিতা /সম্পাদনা/ /নজরুল স্মৃতি তহবিল : ১৯৭৫/

আবদুস সাত্তার /জ. ১৯৩৮/ — আরবী কবিতা /ঢাকা : ১৩৭২/

আবদুল আহাদ চৌধুরী / — রুবাইয়াত /নওগাঁ : বর্ণ বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৭৫/

আবুল কালাম মুহম্মদ আবদুল হক — রমুজ-ই-বেখুদী /ঢাকা : পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ১৯৫৫/

আবুল হাসনাত মুহম্মদ কলিমুল্লাহ /১৯০৬ – ১৯৬৯/ — শিকওয়াহ /ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৩৭৫/

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ /জ. ১৯৩৪/ — সাত নরীর হার /ঢাকা : শিখা প্রকাশনী, ১৯৫৫/

কখনো রং, কখনো সুর /ঢাকা : বাংলা একাডেমী ১৯৭০/

আল মাহমুদ /জ. ১৯৩৬/ — লোক লোকান্তর /ঢাকা : কপোতাক্ষ, ১৩৭০/

কালের কলস /চট্টগ্রাম : বইঘর, ১৩৭৩/

সোনালি কাবিন /ঢাকা : পুণ্ডি, ১৯৭৩/

আলী নওয়াজ — মাওৎসে তুং-এর কবিতা ও বাণী /ময়মনসিংহ : ১৩৭৪/

Dhaka University Institutional Repository




আলাউদ্দিন আল আজাদ /জ. ১৯৩২/

মানচিত্র
/ঢাকা : সাহিত্য ভবন, ১৩৬৮/

আধুনিক আরাকান কবিতা
/চট্টগ্রাম : আরাকান সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, ১৯৬৬/

আশরাফ সিদ্দিকী /জ. ১৯২৭/

তালেব মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা
/ঢাকা : কিতাব মনজিল, ১৯৫০/

বিষকন্যা
/ঢাকা : ১৯৫৫/

সাত ভাই চম্পা
/ঢাকা : সবুজ লাইব্রেরী, ১৯৫৫/

উত্তর আকাশের তারা
/ঢাকা : সবুজ লাইব্রেরী, ১৯৫৮/

তিরিশ বসন্তের ফুল, ২ খণ্ড /কাব্য সমগ্র/
/ঢাকা : কাবুক প্রকাশনী, ১৩[illegible]২/

আহসান হাবীব /জ. ১৯১৭/

ছায়া হরিণ
/ঢাকা : কথা বিতান, ১৩৬৯/

সারা দুপুর
/ঢাকা : কথা বিতান, ১৯৬৪/

আশায় বসতি
/ঢাকা : আদিল ব্রাদার্স, ১৯৭৪/

ইবু সাহা /জ. ১৯৪০/

বড় বাসছে
/ঢাকা : শাবলিষ্টি প্রকাশনী, ১৩৭৬/

গগন তালু /জ. ১৯৪৩/

হাতিয়ার তুলে নাও
/ঢাকা : চলন্তিকা বইঘর, ১৩৭৪/

মিছিলের আর্তনাদ
/ঢাকা : প্রকাশ ভবন, ১৯৭০/

Dhaka University Institutional Repository



গোলাম মোস্তফা
/১৮৯৭ - ১৯৬৪/

রক্তরাগ
/কলকাতা ঃ ১৯২৪/

খোশরোজ
/কলকাতা ঃ ১৯২৯/

কাব্যকাহিনী
/কলকাতা ঃ মখদুমী লাইব্রেরী, ১৯৩২/

তারানা-ই-পাকিস্তান
/ঢাকা ঃ মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী, ১৯৪৮/

বুলবুলিস্তান
/ঢাকা ঃ মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী, ১৯৪৯/

বনি আদম, ১ম খণ্ড
/ঢাকা ঃ ১৯৫৮/

কালাম-ই-ইকবাল
/ঢাকা ঃ মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী, ১৯৫৭/

শেকোয়া ও জওয়াব-ই-শেকোয়া
/ঢাকা ঃ কাওসার লাইব্রেরী, ১৯৬০/

গোলাম সামদানী কোরায়শী
/জ. ১৯৩০/

হেরেমের সওগাত
/করাচী ঃ ইসলাম একাডেমী, ১৯৬৭/

Dhaka University Institutional Repository




[illegible] /জ. ১৯২০/ — [illegible]
/কলকাতা ঃ ১৩৩৯/

ধূপদান
/রংপুর ঃ ১৩৫৮/

সংগ্রাম
/রংপুর ঃ ১৯৫৮/

এক ফালি চাঁদ
/রংপুর ঃ ১৩৫৭/

অনেক ভাবনা /প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কবিতার বাছাই করা সংকলন/
/ঢাকা ঃ ১৯৬৬/

জাহাঙ্গীর চৌধুরী /জ. ১৯৪৯/ — আধুনিক সোভিয়েতের কবিতা, ১ম সং
/ঢাকা ঃ কপোতাক্ষ ১৯৬৪/

জিয়া হায়দার /জ. ১৯৩৬/ — এক তারাতে কান্না
/ঢাকা ঃ সবুজ [illegible], ১৩৭০/

কৌটোর ইচ্ছেগুলো
/ঢাকা ঃ শাইনিং [illegible] এজেন্সী, ১৯৬৬/

[illegible] — [illegible] মিছিল
/ঢাকা ঃ [illegible], ১৯৬৭/

দিলওয়ার — নতুন পৃথিবীর জন্য
/ঢাকা ঃ [illegible] পাবলিশিং হাউস, ১৩৫৮/

Dhaka University Institutional Repository



জাহিদ হোসেন /জ. ১৯৪৮/ — দিনারী
/ঢাকা : মৌসুমী পাবলিশার্স, ১৯৫৬/

শাহীন
/ঢাকা : মৌসুমী পাবলিশার্স, ১৯৬৯/

নির্মলেন্দু গুণ — প্রেমাংশুর রক্ত চাই
/ঢাকা : খান ব্রাদার্স, ১৯৭০/

মোহাম্মদ সাদিক /জ. ১৯৪৪/ ও ফারুক আলমগীর /জ. ১৯৪৩/ — পাকিস্তানী দেশের কত প্রান্তর
/ঢাকা : ১৯৬৯/

পাকিস্তান পাবলিকেশন্স — ইসলাম চয়নিকা
/ঢাকা : ১৯৬৭/

মসউদ-এ-খোদা /জ. ১৯৪৯/ — সূর্য সূর্য দীপ
/ঢাকা : ১৩৭৫/

মমত শাহাবুদ্দীন /জ. ১৯৩৮/ — তুমার পৃথিবীতে একা
/ঢাকা : বাংলা ব্রাদার্স, ১৯৬৫/

পাকাশিত কলুষ
/ঢাকা : বাংলা ব্রাদার্স, ১৩৭৬/

মহকেলোর কবিতা
/ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৬৮/

Dhaka University Institutional Repository



ফররুখ আহমদ (১৯১৮–৭৪) সাত সাগরের মাঝি, ১ম সংস্করণ
(কলকাতা, ১৯৪৪), ১ম অখণ্ড সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৫৯

আজাদ করো পাকিস্তান
(কলিকাতা : মৃত্তিকা প্রচুরি কিতাব,
প্রকাশের তারিখ নেই, আনুমানিক ১৯৪৬)

সিরাজাম মুনীরা
(ঢাকা : ১৯৫২)

মুহূর্তের কবিতা
(ঢাকা : আর্জ এণ্ড বুক, ১৯৬৩)

হাতেম তাঈ
(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৬)

[illegible]

মুনসুর খান মাহবুব (জ. ১৯৪৯) রক্তের কারুকাজ
(ঢাকা : কল্লোল প্রকাশনী, ১৯৬৮)

মফিজুদ্দীন ইউসুফ (জ. ১৯১১) ইসলামের কাব্য সম্ভার
(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬০)

মাহমুদ খান জাফর শতক শতকী কবিতা
(ঢাকা : মুক্ত ধারা প্রকাশনী, ১৯৬৭)

মীজানুর রহমান (জ. ১৯৩০) ইসলামের আলো জিন্দেগীন
(ঢাকা : ইসলাম কালচার ইসলাম সোসাইটী, ১৯৬০)

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান /জ. ১৯৩৬/

দুর্লভ দিন
/ঢাকা : সমকাল প্রকাশনী, ১৩৬৮/

বিপন্ন বিষাদ
/ঢাকা : কাকলি, ১৩৭৫/

শঙ্কিত আলোক
/ঢাকা : কাকলি, ১৩৭৫/

এমিলি ডিকিনসনের কবিতা
/ঢাকা : কবিতা সংসদ, ১৯৭৪/

কাব্য সংগ্রহ
/ঢাকা : সৃজন প্রকাশনী, ১৯৭৬/

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ /জ. ১৯৩৬/

রক্তিম হৃদয়
/ঢাকা : ১৯৭০/

মুফাখখারুল ইসলাম /জ. ১৯২৮

হে পাক কৌম
/কুষ্টিয়া : কারবার প্রকাশনী, ১৩৫৫/

মযহারুল ইসলাম /জ. ১৯২৮/

নিচিহ্ন প্রতিবিম্ব
/ঢাকা : পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ১৯৬৯/

মার্জাদে নিরর্থ
/ঢাকা : পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ১৯৭০/

Dhaka University Institutional Repository



সুলতান ইয়দানী /১৯১৭-৬৮/

মধুবাণী
/ঢাকা : ঢাকা লাইব্রেরী, ১৯৪৮/

রাহবীর
/ঢাকা : ইয়দানী সাহিত্য কুটির, ১৩৫৫/

রসিলা মঞ্জু /গানের সমষ্টি/
/ঢাকা : মোসলেম পাবলিশিং হাউস, ১৯৫৮/

চিত্র লিপি
/ঢাকা : মোসলেম পাবলিশিং হাউস, ১৯৫৯/

আত্তাবুর নকীব
/ঢাকা : ১৯৬০/

পাকিস্তানের জঙ্গনামা /পুঁথি/
/ঢাকা : আশরাফিয়া বুক ডিপো, ১৯৬৫/

রণেশ দাশগুপ্ত /জ. ১৯১২/

ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতা
/ঢাকা : প্রকাশ ভবন, ১৩৭৬/

লেখক সংঘ প্রকাশনী

আফ্রো এশীয় কবিতা গুচ্ছ
/ঢাকা : ১৯৬৮/

শহীদ কাদরী /জ. ১৯৩৬/

উত্তরাধিকার
/চট্টগ্রাম : বইঘর, ১৯৬৮/

শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির

মধু সরোবর
/বরিশাল : শরীফ পাবলিকেশন্স, ১৯৬৬/

কাব্যানুবাদ কারীমা
/বরিশাল : শরীফ পাবলিকেশন্স, ১৯৬৬/

Dhaka University Institutional Repository



শামসুর রাহমান (জ. ১৯২৯)

প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে
(ঢাকা : সার্ভে এণ্ড বুক, ১৩৬৬)

রৌদ্র করোটিতে
(ঢাকা : লেখক সংঘ প্রকাশনী, ১৩৭০)

বিধ্বস্ত নীলিমা
(চট্টগ্রাম : বইঘর, ১৩৭০)

নিরালোকে দিব্যরথ
(ঢাকা : বাংলা পাবলিশার্স, ১৩৭৫)

নিজ বাসভূমে
(ঢাকা : আইডিয়াল লাইব্রেরী ১৯৭০)

বাংলা কবিদের কবিতা
(সুলতান, ১৩৭৬)

ফ্রস্টের কবিতা
(ঢাকা : সাহিত্যিকা, ১৯৬৫)

ফ্রস্টের নির্বাচিত কবিতা
(ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৬৮)

শেখ মোহসেন আহমদ

নীলচিত্রা
(ঢাকা : কো-অপারেটিভ বুক, ১৩৭০)

সানাউল হক /জ. ১৯২৪/

নদী ও মানুষের কবিতা
/ঢাকা : ওয়ার্সী বুক সেন্টার, ১৩৬৩/

সম্ভবা অনন্যা
/ঢাকা : পূর্বাণী, ১৩৬৯/

সূর্য অন্যতর
/ঢাকা : সমকাল প্রকাশনী, ১৩৬৯/

বিচূর্ণ আর্শিতে
/ঢাকা : সমকাল প্রকাশনী, ১৯৬৮/

সকিল বাদ্যার বাক্যে কবিতা
/ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৩৭৮

সিকান্দার আবু জাফর
/১৯১৯–১৯৭৫/

তিমিরান্তিক
/ঢাকা : সমকাল প্রকাশনী, ১৯৬৫/

প্রসন্ন প্রহর
/ঢাকা : সমকাল প্রকাশনী, ১৯৬৫/

বৈরী বৃষ্টিতে
/ঢাকা : সমকাল প্রকাশনী, ১৯৬৫/

কবিতা : ১৩৭২
/ঢাকা : সমকাল প্রকাশনী, ১৯৬৬/

বৃশ্চিক লগ্ন
/ঢাকা : সমকাল প্রকাশনী, ১৯৭১

কবিতা : ১৩৭৪
/ঢাকা : সমকাল প্রকাশনী, ১৯৭১

বাংলা ছাড়ো
/ঢাকা : সমকাল প্রকাশনী, ১৯৭১

রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম
/ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৬

Dhaka University Institutional Repository



সুফিয়া কামাল /জ. ১৯১১/

সাঁঝের মায়া /১ম সং ১৯৩৮; ২য় সং,
/ঢাকা : ১৩৭৩/

মায়া কাজল
/ঢাকা : ১৩৭৩/

মন ও জীবন
/ঢাকা : ১৩৭৪/

উদাত্ত পৃথিবী
/ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৩৭৮

দীওয়ান
/সিলেট : লিপিকা এন্টারপ্রাইজ লিঃ ১৩৭৩/

প্রশস্তি ও প্রার্থনা
/ঢাকা : ১৯৬৮/

মৃত্তিকার ঘ্রাণ
/ঢাকা : চৌধুরী পাবলিশিং হাউস, ১৩৭৭/

সুফী জুলফিকার হায়দার /জ. ১৯১১/

ছায়া জলোয়ার
/১ম সং, কলকাতা ১৯৪৫/

ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম
/ঢাকা : ১৩৬৬ হিজরী/ ; ২য় সংস্করণে এর
নতুন নামকরণ হয় 'কেন সাবাও কুলদান',
/ঢাকা : ইসলামিক একাডেমী, ১৯৫৯/

সুরু যার আমলো যে পড়লো বাসা
/ঢাকা : ইসলামিক একাডেমী, ১৯৫৯/

Dhaka University Institutional Repository



সৈয়দ আলী আহসান ও
সৈয়দ আলী আশরাফ
প্রেমের কবিতা
/করাচী বিশ্ববিদ্যালয় : বাংলা সাহিত্য সমিতি, ১৯৫৮/

সৈয়দ আলী আহসান /জ. ১৯২২/
ইকবালের কবিতা
/ঢাকা : পাকিস্তানী লাইব্রেরী, ১৯৫২/

অনেক আকাশ
/ঢাকা : সার্জ এণ্ড বুক, ১৩৬৬/

একক সন্ধ্যায় বসন্ত
/ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৩৬৯/

উচ্চারণ
/ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৮/

হুইটম্যানের কবিতা
/ঢাকা : সাহিত্যিকী, ১৯৬৫/

কাব্য সমগ্র
/ঢাকা : লালন প্রকাশনী, ১৯৭৪/

সৈয়দ শামসুল হক /জ. ১৯৩৫/
একদা এক রাজ্যে
/ঢাকা : সন্ধানী প্রকাশনী, ১৯৬১/

বিরতিহীন উৎসব
/ঢাকা : [illegible], ১৯৬৯/

বৈশাখে রচিত পঙক্তিমালা
/ঢাকা : সন্ধানী প্রকাশনী, ১৩৭৬/

হাবিব, এম,এ
চৈত্রের দুপুর
/ঢাকা : ১৩৬২/

Dhaka University Institutional Repository



হায়াৎ মামুদ /জ. ১৯৩৯/ — মৃত সন্তান
/ঢাকা : সাহিত্য শিল্প, ১৯৬৭/

হাসান হাফিজুর রহমান /জ. ১৯৩২/ — বিমুখ প্রান্তর
/ঢাকা : পারাবত প্রকাশনী, ১৩৭০/

আর্ত শব্দাবলী
/ঢাকা : পুঁথিপত্র, ১৩৭৫/

অন্তিম শরের মতো
/ঢাকা : সন্ধানী প্রকাশনী, ১৩৭৫/

হোসনে আরা /জ. ১৯১৬/ — মিছিল
/ঢাকা : পাকিস্তান প্রকাশনী, ১৯৬৪/

Dhaka University Institutional Repository



ঘ. বিভিন্ন কবির কবিতার সংকলন

| | | |
|---|---|---|
| ১ | আশরাফ সিদ্দিকী ও আবদুর রশীদ খান | নতুন কবিতা (ঢাকা : ওয়ারী বুক সেন্টার, ১৩৫৬) |
| ২ | মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ও আবু হেনা মোস্তফা কামাল | পূর্ব বাংলার কবিতা (ঢাকা : ১৯৫৪) |
| ৩ | ফারুক মাহমুদ | খোলাই কাব্য (ঢাকা : ১৯৬৩) |
| ৪ | আসদ-আল্লাহ কবীর-উদ্দীন | স্বদেশের ডাক (ঢাকা : ন্যাশনাল রাইটার্স অ্যান্ড [illegible] আসদ আল্লাহ একাডেমী, ১৯৬৬) |
| ৫ | এম এম আসগর | চির উন্নত শির (ঢাকা : পাকিস্তান কাউন্সিল, ১৯৬৬) |
| ৬ | আহসান হাবীব | কাব্যালোক (ঢাকা : পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ১৯৬৮) |
| ৭ | আ ক ম সিরাজ-উদ-দৌলা চৌধুরী | সাবুর (চট্টগ্রাম : রাহুর প্রকাশনী, ১৩৭৫) |
| ৮ | রফিকুল ইসলাম | আধুনিক কবিতা (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭০) |
| ৯ | আবদুল হাফিজ | রক্তাক্ত মানচিত্র (মুদ্রিত, নবীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ মুর্শিদাবাদ, ১৯৭১) |

Dhaka University Institutional Repository

২ পাকিস্তান-আমলে প্রকাশিত
বাংলা কাব্য সংকলন সমূহের
(মৌলিক ও অনুবাদ) কালানুক্রমিক
তালিকা[১]

১৯৪৭

| | |
|---|---|
| এম,এ, মুহিব ছিদ্দিকী | পাকিস্তান বিজয় কবিতা (চকরিয়া : চট্টগ্রাম) |
| সদরুদ্দীন | নয়া আসমান (ঢাকা : ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরী) |
| সুরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত | জাতীয় প্রদীপ (বরিশাল) |
| সৈয়দ আসাদ উদ্দৌলা সিরাজী | রক্তের রাখী (সিরাজগঞ্জ) |

---

১। এই কালানুক্রমিক তালিকা কয়েকটি কারণে সর্বাংশে নির্ভুল না-ও হতে পারে : প্রথমত, তালিকা নির্মাণে আমার প্রধান অবলম্বন ছিল তিনটি সংকলন — বাংলাদেশের বই, (বাজারে চালু বইয়ের তালিকা ।। ১৯৭৪), (ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ১৯৭৫) এবং শামসুল হক সম্পাদিত বাংলা সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জী (১৯৪৭–১৯৬৯), (ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র, ১৯৭০) ও বাংলা সাহিত্য গ্রন্থ পঞ্জী (১৯৭০–১৯৭২), (ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র, ১৯৭৩)। অথচ এগুলিতে অনেক কাব্যের প্রকাশকাল সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। দ্বিতীয়ত, অনেক কাব্যে প্রকাশকাল হিসাবে শুধু বাংলাব্দের সংখ্যা উল্লিখিত আছে, নির্দিষ্ট তারিখ (মাস ইত্যাদি) নেই, এমনকি যেগুলিতে পুরো অব্দ আছে, উপরোক্ত সংকলনে সেগুলিও অব্দসংখ্যায়ই নির্দেশিত হয়েছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ তারিখ ছাড়া বঙ্গাব্দকে সঠিকভাবে খ্রীষ্টাব্দে পরিণত করা যায়না। একটি চমৎকার উদাহরণ হিসাবে সানাউল হকের দুটি কাব্যের কথা বলা যেতে পারে। 'সম্ভবা অনন্যা' ও 'সূর্য অন্যতর' প্রকাশিত হয়েছে ১৩৬৯ বঙ্গাব্দের পৌষ ও মাঘ মাসে। এগুলির খ্রীষ্টীয় তারিখ হবে যথাক্রমে ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর ও ১৯৬৩ সালের জানুয়ারী মাস।

Dhaka University Institutional Repository



১৯৪৮

গোলাম মোস্তফা — তারানা-ই-পাকিস্তান
/ঢাকা : মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী/

সাবিরউদ্দিন আহমদ — ব্যথা
/করিমগঞ্জ মোসলেম লাইব্রেরী/

মোবারকুল ইসলাম — দেহ পাক দেখি
/চাঁদাইল : কাসুরার প্রকাশনী/

মীজানুর রহমান — পাকিস্তানী গান
/ঢাকা/

মোহসেন আহমদ — আলাপন জয়া
/ঢাকা : সেন্ট্রাল বুক/

সৈয়দ মাহবুব মিয়া — মুক্তিপথ
/নোয়াখালী/

আজিজুল হাকিম — রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম
/ঢাকা : ইস্টার্ন বুক সেন্টার/

এম আবদুল কাদির — কালো কুসুম
/ঢাকা : ইতিকথা বুক ডিপো/

১৯৪৯

আবিদুল ইসলাম চৌধুরী — মরজান
/চাঁদপুর/

আশরাফ হোসেন — পয়গাম
/চট্টগ্রাম : কলম সংঘ/

ডঃ এম শমসের আলী — সুরাজ
/ঢাকা : মুজিবলিয়াস লাইব্রেরী/

গোলাম মোস্তফা — বুলবুলিস্তান
/ঢাকা : মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী/

মীর রহমত আলী — মসজিদ কাবা
/ঢাকা, নরসিংদী : ইসলামিয়া লাইব্রেরী/

রওশন ইজদানী — খাকবীর
/ঢাকা : ইজদানী সাহিত্য কুটির/

Dhaka University Institutional Repository



দেওয়ান আবদুল হামিদ — পাকিস্তান কাব্য মনজরী
/ঢাকা ঃ হজরতপুর/

নূর আহমদ শাহ — কায়েদে আজম
/চট্টগ্রাম ঃ পাহাড়তলী/

গিজানুর রহমান — জিন্দা মুসলমান
/ঢাকা ঃ পুরানো পল্টন/

X শেখ মোছলেম আহমেদ — শারাবান তহুরা
/ঢাকা ঃ ভেরাইটি বুক/

১৯৫০

আলতাফ হোসেন — সবুজ মাঠ (১৩৫৭)
/চট্টলা/

আশরাফ সিদ্দিকী — তালেব মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা
/ঢাকা ঃ কিতাব মনজিল/

ছদরুদ্দীন — এক ফালি চাঁদ
/বলাকা, রংপুর/

X মুন্সী এ, মন্নান — স্মৃতি রাখী
/ময়মনসিংহ ঃ পাকুন্দিয়া হাই মাদ্রাসা/

মুহম্মদ আবদুল খালেক — কবিতা নির্ঝর
/ময়মনসিংহ,মোনাইল/

মুহম্মদ আবু বকর শহীদুল্লাহ — জীবন স্বপ্ন
/কুমিল্লা/

মোহাম্মদ হোসেন — পলাশের পাকিস্তান
/পাবনা : বুখারী পাবলিকেশন্স এসোসিয়েশন/

সাহাদাৎ হোসেন — রূপছন্দা
মখদুমী এ্যান্ড আহসানউল্লা লাইব্রেরী

১৯৫১

শ্রী হরিনাথ চন্দ্র পাল — দীপালী
/ফরিদপুর, গোপাল গঞ্জ/

আবদুল কাদের আশরেকী — জানাযার সওয়াব
/ত্রিপুরা/

মরু সন্দুক
/ত্রিপুরা, বিদ্যাকোট : ত্রিপুরা হিন্দু মুসলিম ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন/

X আবদুর রশীদ খান — বক্ষ খানুল মন
/ঢাকা/

মোহাম্মদ আবদুল গনি — ছিন্নহার
/রংপুর : সাহেবগঞ্জ ইসলামিয়া লাইব্রেরী/

ইমদাদুদ্দীন — সংগ্রাম
/চেলকা, রংপুর/

জসীমউদ্দীন — মাটির কান্না
/ঢাকা : আদিল ব্রাদার্স/

জুলফিকার — নতুন পৃথিবীর জন্য
/ঢাকা : পপুলার পাবলিশিং হাউস/

Dhaka University Institutional Repository



| | |
|---|---|
| নূরুল বাহার | অগ্নিস্নান<br>/ঢাকা : ইসলামিয়া লাইব্রেরী/ |
| বশিরুদ্দীন সিদ্দিক শাহ | পাথেয়<br>/ফরিদপুর/ |
| মুহম্মদ আবদুর রহিম পণ্ডিত | বিদ্যাবল প্রেমসংগীত বা প্রেমাবল গান<br>/ত্রিপুরা, নাসিরাবাদ/ |
| রওশন ইজদানী | চিরলিপি<br>/ঢাকা : মোসলেম পাবলিশিং হাউস/ |
| | রূপিকা শত<br>/ঢাকা : মোসলেম পাবলিশিং হাউস/ |
| আবুল কালাম মোস্তফা<br>মুন্সী এ. মান্নান | শিকওয়াহ ও জওয়াব-ই-শিকওয়াহ<br>/ঢাকা : ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী/<br>স্মৃতি বাণী (১৩৫৮)<br>(সংকলনে : [illegible]) |

১৯৫২

| | |
|---|---|
| ৭আবদুর রশীদ খান | ~~নবী-কুসুম~~ নক্ষত্র মানুষ মন<br>(ঢাকা)<br>~~/ঢাকা : এশিয়া বুক হাউস/~~ |
| জহির উদ্দীন মোহাম্মদ হোসেন<br>চৌধুরী | দিন আসবে ঐ মুসলিম জন কই ?<br>/ঢাকা/ |
| মঈন উদ্দীন | নকশা<br>/ঢাকা : চৌধুরী পাবলিশার্স/ |
| কাসিমউদ্দীন আহমদ | আধার দুধীপ (১৩৫৭)<br>/ঢাকা/ |

Dhaka University Institutional Repository



শেখ সাইফুল্লাহ — সঙ্গীত লহরী
/ঢাকা/

সদরুদ্দীন — চাতক
/ঢাকা/

সিরাজ উল হক /বি.এ./ — নই কথা কও (১৩৫৯)
/ঢাকা : পাকিস্তান বুক ডিপো/

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ — রুবাইয়াৎ-ই-উমর খৈয়াম
/ঢাকা : প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী/

সৈয়দ আলী আহসান /সম্পাদনা/ — ইসলামের কবিতা
/ঢাকা : [illegible] লাইব্রেরী/

১৯৫৩

ওহীদুল আলম — বিংশতি
/চট্টগ্রাম : সাহিত্য নিকেতন/

কাজী গোলাম আহমদ — ইদের চাঁদ
/মতিঝিল, ঢাকা/

দিলওয়ার — জিজ্ঞাসা
/সিলেট : মুসলিম খান/

মুহম্মদ আব্দুর রাজ্জাক — ময়ূর পাখা
/নোয়াখালী, মাইজদী কোর্ট/

মহম্মদ মফীজ — কবিতা ও শোভুর
/ঢাকা/

Dhaka University Institutional Repository



| | |
|---|---|
| শেখ সাইফুল্লাহ | অন্তরায় |
| | /ঢাকা/ |
| | ফুলবাগ |
| | /ঢাকা/ |

১৯৫৪

| | |
|---|---|
| আতিকুল হাকিম | বিদগ্ধ দিনের প্রান্তরে |
| | /ঢাকা ঃ ইস্টার্ণ বুক সেন্টার/ |
| আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী | নবদেশ |
| | /ঢাকা ঃ নয়া দুনিয়া প্রকাশনী/ |
| আবদুল হাই মাশরেকী | দুঃখ দিনের তারা |
| | /ঢাকা ঃ তমদ্দুন লাইব্রেরী/ |
| এম আর আবুবকর | যুগের বাণী |
| | /জামালপুর/ |
| নূর আহমদ শাহ | শহীদ |
| | /চট্টগ্রাম/ |
| মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা | অন্তরের সুর |
| | /ঢাকা ঃ খাদিম ব্রাদার্স/ |
| শেখ সাইফুল্লাহ | অভিযান |
| | /ঢাকা/ |
| | দিলরাজ |
| | /ঢাকা ঃ মুকুল প্রকাশনী/ |

Dhaka University Institutional Repository



| | |
|---|---|
| সদরুদ্দীন | নয়া আসমান<br>(ঢাকা : মুক্তিবাসিয়াম লাইব্রেরী) |

১৯৫৫

| | |
|---|---|
| আবদুর রহমান শাদবাদী | ঝর্ণা<br>(মোমেনশাহী) |
| আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ | সাত নরীর হার<br>(ঢাকা : বিচিত্রা প্রকাশনী) |
| আশরাফ আলী চৌধুরী | হাবা বৈশাখ ১৩৬২<br>(যশোর) |
| আশরাফ সিদ্দিকী | বিষকন্যা<br>(ঢাকা) |
| | সাত ভাই চম্পা<br>(ঢাকা : সবুজ লাইব্রেরী) |
| (কবি) বাহাদুর | পুলক বীণা<br>(নারায়ণগঞ্জ) |
| এম এ হাকিম | চৈত্রের দুপুর<br>(ঢাকা : হাকিম মনজিল) |
| এস কে এম মুনুল বারী | অভিশপ্ত পাকিস্তান<br>(সদর বগুড়া) |

Dhaka University Institutional Repository



মফিজুল ইসলাম — পিয়া ও পৃথিবী
/চট্টগ্রাম ঃ শিক্ষক সমবায় লাইব্রেরী/

মহম্মদ সাদেক মিয়া — আলাপ প্রলাপ (ঢাকা)

নূরুল ইসলাম — মাটির ফসল
/ঢাকা ঃ পিয়ারার পাবলিশিং হাউস/

মোফাজ্জলুর রহমান — মুক্তানন্দী
/বরিশাল ঃ নুর লাইব্রেরী/

শেখ সাইফুল্লাহ — ঝংকার
/ঢাকা ঃ বুলবুল প্রকাশনী/

মুক্তিকাম
/ঢাকা ঃ বুলবুল প্রকাশনী/

আবুল কালাম মুহম্মদ — খুদ-ই-সেখুর্দ
আবদুল হক — /ঢাকা ঃ পাকিস্তান পাবলিকেশনস/

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন পঞ্চতীর্থ — পুরোহিত সমাজ কামন ধারা (১৩৬২)
(ঢাকা: ...)

১৯৫৬

আ ন ম বজলুর রশীদ — মঞ্জুর
/ঢাকা ঃ আদিল ব্রাদার্স/

আজিজুল হাকিম — আরাফাতের নামা
/ঢাকা ঃ ইস্টার্ন বুক সেন্টার/

আতাউর রহমান — দুই ঋতু
/বকুল/

X গোলাম মোস্তফা — তারানা-ই-পাকিস্তান (২য় খণ্ড)
/ঢাকা ঃ মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী/

Dhaka University Institutional Repository



জাহিদ হোসেন — দিশারী
/ঢাকা : মৌসুমী পাবলিশার্স/

মহিবুদ্দীন — পাকের বাও
/ঢাকা : আলহামরা লাইব্রেরী/

মাহমুদ মনসুর — আমাদের আজাদী
/ঢাকা/

মুহম্মদ আবদুল খালেক — আহ্লাদ পথ
/বরিশাল/

মোতাহারুল ইসলাম — বীণা
/নোয়াখালী/

সদরুদ্দীন — ১৪ই আগস্ট
/নওগাঁ/

X সাদেক মিয়া — X আজাদ প্রভাত
/ঢাকা/

সানাউল হক — নদী ও মানুষের কবিতা
/ঢাকা : প্যাসিফিক বুক সেন্টার/

সৈয়দ আসাউদ্দৌলা সিরাজী — কিশলয়
/সিরাজগঞ্জ/

১৯৫৭

আজিজুর রহমান — পল্লীবীথি
/যশোর/

আতিক ইসলাম — সন্ধ্যা
/ঢাকা : ইসলামিয়া লাইব্রেরী/

Dhaka University Institutional Repository



| | |
|---|---|
| মীর আবদুল মতীন | আবাদী উৎসব<br>(ময়মনসিংহ) |
| মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাক | মুক্তার বাঁশি<br>(চৌমুহনী, নোয়াখালী) |
| ওমর সাইদুল্লাহ | অরুণা<br>(ঢাকা : স্বদেশ প্রকাশনী) |
| সিরাজউদ্দিন চৌধুরী | সাঁঝের বলাকা<br>(টাঙ্গাইল) |
| সুফিয়া কামাল | মন ও জীবন<br>(ঢাকা) |
| গোলাম মোস্তফা | কালাম-ই-ইকবাল<br>(ঢাকা : স্টুডেন্ট মডেল লাইব্রেরী) |

১৯৫৮

| | |
|---|---|
| অনামিকা | কথা ও সুর<br>(বরিশাল) |
| আলী মনোয়ার | মরুদ্যান<br>(ময়মনসিংহ) |
| আবদুল খালেক | মাটি ও মানুষ<br>(পাবনা) |
| আশরাফ সিদ্দিকী | উত্তর আকাশের তারা<br>(ঢাকা : সবুজ লাইব্রেরী) |

Dhaka University Institutional Repository



| | |
|---|---|
| এ কে মকবুল আহমদ | অপরাধ<br>(সাতপাই, মোমেনশাহী) |
| গোলাম মোস্তফা | বনি আদম (১ম খণ্ড)<br>(ঢাকা) |
| মঈনুদ্দীন | [illegible],<br>(ঢাকা : আলহামরা লাইব্রেরী)<br>আর্তনাদ<br>(ঢাকা : আলহামরা লাইব্রেরী) |
| শামসুর রহমান | [illegible] সাথের দোসর<br>(পুরানা পল্টন, ঢাকা) |
| মুহম্মদ [illegible] আলী | মধুমতীর বাঁকে<br>(দুর্গাপুর, বাকেরগঞ্জ) |
| মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম খান | মরুনিশান<br>(কুষ্টিয়া) |
| সুরাত আলি | চাঁদের হাট<br>(ঢাকা) |
| সৈয়দ আবদুল হাই | শাহেদ<br>(ত্রিপুরা) |
| সৈয়দ আসাউদ্দৌলা শিরাজী | স্বর্ণবাণ<br>(সিরাজগঞ্জ, পাবনা) |
| হরিনারায়ণ বসী | আকাশ মাটি মানুষ<br>(মজুমদার বিল, চট্টগ্রাম) |

Dhaka University Institutional Repository



সৈয়দ আলী আহসান ও
সৈয়দ আলী আশরাফ (সম্পাদনা) — চতুরের কবিতা
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ)

১৯৫৯

আবদুর রশীদ খান — বন্দী মুহূর্ত
(ঢাকা: এশিয়া বুক হাউস)

আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী — আখির মঞ্জর
(ঢাকা : ইস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স)

আবদুল গনি হাজারী — সামান্য ধন
(ঢাকা : কিতাবিক পাবলিশার্স)

আবদুস সাত্তার — বৃষ্টিমুখর
(চাটগাঁ)

আবুল কালাম শেখ নূর মোহাম্মদ — সুখোদ্ধের কথা কয়
(দিনাজপুর : নওরোজ সাহিত্য মজলিস)

কাজী মঈনুদ্দীন — কবিতা
(ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান)

কাজী নজীর আহমদ — কস্তুরী শিখা
(ঢাকা)

মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম খান — সৌমিক
(কুষ্টিয়া)

মোতাহার এলাহী — স্বনিক
(ঢাকা)

মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ — জুলেখার মন
(ঢাকা)

Dhaka University Institutional Repository



মোহাম্মদ মোবারেজ্জর হোসেন — ঝিনেদী
/কুষ্টিয়া/

শামসুর রাহমান — প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে
/ঢাকা : মার্জা এণ্ড বুক/

সুফী জুলফিকার হায়দার — ফের মানাও মুসলমান
/ঢাকা : ইসলামিক একাডেমী/

সুন্দর বাংলো যে গড়লো যারা
/ঢাকা : ইসলামিক একাডেমী/

সৈয়দ আলী আশরাফ — চৈত্র যখন
/ঢাকা : বার্তা এণ্ড বুক/

সৈয়দ আলী আহসান — অনেক আকাশ
/ঢাকা : বার্তা এণ্ড বুক/

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ — দীওয়ান-ই-হাফিজ
/ঢাকা : রেনেসাঁস প্রিন্টার্স/

খোন্দকার মাহমুদুর রহমান — আল্লামার গান ও অন্যান্য কবিতার (নতুন দিল্লী)
এ কে মকবুল আহমদ — অনুবাদ (সওগাত সংস্করণ)

১৯৬০

আলম আল্লাহ জহীর উদ্দীন — নজরানা
/ঢাকা/

আজম হাসেম — সোনালী বাবা
/নবগ্রাম নগর, পাবনা/

আবু বাকী — একদিন আকাশ রং রবীর সুনাম শুনেছি
/ঢাকা : কোহিনুর লাইব্রেরী/

কাজী আবদুর রহমান — কাব্যগ্রন্থ
([illegible] : [illegible] লাইব্রেরী)

Dhaka University Institutional Repository



ফকির চৌধুরী — অভিযোগ
/কারাবন্দমঙ্গ, ঢাকা/

কাদের নওয়াজ — নীল কুমুদী
/দিনাজপুর : নওরোজ পাবলিশিং হাউস/

এ কে এম সালেহ উদ্দীন — যাত্রাপুর
/ঢাকা : সাহিত্যমেলা/

আলাউদ্দীন মোল্লা — গুলাব দীপ
/ঢাকা : প্রতি বুকস/

জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী — দোসুখী রাখুর গান
/রাজশাহী/

মহীউদ্দীন — দিগন্তের পথে একা
/ঢাকা : পাইওনিয়ার পাবলিশার্স/

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা — মন ও মৃত্তিকা
/ঢাকা : খাদিজা ব্রাদার্স/

মুহম্মদ শামসুর রহমান — মুক্তি হবে ধান
/ফরিদপুর/

মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম খান — রাণীর শোধ
/কুষ্টিয়া/

মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন — গীতবন্ধন
/কুষ্টিয়া/

সুলতান জমাদী — খাতামুন নবীইন
/ঢাকা/

শামসুর রাহমান — প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে
(ঢাকা : ওসমান এ্যান্ড কুমার)

Dhaka University Institutional Repository



| | |
|---|---|
| সমসুদ্দীন | মধুমঞ্জু<br>/ইসলামপুর, ঢাকা/ |
| সৈয়দ আসাদ-উদ-দৌলা শিরাজী | মরুশাখা<br>/সিরাজগঞ্জ/ |
| গোলাম মোস্তফা | শিকওয়া ও জওয়াবে-ই-শিকওয়া<br>/ঢাকা : কওমী লাইব্রেরী/ |
| নাসির উদ্দীন ইউসুফ | ইসলামের কাব্য সম্ভার<br>/ঢাকা : বাংলা একাডেমী/ |
| মীজানুর রহমান | ইসলাম অনুপম বাণী<br>/ঢাকা : ইসলাম প্রচার মিশন সোসাইটী/ |
| | ইসলামের বাণী বিবরণ<br>/ঢাকা : ইসলাম প্রচার মিশন সোসাইটী/ |
| মোহাম্মদ আবদুল মালেক | শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া<br>/রংপুর/ |

১৯৬১

| | |
|---|---|
| আবদুর রহমান আনসারী | নিশি ভোরের তার<br>/রাজশাহী/ |
| আবদুল মজিদ তালুকদার | রাহী<br>/ময়মনসিংহ/ |
| আলাউদ্দীন আল আযাদ | মানচিত্র<br>/ঢাকা : সাহিত্যভবন/ |

Dhaka University Institutional Repository

| | |
|---|---|
| আহসান হাবীব | মধুরীকা |
| | (ঢাকা : অনন্য প্রকাশনী) |
| | [illegible] |
| | (ঢাকা : অনন্য প্রকাশনী) |
| | [illegible] |
| | (ঢাকা : অনন্য প্রকাশনী) |
| এম ডি একে ইদরিস | পথের নিশান |
| | (চাঁদপুর, কুমিল্লা) |
| কামরুল আহসান | পৃথিবী আমার আমি পৃথিবীর |
| | (ঢাকা : সাহিত্য [illegible]) |
| তাজাম্মুল হোসেন চৌধুরী | ছায়াময় দিন |
| | (ঢাকা : [illegible] লাইব্রেরী) |
| নিজামউদ্দিন | ফিরে চাও |
| | (রাজশাহী) |
| মোঃ দেলোয়ার হোসেন খান | নতুন প্রভাত |
| | (বরিশাল) |
| মুহম্মদ আবু বকর | কাকিমাবাবা |
| | (যশোর : রুবি প্রেস) |
| মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান | [illegible] দিন |
| | (ঢাকা : [illegible] প্রকাশনী) |
| আবদুল আজিজ শিকদার | [illegible] গান |
| | (ফরিদপুর) |

Dhaka University Institutional Repository



সাদত উদ্দীন মিঞা — সর্পিনী বাসনা
/সলপ, পাবনা/

সৈয়দ শামসুল হক — একদা এক রাজ্যে
/ঢাকা ঃ সন্ধানী প্রকাশনী/

হানিফ খান — আশার বাণী
/নারায়ণগঞ্জ/

ওমর আলী — এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি
(ঢাকা: কোহিনূর লাইব্রেরী)

১৯৬২

আ ন ম বজলুর রশীদ — মেঘের মিনার ও অন্যান্য কবিতা
/ঢাকা/

আবদুল করিম চাষী — আশ্বিনের চাঁদ
/সেলন্দা, পাবনা/

আবদুল্লাহ — পাথর-অচেনা-পাখি
/ঢাকা/

আলাউদ্দীন আল আজাদ — ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ
/ঢাকা ঃ সাহিত্যভবন/

আহসান রফাত — কুহুধিকা
/ঢাকা ঃ নবযুগ প্রকাশনী/

আহসান হাবীব — ছায়া হরিণ (১৩৬৯)
/ঢাকা ঃ কথা বিতান/

এম মোমতাজউদ্দীন — প্রান্তী
/পাবনা/

Dhaka University Institutional Repository



এস এম আনসার আলী — নূর-ই-আমানত
(কলকাতা : ন্যাশনাল সাহিত্য সাধনা কুটির)

ইনামুল হক — অনুরাগ
(ঢাকা : সমকাল প্রকাশনী)

কে এম সফদের আলী — নূরবার কলি,
(কলকাতা, নুরজাহান লাইব্রেরী)

মাহাবারা খাতুন — নীল স্বপ্ন
(ঢাকা : কবিতাঙ্গন)

তাসির হোসেন — শাহীন
(ঢাকা : মৌসুমী পাবলিশার্স)

মুন্সী মজুর মিয়া — ন্যাথার তান
(ময়মনসিংহ)

জিকা সংগীত
(ময়মনসিংহ)

রবীন্দ্র দাস চৌধুরী — সাঁঝ বাতি
(কড়াচিয়া, চট্টগ্রাম)

মতিনা জিলানী — এক আকাশ অনেক তারা
(ঢাকা : শুভেচ্ছা প্রেস)

সামাউল হক — সন্ধ্যা বন্দনা চৈত্র ১৩৬২
(ঢাকা : পূর্বাশা)

X সূর্য বন্যা
(ঢাকা : সমকাল প্রকাশনী)

মির্জা এ.কে.এম. আমিনুল হক — প্রেম ও জীবন (ঢাকা)

নোমান আদিল ও ওমর ফারুক — স্বাধীনতা থেকে স্বপ্ন প্রান্তর (ঢাকা)

Dhaka University Institutional Repository



সৈয়দ আলী আহসান — এক সন্ধ্যায় বসন্ত
(ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান)

হাবিবুর রহমান — উপায়
(ঢাকা : আহমদ পাবলিকেশন্স)

ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান — দেকোয়া ও অন্যান্যে দেকোয়া
(দিনাজপুর : নওরোজ সাহিত্য মজলিশ)

১৯৬০

আমিনুল্লাহ — এক দান জুয়া
(ঢাকা : লোটাস এণ্ড ব্রাদার্স)

আমানুল্লাহ — ইন্দুর কেটে কেটে খাবি
(ঢাকা)

আল মামুন — লোক লোকান্তর ২৫শে ১৩৭০
(ঢাকা : প্রতিভা)

আহমদ নওয়াজ — নদী দীপিকা
(ঢাকা : অনু প্রকাশনী)

এ বি কামালউদ্দীন আহমদ — মালঞ্চ
(জামালপুর, ময়মনসিংহ)

বন্যার জলে বন্যা — অনুভাব
(সাহেব পাড়া, ময়মনসিংহ)

খোদেজা খাতুন — বেদনার এই বালুচরে
(ঢাকা)

জসীমউদ্দীন — মা যে জননী কান্দে
(ঢাকা : আদিল ব্রাদার্স)

Dhaka University Institutional Repository



| | |
|---|---|
| কবীরউদ্দীন আহমদ | সান্ধ্য বাণী<br>/ঢাকা/ |
| জিয়া হায়দার | এক তারাতে কান্না<br>/ ঢাকা : সবুজ প্রকাশনী/ |
| ফজলুর রহমান | প্রাণসখী<br>/সিলেট/ |
| ফররুখ আহমদ | মুহূর্তের কবিতা<br>/ঢাকা : বার্ডস এণ্ড বুকস/ |
| রফিকুল ইসলাম | পূর্ণলিপি<br>/ঢাকা : স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স/ |
| মোহাম্মদ মামুন | দেখেছি পড়েছি কৃষ্ণচূড়ার.<br>/ঢাকা : [illegible] বুক/ |
| শামসুর রাহমান | রৌদ্র করোটিতে<br>/ঢাকা : লেখক সংঘ প্রকাশনী/ |
| শেখ মোহাম্মদ আহমদ | নিশিন্দ্রা<br>/ঢাকা : [illegible] বুক/ |
| [illegible] সর্বণ | ফুলমালা<br>/[illegible], পাবনা/ |
| হাসান হাফিজুর রহমান | বিমুখ প্রান্তর<br>/ঢাকা : [illegible] প্রকাশনী/ |
| দেবব্রত চৌধুরী | আমার আকাশে নিয়ন<br>(ঢাকা : অনুপম প্রকাশনী) |
| আতাউর রহমান | একদিন প্রতিদিন<br>(ঢাকা : সাহিত্য মনজিল) |

১৯৬৪

| | |
|---|---|
| আমিনুল্লাহ শিরাজী | বন্দী পাখী<br>/ঢাকা : সিটি বুক এ্যাণ্ড পাবলিশার্স/ |
| আমিনুল্লাহ | মনের গন্ধ<br>/ঢাকা : মডার্ণ পাবলিশার্স/ |
| X আতাউর রহমান | X একদিন প্রতিদিন<br>/ঢাকা : সাহিত্য মজলিস/ |
| X আবদুল হামিদ আনসারী | X পথের সাথী<br>/ইটাউড়া, ময়মনসিংহ/ |
| আবেদ আলী মজুমদার | মেঘের মাটি ও অন্যান্য কবিতা<br>/বগুড়া/ |
| আকতার হামিদ | সারা দুপুর<br>/ঢাকা : কথা বিতান/ |
| এমদাদ আলী মোল্লা | দীওয়ান-ই-মুহাজির<br>/বগুড়া/ |
| এস এম তৌফিকুল ইসলাম | মেঘের গীত ও অন্যান্য কবিতা<br>/লালমনিরহাট, রংপুর/ |
| মমতাজ | রূপসী কন্যা<br>/ঢাকা : পূর্বী পাবলিশার্স/ |
| আহসানুল আহমদ | রোদের রঙা পাখ<br>/ঢাকা : কবিতালয়/ |

Dhaka University Institutional Repository



দিলওয়ার — ঐকতান

(সিলেট : দিলওয়ার সংবর্ধনা কমিটি)

সুলতানুল ইসলাম — আমান

(ঢাকা : সাহিত্য নিবাস)

সুফিয়া কামাল — উদাত্ত পৃথিবী

(ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ)

হোসনে আরা — বিচ্ছিন্ন

(ঢাকা : পাকিস্তান প্রকাশনী)

জাহাঙ্গীর চৌধুরী — [illegible] কবিতা

(ঢাকা : [illegible])

[illegible] রহমান — [illegible]

(ঢাকা : [illegible] কোম্পানী)

সানাউল হক — [illegible]

(ঢাকা : বাংলা একাডেমী)

আবদুস সাত্তার — [illegible]

([illegible])

১৯৬৫

[illegible] হুসাইন — [illegible]

(সিলেট)

[illegible] রহমান — [illegible]

(রাজশাহী)

আবদুল গনি হাজারী — সূর্যের সিঁড়ি

(ঢাকা : [illegible])

Dhaka University Institutional Repository



| | |
|---|---|
| আলাউদ্দীন আল আজাদ | সূর্য জ্বালার সোপান<br>(ঢাকা : পারাবত প্রকাশনী) |
| আহমদ রফিক | [illegible] শিকল<br>(ঢাকা (ঢাকা : অনু প্রকাশনী) |
| | [illegible]-নিনাদ উৎস নদী<br>(ঢাকা : অনু প্রকাশনী) |
| এম এ ওয়াদুদ | নীহারিকা<br>(সিলেট) |
| এস এম সাফিনা খাতুন | প্রাণধারা<br>(সিরাজগঞ্জ বাজার, পাবনা) |
| শহীদুল আলম | কবিতা সংকলন<br>(ঢাকা : [illegible]) |
| খন্দকার আব্দুল মালেক | সেতু [illegible] গান<br>(পটুয়াখালি) |
| খোরশেদ আলম | আমার দেশ<br>(আঠারবাড়ী, ময়মনসিংহ) |
| কমল শাহাবুদ্দীন | [illegible] একা<br>(ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স) |
| মনোমোহন বর্মণ | [illegible] কুসুম খেলে<br>(ঢাকা : [illegible] ভবন) |
| মাশুক আহমদ আলী | জোয়ার<br>(কুমিল্লা) |
| মীর আবদুল খালিক | [illegible] |

Dhaka University Institutional Repository

| | |
|---|---|
| | নতুন সাথী ([illegible]) |
| মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান | [illegible] |
| | /ঝালকাঠি, বরিশাল/ |
| মোঃ মিজানুল হক খান | [illegible] |
| | /ঢাকা : [illegible]/ |
| মিজানুর রহমান খান | [illegible] |
| | /ঢাকা : নবকাল প্রকাশনী/ |
| | [illegible] |
| | /ঢাকা : নবকাল প্রকাশনী/ |
| | [illegible] |
| | /ঢাকা : নবকাল প্রকাশনী/ |
| মুন্সী মোতাহার হোসেন | [illegible] |
| | /ফরিদপুর : মুন্সী মোতাহার হোসেন স্মৃতি প্রকাশনী পরিষদ/ |
| ✗ [illegible] | ✗ [illegible] |
| | /[illegible]/ |
| মোয়াজ্জেম হোসেন | [illegible] |
| | /ঢাকা : [illegible]/ |
| [illegible] | [illegible] |
| | /ঢাকা : বাংলা একাডেমী/ |
| [illegible] | [illegible] কবিতা |
| | /ঢাকা : [illegible]/ |
| [illegible] | [illegible] কবিতা |
| | /ঢাকা : [illegible]/ |

Dhaka University Institutional Repository



১৯৬৬

আজহারুল ইসলাম — ছায়াপথ
/ঢাকা : ইউনিভার্সিটি পাবলিকেশন্স/

আ ন ম আব্দুর রশীদ — ত্রিমাত্রিক
/ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান/

আজিজুর রহমান — শিশু শতক
/ঢাকা : শিশু শতক/

আনোয়ারুল আবসারী — দাদু
/সাহিত্যধারা, রাজশাহী/

আসাদুর রশীদ খান — মহুয়া
/ঢাকা : কস্মোপলিটান বুক/

আজা আসাদুল হক — প্রজাপতি মন
/নারায়ণগঞ্জ, পতাকা প্রকাশনী/

আব্দুল মান্নান সৈয়দ — জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ
/ঢাকা : রূপম/

আল মাহমুদ — কালের কলস পৌষ ১৩৭৩
/চট্টগ্রাম : বইঘর/

আহসান নজরুল — কায়েদে আজমের প্রথম দিন
/ঢাকা : অনন্ত প্রকাশনী/
বোকাকুমার
/ঢাকা : অনন্ত প্রকাশনী/
মিস্টার আহসান /ঢাকা : অনন্ত প্রকাশনী/
ঈদ-উর কেচ্ছা /ঢাকা : অনন্ত প্রকাশনী/

| | |
|---|---|
| [illegible] | পদ্মাপুকুরের সাঁকো<br>(ঢাকা) |
| [illegible] | অরণ্যে একটি লোক<br>((ঢাকা) |
| মুর্শিদ কাজেম | আলোর ছটা<br>([illegible], [illegible]) |
| [illegible] | [illegible]<br>([illegible]) |
| [illegible] আহমদ খান | [illegible]<br>([illegible], [illegible]) |
| রশীদ চৌধুরী | [illegible]<br>(ঢাকা) |
| আমিনুল ইসলাম | [illegible]<br>([illegible], যশোর) |
| [illegible] | ইচ্ছার অরণ্যে<br>(ঢাকা ও [illegible]) |
| নাসির উদ্দীন আহমদ | [illegible]<br>(ঢাকা ও [illegible] মসজিদ লাইব্রেরী) |
| [illegible] আহমদ | [illegible]<br>(ঢাকা ও [illegible])) বাংলা একাডেমী |
| [illegible] | [illegible]<br>([illegible]) |

মহীউদ্দীন — শিকারে চলেছে শুধু নাগরা কাফের
(ঢাকা : সাহিত্য শিবির)

মোঃ এনায়েত হোসেন বাবুল — জিনতারকা
(বরিশাল : বাবুল ব্রাদার্স)

মোঃ খালেদুর রহমান খান — দী শিশু
(ঢাকা : খালিদ ব্রাদার্স)

মোঃ মাহফুজুল্লাহ — একদা এক
(ঢাকা : আহসানিয়া বুক ডিপো)

মোঃ মহসিন মুন্সা — কবিতা সংকলন
(রাজশাহী : [illegible] নইমগ)

মোঃ সিরাজুল হক খান — স্বপ্নের নক্সা
(ঢাকা : কবীর ব্রাদার্স এন্ড কোং)

X [illegible] — X ক্রিমসন বীথিকা
(নতুনগড় : মইতর)

মনজুর মুর্শেদ — দুই নদী ও মেঘ
(আজকালী, খাই খাঞ্জা)

সুফিয়া কামাল — [illegible]
(সিলেট : [illegible])

মাতৃভাষা
(ঢাকা)

সৈয়দ আলী আহসান — নতুন সচিত্র (পৌষ ১৩৭৩)
(চট্টগ্রাম : বইঘর)

আলাউদ্দিন আল আজাদ — আধুনিক জার্মান কবিতা
(চট্টগ্রাম: জার্মান সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান)

Dhaka University Institutional Repository



| | |
|---|---|
| আবদুল কাদির শরীফ মুহাম্মদ | অবু ওয়াসির |
| | /বরিশাল : শরীফ পাবলিকেশন্স/ |
| | কাব্যাকুমার কারিমা |
| | /বরিশাল : শরীফ পাবলিকেশন্স/ |

১৯৬৭

| | |
|---|---|
| অলিউল্লাহ | রুদ্রাণী |
| | /ঢাকা : কবিতা বিতান/ |
| আ ন ম বজলুর রশীদ | শীতে বসন্ত |
| | /ঢাকা/ |
| আবদুল কাদির | উত্তর বসন্ত |
| | /ঢাকা/ |
| আবদুস সালাম খান | স্মৃতি রেখা |
| | /ঢাকা/ |
| আহসান হাবীব | রূপালি |
| | /ঢাকা : অবসর প্রকাশনী/ |
| কাজী আবদুল কাসেম | গানপ্রীতি মোর |
| | /ঢাকা/ |
| কামাল চৌধুরী | আমার দেশ |
| | /ঢাকা : কথাকাকলি/ |
| দেওয়ান আসাদুজ্জামান | অন্বেষা |
| | /কুষ্টিয়া : কবিতাকামা/ |
| আহমদ রফিক | নির্বাসিত নায়ক |
| | (ঢাকা: কোহিনূর লাইব্রেরী) |

Dhaka University Institutional Repository



| | |
|---|---|
| X রওশন আরা | X কাশিয়ার ফুলবাড়ি<br>/ঢাকা ঃ জাগৃতি/ |
| মুনশীর বাহের | মুক্ত মিছিল<br>/ঢাকা ঃ অনুপম/ |
| নেছার উদ্দিন | কালো গিলাফ<br>/ঢাকা ঃ বঙ্গবাজার লাইব্রেরী/ |
| পুলিনকুমার রায় | শ্রী বান্দুরা<br>/ঢাকা ঃ আমাদের দেশ প্রেস/ |
| মুস্তফা খান বাহাদুর | রাজু কাবুলার<br>/ঢাকা ঃ অপুর্ব প্রকাশনী/ |
| নজিবুর রহমান | লাখের প্রদীপ<br>/ত্রিপুরা ঃ নসরুল্লাবাদ/ |
| মোঃ আবুল কাসেম | অনুরাগ<br>/রংপুর ঃ মুরাদপুর/ |
| মোঃ আবুল খান | পরশ<br>/চট্টগ্রাম ঃ ইসলামিয়া লাইব্রেরী/ |
| সোহরাব খান শেরওয়ানী | কদম<br>/চট্টগ্রাম/ |
| সৈয়দ মোশাররফ হোসেন | এক ফোঁটা খান<br>/দিনাজপুর ঃ মঙ্গলবার সাহিত্য মন্দির/ |
| সাবিহা রহমান | সুঁই<br>/ঢাকা ঃ নদী/ |
| আনসুর রহমান | বিবিধ গীতিমালা<br>( ৮৮, ঢাকা : ১৯৮৩ ) |

Dhaka University Institutional Repository



| | |
|---|---|
| হাবিব [illegible] | [illegible] সংখ্যা (১৩৭৪) |
| খোকনের [illegible] | গল্প |
| | [illegible] একটি [illegible] |
| | অনুবাদ |
| | /ঢাকা : বাংলার [illegible]/ |
| [illegible] হোসেন | [illegible] |
| | /ঢাকা / শিশুদের জন্য বই/ |
| [illegible] কোরায়শী | [illegible] |
| | /ঢাকা : ইসলাম একাডেমী/ |
| [illegible] | [illegible] |
| | /ঢাকা : বাংলা একাডেমী/ |
| [illegible] | ইসলাম [illegible] |
| | /ঢাকা/ |
| আলী ইমাম | [illegible]-এর কবিতা ও গল্প |
| | (সম্পাদিত) |
| [illegible] আল [illegible] | [illegible] কবিতা |
| | (ঢাকা: [illegible] প্রকাশনী) |

Dhaka University Institutional Repository



১৯৬৬

আ ন ম মজলুর রশীদ — রুচি ও রেখা
(ঢাকা

আ ক ম সিরাজ উদ্দৌলা চৌধুরী — কখনো কান্না
(ঢাকা : সারস্বত প্রকাশনী)

আফজল হোসেন — শ্যামলী
(খুলনা : খুলনা লাইব্রেরী)

আবদুর রশীদ খান — বিধ্বস্ত সুর
(ঢাকা : সন্ধানী প্রকাশনী)

আবদুস সালাম চৌধুরী — কণ্ঠদীপ্ত
(বগুড়া : বর্ণ মেলা পাবলিশার্স)

আলমগীর জলীল — আগুন জ্বলা রাত
(ময়মনসিংহ : সাতরং)

আলী নওয়াজ — ছায়া মিছিল
(ময়মনসিংহ)

এস এম এ রশীদ — মুর্শিদ কাহিনী
(পাঁচিল, পাবনা)

জয় আলী — বাস্তুর দিকে
(কুষ্টিয়া)

কাজী মফিজউদ্দীন আহমদ — নতুন মেলা
(ঢাকা)

Dhaka University Institutional Repository



কাজী মাহবুবুর রহমান — বিবস্ত্র মধ্যাহ্ন
(ঢাকা : দি প্রিন্টার্স পাবলিশার্স)

কাজী নূর কাদের সিদ্দিকী — বিমুক্তিক
(বগুড়া)

কে এম সালাহউদ্দীন — এদেশ একটি
(ঢাকা : মনসেরা হোমিও হল)

খোন্দকার মোস্তফা মজুমদার — খোয়াবনির দুঃখ
(কুমিল্লা : রেসকোর্স)

ফকরুদ্দীন — অমর ভাবনা
(ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান)

জাহাঙ্গীর চৌধুরী — বটতলার রঙ
(ঢাকা : বপোতাকী)

জাহান আরা বেগম — কালের খাতা
(পাবনা : নওরোজ কিতাবিস্তান)

X জিয়া হায়দার — X কোটরের ইচ্ছেগুলো
(ঢাকা : সাইফিং বুক এজেন্সী)

নূরুল ইসলাম বাশারী — মাতৃশ্রী কাব্য
(কিশোরগঞ্জ)

~~দ্বিতীয়~~ খোদা — সূর্য মুখী দীপ
(ঢাকা)

মহসেন মুহম্মদ মোসতাকীর — কাকলী
(খুলনা, কাকলী)

সাগর তানু — হাতিয়ার তুলে নাও
(ঢাকা: চিলেকোঠা)

Dhaka University Institutional Repository




মফিজউদ্দিন আহমদ — বক্ষের বাঁশী
/ঢাকা : কবি কুটির/

মানিক মাহমুদ — কিছু বাঁশি
/সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা/

মোঃ নুরুল আমীন — দিনাজপুর দর্পণকাব্য
/পাহাড়পুর, দিনাজপুর/

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান — শিশুর নিশান
/ঢাকা : ক্যাকটি/

পতিত আলোক
/ঢাকা : ক্যাকটি/

রবি সুকান্ত ঘটক চৌধুরী — পূর্বাপর
/ঢাকা/

শহীদ কাদরী — উত্তরাধিকার
/চট্টগ্রাম : বইঘর/

শামসুর রাহমান — নিরালোকে দিব্যরথ
/ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স/

সানাউল হক — বিচূর্ণ আর্শিতে
/ঢাকা : সমকাল প্রকাশনী/

সাবেরা চৌধুরী — বীতু শিবির
/ঢাকা/

সিকান্দার আবু জাফর — কবিতা ১৩৭২
/ঢাকা : সমকাল প্রকাশনী/

Dhaka University Institutional Repository



সুফিয়া কামাল — প্রশস্তি ও প্রার্থনা
/ঢাকা/

সৈয়দ আলী আহসান — উচ্চারণ
/ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস/

X হাবিব ওয়াসুদ্দীন — X আহত ভ্রূণ
/ঢাকা/

হাসান হাফিজুর রহমান — অন্তিম শহরের মতো
/ঢাকা : সন্ধানী প্রকাশনী

আর্ত শব্দাবলী
/ঢাকা : মুক্তধারা/

আবুল হাসনাত কলিমুল্লাহ — শিকড়াহ
/ঢাকা : বাংলা একাডেমী/

ফজল শাহাবুদ্দিন — অন্যকোনোর কবিতা
/ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল/

শামসুর রাহমান — প্রেমের নির্বাচিত কবিতা
/ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল/

লেখক সংঘ প্রকাশনী — আফ্রো-এশীয় কবিতাগুচ্ছ

Dhaka University Institutional Repository



১৯৬৯

| | |
|---|---|
| আ ন ম বজলুর রশীদ | এক ঝাঁক পাখী<br>/ঢাকা : আহমাদ পাবলিশিং হাউস/ |
| আজিজুল আহমেদ | অন্যদিন : অন্য কবিতা<br>/রংপুর, সুকোজর/ |
| আতিকুল হক | কিছুক মুহূর্ত সূর্যকে<br>/ঢাকা : সমকাল প্রকাশনী/ |
| আবদুর রশীদ খান | বিমুগ্ধ সুর<br>রাজশাহী/ |
| আবদুর রহমান | স্মৃতিকণা<br>/চট্টগ্রাম : রহমান সন্স পাবলিকেশন্স/ |
| X আবদুল গণি হাজারী | X জাগ্রত দ্বীপে<br>/ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান/ |
| আবদুল মান্নান সৈয়দ | জ্যোৎস্না রৌদ্রের চিকিৎসা<br>/ঢাকা : সুখন/ |
| আবু বকর সিদ্দিক | ধবল দুধের স্বরগ্রাম<br>/ঢাকা : সাহিত্য শিল্প/ |
| আবুল হাসান | অবধির<br>/পাবনা : বনওয়ারী নগর/ |
| আবুল হোসেন | বিরস সংলাপ<br>/ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ/ |
| আবুল হোসেন মীর | চিত্ত সংলাপ ও [illegible]<br>([illegible]) |

Dhaka University Institutional Repository



ইমামুল কবির মুক্ত — চেতনার কাছে নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ
/ঢাকা : সূর্যচক্র/

ইন্দু সাহা — রক্ত বাসছে
/ঢাকা : মানসিঁড়ি প্রকাশনী/

ইমরুল চৌধুরী — অন্ধকার ব্যতিরেকে
/ঢাকা : সবুজ প্রকাশনী/

এ কে এম আবদুল হামিদ চৌধুরী — রক্তের মাটি
/ময়মনসিংহ/

এ কে মো আবদুল আজীম — গীতি মঞ্জিরা
/বগুড়া : আনোয়ার বুক ডিপো/

এম এম এ রশীদ — সূর্যশিখা
/ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান/

এম এম জাহাঙ্গীর হাসান কাদেরী — দীপশিখা
/ফরিদপুর : টাউন লাইব্রেরী/

ওমর আলী — নদী
/পাবনা : পদ্মা বুক/

ওহাব আজিজুল্লা — কামনা
/মাইজদী : নোয়াখালী/

কাজী মহিউদ্দীন — মনের দিবস
/ঢাকা : পলাশ প্রকাশনী

দিলওয়ার — উদ্ভিন্ন উল্লাস
/জোনাকি মার্কেট, সিলেট : সুরুচি প্রকাশনী/

জিয়া হায়দার — কৌটোর ইচ্ছেগুলো
(ঢাকা: আইডিয়াল বুক এজেন্সী)

Dhaka University Institutional Repository



| | |
|---|---|
| দিলওয়ার হোসেন | দ্বিতীয় সূর্য শপথের<br>/চট্টগ্রাম : কবি তীর্থ/ |
| মুহম্মদাখতার খান | নীল পুরাণ<br>/গাইবান্ধা/ |
| শিরণ বৈশিক | ছন্দের নাম সনেট<br>/এনায়েতপুর/ |
| কামাল সাহাবুদ্দিন | আকাশখিত অমৃত<br>/ঢাকা : বাংলা ব্রাদার্স/ |
| নাসের আলী মিয়া | দক্ষিণ দিগন্ত<br>/ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস/ |
| মনোয়ারা হাসী ও ইলেন হাসী | পলাশ পলক<br>/পাবনা : অনুলা/ |
| মুস্তাফিজুর রহমান | নিরবধি আলোকে আঁধারে<br>/রাজশাহী/ |
| সৈয়দ শামসুল হক | নিরুক্তিহীন উৎসব<br>/ঢাকা : সর্বমিত্র/ |
| | বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা<br>/ঢাকা : সন্ধানী প্রকাশনী |
| কাজী মোতাহার হোসেন | নিরন্তর<br>/ঢাকা/, শিশুদের জন্য নয় |
| রণেশ দাশগুপ্ত | ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতা<br>/ঢাকা : প্রকাশ ভবন/ |
| শামসুর রাহমান | বাবা ফরিদের কবিতা<br>/মুলতান : পরিবেশক পুঁথিপত্র, ঢাকা/ |

Dhaka University Institutional Repository



## ১৯৭০

| | |
|---|---|
| আবহাসানুল ইসলাম | উজান সমুদ্র<br>/ঢাকা : স্মারকা প্রকাশনী/ |
| আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী | এই দেশ এই মানুষেরা<br>/ঢাকা : সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ/ |
| আবদুর রশীদ খান | অবিরত স্বদেশ<br>/ঢাকা : সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ/ |
| আবদুল করিম মল্লা | সাঁঝ দরিয়ার তীরে<br>/টাঙ্গাইল/ |
| আবদুল হাই মাশরেকী | মাঠের কবিতা মাঠের গান<br>/ঢাকা : সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ/ |
| আবদুস সাত্তার | আমার ঘর নিজের বাড়ী<br>/ঢাকা : সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ/ |
| আবদুস সামাদ চৌধুরী | উত্তর মাদুলা<br>/নওগাঁ : বর্ণমেলা পাবলিশার্স/ |
| আবদুস সালাম খান | উদয়<br>/চট্টগ্রাম : সার্বা ইস্টার্ন হাউস/ |
| আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ | কখনো রং, কখনো সুর<br>/ঢাকা : বাংলা একাডেমী/ |
| আহমদ নওয়াব | মনালিকা<br>/ঢাকা : বন্ধু প্রকাশনী/ |
| আবদুল গনি হাজারী | অদ্ভুত দ্বীপে<br>(ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান) |

Dhaka University Institutional Repository




| | |
|---|---|
| আহমদ রফিক | রাত্রি শাণিতে মন<br>/ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান/ |
| ইন্দু সাহা | স্বজন<br>/ঢাকা : মানবিদ্যা প্রকাশনী/ |
| কে এম সামসের আলী | সম্মোহন<br>কলকাতা : শিবনাথ/ |
| গণেশ দাস | মিছিলের আর্তনাদ<br>/ঢাকা : প্রকাশ ভবন/ |
| জোবায়ের আলী | ভগ্ন সৈকত<br>/খুলনা : মোল্লা ব্রাদার্স/ |
| নির্মলেন্দু গুণ | প্রেমাংশুর রক্ত চাই<br>/ঢাকা : খান ব্রাদার্স/ |
| নুরুন্নেসা চৌধুরী | মহুয়ার পুঞ্জ নাম<br>/সিলেট/ |
| গোলাম মোহাম্মদ | পর্যায়ক্রম নেই<br>/চট্টগ্রাম : বোধিদ্রুম লাইব্রেরী/ |
| মকবুল হোসেন | চিত্রময়ে ফসলের দিনা<br>/ময়মনসিংহ/ |
| মযহারুল ইসলাম | মিছিলের প্রতিধ্বনি<br>/ঢাকা : পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন/<br>আর্তনাদ জিন্দা<br>/ঢাকা : পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন/ |

Dhaka University Institutional Repository




মাহমুদ আলম শেখ — মিত্রহীন
(ঢাকা : নিপুণাম প্রকাশনা কেন্দ্র)

মুসা মোহাম্মদ — নিলাম নেহাৎ
(রাজশাহী)

মুহম্মদ আবদুল হাকিম — এই বর্ষ, এই বাংলা বর্ষ
(রাজশাহী)

মুহম্মদ আবু নসর — আমার তোমার সবার গান
(যশোর, পলাশ প্রকাশন)

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ — রক্তিম জয়
(ঢাকা)

মোহাম্মদ রফিক — বৈশাখী পূর্ণিমা
(চট্টগ্রাম)

শামসুর রাহমান — নিজ বাসভূমে
(ঢাকা : আইডিয়াল লাইব্রেরী)

শামসুল আলম সাঈদ — সুবর্ণ
(চট্টগ্রাম : নিশিথ প্রকাশনী)

শামসুল হক কোরায়শী — মোহাজির কান্না
(রাজশাহী)

সাযযাদ কাদির — যথেষ্ট কুসুম
(ঢাকা : নন্দন প্রকাশনী)

সুফিয়া কামাল — মৃত্তিকার ঘ্রাণ
(ঢাকা : বাংলা বাজার)

Dhaka University Institutional Repository



| | |
|---|---|
| আবদুল মান্নান সৈয়দ | মাতাল মানচিত্র<br>/ঢাকা : শিল্পকলা/ |
| সানাউল হক | ইতাবসরের পুত্রের কবিতা<br>/ঢাকা : বাংলা একাডেমী/ |

১৯৭১

| | |
|---|---|
| আ ন ম মজনুর রশীদ | মেঘ সোহাগ<br>/ঢাকা : বর্ণমিছিল/ |
| আবদুস সাত্তার | অনুভব বসতি<br>/ঢাকা : সাদীন ব্রাদার্স/ |
| ইনামুল কবির সুজা | নির্বাসিত পিপাসা<br>/ঢাকা : সূবনী চক্র/ |
| মোরশেদ শফিউল হাসান | যাই যাই ভয়<br>/চট্টগ্রাম : উত্তরাশা প্রকাশন/ |

Dhaka University Institutional Repository



# গ্রন্থপঞ্জী

## ক. সহায়ক গ্রন্থ : বাংলা


অনীল মুখার্জী — স্বাধীন বাংলাদেশ সংগ্রামের পটভূমি, ঢাকা : স্বদেশ প্রকাশনী, ১৩৭৯।

অমলেন্দু দে — বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, কলকাতা : ১৯৭৪।

অমিতাভ গুপ্ত — বাংলাদেশ, নতুন সংস্করণ, কলকাতা : আনন্দধারা প্রকাশন, ১৩৭৮।

আকবর উদ্দীন — কায়েদে আজম, ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৯।

আজাদ সুলতান (সম্পাদনা) — আফ্রিকার হৃদয়ে সূর্যোদয়, ঢাকা : পাক কিতাব ঘর, ১৯৬৮

আতাউর রহমান খান — স্বৈরাচারের দশ বছর, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭০।

আনোয়ারা বাহার চৌধুরী ও শওকত ওসমান (সম্পাদনা) — হাবীবুল্লাহ বাহার, বাহার স্মৃতি কমিটি, ১লা বৈশাখ, ১৩৭৭।

আব্বাস উদ্দিন আহমদ — আমার শিল্পী জীবনের কথা, ২য় সং, ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৫।

আবু জাফর শামসুদ্দীন — চিন্তার বিবর্তন ও পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্য, ঢাকা : পাকিস্তান কমিটি ফর কালচারাল ফ্রিডম, ১৯৬৪।

Dhaka University Institutional Repository




আবুল কালাম শামসুদ্দীন — দৃষ্টিকোণ, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৩৬৮

অতীত দিনের স্মৃতি, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৮

আবুল কাসেম ফজলুল হক — মুক্তি সংগ্রাম, ঢাকা : বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭২

আবুল কাসেম — একুশ দফার রূপায়ণ, ঢাকা : ১৯৫৪

আবুল মনসুর আহমদ — আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ২য় মুদ্রণ, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭০

আবুল ফজল — রেখাচিত্র, ২য় সং, চট্টগ্রাম : বইঘর, ১৯৬৮

আব্দুর রহমান — মুক্তির পথে পথে, চট্টগ্রাম : ১৯৭২

অমলেন্দু দে — বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রসঙ্গে, কলকাতা : ১৯৭১

কামরুদ্দীন আহমদ — পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি, ঢাকা : স্টুডেন্টস পাবলিকেশন্স, ১৩৭৬

বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ, ২য় খণ্ড, ঢাকা : ইনসাইড লাইব্রেরী, ১৩৮২

কামরুদ্দিন আহমদ — আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, ঢাকা, প্রকাশের তারিখ নেই

খোন্দকার আব্দুল খালেক — এক শতাব্দী ধরে বাংলার জীবন, ২য় সং, ঢাকা : মুক্তধারা ভবন, ১৩৭৩

খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস — ভাসানী যখন ইউরোপে, ঢাকা : ১৯৫৮

Dhaka University Institutional Repository



গোলাম মোস্তফা — আমার চিন্তাধারা, ২য় সং, /ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৮/

ছদরুদ্দীন — দেশ-কাল-পাত্র, /ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৬/

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী — শব্দের সীমানা, /ঢাকা : ১৯৭৬/

দেওয়ান আবদুল হামিদ — কবি জুলফিকার হায়দার /জীবন ও সাহিত্য/, /ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬২/

ধনঞ্জয় দাশ — আমার জন্মভূমি : স্মৃতিময় বাংলাদেশ, ২য় মুদ্রণ, /কলকাতা : মুক্তধারা, ১৯৭৮

ফিরোজা খাতুন /সংগ্রহ ও সম্পাদনা/ — কবি গোলাম মোস্তফা, /ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৭/

মহে আলী মিয়া — কবি গোলাম মোস্তফা, /ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৫/

বদরুদ্দীন উমর — পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, /ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স/, ১ম খণ্ড ১৯৭০, ২য় খণ্ড ১৯৭২

বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমস্যা, /ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭৬/

বিপ্লদাস বড়ুয়া — কবিতায় মুক্তিযুদ্ধ (ঢাকা: মুক্তধারা, মে ১৯৭৬)

মনসুর মুসা /সম্পাদনা/ — বাংলাদেশ, /ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৪/

মযহারুল ইসলাম — বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, /ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪/

মাহফুজা খাতুন /সম্পাদনা/ — গোলাম মোস্তফা পুষ্প সংকলন, /ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৮/

Dhaka University Institutional Repository




মুহম্মদ আবদুল হাই (সম্পাদনা) — ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ, (ঢাকা : বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৭০)

মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান — বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় সং, (চট্টগ্রাম : বইঘর, ১৯৭০)

(ডঃ) মুহম্মদ এনামুল হক — মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ৩য় সং (ঢাকা : পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ১৯৬৮)

(ডঃ) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ — ইসলাম, পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ, (ঢাকা : রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৫৮)

মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম — পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টি, ২য় খণ্ড, (ঢাকা : ইস্ট পাকিস্তান স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড, ১৯৭০)

মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ — আমাদের মুক্তিসংগ্রাম, ২য় সং, (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৭)

যুগবিচিত্রা, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৬৭)

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ — বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য, (ঢাকা : ওসমানিয়া বুক ডিপো, ১৩৭৯)

নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা, পরিবর্ধিত ২য় সং, (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৯)

সমকালীন সাহিত্যের ধারা, (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৫)

রণেশ দাশগুপ্ত — লেখকের চোখে শরৎচন্দ্র, (ঢাকা : আদিকাল প্রকাশনী, ১৯৭৭)

শ্রীশচন্দ্র দাশ — সাহিত্য সন্দর্শন ৪র্থ সংস্করণ (কলকাতা : ১৩৬৩)

Dhaka University Institutional Repository




আবদুল হক/সম্পাদনা/ — বাংলা সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জী ১৯৪৭-১৯৬৯, /ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ১৯৭০/
বাংলা সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জী ১৯৭০-৭১, ঐ, ১৯৭২
বাংলা সাময়িক পত্র, /ঢাকা : গ্রন্থায়ন, ১৯৭৩

সরলানন্দ সেন — ঢাকার চিঠি, ১ম খণ্ড, /কলকাতা : মুক্তধারা, ১৯৭১

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী — আরণ্যক দৃশ্যাবলী, /ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৭৫/

সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় — কবি নজরুল ইসলাম, /ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৯/

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন — বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ও বাংলাদেশের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, /ঢাকা : আনুমানিক ১৯৭২

সৈয়দ আলী আহসান — আধুনিক বাংলা কবিতা: শব্দের অনুষঙ্গে (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৭০

/ডঃ/ হাসান জামান — সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য, /ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮
শতাব্দী পরিক্রমা, /ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৪/, সম্পাদিত

হাসান হাফিজুর রহমান — আধুনিক কবি ও কবিতা, /ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৫.
সাহিত্য প্রসঙ্গ (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩)

/ক্ষিতীশ রায় দেব (সম্পাদনা) — সাহিত্যলেখা, /কলকাতা : ১৮৭৯ শকাব্দ/

স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের রূপরেখা, প্রকাশক : মোঃ খলিলুর রহমান, /ঢাকা : ১৩৭৮

Dhaka University Institutional Repository



## খ. সহায়ক গ্রন্থ ঃ ইংরেজি


A. Sadeque — The Economic Emergence of Pakistan (with special reference on East Pakistan), Part I, (Dacca : 1954)

Abu Jafar Shamsuddin — Sociology of Bengal Politics, (Dacca : Bangla Academy, 1973)

Abul Hashim — In Retrospection, (Dacca : Mowla Brothers, 1974)

Arnold Hauser — Social History of Art, 2 Vols., Reprinted, (London : Routledge & Kegan Paul, 1968)

Ayub Khan — Friends Not Masters, (Karachi : Oxford University Press, 1967)

Christopher Caudwell — Illusion and Reality, (London : Lawrence and Wishart, 1958)

C.M. Bowra — Poetry and Politics 1900-1960, (Cambridge : University Press, 1966)

D.I. Chesnokov — Historical Materialism, (Moscow : Progress Publishers, 1969)

D. Wise & T.B. Ross — CIA : The Invisible Government, (USA : Random House, Inc. 1964)

David Daiches — The Place of Meaning in Poetry, (London, Edinburgh: Oliver & Boyd, 1935)

G.W. Choudhury — Documents And Speeches on the Constitution of Pakistan, (Dacca : Green Book House, 1967)

Constitutional Development in Pakistan, 2nd ed. (London : Longman, 1969)

Herbert Feldman — Revolution in Pakistan, (London : Oxford University Press, 1967)

From Crisis to Crisis, Pakistan 1962-69, (London : Oxford University Press, 1972)

J. Isaacs — The Background of Modern Poetry, (London : G. Bell & Sons Ltd., 1951)

J.V. Cunningham — Tradition And Poetic Structure, (USA, Denver : Alan Swallow, 1960)

Dhaka University Institutional Repository



Jamil-UD-Din Ahmad (Collected & edited) — Speeches and Writings of Mr. Jinnah, reprinted, (Lahore : Sh Muhammad Asraf, 1964)

Kamruddin Ahmed — A Social History of East Pakistan, 2nd ed. (Dacca : Cresent Book Store, 1967)

Karl Von Vorys — Political Development in Pakistan, (USA, Princeton : Princeton University Press, 1965)

Keith Callard — Pakistan A Political Study, (London : Allen & Unwin, 1957)

(Dr) Mahbub-UD-Din Ahmed — Urban Housing Development Survey of Bangladesh, A Research Report, (ISRT, University of Dacca, 1974)

Mao Tse-Tung — On Literature And Art, 3rd ed., (Peking : Foreign language Press, 1967)

Poems (Peking : Foreign Language Press, 1976)

Mohan Ram — Indian Communism, (Delhi : Vikas Publications, 1969)

Mussafar Ahmed Chaudhury — Government And Politics in Pakistan, (Dacca : Puthighar, 1968)

Mustaq Ahmed — Government and Politics in Pakistan, 2nd ed. (Karachi : Pakistan Publishing House, 1963)

Rehman Sobhan — Basic Democracies, Works Programme and Rural Development in East Pakistan, (University of Dacca : Bureau of Economic Research, 1964)

Rounaq Jahan — Pakistan : Failure in National Integration, (Dacca : Oxford University Press, 1977)

S. Sajjad Husain (editor) — Report : Dacca University Seminars on Contemporary Writing in East Pakistan, (University of Dacca : Department of English, 1957)

Serajuddin Hussain — Look into the Mirror, (Dacca : Khoshroz Kitab Mahal, 1974)

Syed Qamrul Ahsan — Politics and Personalities in Pakistan, Revised ed. (Dacca : 1969)

Dhaka University Institutional Repository




| | |
|---|---|
| Syed Sharifuddin Pirzada | Foundations of Pakistan, (All-India Muslim League Documents : 1906-1947), (Karachi : National Publishing House Ltd. 1970). |
| Talukder Maniruzzaman | The Politics of Development, The case of Pakistan 1947-58, (Dacca : Green Book House Ltd., 1971) |
| | Radical Politics and the Emergence of Bangladesh, (Dacca : Bangladesh Book International Ltd. 1975) |
| Tariq Ali | Pakistan Military Rule of Peoples' Power, (New York : William Morrow And Company, Inc. 1970) |
| Terry Eagleton | Marxism And Literary Criticism, (London : Methuen & Co. Ltd. 1976) |
| (Centre For Urban Studies) | Squatters In Bangladesh Cities, (University of Dacca, Department of Geography, 1976) |
| .. .. | Bengali And Urdu : A Literary Encounter, A Seminar, (Dacca : Bengali Academy, 1964) |
| | Literary Prizes in Pakistan, 2nd ed. (Dacca : National Book Centre, 1969) |
| | Pakistan Year Book 1949(Karachi : Kitabistan) |
| A Faruk, A.N.M. Muniruzzaman, T. Islam | Science Trained Manpower (University of Dacca : Bureau of Economic, 1972) |
| Mirza Shahjahan | Agricultural Finance in East Pakistan (University of Dacca : Deptt. of Economics, 1968) |

গ. সহায়ক পুস্তক ঃ বাংলা


| | |
|---|---|
| আবু হেনা মোস্তফা কামাল | বাংলাদেশের কবিতা ঃ একটি সামাজিক সমীক্ষা, মাসিক সমকাল, ফাল্গুন, ১৩৬৩, ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা। |
| আবুল কালাম শামসুদ্দীন | ফররুখ আহমদের মহাকাব্য ঃ হাতেম তায়ী, মাসিক পূবালী, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা |
| আব্দুল গনি হাজারী | কালায়নের কবি ঃ সিকানদার আবু জাফর মাসিক বই, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ-৫ম সংখ্যা, জুন-জুলাই ১৯৭০ |
| | সংস্কৃতি চিন্তা, হায়াত মামুদ (সম্পাদনা), সব্যসাচী পুরুষ, (ঢাকা ঃ পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ১৩৭৭) |
| আবদুল মান্নান সৈয়দ | সিকানদার আবু জাফরের একটি কবিতা মাসিক বই, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ-৫ম সংখ্যা, জুন-জুলাই ১৯৭০ |
| আব্দুল হাফিজ | সিকানদার আবু জাফরের কবিতা-ভুবন, মাসিক সমকাল, ৮ম বর্ষ, মাঘ ১৩৬২ |
| আব্দুস সাত্তার | কবি আজিজুল হাকিম, মাহে নও, মার্চ ১৯৬২ |
| (ডাঃ) আরিফুর রহমান ও আবু মোহাম্মদ | ঢাকার পত্রিকালয় সাপ্তাহিক বিচিত্রা, মার্চ ৮, ১৯৭৭ |
| আহমদ শরীফ | এবারের সাংস্কৃতিক সম্মেলনে, দৈনিক ইনসাফ, আশ্বিন ১২, ১৩৫৯ |
| এম, নজরুল ইসলাম | কৃষক শ্রমিক পার্টি (অপ্রকাশিত), ১৯৭৪ সালের ১০ – ১৪ই জানুয়ারী বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক আয়োজিত উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক সেমিনারে পঠিত। |

Dhaka University Institutional Repository

| | |
|---|---|
| কবীর চৌধুরী | আবদুল গনি হাজারীর কাব্যবিচার : একটি ভূমিকা, সাঁকো /সাহিত্য সাময়িকী/, ১৯৭৭ |
| আবদুল হাসান | ফজলুর ভাই, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, নভেম্বর ১, ১৯৭৪ |
| নুরুল্লাহ শাহাব | লেখক ও লেখকের স্বাধীনতা, মাসিক মোহাম্মদী, ফাল্গুন ১৩৬৫ |
| মোক্তার আবদুল হাকিম | বাংলার স্বার্থের প্রশ্নে মেরে বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক, এপ্রিল ২৭, ১৯৭৪ |
| গোলাম মোস্তফা | বাঙালী জনকের ইতিহাস, নওবাহার, ফাল্গুন ১৩৫৯ |
| /ডঃ/ রাশিদ ইকবাল | লেখকদের জাতীয়তা ও ধর্মনিরপেক্ষতা, মাসিক মোহাম্মদী, ফাল্গুন ১৩৬৪ |
| তালিম হোসেন | নজরুল একাডেমী, নজরুল একাডেমী পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, গ্রীষ্ম ১৩৭৬ |
| দেওয়ান আবদুল হামিদ | পল্লীকবি রওশন ইজদানী, মাহে নও, পৌষ ১৩৭৪ |
| ফররুখ আহমদ | পাকিস্তান : রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য, সওগাত, আশ্বিন ১৩৫৪ |
| মহিউদ্দীন | চট্টগ্রামে সাড়ে তিনদিন, মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ ১৩৬৫ |
| | দেখে এলাম করাচী, মাসিক মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬ |
| /ডঃ/ মুহম্মদ এনামুল হক | পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উর্দু ও বাংলা, মাসিক কৃষ্টি, নভেম্বর ১৯৪৭ |
| /জেনারেল/মোঃ আইউব খান | পাকিস্তানের সংহতি ও লেখকদের ভূমিকা, মাসিক মোহাম্মদী, ফাল্গুন ১৩৬৫ |

Dhaka University Institutional Repository




মোঃ নাসির আলী — করাচী লেখক সম্মেলন,
মাসিক মোহাম্মদী, ফাল্গুন ১৩৬৫

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান — বেগম সুফিয়া কামালের কবিতা :
মাসিক সই, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৬৭

সিকান্দার আবু জাফরের সাহিত্যসাধনা
মাসিক সই, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ-৫ম সংখ্যা, জুন-জুলাই ১৯৭০

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ — আজিজুল হাকিম, মাসিক পূবালী, ফাল্গুন ১৩৬৬

মুহূর্তের কবিতা — একটি সমীক্ষার সূত্র,
মাসিক পূবালী, কার্তিক ১৩৭০

মোহাম্মদ মোদাব্বের — নতুন আলোকে সিকান্দার আবু জাফর
মাসিক সমকাল, ৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৬২

রশীদ আল ফারুকী — শিল্পের অজ্ঞাত যাত্রা (আল মাহমুদের কবিতার
আলোচনা), মাসিক উত্তরাধিকার, মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৫

আতাউর রহমান — আমার আপন ঢাকা
সাপ্তাহিক বিচিত্রা, এপ্রিল ৮, ১৯৭৫

ঐতিহ্যবোধ ও আধুনিক বাংলা কবিতা,
শারদীয় সংখ্যা, পূর্বদেশ

সরদার ফজলুল করিম — বাঙালী সংস্কৃতি-চিন্তা,
বাংলাদেশ, মফজুল মুল্লা সম্পাদিত, (বাংলা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান,
১৯৭৪

বাংলাদেশের রাজনীতি ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী,
বাংলাদেশের সামাজিক অগ্রগতির সমস্যা (বাংলাদেশ
লেখক শিবির), ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৭৫

Dhaka University Institutional Repository




সাইদুর রহমান /১/ — নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের গোড়াপত্তন, [illegible] /অনিয়মিত পত্রিকা/, ঢাকা জুন ১৯৭৬

সাইফ-উর রহমান /১/ — আইয়ুব খানের আমলে জাতীয় ভাষা সৃষ্টির চেষ্টা ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৭৪

তিনটি সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৭৬

সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন : কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম, পাণ্ডুলিপি, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯৭৬

সাইদুনা ইয়াসমীন বানু — বাংলাকে যেমন দেখেছি, ঢাকা ডাইজেস্ট, নভেম্বর ১৯৭৪

সারওয়ার কাদির — এখন কবির প্রতিকৃতি আহসান হাবীব, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, নভেম্বর ৪, ১৯৭৭

সিকদার আমিনুল হক — কবি আহসান হাবীব, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, নভেম্বর ৪, ১৯৭৭

সৈয়দ আবুল মকসুদ — মাটি ও মানুষের কবি /সোনাউল হকের কবিতা সম্পর্কে আলোচনা/, ত্রৈমাসিক সংলাপ, ২৩।৪।৭৮

সৈয়দ আলী আহসান — পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যের ধারা, মাহে নও, আগস্ট ১৯৫১

হুমায়ুন আজাদ — শামসুর রাহমানের কবিতা, সন্ধ্যা /ছোট পত্রিকা/, ১ম খণ্ড, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৪


---

(১) ও (২) একই ব্যক্তি

Dhaka University Institutional Repository



পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির কার্য বিবরণী,
মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৫১

বাংলা একাডেমীর সাংস্কৃতিক সপ্তাহ,
দৈনিক পাকিস্তান, জুন ১, ১৯৬৬

বাংলা একাডেমীর একটি স্মরণীয় সপ্তাহ,
মাসিক মাহে নও, কার্তিক ১৩৭২

মহাকবি সুলোচনের সম্পর্কে বিশেষ বিচার,
দৈনিক পাকিস্তান, জুলাই ১১, ১৯৬৬

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি,
মাহে নও, নভেম্বর ১৯৬৫

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি,
মাহে নও, জানুয়ারি ১৯৬৬

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি,
মাহে নও, ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬

Dhaka University Institutional Repository

## খ. সহায়ক প্রবন্ধ ঃ ইংরেজি


| | |
|---|---|
| Abdul Hameed Khan | The left in East Bengal-II, The Marxist Divide, Forum (Weekly), Dece; 26, 1970 |
| M. Rashiduzzaman | The National Awami Party of Pakistan : Leftist Politics in Crisis, Pacific Affairs, Fall 1970 |
| | The Pakistan National Assembly Under the 1962 Constitution, Pacific Affairs, Winter 1969-70 |
| | The Awami League in the Political Development of Pakistan, Asian Survey, Vol. 10, 1970 |
| Mizanur Rahman Shelley | Focus on Poetry : Two Poets, Bengali Academy Journal, Vol. I, No. 1, April 1970 |
| Swadesh R. Bose | Trend of Real Income of the Rural Poor in East Pakistan, Pakistan Development Review, Vol.VIII |
| S.J. Burki | Ayub's Fall : A Socio-Economic Explanation, Asian Survey, No. 3, Vol. XII, March 1972 |
| Wayne Wilcox | Pakistan in 1969 : Once again in the starting Point, Asian Survey, Feb. 1970 |

Dhaka University Institutional Repository



৪. একুশের সংকলন

| | |
|---|---|
| হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদনা) | একুশের ফেব্রুয়ারি, ১ম সং ১৯৫৩, ২য় সং ১৯৬৫, /ঢাকা: পুঁথিপত্র/ |
| আখতার হোসেন ও আবু সালেহ /সম্পাদনা/ | চিচিং ফাঁক, /ঢাকা : ১৯৬৯/ |
| চাতক চক্র | একুশ, /১৯৬৯/ |
| পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন | রক্ত পলাশ, /রাজশাহী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, ১৯৬৯/ |
| পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন | শপথ, /ঢাকা : সলিমুল্লাহ মুসলিম হল শাখা, ১৯৬৯/ |
| পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন | ইস্পাত, /ঢাকা : প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, ১৯৭০/ |
| বাংলা একাডেমী | একুশের সংকলন, /ঢাকা : ১৯৭৮ |

Dhaka University Institutional Repository



চ. সরকারী প্রকাশনা

১ জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট, (শিক্ষা দফতর, জানুয়ারী–আগস্ট ১৯৫৮

২ পূর্ব পাকিস্তানের সভী সম্পর্কে প্রস্তাব, (ঢাকা : তথ্য ও জাতীয় বিষয়ক দফতর, আগস্ট ১৯৫৮

৩ Report of the East Bengal Language Committee 1949, (Dacca : East Pakistan Government Press)

৪ East Pakistan Assembly Proceedings, Official Report, June 1958

৫ Constituent Assembly of Pakistan Debates, Official Report, October, 1953

৬ National Assembly of Pakistan, Parliamentary Debates, Official Report, February 1957 and June 1967

৭ Pakistan Chronology, 1966 (Ministry of Information and Board Casting, Government of Pakistan, 1967)

৮ Statistical Digest of East Pakistan, No. 5, 1968, (Dacca : East Pakistan Bureau of Statistics)

৯ Twenty years of Pakistan 1947-67 (Ministry of Information and Broad Casting, Government of Pakistan, 1967)

১০ Statistical Information on Education in East Pakistan, (Dacca : Directorate or Public Instruction, 1970)

Dhaka University Institutional Repository



## ছ. রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র ও ম্যানিফেস্টো প্রভৃতি

১ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের খসড়া ম্যানিফেস্টো, (জেনারেল সেক্রেটারী শামসুল হক এম এ কর্তৃক প্রকাশিত, প্রকাশের তারিখ নেই)

২ মুসলিম লীগ, যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী লীগ আমলের তুলনামূলক খতিয়ান, (পূর্ব পাক আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক হাফেজ হাবীবুর রহমান কর্তৃক প্রকাশিত, প্রকাশের তারিখ নেই)

৩ পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিসের নয়া গঠনতন্ত্রের খসড়া, (প্রকাশের তারিখ নেই)

৪ ন্যাপের ১৪ দফা : জাতীয় মুক্তির কর্মসূচী, (যুগ্ম সম্পাদক মহিউদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত, প্রকাশের তারিখ নেই)

৫ Constitution and Rules of the Pakistan Muslim League, (Published by S. Shamsul Hassan, Karachi, No date of publication)

৬ Constitution of the East Pakistan Provincial Muslim League, as passed in the Council Meeting held at Dacca on 12.10.52.

Dhaka University Institutional Repository



## ঘ. পুস্তিকা, প্রচারপত্র, স্মরণিকা


১ ... পাকিস্তান যুব সম্মেলন, (ঢাকা : ৩৬ নং [illegible] স্ট্রীট, প্রকাশের তারিখ নেই)

২ [illegible] (সম্পাদনা) সংস্কৃতি সংসদ স্মরণে, (সংস্কৃতি সংসদ, হেমন্ত ১৩৭২)

৩ আ.ন.ম. [illegible] (সম্পাদক) ছায়ানট সঙ্গীত বিদ্যায়তন ১৩৮০

৪ জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা নব পর্যায়ে জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা — জনগণের অভিমত, ১৯৭০, (ঢাকা : জুলাই ১৯৭০)

৫ 'সংগ্রামী ছাত্র সমাজের ডাক : এগার দফার দাবীতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলুন' — (প্রচার পত্র, ১৯৬৯)

৬ 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার ১১ দফা কর্মসূচী', পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষে আব্দুল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত, (পুস্তিকা, ফেব্রুয়ারী ২২, ১৯৭০)

৭ 'লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণের পূর্ণ বিবরণ' — (পুস্তিকা আকারে প্রচারিত, তারিখ বিহীন)

৮ 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচী' — ইশতেহার নং এক (১৯৭১)

৯ 'সুফী মোতাহার হোসেন সাহিত্য পুরস্কার : ১৯৭৬' স্মরণিকা (বাংলা সাহিত্য পরিষদ)

Dhaka University Institutional Repository

খ. ভাষণ/অভিভাষণ

১ পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন : কুমিল্লা /১৯৫২/, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ

২ পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন : কুমিল্লা /১৯৫২/, মূল সভাপতি আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের অভিভাষণ

৩ পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন /১৯৫৪/, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ

৪ পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন /১৯৫৪/, মূল সভাপতি ডঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, বিশিষ্ট অনুসন্ধান বিশারদ-এর অভিভাষণ

৫ পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন /১৯৫৪/, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর উদ্বোধনী ভাষণ

৬ পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন /১৯৫৪/, যুগ্ম সম্পাদকের রিপোর্ট

৭ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে /কাগমারী/ সভাপতি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর অভিভাষণ /১৯৫৭/

৮ পূর্ব পাকিস্তান পাট চাষী কনফারেন্সে /টাঙ্গাইল/ মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর অভিভাষণ /১৯৬৭/

৯ প্রাদেশিক কৃষক সমিতির কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর অভিভাষণ /১৯৬৭/